বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯৪৭-২০০০) : উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন

(The Political Novels of Bangladesh (1947-2000): A Post-colonial Study)

জাহিদ হাসান সরকার



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯৪৭-২০০০) : উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন

(The Political Novels of Bangladesh (1947-2000) : A Post-colonial Study)

গবেষক

জাহিদ হাসান সরকার

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

পুনঃভর্তির শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৪৯/২০১৬-২০১৭

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০২৬

Dhaka University Institutional Repository

ভীষ্মদেব চৌধুরী পিএইচ ডি
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
মুঠোফোন : ০১৭১১ ২২২ ১২২

Bhishmadeb Choudhury Ph D
Professor, Department of Bangla
University of Dhaka
Dhaka 1000
Mobile : 01711 222 122

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জাহিদ হাসান সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯৪৭-২০০০) : উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন' (The Political Novels of Bangladesh (1947-2000) : A Post-colonial Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এতে প্রকাশিত প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত মৌলিক। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক ইতঃপূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। এর কোনো অংশ গবেষক কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেননি।

(অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯৪৭-২০০০) : উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন' (The Political Novels of Bangladesh (1947-2000) : A Post-colonial Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের অধীনে আমার নিজস্ব রচনা। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয়নি। এতে ব্যবহৃত প্রাথমিক তথ্য ও সহায়ক তথ্য-উপাত্তের সূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব।



(জাহিদ হাসান সরকার)
পিএইচ ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৪৯/২০১৬-২০১৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
পুনঃভর্তির শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমি ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে পিএইচ ডি প্রোগ্রামে নাম নিবন্ধন করি। আমার গবেষণা-অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস (১৯৪৭-২০০০) : উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন' (The Political Novels of Bangladesh (1947-2000) : A Post-colonial Study)। অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমার গবেষণাকর্মটি তত্ত্বভিত্তিক এবং এই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবিস্তার, উপনিবেশবিরোধী লড়াই ও পরিণতিতে স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতা দেশে ঔপনিবেশিকতা জায়মান থাকার প্রকাশ্য ও সংগুপ্ত বিস্তৃত ইতিহাস। ইতিহাস-আশ্রয়ী এই তত্ত্বীয় সাহিত্যবিশ্লেষণের এই গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, ক্ষেত্রবিশেষে উপকরণ জুগিয়ে এবং সর্বোপরি আমাকে গবেষণাকর্মে ব্যস্ত রেখে অভিভাবকসুলভ তত্ত্বাবধানে এবং উপস্থাপিত প্রবন্ধ বারবার পঠনের একনিষ্ঠ পরিশ্রমে তিনি আমার গবেষণাকে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমার গবেষণাকর্মে নানাভাবে অকৃত্রিম সহযোগিতা জুগিয়েছেন শ্রদ্ধেয় স্যার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, বন্ধু কাজী শাহজাহান, বন্ধু অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম, অকৃত্রিম সুহৃদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, বন্ধু আমজাদ হোসেন শিশির। সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। আমার গবেষণাকর্মের প্রেরণার উৎস ছিলেন প্রিয় বৌদি সমর্পিতা চৌধুরী। তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নাছিমা আক্তারের প্রতি। আমার স্ত্রী অধ্যাপক আমিনা আক্তারের প্রতি প্রকাশ করছি হৃদয়মথিত কৃতজ্ঞতা। বলাবাহুল্য, আমার অভিসন্দর্ভ রচনায় তাঁর ধৈর্য, সমর্থন, প্রেরণা, পরামর্শ ও সহযোগিতার ব্যাপ্তির তুলনায় কৃতজ্ঞতা অপ্রতুল। আমার মা আর দুই সন্তান, যাদের বিপুল ত্যাগ আছে আমার এই গবেষণাকর্মে, তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসা। স্বজন, সুহৃদ, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মী যাঁদের সহযোগিতা ও প্রেরণা আমার গবেষণাকর্মটিকে সহজ করেছে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাকে ফেলোশিপ প্রদান করে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করার জন্য ইউজিসি কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মচারীগণের প্রতি। গবেষণাকর্মে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার কারণে আমি তাঁদের কাছে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের গবেষণা শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরো অনেকের কাছেই ঋণ প্রকাশের দায় আছে, নাম প্রকাশ না করেই তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবনত কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

কৃষি-উৎপাদনকেন্দ্রিক বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সামন্তব্যবস্থায় বাঙালি জনমানসে রাষ্ট্র ও রাজনীতি ছিল অনুপস্থিত। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সর্বগ্রাসী উপস্থিতিতে বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণকাঠামোটি ভেঙে যায়; ঔপনিবেশিক রাজনীতির ছত্রছায়ায় জনজীবনে রাষ্ট্রের প্রবল আবির্ভাব ঘটে। উপনিবেশবাদের নিয়মে ভূমি-দখলের পাশাপাশি উপনিবেশকরা উপনিবেশিতের চেতনা-দখলের প্রয়াস চালায়। সময়-পরিক্রমায় দেশ উপনিবেশ-মুক্ত হলেও উপনিবেশের সংস্কার ও মূল্যবোধ চেতনালোক থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। উপনিবেশের অবশেষ এবং ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণাগুলো নানামাত্রায় নানাভাবে আমাদের জীবনে রয়ে গেছে এবং আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে এই প্রভাবগুলো খোঁজাই আমাদের এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব হলো সাবেক উপনিবেশগুলোর জনগোষ্ঠীর নিজেকে চেনার ও নিজের আলোয় বিশ্বকে দেখার এক জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি। ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাবে উপনিবেশগুলোর নিজস্ব কাঠামো ভেঙে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপনিবেশিত রাষ্ট্রের পুরো কাঠামোটি যে জটিল চারিত্র্য পরিগ্রহ করেছে তার তত্ত্ব-সন্ধান করা এবং রাজনৈতিক বিউপনিবেশায়নের (decolonization) পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মুক্তির সামগ্রিক রূপরেখা অন্বেষণ করা উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের উপজীব্য।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের ঔপনিবেশযুগে প্রবেশ। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ই বাঙালির ইতিহাসের প্রথম পরাজয়; এই প্রথম সে পরাজিত হলো সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের হাতে। বাঙালি পরিগণিত হয় ইউরোপের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থান্ধ-প্রেরণায় সৃষ্ট ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার নতুন রাজ্যের প্রজা। পলাশীর অব্যবহিত ফল ছিল বাংলার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চূড়ান্ত পতন। জমিদার-তালুকদার এই ব্যবস্থার মধ্যে নিপীড়কশক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। তাদের নিপীড়নে এদেশের মানুষ চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়েছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ ভূমিহীন প্রজায় পরিণত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অর্থনৈতিক শোষণেই তৃপ্ত থাকে না, শাসনটাকে স্থায়ী ও সর্বময় করার উদ্যোগ নেয়। এর জন্য রাষ্ট্র আর জনজীবনের বাইরে বসে শাসন করার নীতি পরিবর্তন করে। শাসনটাকে শেকড়ে-বাকড়ে পৌঁছে দিতে দখল করা ভূমির জনজীবনকে নতুন করে নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের এই নবনির্মাণের প্রয়াসের নামই উপনিবেশায়ন। আমলা-পুলিশ-আইন-বিচার সবকিছু মিলিয়ে একটি কঠোর প্রকৃতির প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে।

ইউরোপীয় ঘরানায় বাংলার ভূমি-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয় এবং জমির মালিকানা তুলে দেওয়া হয় জমিদারদের হাতে। এই ব্যবস্থায় জমিদাররা ইচ্ছামতো খাজনা আদায়ের অধিকার পায়। তাদের জুলুমের প্রতিরোধ আসলে তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পুলিশ আসে। এই পুলিশের হাতে নির্যাতনের অপরিসীম ক্ষমতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়ার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়; কিন্তু এই বিচারব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে বিচার চাওয়া মানে হলো হয়রানি, কয়েকগুন বেশি ক্ষতির শিকার হওয়া। আর অন্যায়কারীই এখানে বিচারক। আর ঔপনিবেশিক আইন প্রণীত হয়েছে ঔপনিবেশিক গরজে; মুনাফা, আধিপত্য ও শাসনের স্থিতি নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। এই কারণেই তাদের প্রয়োজন হয়েছে এমন এক ধরনের আইনের, যার সাহায্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে জনগণকে স্তব্ধ করে রাখা যাবে। অনিবার্যতই এই আইনে উপনিবেশিত জনগণের কল্যাণ-ভাবনা একবারেই কাকতালীয় ব্যাপার। এই রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র হলো সরকারের এক বিশাল কর্তৃত্ববাদী কারখানা, যা আইন দ্বারা সংগঠিত ছিল। শাসক-শাসিতের মধ্যে ব্যবধান টেনে শাসিত শ্রেণিকে আজানু অবনত করে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

প্রাথমিক লুটপাটের পর ব্রিটিশরা মনোযোগী হয় ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বিকাশের চাহিদা মোতাবেক ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে। স্থানীয় পুঁজিকে নিয়ে যাওয়া হয় জমিদারিতে আর স্থানীয় শিল্পোদ্যোগকে ধ্বংস করা হয়। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলায় একটি 'mercantile aristocracy'-র বদলে একটি নতুন 'landed aristocracy' প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে নির্বিচারে পাখির মতো মানুষ মারার দক্ষতা ও নিষ্ঠুরতায় দেশ-দখল সম্পন্ন হওয়ার পর জারিকৃত ঔপনিবেশিক শাসনকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দরকার ছিল শাসিতের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন; আর একারণেই 'প্রাচ্যতত্ত্ব' ছিল উপনিবেশবাদের লক্ষ্যভেদী হাতিয়ার। বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র,

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতত্ত্ব ইত্যাকার বিচিত্র শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে তৈরি করা হয় শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের এক মহাবয়ান। এ বয়ানের প্রতিপাদ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্য করে তোলা: 'ইউরোপীয়রা অন্যান্যদের থেকে উন্নত হওয়ার জন্য নির্বাচিত মানবগোষ্ঠী, আর এটাই ভবিতব্য'; আর লক্ষ্য ছিল, ইউরোপীয়রা এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে বর্বর ও সভ্যতাশূন্য জনগোষ্ঠীকে সভ্যকরণের মহান দায়িত্ববোধ থেকে; শাসিতের পক্ষে শাসিত হওয়াই ন্যায্য ও মঙ্গলজনক––এ বিশ্বাস উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মনে গেঁথে দেওয়া। ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের মিথটি ভারতবাসীকে এমনভাবে দ্রবীভূত করেছে যে, তাঁরা কায়মনোবাক্যে ব্রিটিশ শাসনকে আশীর্বাদ মনে করেছেন। 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'-র তত্ত্বায়নে ঔপনিবেশিক শাসন বৈধতা পেলো।

অর্থনৈতিক শোষণের পাশপাশি চলে আমাদেরকে মানসিকভাবে নিঃস্ব এবং অধস্তন করার চেষ্টা। এর জন্য তৈরি করা হয় প্রাচ্যবাদ, যার লক্ষ্য হলো আধুনিক পশ্চিম অ-পশ্চিমকে নির্মাণ করেছে বৈপরীত্যের ভাবচিত্রে; দ্বিমেরুর ভাবরূপে 'অপর'-এর নির্মাণপ্রক্রিয়ায় জড়িয়ে ছিল 'পরিবর্তনহীনতা আর পরিবর্তন', 'শুচিতা আর ভ্রষ্টাচার', 'অচলাবস্থা আর প্রগতি', 'অবনতি আর উন্নতি', 'গ্রামীণ আর শহুরে' ইত্যাকার অজস্র তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার কথার ছাঁচ। বিপরীত-দ্বৈতের কাঠামোয় ফেলে জনসমাজকে বিভক্ত করার প্রয়াস উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, এটি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিরও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্প্রদায়গত বিভাজন ছাড়াও একই সম্প্রদায়ের মধ্যে উঁচু-নীচুর অজলচল বিভক্তি, গ্রাম ও শহরের, এমনকি গ্রাম থেকে আসা শহরে আসা মানুষের সঙ্গে শহুরে মানুষের মধ্যেকার ভাষা ও মূল্যবোধগত প্রতিতুলনার হাজারো বয়ান দেশীয় জনসমাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে।

শিক্ষা উপনিবেশায়নের একটি শক্তিশালী উপকরণ; এর মধ্যে রয়েছে মানুষের মগজ নিয়ন্ত্রণের অনিঃশেষ শক্তি এবং ক্ষমতা বিস্তারের বশীকরণ মন্ত্র। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলো, যেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর করার পাশাপাশি মানসিকভাবে বশীভূত একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করা। এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্রে জুড়ে নিয়েছে। আমাদের স্বাধীন দেশের প্রভুত্বমূলক আমলাতন্ত্র, নিপীড়নকারী পুলিশ, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ ঔপনিবেশিক শাসনের সৃষ্টি। স্বাধীনতার কালেও তাদের কারোরই চরিত্র বদল হয়নি। শাসনক্ষমতার স্থিতির জন্য বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করেছে। এর জন্য তারা প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইতিহাস চালু করেছে যার ভেতর থেকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে এবং হিন্দুদের কাছে মুসলমানরা বিজাতীয় পরিগণিত হয়েছে। মুসলমানরাও শত্রুতামূলক প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করলে পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পৌঁছে। দেশভাগের এই ঐতিহাসিক প্রক্ষাপটটি ব্রিটিশরা খুব পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলেছে। দেশভাগ ও দেশভাগোত্তর প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ামকশক্তি হয়ে ওঠার কারণ লুকিয়ে আছে ইংরেজদের তৈরি প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইতিহাসে।

মনস্তাত্ত্বিক নবনির্মাণের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে ধনবাদ গভীরভাবে শেকড় গেড়েছে। তাই আমাদের চিন্তায় আজো জনকল্যাণ কাজ করে না, ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসাবটিই আমাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক সচল থাকে। এই কারণেই রাজনীতি, বাণিজ্য, সরকারি কর্মকাণ্ডে সর্বত্র দুর্বৃত্তায়ন। দুর্বৃত্তায়নের শক্তি জোগায় রাজনৈতিক ক্ষমতা। আর এখানে ক্ষমতার মোহ এতো প্রকট। ক্ষমতার জন্য রাজনীতিবিদেরা নৈতিক-অনৈতিক সকল পন্থা অবলম্বন করে। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও এখানে রাজনৈতিক হাতিয়ার। ক্ষমতার ছায়া পেতে ব্যবসায়ী, আমলা, পুলিশ থেকে শুরু করে সকলেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে মদদ জোগায়। সাধারণ মানুষ, দুর্বৃত্তায়নের যারা চূড়ান্ত শিকার, তারাও ক্ষমতার আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ওঠে। এভাবে আমাদের সমাজমনস্তত্ত্বে দুর্নীতির প্রতি একটি সম্মতি তৈরি হয়ে গেছে। এভাবে ঔপনিবেশিক শাসক চলে গেলেও ঔপনিবেশিকতা রয়ে গেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঔপনিবেশিকতা কথাসাহিত্যের কথামালায় প্রায়োগিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়। আমরা কথাসাহিত্যেই আবিষ্কার করি এক প্রান্তবর্তী মানুষ মজিদকে, অস্তিত্ব-মূল সন্ধানী অভিযাত্রায় ঔপনিবেশিকতাই যার অবলম্বন।

সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে আমরা ১৯৪৭-২০০০ সালের মধ্যে রচিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণের প্রয়াস নিয়েছি।

প্রায় দুই শত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত বাংলার পূর্বাংশ পূর্ববাংলা পূর্ব-পাকিস্তান পরিচয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয় ভারতে। বাংলার এই খণ্ডায়নে মূলত দায়ী ছিল বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠে অসাম্প্রদায়িক পাটাতনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যর্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূপ্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘরানার হাজার মাইল দূরবর্তী দুই ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে জাতিগঠনের প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠী এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে জাতিগঠনের মৌলিক ভিত্তি––যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, জীবনাচার এসবকে উপেক্ষা করে ধর্মকেই তাঁরা জাতিগঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অভিজাত শাসকেরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রের মানদণ্ডে নির্মাণ করার কৃত্রিম উপায়ে পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ছাতার নিচে এনে একটি জাতিতে পরিণত করার উদ্যোগ চলে, যেখানে নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত হবে। বাঙালিরা উদ্যোগ মেনে নেয়নি। বাঙালিরা শাসকগোষ্ঠীর এই অপচেষ্টার মধ্যে নিজেদের অধস্তনতাকে আবিষ্কার করে এবং শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্বপাকিস্তান এক অবরুদ্ধ উপনিবেশে পরিণত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি এই নব্য-ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ গড়ে তোলে; এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ভেতর থেকে পুনর্জাগ্রত হয় বাঙালির অন্তর্নিহিত সর্বজনীন জীবনবোধ, গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ১৯৬১-র সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ছয়দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পথ বেয়ে ১৯৭১-এ এসে তা স্বাধীনতার সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। এই সময়ের উপন্যাস হয়ে ওঠে সমকালীন রাজনীতি বোঝার ময়দান। এপর্বের উপন্যাসে আমরা পাই বাঙালির ওপর নানামাত্রিক নিপীড়নের চিত্র; নিপীড়নকে বাঙালির আত্মপরিচয় সন্ধান এবং নিজস্ব দেশ প্রতিষ্ঠার অবিনাশী সংগ্রাম। এই পর্বের উপন্যাসের মূল উপজীব্য ধ্বংসস্তূপে আশাবাদ।আর গভীর আশাজাগানিয়া মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে আশা-নিরাশার দোলাচল এবং হতাশার দিকেই পাল্লাটা ভারি।

ঔপনিবেশিক শাসনে মানুষের জীবনের অবরুদ্ধতা, অপরায়ণের যন্ত্রণা, মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রাম, উপনিবেশমুক্তির আনন্দ ও স্বাধীন দেশে নতুন করে উপনিবেশিত হওয়ার বিষাদ––এই চক্রব্যূহে আবর্তিত জীবনের বহুবিভঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের আমাদের আলোচিত উপন্যাস সাহিত্যে; বিশেষত ব্রিটিশোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকেরা সূক্ষ্মদর্শী সৃজনশীলতায় কথাশিল্পের অবয়বে অনুসন্ধান করেন সাবেক উপনিবেশসমূহে ঔপনিবেশিক শাসনের বহমানতা, চলিষ্ণু জীবনের ভাঁজে ভাঁজে সন্ধান করেন উপনিবেশিতের মনস্তত্ত্বে শেকড়ায়িত উপনিবেশায়নের বহুস্তরীভূত তন্তুজাল এবং জাল ছিন্ন করার প্রেরণা ও কলাকৌশল। জীবন অনুসন্ধানের আকর উপাদান হিসেবে সমাজবীক্ষণে সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম এবং উত্তর-উপনিবেশবাদী বীক্ষণে আমাদের আলোচিত অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস এই মূল্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ২-৪

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত ৫-১২

প্রথম পরিচ্ছেদ : উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের স্বরূপ ১৩-৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলায় উপনিবেশায়নের স্বরূপ ৩৩-৫৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতে তথা বাংলায় বিউপনিবেশায়ন ও নব্য-উপনিবেশ ৫৯-৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপনিবেশের চেতনাগত অবশেষ এবং উপনিবেশ-মুক্তির অন্বেষা ৮৮-৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায় **৯৬-১৩৯**

পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলার উপন্যাস: উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায় ১৪০-২৩৯

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস : উত্তর-উপনিবেশবাদী অবলোকন

উপসংহার ২৪০-২৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ২৪৫-২৫২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সংকট-সর্পিল জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, বিরোধ-দ্বন্দ্ব দেশ-কালসত্তার উৎস-কাঠামো ও উপরি-কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ পরিধিসমেত রূপায়িত হয় সাহিত্যে। আধুনিক জীবনে রাজনীতি অত্যন্ত প্রভাব-বিস্তারী বিষয়; মানুষের জীবনের অন্যতম শক্তিশালী নিয়ামক শক্তিও। রাজনীতি আমাদের সময় ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে; আধুনিক মানুষের জীবনের ভবিতব্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা। রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন। জীবনের প্রতিটি প্রহরে রাজনীতির উপস্থিতিতে আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক; এমনকি রাজনীতির প্রতি অনীহ মানুষের চেতনালোকও রাজনীতি-সংক্রমিত। কৃষি-উৎপাদনকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সামন্ত-ব্যবস্থায় বাঙালি জন-মানসে রাষ্ট্র ও রাজনীতি ছিল অনুপস্থিত। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সর্বগ্রাসী উপস্থিতিতে বাংলার গ্রামীণ কাঠামোটি ভেঙে যায়; ঔপনিবেশিক রাজনীতির ছত্রছায়ায় জনজীবনে রাষ্ট্রের প্রবল আবির্ভাব ঘটে। উপনিবেশবাদের নিয়মে ভূমি-দখলের পাশাপাশি উপনিবেশকরা উপনিবেশিতের চেতনা-দখলের প্রয়াস চালায়। সময়-পরিক্রমায় দেশ উপনিবেশ-মুক্ত হলেও উপনিবেশের সংস্কার ও মূল্যবোধ চেতনালোক থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

সাহিত্যের প্রকরণসমূহের মধ্যে উপন্যাস প্রবলভাবে মানুষের জীবন-ঘেঁষা; আর একারণেই উপনিবেশ-সৃষ্ট রাষ্ট্র ও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে বাঙালির জাতীয় জীবনে যে সামূহিক সংকট তৈরি হয়, আমাদের উপন্যাসের অবয়বে তা-ই হয়ে ওঠে প্রধান উপজীব্য। ফলত বাংলাদেশের উপন্যাস হয়ে উঠেছে রাজনীতিপ্রবণ ও রাজনীতিমুখ্য। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের সৃজনশীল প্রয়াসে ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সালের সময়সীমায় রচিত উপন্যাসে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে নানা ভাবে– (১) রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা, (২) রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন, (৩) রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ও (৪) রূপকাভরণে রাজনৈতিক প্রত্যাশার প্রতিফলন, (৫) জনগণের ওপর রাজনীতির প্রভাব ও উপন্যাসে জনপ্রত্যাশার রূপায়ণ। উপর্যুক্ত পাঁচ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন-যুক্ত উপন্যাসকে আমরা অভিসন্দর্ভে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হিসেবে বিবেচনা করেছি। এবং এই উপন্যাসসমূহে কীভাবে উপনিবেশের অবশেষ এবং ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা ও উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে, উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্য বিবেচনা-পদ্ধতির আলোকে তা বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে গবেষণা-অভিসন্দর্ভে।

উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব হলো সাবেক উপনিবেশগুলোর জনগোষ্ঠীর নিজেকে চেনার ও নিজের আলোয় বিশ্বকে দেখার এক জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি। ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাবে উপনিবেশগুলোর নিজস্ব কাঠামো ভেঙে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপনিবেশিত রাষ্ট্রের পুরো কাঠামোটি যে জটিল চারিত্র্য পরিগ্রহ করেছে তার তত্ত্ব-সন্ধান করা এবং রাজনৈতিক বিউপনিবেশায়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মুক্তির সামগ্রিক রূপরেখা অন্বেষণ করা উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের উপজীব্য। অর্থাৎ উপনিবেশিত ও উপনিবেশমুক্ত পৃথিবী উত্তর-উপনিবেশবাদী বিবেচনার ক্ষেত্র। অতীতে উপনিবেশ স্থাপনের বৈধতার প্রয়োজনে উপনিবেশিত দেশের জ্ঞানকাণ্ড, ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে হীনমূল্য প্রমাণের প্রয়াসে উপনিবেশক পাশ্চাত্য নিজেদের সবকিছুকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছে এবং নিজেদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপনিবেশকে দেখেছে। উত্তর-উপনিবেশ যুগে উপনিবেশকের এই একপাক্ষিক সাম্রাজ্যিক দৃষ্টির বিপরীতে উপনিবেশিত প্রাচ্য নিজের চোখে উপনিবেশের ও উপনিবেশমুক্ত সময়কে বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করেছে। এটা 'কেন্দ্র-প্রান্ত', 'আমরা-ওরা' সম্পর্কের যে বাস্তবতা, তাকে দ্বিমুখী দৃষ্টিতে দেখার, বোঝার ও অনুধাবন করার বিষয়। এই চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপই প্রকৃতপক্ষে উত্তর-উপনিবেশবাদ। উপনিবেশক পাশ্চাত্যের প্রাধান্যের ধারণাটি ভেঙে দেওয়া এই উত্তর-উপনিবেশবাদী বিবেচনায় বৈষম্যহীন, সকলের জন্য সমান অংশীদারিত্বের এক অবারিত মুক্ত বিশ্ব-

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গড়ার অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। উত্তর-উপনিবেশবাদ আগ্রাসী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিপরীতে উপনিবেশিত প্রাচ্যের মানবতাবাদী প্রতিবয়ান। এই সূত্রে এডওয়ার্ড সাইদ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের তত্ত্বলোক প্রস্তাবিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক কাঠামোতে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত ও প্রয়োজনানুসারে গৃহীত হয়েছে।

আমাদের ১৯৪৭-২০০০ সময়পর্বের বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে বাংলাদেশে উপনিবেশবাদের বিস্তার, উপনিবেশ-বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের স্বরূপ, উপনিবেশের চরিত্র বদল, ভাষার সংগ্রাম ও বাঙালির জাতিসত্তার সন্ধান, জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা–যেমন দেশীয় সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিক আত্মসংকট, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরে ঔপনিবেশিক সংস্কার ও মূল্যবোধের অশরীরী উপস্থিতি ও আচ্ছন্নতা, সর্বোপরি ঔপনিবেশিকতার প্রচ্ছন্ন জাল ছিঁড়ে প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশ-মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপন্যাস মূল্যায়নের পরিসরে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। আলোচিত পর্বের উপন্যাসের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি হিসেবে পূর্ববর্তী দেশকাল-সমাজও পরিধিভুক্ত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

২। গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology) : আলোচিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভে মানববিদ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় অবলম্বিত পরিমাণগত ও গুণগত গবেষণা পদ্ধতির দ্বিতীয়টি অর্থাৎ গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আমাদের গবেষণার প্রতিপাদ্য যেহেতু মননে-বিশ্বাসে-অভ্যাসে-সংস্কারে উপনিবেশের অবশেষ ও উপনিবেশ-মুক্তির প্রত্যাশাকে মূল্যায়ন করা, সেহেতু দৈবচয়নমূলক তথ্য সংগ্রহ, সারণি প্রস্তুতকরণ কিংবা মনোভাবের শতকরা হার নির্ণয় আমাদের কর্মপন্থা ছিল না। আমরা মূলত বাঙালি ঔপন্যাসিকমণ্ডলীর, বৃহদর্থে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূলে নিহিত ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার ও ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির অভীপ্সাকে নির্ণয় করেছি। ফলে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিই আমাদের অভিসন্দর্ভের জন্য উপযুক্ত গবেষণা-পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে সাহিত্য মূল্যায়নের জন্য যেহেতু স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা পদ্ধতি নেই, সেহেতু বর্তমান গবেষণায় উল্লিখিত গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক ও নান্দনিক সাহিত্য-মূল্যায়ন রীতিও বক্ষ্যমাণ গবেষণায় অনুসৃত হয়েছে।

৩। আমাদের অভিসন্দর্ভটির গঠন নিম্নোক্ত সূচিতে বিন্যস্ত হয়েছে

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ।। পরিপ্রেক্ষিত

প্রথম পরিচ্ছেদ : উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের স্বরূপ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলায় উপনিবেশায়নের স্বরূপ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতে তথা বাংলায় বিউপনিবেশায়ন ও নব্য-উপনিবেশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপনিবেশের চেতনাগত অবশেষ এবং উপনিবেশ-মুক্তির অন্বেষা

দ্বিতীয় অধ্যায় ।। পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলার উপন্যাস: উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায় ।। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস : উত্তর-উপনিবেশবাদী অবলোকন

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়ে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের পটভূমি ও অভীপ্সা এবং উপন্যাস-বীক্ষণে তত্ত্বটির প্রাসঙ্গিকতা; প্রথম পরিচ্ছেদে তত্ত্বটির স্বরূপ ও গঠনপ্রক্রিয়া এবং তত্ত্ববিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার উপনিবেশায়ন ও আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর; তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও পরিণাম এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে উপনিবেশমুক্ত বাংলা ও ভারতবর্ষের স্বাধীন কাঠামোতে ঔপনিবেশিকতার উপস্থিতি ও তা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বালোকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলায় রচিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহের এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে রচিত প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহের উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা বক্ষমাণ অভিসন্দর্ভের মূল অভীপ্সা। উপসংহারে আমরা আলোকপাত করেছি ১৯৪৭-২০০০ সময়পর্বে রচিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ববীক্ষণে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ।

গ্রন্থপঞ্জি অংশে গবেষণার লক্ষ্যে অধীত উপন্যাসসমূহকে আকরগ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থকারের নামের আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হয়েছে। গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার্থে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং উপন্যাস বিশ্লেষণের জন্য যে সহায়ক গ্রন্থসমূহ অধীত হয়েছে সেগুলো বাংলা ও ইংরেজি ভাষা লিখিত। গ্রন্থপঞ্জিতে প্রথমে বাংলা ভাষায় রচিত এবং এরপরে ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ লেখকের নামের আদ্যক্ষরের ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের জন্য পঠিত সাময়িকী ও পত্রিকার নাম সহায়কগ্রন্থপঞ্জি বিন্যাসের অনুকরণে আলাদা শিরোনামে বিন্যস্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, আমরা অভিসন্দর্ভে লেখকের পূর্ণনাম ব্যবহার করেছি।

পরিশেষে, দুইটি ঔপনিবেশিককাল পেরিয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যাশা বিপুল। এই প্রত্যাশা নিয়ে বাঙালির উচ্ছ্বাস আছে, আশাভঙ্গের বেদনাও আছে। উপন্যাসের অবয়বে মানুষের আশা-নৈরাশ্যের বহুভঙ্গিম প্রকাশ অনিবার্য। উপন্যাসে প্রতিফলিত বাঙালির আশা-নৈরাশ্যের বহুমাত্রিক রূপটি কার্যকারণসহ উদ্‌ঘাটন করার একটি তত্ত্বীয় প্রয়াস আমাদের বক্ষ্যমাণ গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত

১

উপনিবেশবাদ গত কয়েকশ বছরের মানবেতিহাসের এক বিভীষিকাময় বাস্তবতা। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের (১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্য দিয়ে ইউরোপীয়দের মনে যে পরদেশ দখলের নেশা[১] পেয়ে বসে তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের ৮৪.৬ শতাংশ ইউরোপীয় উপনিবেশে পরিণত হয়; ইউরোপীয় শক্তিসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয় পুরো দুনিয়াকে, এর মধ্যে কেবল ব্রিটেনের অধিগত হয় পৃথিবীর মোট ভূমির এক পঞ্চমাংশ ও মোট জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ। (Robert J. Young, 2003: 2)। এটি হলো উপনিবেশবাদের পরিমাণগত দিক; আর গুণগত দিকটি ফুটে উঠেছে Robert J. Young-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যে: '…the long violent history of colonialism, which symbolically began over five hundred years ago, in 1492: a history which includes histories of slavery, of untold , unnumbered deaths from oppression or neglect, of the enforced migration and diaspora of millions of peoples – Africans, Americans, Arabs, Asians and Europeans, of the appropriation of territories and of land, of the institutionalization of racism, of the destruction of cultures and the superimposition of the other cultures.' (Robert J. Young, 2003: 4)।

পরদেশ দখল ও উপনিবেশ স্থাপন মানব-সভ্যতার ক্রমধারায় সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান[২]; তার উদাহরণ রোমান, পারস্য, গ্রিস, মোগল ইত্যাকার সাম্রাজ্য। তবে পুরনো উপনিবেশের সঙ্গে ইউরোপীয় উপনিবেশের কোনো প্রকার মিল অনুসন্ধান অবান্তর। আদিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পেছনে সক্রিয় ছিল রাজ্যবিস্তার ও অর্থনৈতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা; আর তা ছিল যশ-খ্যাতি, উপঢৌকন, নগদ লুণ্ঠন ও শাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটি জাতিকে পুরোপুরি গিলে ফেলার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না, বা সেই কলাকৌশলও তাদের জানা ছিল না। মার্কসীয় চিন্তা আদি উপনিবেশের সঙ্গে ইউরোপীয় উপনিবেশের পার্থক্য টেনেছে এভাবে : 'আদি উপনিবেশ হলো প্রাক্-পুঁজিবাদী, আর আধুনিক উপনিবেশ ইউরোপীয় পুঁজিবাদের শাসনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।' শেষোক্তটির তত্ত্বদর্শন হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত।[৩] ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের প্ররোচনায় বিংশ শতাব্দীর অবসানের পূর্ববর্তী তিন শত বছরে পৃথিবীর আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে; আর এ রূপান্তরণ ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে। গড়ে উঠেছে পশ্চিমা কর্তৃত্বাধীন এক বিশ্বব্যবস্থা, গোটা বিশ্ব চলে এসেছে পশ্চিমা লাভালাভের হিসাবের নিয়ন্ত্রণে। এ প্রসঙ্গে একবাল আহমেদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'For 300 years before the twentieth century dawned, the world had been transforming, a transformation brought about by modern science, technology, and imperialism. It was through this age of capitalist and European expansion that a world system came to be dominated by the west and the international market came to be controlled entirely for the West's benefit. This sounds rather benign, as though the free market was really free and worked merely to the advantage of the fittest. Far from it; Western domination was achieved by force so widespread, institutionalized, and legitimized by religion and morality that to date the epistemology of this universal violence still shapes relation between the Western and non-Western worlds.' (Eqbal Ahmad, 2016 : xxxvi)। বেপরোয়া শোষণ-পেষণ এবং ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসনের মাধ্যমে ইউরোপের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ বিজিত জাতিগুলোকে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতাহীন করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে সভ্যতার গরিমায় অন্ধ আধুনিক ইউরোপ নির্মাণ করেছে জ্ঞানতাত্ত্বিক ডিসকোর্স[৪]। ইউরোপ-কেন্দ্রিক আধুনিকতার জঠর থেকে ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ধারণা গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাকার যাবতীয় বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটা পৃথিবীতে উপনিবেশীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

আরোপের জ্ঞান ও প্রত্যয়ের তন্ত্র। উপনিবেশ স্থাপনকারীর সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে উদ্ভূত এই জ্ঞানতত্ত্ব উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীকে ভুক্তভোগীতে পরিণত করে; উপনিবেশিতের চেতনাবোধের গভীরে তৈরি করে পশ্চিমা কর্তৃত্বের প্রতি এক চিরকালীন সম্মতি। এই হিংসার জ্ঞানতত্ত্ব জাতিবৈষম্যবাদকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দান করেছে, রূপায়িত করেছে পশ্চিমা ও অপশ্চিমা বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্কের আদল; এর অনুশীলন খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে মানববিশ্বকে এবং ঠেলে দিয়েছে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষকে এক মানবেতর পরিস্থিতিতে। এই জ্ঞানতত্ত্বের বদৌলতেই পশ্চিমা কর্তৃত্ব বহুবিস্তৃত, প্রাতিষ্ঠানিক ও তথাকথিত নৈতিক বৈধতার শক্তি অর্জন করেছে।

জাতিবৈরিতার আশ্রয়ে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ অমোঘ শক্তি হিসেবে উপনিবেশিতের ওপর চেপে বসেছে; ভেঙেচুরে তাকে পুনর্নির্মাণ করেছে এক চিরায়ত 'অপর'[৫] হিসেবে। মানুষের প্রতি এমন জ্ঞানভিত্তিক অবমাননা ও নিগ্রহ মানবেতিহাসে এর আগে কখনোই ঘটেনি। প্রাচ্যের এমনতর উপস্থাপন মোটেই খেয়ালি বিষয় ছিল না; তা ছিল সুপরিকল্পিত ও সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'শ্রেণিগত, জাতিগত ও ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন অব্যাহত রাখার ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তাগণ জাতিসমূহের দৈহিক ও মানসিক অসাম্য, 'প্রাগ্রসর' ও 'আদিম' জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত জাতি ইত্যাকার ভ্রান্ত 'তত্ত্ব' উপস্থাপন করেছেন।' (মিখাইল নেস্তুর্খ, ১৯৮৪ : ৫)। শোষণ-বঞ্চনা আর ঘৃণার প্রতিক্রিয়া থেকেই দেশে দেশে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তাবাদ; উপনিবেশসমূহে গড়ে ওঠেছে তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলন। ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কতিপয় উপনিবেশ হিসাব-বহির্ভূত রাখলে পৃথিবীর অধিকাংশ উপনিবেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বে উপনিবেশের অবসান ঘটেছে; অর্থাৎ, আক্ষরিক অর্থে সাবেক উপনিবেশের জনগোষ্ঠী এখন উপনিবেশ-মুক্ত স্বাধীন দেশের বাসিন্দা। উপনিবেশ-মুক্ত এই পৃথিবীকে বলা হয়েছে উত্তর-উপনিবেশী পৃথিবী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর জনগণের জীবনে স্বাধীনতা পরাধীনতার আদল নিলো অচিরেই; উপনিবেশের অবসান ঘটলেও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা এবং এর ভাবাদর্শ বহাল-তবিয়তেই রয়ে গেল। ওইসব দেশে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক শাসন-শোষণের অভিজ্ঞতা যতটা অতীতের ছিল, তার কোনো তাৎপর্যপূর্ণ হেরফের হলো না; বরং উপনিবেশী আধিপত্য ক্ষেত্রবিশেষে আগের চেয়েও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়-উত্তরকালে পৃথিবী প্রবেশ করেছে সর্বকালের সবচেয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ নয়া-উপনিবেশবাদের যুগে, যার নেতৃত্বে রয়েছে অপ্রতিহত সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই পটভূমিতে সাবেক উপনিবেশের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্য থেকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠী নয়া পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধানে জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদী জ্ঞানভাষ্যের বিপরীতে এই গোষ্ঠীভুক্ত গবেষকরা প্রবৃত্ত হন পাল্টা জ্ঞানভাষ্য রচনায়, যা 'উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন' (Post-colonial Studies) নামে পরিচিত।

উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব হলো সাবেক উপনিবেশগুলোর জনগোষ্ঠীর নিজেকে চেনার ও নিজের আলোয় বিশ্বকে দেখার এক জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি। ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাবে উপনিবেশগুলোর নিজস্ব কাঠামো ভেঙে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপনিবেশিত রাষ্ট্রের পুরো কাঠামোটি যে জটিল চারিত্র্য পরিগ্রহ করেছে তার তত্ত্ব-সন্ধান করা এবং রাজনৈতিক বিউপনিবেশায়নের (decolonization) পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মুক্তির সামগ্রিক রূপরেখা অন্বেষণ করা উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের উপজীব্য। অর্থাৎ উপনিবেশিত ও উপনিবেশমুক্ত পৃথিবী উত্তর-উপনিবেশবাদী বিবেচনার ক্ষেত্র। অতীতে উপনিবেশ স্থাপনের Legacy-র প্রয়োজনে উপনিবেশিত দেশের জ্ঞানকাণ্ড, ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে হীনমূল্য প্রমাণের প্রয়াসে উপনিবেশক পাশ্চাত্য নিজেদের সবকিছুকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছে এবং নিজেদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপনিবেশকে দেখেছে। উত্তর-উপনিবেশ যুগে উপনিবেশকের এই একপাক্ষিক সাম্রাজ্যিক দৃষ্টির বিপরীতে

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করেউপনিবেশিত প্রাচ্য নিজের চোখে উপনিবেশের ও উপনিবেশমুক্ত সময়কে বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করেছে। এতে 'কেন্দ্র-প্রান্ত' (Centre-Perephery) সম্পর্কের যে বাস্তবতা, তাকে দ্বিমুখী দৃষ্টিতে দেখার, বোঝার ও অনুধাবন করার কাজটি পূর্ণাঙ্গ হবে। এই চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপই প্রকৃতপক্ষে বিবেচনায় বৈষম্যহীন, সকলের জন্য সমান অংশীদারত্বের এক অবারিত মুক্ত বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ার অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। উত্তর-উপনিবেশবাদ আগ্রাসী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিপরীতে উপনিবেশিত প্রাচ্যের মানবতাবাদী প্রতিবয়ান (Counter Discourse)।

ঔপনিবেশিক রাজনীতির জটিল গ্রন্থিগুলো পরখ করা আর উপনিবেশায়নের গ্রন্থিগুলো ছিন্ন করে সাবেক উপনিবেশগুলোর সর্বৈব মুক্তি অর্জন করার পন্থা অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক শাখা হিসেবে গড়ে ওঠে 'উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়ন'। মূলত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিই এই অধ্যয়নের প্রধান অধিক্ষেত্র। জীবনের পূর্ণাঙ্গ-সম্ভব প্রতিফলন ঘটে থাকে সাহিত্যে, বিশেষত আধুনিক গদ্য মহাকাব্য উপন্যাসে। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব আর পরিচর্যার অধীনেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ; আর ঔপনিবেশিক রাজনীতির ছাপ-চিহ্নও তাই ছড়িয়ে আছে বাংলা উপন্যাসের সর্বাবয়বে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনভোগের অভিজ্ঞতা বাঙালিরপ্রায় দুশ বছরের; পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক (semi-colonial) শাসনের অভিজ্ঞতাও সিকি শতাব্দীর। ভারতবর্ষে বাঙালির উপনিবেশিত হওয়ার অভিজ্ঞতা যেমন প্রথম, তেমনি মনস্তত্ত্বে এই ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ ধারণ-লালনের ইতিহাসও তার সবচেয়ে দীর্ঘ এবং এর প্রভাবও ব্যাপক-গভীর। আবার সিকি শতাব্দীর ব্যবধানে দুই দুইবার মেকিস্বাধীনতা ও প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের অভিজ্ঞতায়ও বাঙালি-চৈতন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ব্রিটিশ আধিপত্যেই রাজনীতি-বিযুক্ত বাঙালি রাজনীতি-চেতন হয়ে ওঠে এবং উপনিবেশ-বিরোধী রাজনীতিতে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাজনীতি আধুনিক জীবনের সর্বাঙ্গণে বাতাসের মতো অস্তিত্বমান; অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন কোনো কিছুই রাজনীতির স্পর্শমুক্ত নয়। পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবেই রাজনীতিচেতনা বাঙালি জনজীবনে এমন সর্বব্যাপকতা অর্জন করেছে। বাঙালির উপনিবেশিত হওয়া ও উপনিবেশ-মুক্তির রাজনীতি, ঔপনিবেশিক রাজনীতির মনস্তত্ত্ব, বাঙালির আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ঔপনিবেশিক প্রভাব ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং তার রাজনৈতিক অর্জন-বিসর্জনের ইতিবৃত্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশেষত রাজনৈতিক উপন্যাসে। উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসে বিধৃত ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ব্রিটিশ কলোনিয়াল রাজনীতির স্বরূপ সন্ধানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

২.

রাজনৈতিক উপন্যাস

গ্রিক মনীষী এরিস্টটলের কাছে মানুষ হচ্ছে 'Zoon Politikon'। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা-উদ্যম, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, কর্ম-কল্পনা, আবেগ ও জীবনাচরণে রাজনীতির সর্বময় উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবতই রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জীব।' আধুনিক জীবনে রাজনীতি অত্যন্ত প্রভাব-বিস্তারী বিষয়; মানুষের জীবনের অন্যতম শক্তিশালী নিয়ামক শক্তিও। রাজনীতি আমাদের সময় ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে; আধুনিক মানুষের জীবনের ভবিতব্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা। রাজনীতি সম্পর্কে মানুষ সচেতন, অচেতন, এমনকি বিমুখ থাকলেও বাস্তবিকপক্ষে তাদের সমস্ত কর্ম, চিন্তা ও আবেগ রাজনীতি থেকেই উদ্ভূত এবং রাজনীতির গর্ভেই পতিত হয়। (Georg Lukac's,1972 : 9 দ্রষ্টব্য)। রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত মানুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন। জীবনের প্রতিটি প্রহরে রাজনীতির উপস্থিতিতে আধুনিক মানুষ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক; এমনকি রাজনীতির প্রতি অনীহ মানুষের চেতনালোকও রাজনীতি-প্রভাবিত। স্বভাবধর্মে প্রবলভাবে জীবনঘনিষ্ঠ শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পগত শুচিতা রক্ষার অজুহাতে রাজনীতির সংস্রব এড়িয়ে যাওয়া বা রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা বেমানান, অসম্ভবও। মানুষের জীবনের সমগ্ররূপকে প্রত্যক্ষতায় ও নিবিড়তায় উপন্যাসের আয়তনে ধরার প্রয়াসে রাজনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে আপন উপস্থিতি জানান দেয়। প্রবল জীবনাসক্তি ও জীবনাগ্রহের তাড়নায়ই ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং জীবনের অসংখ্য ও অপরিমেয় বৈচিত্র্য–– এর ব্যাপকতা, গভীরতা, জটিলতা সমস্ত কিছুকে উপন্যাসের চারু-অবয়বে গেঁথে দেন। ভার্জিয়া উলফ যথার্থই বলেন : 'লেখকরা রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকাশকদের প্রতিটি গ্রন্থ তালিকা, এখন যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয় তার প্রতিটি এই সত্যের প্রমাণ করে।... কবি সাম্যবাদ ও ফ্যাসিবাদকে গীতিকবিতায় রূপ দেন, ঔপন্যাসিক চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তে তার সামাজিক পরিপার্শ্ব এবং রাজনৈতিক মতবাদকে রূপায়িত করেন। স্পষ্টতই লেখক মানব জীবনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কোন আলোড়ন তার দৃষ্টিকোণকেও পরিবর্তিত করে।' (Georg Lukac's, 1972 : 9 দ্রষ্টব্য।)

জীবন-সামগ্র্যের চাপে কোনো উপন্যাসে যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহুধা জটিল উদ্দীপনা, বিরুদ্ধ মতাদর্শের সংঘাত, আদর্শবাদ ও কর্মপন্থার বিভিন্নতা ও উদ্ভূত সংগ্রাম মুখ্য তাৎপর্যে বিন্যস্ত হয়, তখন উপন্যাসটি রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। ব্যক্তি বা চরিত্রের অন্তর্লীন ঐশ্বর্য অনুসন্ধান, হৃদয়ের শ্রুতিলিখন বা মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শিল্পপ্রকরণ হিসেবে উপন্যাসের মৌল বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের এ বৈশিষ্ট্য মেনেই রাজনৈতিক উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বা দেশকালের পরিপ্রেক্ষণীর সঙ্গে শৈল্পিক সামঞ্জস্যে। ফলে সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব, আন্দোলন-প্রতি-আন্দোলনের তরঙ্গভঙ্গ রাজনৈতিক উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Chaman Nahal বলেন: 'রাজনৈতিক উপন্যাস এমন এক শৈল্পিক কোলাজ, যেখানে অন্তরঙ্গভাবে এবং একই সঙ্গে ব্যাখ্যাযোগ্য কৌশলে সমন্বিত হয় বহু উপাদান, যেমন- রাজনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, শ্রেণি ও নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত পূর্ব-সংস্কার, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুধ্যান।'[৬]

Morris Edmund Speare রাজনৈতিক উপন্যাসকে চিহ্নিত করেছেন নিম্নোক্তভাবে: 'A work of fiction, which learns rather to ideas than to emotions which deals rather with the machinery of law making or with a theory about public conduct than with the merits of any given piece of legislation; and where the main purpose of the writer is partially propaganda, public reform or exposition of the lives of personages who maintain government, or of the forces which constitute the government. In this exposition the drawing room is frequently used as a medium for presenting the inside life of politics.' (Morris Edmund Speare, 1924 :IX.)

স্পিয়ারের সংজ্ঞায় রাজনৈতিক উপন্যাসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে আলোকপাত হয়েছে :[৭]

১. রাজনৈতিক উপন্যাসে থাকবে একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব বা আদর্শের জোরালো উপস্থিতি।

২. ঔপন্যাসিক হবেন রাজনীতির আধেয়টির স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন; আর এ সুবাদেই তিনি উপন্যাসের কাঠামোয় আইন প্রণয়ন, শাসনের প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রাজনীতির আধেয়ে অঙ্গীভূত করেন ।

৩. ক্ষমতা-কাঠামো গঠনের জটিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রেরণা ও সামর্থ্যের প্রতিফলনও থাকবে উপন্যাসে।

৪. উপন্যাসের অবয়বে অন্তর্লীন হয়ে থাকবে ঔপন্যাসিকের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার; আর উপন্যাসে এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটবে রাজনৈতিক প্রচারণা, জনমত গঠন, রাজনীতির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কর্ম-জীবনের উদ্ভাসনে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. স্পিয়ারের সংজ্ঞানুসারে আবেগ-গৌণ মতাদর্শিক উপস্থাপনা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের লক্ষণ; উপন্যাসে থাকবে মতাদর্শিক চিন্তার ওপর আবেগীয় অনুভূতির প্রাধান্য; এর অন্যথা উপন্যাসের সাহিত্যরসকে খণ্ডিত করে। মতাদর্শের আবেগময় উপস্থাপনার মধ্যেই উপন্যাসের পুরোভূমি বহুবর্ণিল ছটায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৬. উপন্যাসে রাজনীতির প্রতিফলন রাজনৈতিক মানুষের বহির্জীবনের দরবারি-আলেখ্য মাত্র নয়; ব্যক্তির গহন-জীবনের একান্ত-কথনও।

Joseph Blotner রাজনৈতিক উপন্যাসকে এমন গ্রন্থ বলে সংজ্ঞায়িত করেন যাতে 'directly describes interprets or analyses a political phenomena' (Richard Snyder, Foreword, *The Political Novel, Joseph Blotner,* Op. Cit., p.2.) আর উপন্যাসের চরিত্র-পাত্ররা 'must carry out political acts and move in a political environment.' (Ibid, p.1-2.) তিনি অধিকন্তু বলেন, 'It has described and interpreted human experience, selectively taking the facts of existence and imposing order and form upon them in an aesthetic pattern to make them meaningful.' (Ibid. p.l.)

Blotner-এর সংজ্ঞায় রাজনীতিই রাজনৈতিক উপন্যাসের সারকথা, এর সর্বত্রই রাজনৈতিক আবহাওয়া, এর চরিত্রদের কর্মকাণ্ড রাজনীতি-লিপ্ত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সামগ্রিকতার মানদণ্ডে রাজনীতির পরিসীমাটি অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক; অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, এমনকি মানুষের কল্পনাপ্রবণতাও রাজনীতির পরিভুক্ত; আধেয়ের এই সযত্নলালিত অনির্দিষ্টতা ও আবছাময়তা উপন্যাসের শৈল্পিক পরিচর্যার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় বিষয়।

অধিকতর বিশ্লেষণী পরবর্তী গ্রন্থ *The Modem American Political Novel (1900-1965),* (1965) –এ Blotner রাজনৈতিক উপন্যাসের কতগুলো সুনির্দিষ্ট ধরনের উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ :

1. 'the novel as a political instrument',
2. 'the novelist as a political historian',
3. 'the novel as a mirror of national character',
4. 'the novelist as an analyst of group behaviour' and
5. 'the novelist as an analyst of an individuals behaviour'.

Irving Howe রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি পূর্ণাঙ্গসম্ভব সংজ্ঞা টেনেছেন এভাবে: 'By Political Novel I mean a novel in which political ideas play a dominant role or in which political milieu is the dominant setting—though again a qualification is necessary, since the word dominant" is more than questionable. Perhaps it would be better to say: a novel in which *we take to be dominant* political ideas or the political milieu, a novel which permits this assumption without thereby suffering any radical distortion and, it follows, with the possibility of some analytical profit.,' (Irving Howe, 1957: 17).

রাজনৈতিক উপন্যাস হলো রাজনীতি-জারিত শিল্পকর্ম; রাজনীতি এখানে এক বৃহৎ ও মহৎ সত্যের অঙ্গীকাররূপে প্রধান বিচার্য; এর বাতাবরণে রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামের রঙ-রেখার ঘন সন্নিবেশ, চরিত্রচিত্রণে রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘাত-দ্বন্দ্ব-মিলনের সূত্রটি অবশ্য-মান্য। ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক জীবনবীক্ষা ও অভিজ্ঞতাও রাজনৈতিক উপন্যাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ; লেখকের মৌল জীবনবীক্ষা ও স্বকীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জারণে উপন্যাসে বিধৃত রাজনৈতিক বক্তব্য সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে। লেখকের প্রাজ্ঞ ও অনুভূতি-গভীর পরিবেশনায় রাজনীতি ও শিল্পের নিপুণ কারিগরিতে রাজনৈতিক উপন্যাস একটি শৈলীনন্দন শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ হয়।

রাজনৈতিক উপন্যাসের স্বরূপ-সামগ্র্য উদ্ঘাটনে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংজ্ঞার্থ অনুসন্ধান অনেক বেশি গভীরতাস্পর্শী : 'প্রচলিতভাবে যে সব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল: কোন রাজনৈতিক ঘটনা-আন্দোলন প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিত। কিন্তু গভীর স্তরে রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গানিক। কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষতঃ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে

ইতিহাস ও সমাজের গভীর প্রক্রিয়ার উন্মোচনে অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে দেখানোয়, অভিজ্ঞান সন্ধানে, জনসমাজের নির্মাণ ভাঙনের চেতনায়, এমন কি ধর্মীয় জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক অন্বেষণেও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক।' (পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ১১)।

রাজনৈতিক উপন্যাস বোঝার উপর্যুক্ত তত্ত্বপ্রয়াসের আলোকে ১৯৪৭ থেকে ২০০০ সালের সময়সীমায় রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে নিম্নোক্তভাবে-– (১) রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা, (২) রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন, (৩) রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন, (৪) প্রতীক ও রূপকাভরণে রাজনৈতিক প্রত্যাশার প্রতিফলন ও (৫) জনগণের ওপর রাজনীতির প্রভাব ও উপন্যাসে জনপ্রত্যাশার রূপায়ণ। উপর্যুক্ত পাঁচ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন-যুক্ত উপন্যাসকে আমরা 'রাজনৈতিক উপন্যাস' হিসেবে বিবেচনা করব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. 'এ সন (১৪৯২) হতে য়ুরোপীয়রা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে জয়ী হতে শুরু করে– তা কী সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বললে জাতিতাত্ত্বিক।... নয়া পৃথিবী আমেরিকা আবিষ্কারের ফল হলো : পুঁজিবাদ বিকাশের পথ সুগম হবার পাশাপাশি পৃথিবী জয়ের নেশাও।... ১৪৯২ ছাড়া এ কথা চিন্তা করা রীতিমত দুরূহ যে, য়ুরোপে শিল্প বিপ্লব হয়েছে যে ঘটনার ৩০০ বছরেরও কম আগে, যা নতুন উদ্যম ও বেগ দিয়েছে য়ুরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারে। এরপর থেকে য়ুরোপ ভারতে গ্রহণ করেছে নজিরবিহীন সামরিক পন্থা– পিষে দমন করেছে ১৮৫৭ এর সিপাহীদের, চীনে তাদের পথ হয় খোলা, তুর্কি সাম্রাজ্যের পতন এবং শেষে সারা আফ্রিকা মহাদেশ তাদের করতলগত হয়েছে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ। আবারও এ পুঁজিবাদের অগ্রযাত্রা অসম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতি অনুসরণের মাধ্যমে বয়ে এনেছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। য়ুরোপের শিল্প বিদায় বার্তা বয়ে এনেছে স্থানীয় হস্তশিল্প ও ছোট শিল্পের জন্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দিয়েছে শিল্পভিত্তিক পাশ্চাত্য দেশগুলি ও কাঁচামাল সরবরাহকারী বিজিত দেশগুলির মাঝে।' (*সমির আমিন: ১৪৯২*, ফকরুল চৌধুরী, ২০১১: ৭৫-৭৯)।

২. 'সবচেয়ে পুরাতন সত্য এই যে, যেদিন হইতে মানুষ পৃথিবীতে জীবজগতের একটি জীব হওয়া সত্ত্বেও, অন্য জন্তুর মতো সাধারণ জন্তু না হইয়া মানুষ বলিয়া একটা বিশিষ্ট জীব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সে সাম্রাজ্যবাদীও হইয়াছে। ... ইহা ঘটিয়াছে মানুষের মনুষ্যধর্ম হইতে।' (শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, *আমার দেবোত্তর সম্পত্তি*, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৫৪)।

৩. সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক মাইকেল প্যারেন্টি বলেন, কোনো একটি দেশের প্রধান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যেভাবে অন্য দেশের জমি, শ্রম, কাঁচামাল ও বাজার দখল করে তাই সাম্রাজ্যবাদ।

মার্কসবাদের প্রধান তাত্ত্বিক ও বাস্তবায়নকারী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন লেনিন তাঁর *Imperialism, the Highest Stage of Capitalism* গ্রন্থে বলেছেন, সাধারণভাবে পুঁজিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ও প্রত্যক্ষ পূর্বানুবর্তন হিসেবেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব। পুঁজি ও উৎপাদন বিকাশের প্রথম পর্যায়ে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে। এ পর্যায়ে ইউরোপীয় শিল্পপুঁজির লক্ষ্য ছিল নিজ দেশে উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার দখল করা। পণ্যের অবাধ চালানের প্রয়োজনে তারা অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়। কলকারখানার বিপুল প্রবৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত মুনাফায় শিল্পপুঁজি পরবর্তী পর্যায়ে এসে একচেটিয়া 'লগ্নিপুঁজি'তে পরিণত হয়। একচেটিয়া লগ্নিপুঁজি যে প্রভূত মুনাফা অর্জন করে তা পুনরায় নিজ দেশে বিনিয়োগ করলে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা যায় না। এ পুঁজি যায় অনুন্নত দেশে যেখানে শ্রমশক্তি সস্তা ও অফুরান; কাঁচামাল, জমি সুলভ ও সস্তা এবং পুঁজির ঘাটতি রয়েছে। লগ্নিপুঁজি অনুন্নত

দেশে পণ্যের সঙ্গে পুঁজিও রপ্তানি করে মুনাফাকে চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে যায়। রপ্তানিকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাকি দুনিয়াকে নিজের আয়ত্তে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। লেনিন এই বিশ্বব্যবস্থাকেই 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন; বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্যায় এবং পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।

4. মিশেল ফুঁকো 'ডিসকোর্স' ধারণাটিকে তত্ত্বায়িত করেছেন। Discourse, as defined by Foucault, refers to: '*ways of constituting knowledge, together with the social practices, forms of subjectivity and power relations which inhere in such knowledges and relations between them. Discourses are more than ways of thinking and producing meaning. They constitute the 'nature' of the body, unconscious and conscious mind and emotional life of the subjects they seek to govern*. (Chris Weedon; *Feminist Practice and Poststructuralist Theory,* B. Blackwell, 1987, p. 108*) .... a form of power that circulates in the social field and can attach to strategies of domination as well as those of resistance* (Irene Diamond and Lee Quinby, *Feminism and Foucault: Reflections on Resistance;* Northeastern University Press, 1988, p. 185*).*

   ফুঁকোর ডিসকোর্স ধারণাটিকে এডওয়ার্ড সাইদ ব্যবহার করেছেন ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ধারণাটিকে বিবৃত করতে। এডওয়ার্ড সাইদ এই জ্ঞানভাষ্যকে অভিহিত করেছেন 'Orientalism' হিসেবে। তিনি বলেন, 'Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between `the Orient' and (most of the time) `the Occident'. Thus a very large mass of writers, among whom are poets, novelists, philosophers, political theorists, economists, and imperial administrators, have accepted the basic distinction between East and West as a starting point for elaborate theories, epics, novels, social description, and political accounts concerning `the Orient', its people, customs, `mind', destiny, and so on.' (Edward Said, 2001: 2-3)

   Edward W. Said প্রাচ্যতত্ত্বকে পাশ্চাত্যের 'একগুচ্ছ স্বার্থের একটি গোটা নেটওয়ার্ক' (the whole network of interests) হিসেবে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন: '...orientalism can be discussed and analysed as the corporate institution for dealing with the orient--dealing with it by making statements about it, authorizing vies of it, describing it, by teaching it, setting it, ruling over it : in short, Orientalism as a western style for dominating , restructuring, and having authority over the Orient. ' (Edward Said, 2001: 3).

৫. 'The colonized subject is characterized `other' through discourses such as primitivism and cannibalism, as a means of establishing the binary separation of the colonizer and colonized and asserting the naturalness and primacy of colonized culture and world view.' অথবা, 'In post-colonial theory, it can refer to the colonized others who are marginalized by imperial discourse, identified by then difference from the centre and, perhaps crucially, become the focus of anticipated mastery by the imperial `eg'.' (Ashcroft et.al, 2004 : 169-170; সৈয়দ আজজুল হক, ২০১৭ : ৫০ থেকে উদ্ধৃত)।

৬. 'A work of art is a collage, in the creation of which many factors such as politics, social values, class and ethnic distinctions, personal prejudices, mystical visions and intellectual speculations combine in an intimate and at times in an explainable manner.' (Chaman Nahal, "The Indian Political Novel": Khushwant

Singh, Raj Anand and Nayantara Sahgal in New Literatures in English, Delhi: Allied Publishers, 1985, p.135.)

९. a. The emphasis on the word 'ideas' implies the presence of a political theory or an ideology.

b. He is fully conscious of the need to be elastic about the content of politics that goes into the novel. So he refers to the process of law making, governance and political personages as political content in a novel.

c. He, to imply the complicated political processes in the formation of power structures probably uses the term 'forces'.

d. The other important feature of his definition is his noticing of a political commitment on the part of the writer, as implied in the words 'propaganda' and 'public reform'.

e. Speare's definition of the political novel, by laying a heavy emphasis on 'ideas' at the cost of emotions seems to restrict its canvas for any novel that lays greater emphasis on 'ideas' at the cost of emotions reduces the fiction into a treatise or a pamphlet.

f. Speare's idea of a political novel limits itself further by taking politics only up to the 'drawing room', excluding 'bed room' from the confines of a political novel, seemingly excluding the personal and the private aspects of life from the arena of political behaviour.

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের স্বরূপ

'আধুনিক : উত্তর-আধুনিক', 'উপনিবেশবাদ : উত্তর-উপনিবেশবাদ'–দুই শব্দজোড়ের শেষ শব্দদ্বয়ের মাঝখানের হাইফেন নিয়ে রয়েছে বিভ্রম। যেমন মনে করা হয় আধুনিক মানে আজকের বিষয়, আর উত্তর-আধুনিক হলো আগামীকালের কিছু; তেমনি উত্তর-উপনিবেশবাদের মাঝখানের হাইফেনটি উপনিবেশ-পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে ভাবতেই আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার ব্যবধানটা সময়ের দূরত্বে পরিমাপযোগ্য নয়; ব্যবধানটা সম্পূর্ণতই প্রত্যয়গত। রেনেসাঁসের ফলে জ্ঞানের যে উৎসারণ ঘটেছিল তার প্রভাবে ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার বৃত্ত ভেঙে ব্যক্তির মুক্তি নিশ্চিত হয়েছিল; আর তাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল আধুনিকতা বলে। জ্ঞান যখন ক্ষমতায় পর্যবসিত হয় তখন সেই জ্ঞানই সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপে তৎপর হয়; ব্যক্তি অনুভব করে সে নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত। বিশ শতকের শেষার্ধে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শুরু হয় ব্যক্তির বিদ্রোহ, আর এ বিদ্রোহ জ্ঞানভিত্তিক। এরই নামকরণ হয়েছে উত্তরাধুনিকতা। এই নিরিখে আধুনিকতা-উত্তরাধুনিকতা একই অনুষঙ্গে বর্তমান ও বহমান। আধুনিকতা যদি হয় ব্যক্তির মুক্তি, তবে উত্তরাধুনিকতা হলো মুক্তিটাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ক্ষমতার সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই। একইভাবে উত্তর-উপনিবেশবাদ উপনিবেশবাদের পরের ব্যাপার নয়; উপনিবেশক চলে যাওয়ার পর উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বগুলোর আবিষ্কার হয়েছে বিষয়টি মোটেই এমন নয়। উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশবাদ সমান্তরাল, এদের সম্পর্ক মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো, একটা পিঠ থাকলে আরেকটা পিঠ কল্পনা করা যায় এবং দুটো পিঠ মিলেই একটি সত্তা তৈরি হয়। ইতিহাসে উপনিবেশবাদী চর্চার যেমন একটি দীর্ঘ পরিক্রমা আছে যার থেকে উপনিবেশবাদী তত্ত্ব তৈরি হয়েছে, তেমনি যেখানেই উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই উত্তর-উপনিবেশবাদী শর্তগুলো গড়ে উঠেছে। তবে তত্ত্ব হিসেবে উত্তর-উপনিবেশবাদের চর্চা সাম্প্রতিক কালের। তত্ত্বের পেছনে কিছু সূত্র ও উপাদান থাকে; সংশ্লিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সেগুলো খণ্ড-খণ্ড রূপে, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে; একটা সময়ে এসে একটি প্রবণতা তৈরি হয়–বিষয়টি গভীর অনুধাবনের, চর্চার; আর তখনই দেখা যায় আপাত-বিচ্ছিন্ন সূত্রসমূহকে সংহতকরণ ও সূত্রবদ্ধ করার প্রয়াস। বিষয়টি সূত্রবদ্ধ ও শৃঙ্খলার ভেতর এলে তখন আমরা তাকে বলি তত্ত্ব। অর্থাৎ তত্ত্ব হলো বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চিন্তাগুলোর সাধারণীকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ, যাকে সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। উত্তর-উপনিবেশবাদের যতগুলো বিষয় আছে, তা খণ্ডখণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে চর্চা হয়েছে সমগ্র ঔপনিবেশিক সময়কাল জুড়েই। উপনিবেশ-উত্তর নতুন পরিস্থিতির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিককালে গড়ে ওঠা আপাত-বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডখণ্ড চিন্তাসমূহকে সাবেক উপনিবেশের চিন্তাশীল মানুষেরা সুগভীর প্রচেষ্টায় একটি তত্ত্বরূপ দান করেন, যার শাস্ত্রীয় নাম উত্তর-উপনিবেশবাদ।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী রাজনীতি-চর্চার দীর্ঘ ইতিহাসের ক্রমপরিণতির প্রতিক্রিয়া থেকে সম্ভূত বলেই উপনিবেশ ও উপনিবেশ-উত্তর পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের অধ্যয়নক্ষেত্র। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, উপনিবেশায়ন, বিউপনিবেশায়ন, নয়া-উপনিবেশবাদ–এ সকল প্রপঞ্চের যৌগেই গড়ে উঠেছে এ তত্ত্ব। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি বা ধারণা প্রকাশ করলেও এরা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত – কোনো কোনোটি একে অপরের প্রণোদক ও পরিপূরক; আবার কোনো কোনোটি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নে তাই উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশায়ন ও বিউপনিবেশায়ন সম্পর্কে আলোকপাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

১.১

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ – সম্পর্ক ও স্বরূপ

উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ হাত ধরাধরি করে হাঁটে বটে, কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ এক নয়। উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাইদ তাঁর *Culture and Imperialism* গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যকার পার্থক্য ও সম্পর্কের বিষয়টি মূল্যায়ন করেছেন নিম্নোক্তভাবে :

'As I shall be using the term 'imperialism' means the practice, the theory, and the attitudes of a dominating metropolitan centre ruling a distant territory; 'colonialism', which is almost always, a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory … In our time, direct colonialism has largely ended, imperialism… lingers where it has always been, in a kind of general cultural sphere as well as in specific political, ideological, economic, and social practices.'

এডওয়ার্ড সাইদের বিবেচনায় সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটি আদর্শবাদের নাম, যে সমগ্র পৃথিবীতে নিজের সমস্ত মতবাদ প্রচার করে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়; আর উপনিবেশবাদ হলো তার প্রায়োগিক বাস্তবতা। সাম্রাজ্যবাদ এক দেশের সম্পদের ওপর আরেক দেশের অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ সম্পদ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য দেশে আরোপিত যাবতীয় অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়। সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতার অংশ হিসেবে উপনিবেশবাদের আবির্ভাব; বসতি স্থাপনের মাধ্যমে অন্যদেশের ওপর দখলদারিত্ব ও প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করে উপনিবেশবাদ তার উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ধরে নেয়া হয় উপনিবেশী শাসন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে উপনিবেশবাদের গন্তব্যের/চূড়ান্ত অন্বিষ্টের নাম, যেখানে উপনিবেশবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। উপনিবেশবাদ যেখানে পাকাপোক্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেখানে হাজির হয়েছে। যেখানে উপনিবেশবাদ পোক্ত হয়নি, সাম্রাজ্যবাদ তা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আরেক উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক John McLeod-এর অভিমত অনুসারে: সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে 'ideological concept', আর উপনিবেশবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদের 'one form of practice'।[১] সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ স্থাপন না করেও অন্য কোনো রূপে কার্যকর থাকতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা, সে-তুলনায় উপনিবেশের রয়েছে স্থানীয় রূপ যাকে ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায়; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তার পুঁজি ও মূল্যবোধ নিয়ে অবাধে বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়ায়, বাধা পেলে রক্তপাত ঘটায়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপন না করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া সাবেক উপনিবেশগুলোতে স্বত্ব হারালেও পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সেখানে এখনো তাদের কর্তৃত্ব এবং বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখেছে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক যুগ শেষ করে নয়া-উপনিবেশবাদের (Neo-colonialism) যুগে প্রবেশ করেছে এবং প্রবল প্রতাপে টিকে আছে। অর্থাৎ সারকথা হলো, সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে 'all implusive' একটি phenomena-র নাম; আর উপনিবেশবাদ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়ার নাম––প্রক্রিয়াটা চলমান থাকে আর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়; প্রতিষ্ঠা পায় শুধু ভূগোলে নয়; চিন্তায়, সভ্যতার নানামাত্রিক সূচকে।

১.১.১

উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদ হলো অধিকৃত ভূ-খণ্ড ও তার জনগোষ্ঠীর ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও তা টিকিয়ে রাখার মতবাদ। *Oxford Dictionary* উপনিবেশবাদ-এর সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেছে: 'The policy or practice of acquiring full or partial political control over another country, occupying it with settlers, and exploiting it economically.' অর্থাৎ উপনিবেশবাদ হলো একটি দেশ থেকে কিছু মানুষের অন্য একটি দেশে গিয়ে তা দখল করে নেয়া, দখল করার জন্য যা যা করার দরকার তা তা করা এবং দখলটাকে কায়েমি ও

দীর্ঘমেয়াদি করা এবং দেশটিকে উপনিবেশী শক্তির অধীনে আনার উদ্দেশ্যে গৃহীত কৌশল বা প্রক্রিয়া। উপনিবেশবাদের মূল লক্ষ্য হলো সম্পদ-লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে নিজ দেশের পরিসীমার বাইরে সমরশক্তি প্রয়োগে অন্য দেশ দখল, বসতি স্থাপন। Elleke Boehmer উপনিবেশবাদ সম্পর্কে বলেছেন : 'Colonialism involves the consolidation of imperial power, and is manifested in the settlement of territory, the exploitation or development of resources, and the attempt to govern the indigenous inhabitants of occupied lands, often by force.' (Boehmer, 2005: 2)|

উপর্যুক্ত মন্তব্যের মধ্যে আমরা উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য ও তার কার্যপ্রণালি সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা পাই –

১. অন্যদেশে বসতি স্থাপন উপনিবেশবাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
২. উপনিবেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কই হলো উপনিবেশবাদের মর্মমূল নিহিত বিষয়।
৩. উপনিবেশিত দেশে একটি বৈষম্যপূর্ণ ক্ষমতা কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমেই উপনিবেশবাদ তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে।
৪. দখলকৃত ভূমির স্থানীয় অধিবাসীদের উপর জবরদস্তির শাসন কায়েম করে।

উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপনিবেশকের অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ে উপনিবেশিতকে বাধ্য করা। উপনিবেশক দেশ নিজদেশের পণ্যের জন্য পরদেশে বাজার সৃষ্টি ও সেই বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে পরদেশে বাজার সৃষ্টি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সস্তা শ্রম-শক্তির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ছিল তাদের উপনিবেশ স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য। John McLeod উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন: 'The seizing of 'foreign' lands for government and settlement was in part motivated by the desire to create and control markets abroad for western goods, as well as securing the natural resources and labour-power of different lands and peoples at the lowest possible cost. Colonialism was a lucrative commercial operation, bringing wealth and riches to Western nations through the economic exploitation of others. It was pursued for economic profit, reward and riches. Hence, colonialism and capitalism share mutually supportive relationship with each other.' (John McLeod, 2007 : 7)।

পণ্যভোগী পুঁজিবাদ উপনিবেশবাদের বিকাশে শক্তি জোগায়; বিপরীতক্রমে বলা যায়, উপনিবেশবাদ পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ঔপনিবেশিক তৎপরতায় ঔপনিবেশিক দেশ ও উপনিবেশের মধ্যে মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রবাহে নতুন মাত্রা লাভ করে। সম্পদের এ প্রবাহ ছিল দ্বিমুখী––কাঁচামাল, দাস ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক গেছে কেন্দ্রে, অথবা কেন্দ্র-নিদের্শিত অন্য কোনো গন্তব্যে; আর কেন্দ্রের উৎপাদিত পণ্য গেছে উপনিবেশগুলিতে। সম্পদের এই দ্বিমুখী প্রবাহে মুনাফার পুরোটাই গেছে উপনিবেশক দেশের ভাণ্ডারে; আর ক্রমাগত শূন্য হয়েছে উপনিবেশের ভাঁড়ার। এভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটি বিধ্বস্ত করে দিয়ে নিজদেশের পুঁজির বিকাশকে অপ্রতিহত করে তোলে। এজন্য কোনো কোনো তাত্ত্বিক উপনিবেশবাদী কর্মকাণ্ডকে দেখেছেন ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ও শিল্পবিপ্লবের ধাত্রীর ভূমিকা হিসেবে।[২]

উপনিবেশবাদ আপাদমস্তক একটি অপরাধতন্ত্র; এর ভাবাদর্শ দস্যুতার[৩]; এর কার্যক্রম সর্বাংশে অপরাধমূলক; এর বুনিয়াদ নরগোষ্ঠীবাদে; মানববিশ্বকে সাদায়-কালোয় তত্ত্বগতভাবে ভাগ করে এই কার্যক্রম প্রণালিবদ্ধভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছে[৪], আর রাশি রাশি হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে সে কালো/বাদামি মানুষের হীনত্ব প্রচার করেছে।[৫] ইউরোপ তার নিজের মানদণ্ডে 'নিজে'কে মহিমান্বিত করার পাশাপশি কালো/বাদামি চামড়ার মানুষকে পরিণত করে অর্ধ-মানবে।[৬] জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, সাহিত্য-শিল্পকলা সর্বক্ষেত্রে 'সাদা'দের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিপরীতে উপনিবেশবাদ কালো/বাদামি চামড়ার 'প্রাচ্যজন'-কে চিত্রিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে শূন্য, সভ্যতা-বিবর্জিত, পশুতুল্য এক অধঃপতিত 'অপর' হিসেবে।[৭]

এই বিভাজনের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা-সম্পর্কের এক অসম বিন্যাস জারি করা – নিজেকে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে রেখে অবশিষ্ট বিশ্বকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়া এবং ভিন্ন বর্গের মানুষকে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা

থেকে চিরতরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। মানবসভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে ইতিহাসের বিশেষ পর্বে এসে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে উৎকর্ষ অর্জন করেছে তাকেই তার ক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে; মনে গজিয়েছে বাকি বিশ্বের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।[৮] ঔপনিবেশিক শক্তি পরদেশ শাসন ও তার সম্পদের ওপর নিজের অধিকার খুঁজে নেয় নিজের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিতে; আর সেই অন্যায় শাসনকে চাপিয়ে দেয় যোগ্যতমের শাসন হিসেবে। আধুনিক মারণাস্ত্রের দাপটে দিশেহারা জনগোষ্ঠীকে হতচেতন ও আত্মিকভাবে রিক্ত করতে তার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর হস্তক্ষেপ করে।[৯]

উপনিবেশবাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ফানোঁ-র সুতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী মন্তব্য হলো: 'উপনিবেশবাদ একটি অধিকৃত দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওপর শাসন চাপিয়েই,.... একটি জনগোষ্ঠীকে কব্জা করে তাদের মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত রূপরস ও সারবস্তুকে নিংড়ে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী যুক্তি দেখিয়ে উপনিবেশবাদ নিপীড়িত জনগণের অতীত ইতিহাসের দিকে হাত বাড়ায়, তাকে বিকৃত করে, কলঙ্কিত করে এবং ধ্বংস করে।' (ফানো, ২০১৭: ১৫২)। আপন আধিপত্যকে অপ্রতিহত করতে উপনিবেশবাদ মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচ্যের সকল অবদানকে অবলীলায় নাকচ করে দেয়। একারণেই ফাঁনো বলেন: 'উপনিবেশবাদ হচ্ছে অন্য মানুষের প্রতি পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকৃতি, অন্য মানুষের মানবিকতার সমস্ত গুণের প্রতি কৃতসঙ্কল্প অগ্রাহ্যতা।' (ফানো, ২০১৭: ১৮০)। উপনিবেশবাদ উপনিবেশের নিজস্ব সংস্কৃতি উচ্ছেদ করে সেখানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। আর সাংস্কৃতিক আধিপত্য গিলে খায় উপনিবেশিতের সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বভাব-ধর্ম, আচার-প্রথা–এক কথায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর আত্ম-পরিচয়।[১০] নিজের কালো/বাদামি চামড়া আর 'অধঃগামী' সংস্কৃতি নিয়ে উপনিবেশিতরা এক গভীর হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়; শ্বেতাঙ্গের সর্বময় শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে উপনিবেশিতের মনে তৈরি হয় প্রশ্নহীন আনুগত্য। অধিকৃত ভূমির জনগণের মনও উপনিবেশে পরিণত হয়; ফলশ্রুতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তৈরি হয় জনগণের নিঃশর্ত অনুমোদন। এই অনুমোদন রচনা করে অন্যায্য ঔপনিবেশিক শাসনের ন্যায্যতার বুনিয়াদ; যোগান দেয় ঔপনিবেশিক শাসনকে অপ্রতিহত ও চিরস্থায়ী করার রসদ।

উপনিবেশবাদ এক অতিকায় দৈত্যের মতো; এর নোংরা আত্মপ্রেম, অর্ধোন্মাদ ও হঠকারী প্রভাবে পদদলিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, কল্যাণকামিতা। 'স্পিরিচুয়াল' অভিযানের নামে বাকি বিশ্বের ওপর ইউরোপ জবরদখল চালিয়েছে, তার অপরাধকে যুক্তিসঙ্গত করেছে, আর মানবজাতির পাঁচ ভাগের চার ভাগকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার বিষয়টিকে বৈধ করেছে।

১.১.২
উপনিবেশ

সাধারণত উপনিবেশ বলতে পরাধীন দেশকে বুঝায়। কোনো বহিরাগত দেশ বা জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক অন্য কোনো রাষ্ট্র বা জাতিগোষ্ঠীর ভূমি ও সম্পদের ওপর সরাসরি সামরিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য ও সার্বিকভাবে অধিগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হলে অধিগৃহীত দেশটিকে উপনিবেশ বলা হয়। বাণিজ্যের প্রসার, পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পনের শতকের শেষ লগ্ন থেকে ইউরোপের কতিপয় দেশ উন্নত নৌশক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের দখলে নেয়; আর এ দখলীকৃত দেশগুলোকেই তারা উপনিবেশ (Colony) নামে অভিহিত করে। ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রধানত দু-ধরনের – বসতি উপনিবেশ ও বাণিজ্য উপনিবেশ। উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে পশ্চিম ইউরোপ থেকে দলে দলে মানুষ গিয়ে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তেবসতি স্থাপন ও নিজেদের শাসন কায়েম করেছিল। উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে ওইসব এলাকার স্থানীয় জনগণকে নির্মমভাবে উচ্ছেদ ও নির্মূল করা হয়, চালানো হয় গণহত্যা। এ ধরনের উপনিবেশকে বলা হয় বসত্কার উপনিবেশ। বসতি উপনিবেশে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশ হতে বিপুল সংখ্যক মানুষজন উপনিবেশে প্রতিস্থাপন করা হয় বলে এ ধরনের উপনিবেশকে বাস্তুতান্ত্রিক উপনিবেশও (Ecological colony) বলা হয়। এখানে বিপুল-বিস্তারী ভূমি ও

ভূমিকেন্দ্রিক যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় আদিবাসীদের কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ব্যাপক নির্মূলীকরণের কারণে বসতি উপনিবেশে স্থানীয় শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেলে অন্য উপনিবেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করা হয়েছে। বসতি উপনিবেশগুলোতে দাসত্ব চাপিয়ে দিয়ে চালানো হয়েছে অমানবিক শ্রম-শোষণ। এভাবে দাসপ্রথার মাধ্যমে পুরো আফ্রিকা এক অমানবীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। ঔপনিবেশিক বিস্তারের পরবর্তী ধাপে গড়ে ওঠে বাণিজ্য উপনিবেশ। এধরনের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল পুঁজিবাদের অবারিত বিকাশের প্রয়োজনে; অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, শিল্পপণ্যের কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয়এবং শিল্পজাত পণ্যের অবাধ বাজারজাতকরণ ইত্যাকার বাণিজ্যিক অভিপ্রায়ে। পরদেশ দখল ও তা স্থায়ীকরণের মাধ্যমে মুনাফাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলাই ছিল বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। যতদিন সম্ভব দখলে রেখে, যতভাবে সম্ভব উপনিবেশ থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই এক্ষেত্রে উপনিবেশকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। উপনিবেশিত দেশগুলোর সঙ্গে তাদের কোনো প্রকার বন্ধন তৈরি হয়নি। ভারতবর্ষ বাণিজ্য উপনিবেশের নির্মম দৃষ্টান্ত।

১.১.৩

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিত

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সূচনা পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এর পেছনে ছিল তিনটি কারণ : প্রথম কারণটি হলো রেনেসাঁস। রেনেসাঁসের হাত ধরে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসার হলো, নতুন চিন্তা-ভাবনার সূচনা হলো, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির হাত ধরে ইহজাগতিকতার প্রবর্তন হলো; তারই অভিঘাতে ঈশ্বরকেন্দ্রিক পৃথিবীর পরিবর্তে অধিষ্ঠান হলো মনুষ্যকেন্দ্রিক বিশ্বের, ধর্মতন্ত্রকে অস্বীকার করে ও সমষ্টির পরাক্রমতার বৃত্ত ভেঙে উদ্ভব ঘটলো ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠিত হলো ব্যক্তির স্বাধীনসত্তা ও নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ যাকে আমরা ইহজাগতিকতাবাদ (Secularism) বলি তার শুরু ও প্রতিষ্ঠা রেনেসাঁসের হাত ধরে। সেক্যুলার চিন্তা ধর্মের প্রাধান্যকে খর্ব করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধর্ম মানুষের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু ধর্মতন্ত্র যুগে যুগে মানুষকে শোষণ করেছে। এ প্রবণতা ইউরোপে খুবই প্রবল ছিল। রেনেসাঁসের প্রভাবে ধর্মতন্ত্রকে অস্বীকার করে ব্যক্তির উদ্বোধন ঘটেছিল। রেনেসাঁস মানুষকে বিশ্বমুখী করেছে, মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে বৈশ্বিক চিন্তা। রেনেসাঁস-পূর্ব সময়ে মানুষ স্থানীয়তায় আবদ্ধ ছিল, নিজস্ব পরিবেশ নিয়েই চিন্তামগ্ন ছিল; বিশ্বটাকে স্পর্শ করার তাড়না ছিল না, বিশ্বটাকে জানতও না প্রকৃত অর্থে। পঞ্চদশ শতক থেকেই শুরু হয়ে গেল ইউরোপের তথাকথিত আমেরিকা আবিষ্কার; অথবা ভারত বা আফ্রিকার অভিমুখে অভিযাত্রা। রেনেসাঁসের পর ইউরোপ এই বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল, তাতে বিশ্বের প্রতি আগ্রহ বাড়ল, যাকে ইংরেজিতে বলে Exploration বা অনুসন্ধানী অভিযাত্রা। খুঁজে বের করার এই দৃষ্টিভঙ্গিটাও সেসময় রেনেসাঁসের বদৌলতে তৈরি হলো, যার ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রধান প্রধান শক্তিগুলো হলো ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও স্পেনীয়। জার্মানরাও ব্যবসায়িক উপনিবেশ চক্রে সক্রিয় ছিল। এই পাঁচ-ছয়টি শক্তি মিলে সমগ্র পৃথিবীটাকে পদানত করে রেখেছিল। এমন একটা সময় ছিল যখন বলা হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না। অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম মিলে অধিকৃত সমগ্র ভূগোলে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পুঁজির অবারিত বিকাশের প্রয়োজন ছিল ইউরোপের উপনিবেশ বিস্তারের দ্বিতীয় কারণ। পুঁজির বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে ইউরোপে শিল্পযুগ তৈরি হয়েছে; আর যেখানে যেখানে ইউরোপের পুঁজি গিয়েছে সেখানেই উপনিবেশ চালু হয়েছে। ইউরোপে শিল্পযুগ শুরু হয়ে যাওয়ার পর, কলকারখানার উৎপাদন শুরু হয়ে যাওয়ার পর, যাকে আমরা assembly line production বলি, সেটি শুরু হয়ে যাওয়ার পর যে পরিমাণ সম্পদ দরকার সেগুলি জোগান দেয়ার জন্য উপনিবেশ বিস্তারকে অনিবার্য করে তুলেছিল। অন্য দেশে তাদের সভ্যতা নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, উপনিবেশ বিস্তারের প্রধান কারণ হলো তারা শোষণ করতে চেয়েছে সমস্ত পৃথিবীর সম্পদ, যাতে পশ্চিমের কলকারখানা ক্রমাগত খোলা থাকে, যাতে পশ্চিম ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়।

উপনিবেশ স্থাপনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের বিষয়। বিশেষ করে রেনেসাঁসের পরে যখন ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বের পরিবর্তে মানবকেন্দ্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, তখন উপনিবেশের মানুষকে যাতে

প্রভাবিত করা যায় তার জন্য গির্জাগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য হলো যত বেশি সম্ভব মানুষকে গির্জায় আনা যাবে, তত বেশি মানুষ ঈশ্বরের বন্দনা করবে; কাজেই ঈশ্বরকে আবারও কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করানো যাবে। ফলত যে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের চিন্তা ধাবিত ছিল সেগুলোই আবার প্রতিষ্ঠা পাবে। রেনেসাঁস-পূর্ব যুগে ইউরোপের প্রতিষ্ঠানগুলো চলত নিজেদের গণ্ডির ভেতরে; প্রথাগত নিয়মের যে 'অনতিক্রান্ত বৃত্ত' (circle-pass-not) তারা তৈরি করেছিল, কারোর পক্ষে তার বাইরে যাবার কোনো সুযোগ রাখেনি। এই গণ্ডির বাইরে যাওয়াটা হলো রেনেসাঁসের প্রথম প্রয়াস। এই গণ্ডি অতিক্রম করে রেনেসাঁসের মানুষ এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করেছে যেগুলো শোনা বা উত্তর দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুত ছিল না। এতে ধর্মের বিষয়টা অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক হয়ে গিয়েছে, পুরোহিতদের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে পড়েছে। এ অবস্থায় নিজ ভূখণ্ডে আধিপত্য-হারানো পুরোহিতরা অনেক ভেবে-চিন্তে ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিশ্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে নতুন অধিকৃত দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছেন। এটি অনেকটা ঢেউয়ের মতো; উত্থান, পতন, আবার উত্থান; একবার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে, আবার ক্ষমতার উত্থান ঘটছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যখন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, সামরিক বাহিনী ও সমরাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছে; বিশেষত গাদা বন্দুকের স্থলে আধুনিক বন্দুকের উদ্ভাবন হয়েছে তখন উপনিবেশবাদের উত্থান ত্বরান্বিত হয়েছে।

১.১.৪

উপনিবেশায়নের করণকৌশল

ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশসমূহের পরদেশে দখলদারিত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং দখলকৃত দেশকে স্থায়ীভাবে করতলগত রাখার জন্য অনুসৃত কৌশল, কর্মপন্থা ও কর্মযজ্ঞকে উপনিবেশায়ন বলে অভিহিত করা হয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে colonization-এর লিপিবদ্ধ সংজ্ঞা নিম্নরূপ: 'the action or process of settling among and establishing control over the indigenous people of an area.' ইউরোপীয় শাসক কর্তৃক পরদেশকে উপনিবেশে পরিণত করার সার্বিক কর্মকাণ্ডই উপনিবেশায়ন। উপনিবেশকের কাজ ছিল শাসনকাঠামোর মধ্যে অধিকৃত দেশের সম্পদ করায়ত্ত করা; কাজটি তারা করেছে ধারাবাহিকভাবে––প্রথমত প্রাকৃতিক সম্পদ, দ্বিতীয়ত, রাজস্ব সংগ্রহ; তৃতীয়ত, চুক্তিবদ্ধ শ্রম; সবশেষে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের আত্মসাৎকরণ। শোষণের শাসনটাকে মোলায়েম, নির্বিঘ্ন ও দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়োজনে ইউরোপ তার নিজের মডেলে অধিকৃত দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সাজিয়ে নেয় প্রয়োজনমতো।

ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশসমূহের পরদেশে দখলদারিত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং দখলকৃত দেশকে স্থায়ীভাবে করতলগত রাখার জন্য অনুসৃত কৌশল, কর্মপন্থা ও কর্মযজ্ঞকে উপনিবেশায়ন বলে অভিহিত করা হয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে colonization-এর লিপিবদ্ধ সংজ্ঞা নিম্নরূপ: 'the action or process of settling among and establishing control over the indigenous people of an area.' ইউরোপীয় শাসক কর্তৃক পরদেশকে উপনিবেশে পরিণত করার সার্বিক কর্মকাণ্ডই উপনিবেশায়ন। উপনিবেশকের কাজ ছিল শাসনকাঠামোর মধ্যে অধিকৃত দেশের সম্পদ করায়ত্ত করা; কাজটি তারা করেছে ধারাবাহিকভাবে––প্রথমত প্রাকৃতিক সম্পদ, দ্বিতীয়ত, রাজস্ব সংগ্রহ; তৃতীয়ত, চুক্তিবদ্ধ শ্রম; সবশেষে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের আত্মসাৎকরণ। শোষণের শাসনটাকে মোলায়েম, নির্বিঘ্ন ও দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়োজনে ইউরোপ তার নিজের মডেলে অধিকৃত দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সাজিয়ে নেয় প্রয়োজনমতো।

উপনিবেশায়নে সক্রিয় ছিল ব্যবসায়ী, সামরিক বাহিনী ও ধর্মপ্রচারকের ত্রিবেণী শক্তি। ভারত, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর তাবৎ উপনিবেশে প্রথমে গিয়েছে ব্যবসায়ীরা, রাষ্ট্রের সম্মতি ও সমরশক্তির সমর্থন নিয়ে; সামরিক বাহিনীর অধীনে তারা বসতি স্থাপন করেছে। সমরশক্তির অধীনে ছিল প্রশাসকেরা, একটি কাঠামো তৈরি করে

তারা সেখানে শাসনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। উল্লিখিত তিন শক্তি একসঙ্গে হয়ে যাওয়ার পর গির্জা সেখানে সানন্দে উপস্থিত হয়েছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মৌলনীতি হলো সাবর্ত্রিক আধিপত্যে উপনিবেশকে গিলে ফেলা; কৈশিকনালীর (Capillary) অবয়বে ক্ষমতাকে সর্বত্র সঞ্চালিত করা। তাই উপনিবেশায়নের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো সামরিক উপস্থিতির পাশাপাশি কঠোর আইনের আওতায় আমলাতন্ত্র, পুলিশ বাহিনী ও বিচার ব্যবস্থা এই ত্রিভূজের সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল ও কর্তৃত্বপরায়ণ প্রশাসনিক কাঠামোগড়ে তোলা। ঔপনিবেশিক স্বৈরশাসনে জনগণকে সার্বিক নজরদারিতে এনে তাদের আচরণ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিল। এ কাজটি তারা আরেকভাবে করেছে যার প্রমিত নাম সভ্যতায়ন মিশন। এই ধারণাটি হলো দেশজদের আলোকিত করা, যুক্তির শক্তি দিয়ে তাদের অতিকথন চিন্তাভাবনা দূরীভূত করা; আধুনিকায়নের নামে অধিকৃত ভূখণ্ডের গহীনে প্রবেশ করে স্থানীয় জ্ঞান-রীতিনীতি-প্রথা-সংস্কৃতি, এককথায় উপনিবেশের অর্থনীতি ও সমাজকে ভেঙেচুরে নিজস্ব আদলে পুনর্গঠন করা। এটাকেই এডওয়ার্ড সাইদ বলেছেন 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক নির্মাণ'।

উপনিবেশায়নের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণিকে পক্ষভুক্ত করা। বাড়তি সুবিধার বিনিময়ে গড়ে তোলা এ তাঁবেদার গোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী ও স্বজাতিবৈরী কর্মকাণ্ড দেশে দেশে উপনিবেশায়নকে বেগবান ও পোক্ত করেছে। কিন্তু অবৈধ শাসন জারি রাখার পক্ষে তা পর্যাপ্ত ছিল না। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার দমনযজ্ঞের মধ্যেই উপনিবেশ জুড়ে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের খণ্ড খণ্ড শিখা। ক্রমাগত বিদ্রোহের পটে শক্তিপ্রয়োগে উপনিবেশ ধরে রাখার কৌশল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল; তদুপরি সারাক্ষণ যুদ্ধ পরিস্থিতি উপনিবেশ স্থাপনের পুঁজিবাদী উদ্দেশ্যকেও ব্যাহত করে। বিদ্রোহের উৎস-মুখ বন্ধ করার জন্য দরকার ছিল উপনিবেশী শাসনের প্রতি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-ভক্তি ও শ্রদ্ধা উৎপাদন, উপনিবেশী শাসন-প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ। এ লক্ষ্যপূরণে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর দেহের পাশাপাশি মনকে বাগে আনা খুব প্রয়োজনীয় দাওয়াই হয়ে ওঠে, যাকে তাত্ত্বিকেরা বলেন 'মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন'। উপনিবেশায়নের এ কৌশলে পশ্চিমের জ্ঞানকেন্দ্রগুলো উপনিবেশ-গুলোতে আস্তানা গাড়ে। রেনেসাঁসলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্পের প্রসার তাদেরকে সুবিধা ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে: 'যারা প্রকৃতির যান্ত্রিক জ্ঞান ধারণ করে তাদের জন্য এ জ্ঞান প্রভুত্ব করার একটা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। যাদের এ জ্ঞান নেই তাদের ওপরেই এই প্রভুত্ব চলে।' (Horkheimerand Adorno, 1972: 4)। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মনে তৈরি হয় আপন শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা[১১] এবং তাদের মনে গজিয়ে ওঠে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা (the will to power)। (Fanon, 2008 : 3)। কর্তৃত্বের শক্তি হিসেবে ইউরোপীয়রা 'প্রাচ্যতত্ত্ব' (Orientalism) নামের এক সুপরিসর 'কাঠামোবদ্ধ জ্ঞানভাষ্য'র (discourse) মাধ্যমে প্রাচ্য-জনগোষ্ঠীকে অধঃস্তন 'অপর' (other) হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস চালায়। প্রসঙ্গটিকে হোমি কে. ভাবা উন্মোচিত করেছেন নিম্নোক্ত বিবৃতিতে: 'এই ডিসকোর্সের চালাকি পদক্ষেপ হলো জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে 'প্রজার জাত'-এর জন্য একটা পরিসর তৈরি করা, যেন এই জ্ঞানমতে কড়া নজরদারি করা যায় এবং আনন্দ/বিষাদের জটিল একটি ধরন জাগিয়ে দেয়া যায়। তারা চায় উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের সম্পর্কে জ্ঞান ফলানোর মধ্য দিয়ে এর কৌশলগুলো যেন অনুমোদন করে নেয়া হয়, যদিও সেই জ্ঞান ছাঁচে-ঢালা কিন্তু বিরোধাত্মক মূল্যে মূল্যায়িত। উপনিবেশী ডিসকোর্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপনিবেশিতদেরকে জাতিগত উৎপত্তির ভিত্তিতে পতিত নমুনারূপে প্রমাণ করে (সেই জাতকে) জয় করার কাজটা জায়েজ বলে দেখানো এবং তাদেরকে শাসন ও আদেশ-নির্দেশ করার একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা।' [১২]

জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিচিত্র মানদণ্ডে মানুষকে দাগ টেনে ভাগ করা উপনিবেশবাদের প্রধান করণ-কৌশল। উপনিবেশবাদ যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তারা প্রচুর দ্বিত্ববাদ (binary opposition) তৈরি করেছে। তার

প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যে কেন্দ্র সেটা প্রতিষ্ঠা করা; আর প্রাচ্যকে প্রান্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা। বর্ণবাদী প্রচারণায় উপনিবেশের মানুষেরা পরিণত হয় 'প্রাকৃতিক-প্রাণী'-তে, তাদেরকে বর্ণনা করা হয় প্রাণিবিদ্যার পরিভাষায়, জীবজন্তু বিষয়ক গল্পের অবতারণা করে।[১৩] জাতিদ্বেষ-তাড়িত এই সমীকরণ সহজাতভাবেই সত্যবিভ্রম ও বিচারবুদ্ধিরহিত; এপ্রচারে কেবল বিকৃতিই প্রতিফলিত; পরাভূত জনগোষ্ঠী সেখানে নিজ অবয়ব ও আত্মচারিত্র্যকে প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত বিদঘুটেভাবে।[১৪] সাদাদের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহিংসতায় কালোদের মনোজগৎ চূর্ণ হয়, ব্যক্তিত্ব-হারিয়ে মানবসভ্যতার তলানিতে সে আশ্রয় নেয়। ফানো বলেন, 'The black man naturally feels that *he is in closer touch with the 'lower animals' than with the white man, who is so far superior to him in every respect*.' (Fanon, 2008 : 134)। এভাবে উপনিবেশিত মানুষকে অধঃপতিত করার ঔপনিবেশিক অভিপ্রায় হলো: 'এইসব প্রাকৃতিক প্রাণী যারা অন্ধ-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে, তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে একটি কঠোর অনমনীয় শাসক-শ্রেণীর দ্বারা। তাদের চরিত্রকে জয় করা নয়, বরং পোষ মানাতে হবে।' (ফানো, ২০১৭ : ২২২)। শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ, বশে-আনা এবং শান্ত করা – ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার এই থিমে উপনিবেশিতের ওপর পরিচালিত সহিংসতা পায় ন্যায্যতার ভিত্তি।

উপনিবেশায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উপনিবেশের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার ওপর বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ। স্থানীয় সংস্কৃতির এসব উপকরণের উচ্ছেদ বা বিকৃতি সাধন এবং সেখানে ঔপনিবেশিক ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজেদের সর্বময় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও উপনিবেশিতের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তারের একাগ্র চেষ্টা চালিয়েছে। ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা–– সংস্কৃতির এই তিন উপকরণ পারস্পরিক নির্ভরতায় সম্পর্কিত এবং এরা কোনো একটি জাতির যৌথচেতনা বা সামষ্টিক আত্মপরিচয় নির্মাণের মৌলিক উপাদান। এসব উপকরণের যৌগেই একটি জনগোষ্ঠী পায় প্রাণ-প্রাচুর্যে বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার নির্যাস।
উপনিবেশী তৎপরতায় স্থানীয় সাহিত্যকে নিম্নরুচির শিল্পকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীকে নিজ সাহিত্যের প্রতি বিমুখ করা হয়। প্রজারা হয় নিজ ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ ঘটিয়ে পশ্চিমা সাহিত্যের চর্চায় নিমগ্ন হয়েছে, অথবা সাহিত্যের নিজস্ব রীতি-নীতি বিসর্জন দিয়ে ইউরোপীয় ভাবাদর্শ ও প্যাটার্নে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছে। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় ও পরিচর্যায় পশ্চিমা ভাষাগুলো, বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা, আপন উপনিবেশে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব অর্জন করে।

শিক্ষার উপনিবেশায়ন হলো উপনিবেশীকরণের সবচেয়ে মারাত্মক, কুটিল ও ধূর্ত কৌশল। পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো প্রতিটি উপনিবেশে শিক্ষা ছিল উপনিবেশীকরণের জোরালো হাতিয়ার। উপনিবেশকেরা উপনিবেশের স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। যার সাহায্যে স্থানীয় প্রজাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করে যুগ যুগ ধরে বশে রাখা যাবে।
ভারতবর্ষে উপনিবেশী শিক্ষা চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক দিক হলো ফিরিঙ্গি সাহেব তৈরি করা, যারা মানুষ হিসেবে হবে সংকর (Hybride)। না-প্রতীচ্য না-প্রাচ্য এরকম একটা প্রজা তৈরি করতে পারলে তার ফলনটা ভালো হবে; অর্থাৎ সে পশ্চিমের পক্ষে কলম ধরবে, পশ্চিমের স্বার্থের পক্ষে সব কাজ করে যাবে।[১৫]

উপনিবেশায়নে ধর্মপরায়ণতার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুপ্রিয় কৌশল। ঔপনিবেশিক শাসকেরা একদিকে নিজেদের খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে স্থানীয় ধর্মগুলোকে উচ্ছেদ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়; অন্যদিকে স্থানীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীকে বিভাজিত করে রাখে। 'ভাগ করো এবং শাসন করো' – সাম্রাজ্যবাদী এই নীতি ভারতবর্ষে ও আফ্রিকায় অপূর্ব ফলদায়ী হয়েছে। 'স্পিরিচুয়াল' বিবাদের অস্তিত্বকে মেলে ধরে ঔপনিবেশিক শাসকেরা উপনিবেশের জনগণকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে; ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়িয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি করে অমোচনীয় ব্যবধান। ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়

যে, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের অনুপ্রবেশের বহু আগে ভারতবর্ষ মুসলমানদের আক্রমণে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। প্রাচ্যতত্ত্বের আশ্রয়ে প্রাচীন ভারতের শৌর্য-বীর্য ও মহত্ত্বকে উদ্ঘাটন করে ঔপনিবেশিক শাসকেরা মুসলিম শাসনকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আগ্রাসন হিসেবে প্রতিপন্ন করে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্যমান দুরবস্থার জন্য মুসলিম শাসকদের দায়ী করে। ইসলামি মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে অনাধুনিক ও পশ্চাদপদ এবং মুসলিম শাসকদেরকে ভোগাসক্ত, উৎপীড়ক, বহিরাগত স্বৈরাচারী হিসেবে প্রচার করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে ব্রিটিশ শাসনকে শ্রেয়তর হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে মুসলিম শাসনের প্রত্যাবর্তন ঘটবে– এই ভয়ের সংক্রমণ ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে হিন্দু জনমতকে সংগঠিত করে। ফলে আড়ালে পড়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিভীষিকাময় চিত্রপট এবং স্থায়ীভাবে বিনষ্ট হয় উপনিবেশিত সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক ঐক্যবোধ ও আস্থার পরিবেশ।

বিশ্বজুড়ে ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপনের মূল অভিপ্রায়ই ছিল পরদেশ আয়ত্তে এনে তার যাবতীয় সম্পদ ইচ্ছেমতো কুক্ষিগত করা। এজন্যই উপনিবেশায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো উপনিবেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে মানানসই করে পুনর্গঠন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, যতক্ষণ বিদ্যমান ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্য অনুকূল, ততক্ষণ পর্যন্ত উপনিবেশবাদীরা বিদ্যমান ব্যবস্থায় কোনো হস্তক্ষেপ করেনি; বরং বিদ্রোহ উস্কে দিতে পারে এরকম অযাচিত পদক্ষেপ তারা এড়িয়ে চলত। উপনিবেশায়নের এদিকটি সম্পর্কে ফ্রান্ৎস ফানোঁর পর্যবেক্ষণ হলো : 'উপনিবেশবাদ প্রায়শই গ্রামদেশের স্থবিরতাকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের আধিপত্যকে জোরদার বা প্রতিষ্ঠা করেছে।...প্রতিষ্ঠিত সর্দার-মাতবরদের বেষ্টনীর ভেতর সংখ্যাগুরু গ্রামবাসী সামন্ততান্ত্রিক আবহে জীবনযাপন করছে; বসত্কারের সামরিক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা বজায় রাখা হচ্ছে সমাজের এই মধ্যযুগীয় কাঠামোর পূর্ণ প্রতাপ।' (ফানো, ২০১৭ : ৮২)। রাজস্ব আদায়ের জন্য পুরনো সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদারি-প্রথাই বহাল থাকে। তবে ভূমি-ব্যবস্থাপনায় আনা হয় ঔপনিবেশিক স্বার্থানুগ পরিবর্তন; জমির ওপর কৃষকের পুরুষানুক্রমিক মালিকানা রহিত করে জমির মালিকানা অর্পিত হয় ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন মুৎসুদ্দি ও মহাজনশ্রেণির হাতে। পুরনো সামন্ত শ্রেণিকে হটিয়ে দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে বণিকপ্রবৃত্তির নতুন সামন্তশ্রেণি, যারা লেঠেল বাহিনীর সহায়তায় কৃষকের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক পন্থায় বিপুল পরিমাণ খাজনা আদায় করে তার সিংহভাগ শাসকের তহবিলে যোগান দিয়ে বাকি অর্থে বিলাসবহুল জীবন-যাপনে মগ্ন হয়।

সর্বাত্মক উপনিবেশায়নে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মর্যাদার অবনমন ঘটে; এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা শাসকরা তাদের শোষণ-দমনের অবৈধ শাসনকে সভ্যতার পোশাক পরিয়ে একটি নৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় ফেলে উপনিবেশকরা উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর চেতনাস্তরে রোপন করেছে অসহায়ত্ব ও নির্ভেজাল দাসত্ব। উপনিবেশের ন্যূব্জ জনগণ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে যে, সভ্যের শাসনে শোষিত-নিষ্পেষিত হওয়াও স্রষ্টার আশীর্বাদ; কোন পূর্বকালের পুণ্যফলের কল্যাণে বিধাতার প্রতিনিধি হয়ে সুদূর ইউরোপ থেকে দয়া করে উপনিবেশকরা তাদের শাসন করতে এসেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানেও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পুরো কাঠামোটিই অবিকল বহাল থেকে যায়; সমাজে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্কৃতিতে, ব্যক্তির গহনচৈতন্যে অবিরাম খেলা করে ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা। এ ঘোর যেন অমোঘ, চিরকালের।

১.১.৫

বিউপনিবেশায়ন

উপনিবেশায়ন যদি হয় উপনিবেশকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধার সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা; তাহলে বিউপনিবেশায়ন হলো শোষণ-নির্যাতনের ব্যূহ ভেদ করে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মুক্তি অর্জনের সংগ্রামী প্রয়াস। বিউপনিবেশায়ন হলো কোনো উপনিবেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, কোনো পরাধীন দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক-ভাবে স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু বাস্তবতা হলো ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা প্রাক্তন উপনিবেশে সমহিমায় বিদ্যমান; উপনিবেশের মানুষদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির

উপাদান বিকৃত/দমিত; জাতির সামগ্রিক চৈতন্যে রয়ে গেছে প্রাক্তন উপনিবেশকদের চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং তাদের তুলনায় হীনম্মন্যতার বোধ। উপনিবেশমুক্ত দেশগুলোর এই অবস্থাটিকেই তাত্ত্বিকেরা উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতি এবং এই প্রভাব নিষ্ক্রিয়করণের কাজকেই বিউপনিবেশায়ন বলে সংজ্ঞায়িত করেন। 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ-বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আলোয়, নিজের সামর্থ্যে নিজেকে চিনে নেবার প্রক্রিয়ার নামই ডিকলোনাইজেশন। নিজেকে চিনতে পারা, নিজেদের উপযোগী শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের মাধ্যমে মুক্তির আস্বাদ লাভের প্রক্রিয়াই Declonization।'[১৬] এশিয়া বা আফ্রিকার মানুষ যাকে জানে 'মুক্তির সংগ্রাম' হিসেবে, ইউরোপীয়রা তাকেই বলে বিউপনিবেশায়ন। ইউরোপীয়দের এই সংজ্ঞায়নে আছে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মনে উপনিবেশের স্মৃতি তাজা রেখে তাদের পরোক্ষ শাসন বজায় রাখার দুরভিসন্ধি। উপনিবেশ থেকে সশস্ত্র বাহিনী আর পতাকা গুটিয়ে নিলেই উপনিবেশবাদের অবসান ঘটে না; উপনিবেশ স্বাধীন হওয়ার পরও উপনিবেশকের ছায়া-উপস্থিতি জনগণের মনস্তত্ত্বে প্রবলভাবে বিদ্যমান রয়ে যায়, যা অর্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করে দেয়। তাই জনগণের চৈতন্য থেকে উপনিবেশের অশরীরী উপস্থিতি দূরীকরণের প্রক্রিয়াটিকেও বলা হয় বিউপনিবেশায়ন। বিউপনিবেশায়নে বিজাতীয় সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই জরুরি বিষয়। এটা xenophobia বা ভিনদেশ-আতঙ্ক নয়, স্বকীয় সত্তাকে পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া। বিউপনিবেশায়ন সম্পর্কে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ও বিউপনিবেশায়ন তাত্ত্বিক ফ্রান্ৎস ফানোঁ-র রয়েছে বিউনিবেশায়ন সম্পর্কে গভীর ও গূঢ় বিশ্লেষণ। এ সম্পর্কে ফাঁনোর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো: বিউপনিবেশায়ন সর্বদাই একটি সহিংস প্রপঞ্চ। আর সহিংস পন্থায় এক প্রজাতির লোকজনের স্থলে অন্য এক প্রজাতির লোকজনের প্রতিস্থাপন। সংক্রমণের কোনো অবকাশ ছাড়াই আমূল, পরিপূর্ণ এবং পুরোদস্তুর এই অদলবদল ঘটে। সমগ্র সমাজ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তনেই বিউপনিবেশায়নের সফলতার প্রমাণ। বিউপনিবেশায়ন বিশ্বের বিন্যাসের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয় এবং এটি অবশ্যই একটি পুরোপুরি বিশৃঙ্খলার কর্মসূচি। বন্ধুসুলভ সমঝোতার মাধ্যমে এটা লাভ করা সম্ভব নয়। বিউপনিবেশায়ন হচ্ছে দুটো শক্তির মুখোমুখি হওয়া, প্রকৃতিগত কারণে যারা পরস্পরের বিপরীত। উপনিবেশে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত এবং তার দ্বারা লালিত এক ধরনের বাস্তবতা এর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী। প্রথমত, এই দুই শক্তির বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সহিংসতায় এবং তাদের সহাবস্থানে– তার মানে বসত্কার কর্তৃক ভূমিপুত্রের শোষণে। সারি সারি বেয়োনেট আর কামানের সাহায্যে চালানো হয় সেই শোষণ। যে প্রক্রিয়ায় মানুষজন উপনিবেশিত হয়েছে সেই একই প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে মুক্ত করে তারা মানুষ হয়ে ওঠে। 'শেষের জন আগে আর আগের জন শেষে' বিউপনিবেশায়ন এই আপ্তবাক্যকে কার্যে পরিণত করে। শেষের সেই জনকে যদি প্রথম হতে হয় তবে তা হতে পারে একমাত্র দুই যোদ্ধার মধ্যে রক্তক্ষয়ী এবং চূড়ান্ত এক সংগ্রামের শেষে। শেষের জনকে সবার শীর্ষে বসানোর অভিপ্রায়– প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সিড়ি ভেঙে টপকিয়ে শেষের জনকে ওপরে উঠানো তখনই সাফল্য লাভ করে যখন আমরা এর জন্য সহিংসতাসহ সবকিছুকে নিয়োগ করি। [ফানো, আমিনুল (অনুবাদ) ২০১৭ : ২৯-৩০]।

বসতি উপনিবেশগুলোর– যেগুলো বর্তমানে 'সেটেলার নেশন' হিসেবে পরিচিত – বিউপনিবেশায়ন শুরু হয় আঠার শতকের শেষ দিকে (১৭৭৬ খ্রি.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে, এর অবসান ঘটে বিশ শতকের প্রথম দশকে (১৯০৯ খ্রি.) দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে। এই দেশগুলোতে কার্যত ঔপনিবেশিক দেশের স্বজাতীয়ের শাসনই বহাল আছে।[১৭] অন্যদিকে বাণিজ্য উপনিবেশগুলোতে বিউপনিবেশায়ন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে শুরু হয়ে ষাটের দশকে গিয়ে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং সত্তরের দশকের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিউপনিবেশায়ন সম্পন্ন হয়। বাণিজ্য উপনিবেশগুলোর বিউপনিবেশায়ন হয় দেশগুলোতে গড়ে ওঠা উপনিবেশ-বিরোধী প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ব্যাপক সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। নতুন বিশ্বশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব বিশ্বব্যাপী বিউপনিবেশায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার বিপুল ব্যয়ভার বহন করাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পুরনো সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলোর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই সম্মানজনক উপায়ে ও নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ বহাল রেখে ঔপনিবেশিক শক্তি এক পর্যায়ে তার বর্বরতা ত্যাগ করে পছন্দসই দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে পতাকা গুটিয়ে উপনিবেশ থেকে প্রস্থান করে।[১৮]

১.১.৬

নয়া উপনিবেশবাদ

'নয়া-উপনিবেশবাদ' (Neo-colonialism) উপনিবেশবাদের নতুন ধরন। ঘানার প্রথম রাষ্ট্রপতি কোয়ানে এনক্রমা (Kwane Nkrumah) তাঁর *Neo-colonialism : The Last Stage of Imperialism* গ্রন্থে কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।

তত্ত্বগতভাবে বর্তমান বিশ্বে উপনিবেশ নেই; এর অর্থ হচ্ছে উপনিবেশক-উপনিবেশিত, ইংরেজ-নেটিভ, আপন-অপর যুগ্মবৈপরীত্যগুলো মুছে গেছে, বিভাজন ও শোষণ-পেষণের শাসনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু উপনিবেশোত্তর বিশ্বের প্রবল বাস্তবতা হলো সাবেক উপনিবেশগুলোর স্বশাসনের কাঠামোয় সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব ও তার স্বার্থের উপস্থিতি পূর্ণ-প্রতাপেই বহাল আছে। এটি সাবেক উপনিবেশগুলোর নতুন করে উপনিবেশিত হওয়ার অভিজ্ঞতা; দেশ-দখল না করেও শোষণ-পেষণ চালিয়ে যাওয়ার এক নবতর বৈশ্বিক ব্যবস্থা। এই বৈশ্বিক ব্যবস্থার পরিচয়-চারিত্র্য প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক মাইকেল প্যারেন্টি বলেন : 'ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পুরো দুনিয়াকে যে ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে, সেই কায়দায় আজ কোনো উপনিবেশ নেই বললেই চলে। সরাসরি উপনিবেশ হিসেবে না রেখে দুর্বল দেশগুলোকে সার্বভৌমত্বের ফাঁদে আটকানো হয়েছে, যেখানে পাশ্চাত্যের লগ্নি পুঁজি এ দেশগুলোর লাভজনক সম্পদের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এই সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে : অনানুষ্ঠানিক সাম্রাজ্য, উপনিবেশ-হীন উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ কিংবা নয়া সাম্রাজ্যবাদ।' (মাইকেল প্যারেন্টি, : ২২)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীন দেশসমূহের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে; বলাবাহুল্য এ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য নানান আইনি কাঠামোর ছত্রচ্ছায়ায় আগের তুলনায় আরও সংহত, অপ্রতিহত ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

বিশ শতকের শেষ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বময় আধিপত্য একচ্ছত্র হয়েছে। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ও সুবিশাল অর্থনীতি তাদের অমিত শক্তির উৎস; তদুপরি তার পেছনে নিঃশর্ত আনুগত্য নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে সাবেক ঔপনিবেশিক দেশগুলোরস্বার্থান্ধ জোট। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রবর্তিত আইনি-কাঠামোর ছত্রচ্ছায়াপুষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবেতিহাসেরই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর ও আধিপত্যবাদী দেশ। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসনের অজুহাত বিস্তার করে অবাধ্য দেশকে শায়েস্তা করতে ভয়ানক সব মারণাস্ত্র নিয়ে সেখানে অনায়াসেই ঢুকে যাচ্ছেএবং নির্বিচার সামরিক হামলা চালিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠা করছে বশংবদ সরকার। আবার কখনো বৈরী দেশকে শাস্তি দিতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে গভীর সংকটে নিক্ষেপ করে। বাকি বিশ্ব এই সাম্রাজ্যবাদী উন্মত্ততার নিরুপায় দর্শক মাত্র; আবার কেউ কেউএর সক্রিয় সমর্থকও। বলা যায়, নতুন বিশ্বশাসনের একটিই মাত্র কেন্দ্র যার নাম ওয়াশিংটন; আর অবশিষ্ট বিশ্ব তার প্রান্ত। মার্কিন কর্তৃত্বাধীন এই আধিপত্যকে বলা হচ্ছে 'Neo-colonialism' বা `Neo-imperialism'। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া ও সিরিয়ায় সামরিক অভিযান নয়া-উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের সাম্প্রতিকতম নজির।

১.১.৭

উত্তর-উপনিবেশবাদ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশসমূহকে ইতিহাসবিদেরা post-colonial state হিসেবে নির্দেশ করেন। এ নিরিখে উত্তর-উপনিবেশ বলতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী *সময়*কে অথবা কোনো দেশের উপনিবেশ-মুক্ত স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম *পরিস্থিতি*কে বোঝায়। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে ইতিহাসবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকেরা এই শব্দবন্ধকে উপনিবেশ-মুক্ত স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির জটিল উপস্থিতির চারিত্র্য নির্দেশ করতেও ব্যবহার করছেন। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হলেও অচিরেই দেখা গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে শুরু করে জনজীবনের প্রতিটি পরতে উপনিবেশী ধ্যান-ধারণা ও পশ্চিমী সংস্কৃতির সর্বময় আধিপত্য বিদ্যমান; উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিবর্তন হয়নি ক্ষমতার হাতবদল ছাড়া। সাবেক উপনিবেশের চিন্তক মহলে শুরু হয় এ পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ, এর অন্তর্গূঢ় কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন তাঁরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাধীন দেশে জড়িয়ে থাকা ঔপনিবেশিক শাসনের অবশেষগুলো চিহ্নিতকরণ ও মুছে ফেলার লক্ষ্যে সাবেক উপনিবেশের মনীষী-ভাবুকদের সামবায়িক চর্চায় একটি জ্ঞানভাষ্য হিসেবে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, উত্তর-উপনিবেশবাদের তত্ত্ব-প্রবক্তাগণ প্রধানত সাবেক উপনিবেশের মানুষ, তাঁদের বসবাস ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও বেড়ে ওঠা উপনিবেশকদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।[১৯] একটি কথা স্মর্তব্য যে, উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকেই উপনিবেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্রিয় ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকে প্রতিরোধ এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করার মনোভঙ্গি, যদিও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। কাজেই উত্তর-উপনিবেশবাদের প্ররোচক পরিস্থিতি এবং চর্চা ও লেখালেখির ইতিহাস বেশ পুরনো, তবে তখন এর কোনো শনাক্তযোগ্য নাম ছিল না।

মূলত এডওয়ার্ড সাইদের রচনার মধ্য দিয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদের তত্ত্বভিত্তি রচিত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী একটি একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর *Orientalism* (১৯৭৮) উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের আকর গ্রন্থ। এছাড়া তাঁর *Culture and Imperialism* আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তিনি মূলত তাঁর গবেষণাকর্মে উপনিবেশের প্রতি উপনিবেশকদের মানসিকতাকে চিহ্নিত করেছেন; মনগড়া ডিসকোর্স তৈরি করে প্রাচ্য জনমনে হীনম্মন্যতার বোধ চাড়িয়ে দিয়ে চিরতরে বশীভূত করার ঔপনিবেশিক রাজনীতিকে উন্মোচিত করেছেন। এরপর উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব নির্মাণে শামিল হন ভারত, কেনিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো, মিশর প্রভৃতি প্রাক্তন উপনিবেশের মেধাবী পণ্ডিতগণ। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, হোমি কে. ভাবা, এজাজ আহমেদ, আবদুল আর. জানমোহামেদ, বেনিটা পেরি, বিল অ্যাশক্রফ্‌ট, হেলেন টিফিন, ন'গুগি ওয়া থিয়োঙ্গা, চিনুয়া আচেবে প্রমুখ। তাঁদের চিন্তাভাবনা ও লেখার মধ্য দিয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব নানাদিকে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃততর হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব গড়ে উঠেছে উপনিবেশবাদের তাত্ত্বিক পটভূমিতে, উপনিবেশবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, তাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। বস্তুত উত্তর-উপনিবেশবাদ হলো উপনিবেশবাদের পাল্টা-জ্ঞানভাষ্য; রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশগুলোয় বহাল উপনিবেশী প্রভাব নিষ্ক্রিয় করার এক আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। উপনিবেশবাদী শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানভাষ্য সাবেক উপনিবেশগুলোর ইতিহাস-ঐতিহ্য ও চিন্তাজগৎ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা নিরূপণ এবং উপনিবেশিতের চেতনা-জগৎ থেকে ওই আধিপত্য দূরীকরণের এক তাত্ত্বিক প্রণোদনা ও আন্দোলনই হলো উত্তর-উপনিবেশবাদ। উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের গোড়ার কথা হলো কয়েক শতাব্দী ধরে চলা বিশ্বব্যাপী উপনিবেশায়নের ধূর্ত কৌশলগুলোকে, বিশেষত পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট দুরভিসন্ধিমূলক 'প্রাচ্যতত্ত্ব'-র মুখোশ উন্মোচন করা। জ্ঞানতত্ত্ব, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতির হৃদপিণ্ডের শিরা-উপশিরা

বেয়ে ইউরোপ অতি কৌশলে প্রাচ্যের এক গভীর রাজনৈতিক নির্মাণ হাজির করে। পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের এই পরিচিতি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিতের সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে মুছে ফেলে বা বিকৃত করে ইউরোপকেই বিশ্বজনীন আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং তার অন্ধ অনুকরণে উপনিবেশিতকে প্রণোদিত ও বাধ্য করে। পশ্চিমা জ্ঞানের প্রভাবে উপনিবেশিতের মনে হীনতার বোধ দানা বাঁধে এবং নিজের 'অপর' পরিচয় ঘনীভূত হয়। এই জ্ঞানকাণ্ডের শেকড় উপনিবেশিত জনচেতনার এত গভীরে পৌঁছেছে যে, স্বাধীনতা-উত্তর কালেও পশ্চিমকে শ্রেষ্ঠ বলে জানার এবং দৈনন্দিন জীবন-চর্চায় উপনিবেশী প্রথা-পদ্ধতিকে মেনে চলার বাতিক কিছুমাত্র হেরফের হয়নি; এই জনচেতনা পাশ্চাত্যের আদলে আদর্শ মানুষ হওয়ার বাসনা কিছুমাত্র পরিত্যাগ করতে পারেনি। বরং উৎপাটনের উদ্দেশ্যে এর এক শেকড় ধরে টান দিলে বহু শেকড়ে টান পড়ে আর তাতে বিপর্যয়ের অনুভূতি ভর করে সাবেক উপনিবেশিতের জনমনে।এর জন্য প্রয়োজন উপনিবেশকের সৃষ্টি করা জ্ঞানভাণ্ডারে হানা দেওয়া ও উপনিবেশের জ্ঞানজগতে উপনিবেশী বিন্যাস নিষ্ক্রিয় করা, এর অন্তর্নিহিত রাজনীতিকে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সামনে উন্মোচন করা এবং উপনিবেশিতের মনের উপনিবেশ ভেঙে দিয়ে আপন স্বরূপে নিজেকে চিনে নেওয়ার পথটি বাতলে দেওয়া। এই কাজটি সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ; কারণ যে প্রভাববলয় গড়ে উঠেছেপাশ্চাত্যের এক সুবিশাল পরিশ্রম ও বিনিয়োগযুক্ত জ্ঞানযজ্ঞের ভিতে এবং যার পেছনেএখনো পূর্ণোদ্যমে সক্রিয় সেই প্রকাণ্ড শক্তি, সেই জ্ঞানকাণ্ডকে নিষ্ক্রিয় করে জনচৈতন্য থেকে মুছে ফেলা এক দুরূহ প্রয়াস নিঃসন্দেহে। এর জন্য চাই আরেকটি সুবিশাল জ্ঞাননির্মাণের মহাযজ্ঞ; আর এই মহাযাজ্ঞিক তত্ত্বই হলো উত্তর-উপনিবেশবাদ। এই বিবেচনায় উত্তর-উপনিবেশবাদ হলো একটি তত্ত্ব-প্রপঞ্চ, একটি সুসমন্বিত জ্ঞানভাষ্য; যা গড়ে উঠেছে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র জ্ঞানশাখার সামবায়িক চর্চার মধ্য দিয়ে; যার লক্ষ্য হলো পাশ্চাত্যের জ্ঞানজাগতিক একচ্ছত্র প্রভাবকে খর্ব করে উপনিবেশমুক্ত দেশসমূহের জাতীয় আত্মপরিচয়কে সমুন্নত করে তাদের অর্জিত স্বাধীনতাকে সর্বার্থে ফলপ্রসূ করে তোলা।

উপনিবেশক-উপনিবেশিতের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ, উপনিবেশিতের প্রতি উপনিবেশকের মনোভাব, ঔপনিবেশিক দুর্বৃত্তায়ন ও প্রতারণা, উপনিবেশী শাসন ও সংস্কৃতির প্রতি উপনিবেশিতের সাড়া ও প্রতিক্রিয়া, উপনিবেশে উপনিবেশী শাসনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব, উপনিবেশী শাসন থেকে মুক্তির প্রতিরোধ আন্দোলন, স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি, সর্বোপরি বিউপনিবেশায়নকে অর্থবহ ও সামগ্রিক করার করণীয় নির্ধারণ উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে এ তত্ত্বের প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয়ে তা নিচ থেকে সমাজের উপরিতলকে ছুঁয়ে দেয়। যে সব প্রসঙ্গকে এতদিন স্থির ও ধ্রুব মনে করা হয়েছে, সেসব বিষয়কে নিরন্তর প্রশ্ন করে, চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তর-উপনিবেশবাদ পশ্চিমি, এমনকি অপশ্চিমি দেশগুলোর ক্ষমতা-কাঠামোর ভেতর থেকে বিকল্প জ্ঞান তৈরির প্রণোদনা জোগায়। তাই এই তত্ত্ব একই সঙ্গে তত্ত্ব ও তত্ত্বচর্চার সম্পর্ক, সমতার সম্পর্ক, দ্বন্দ্বের সম্পর্ক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে। যে পৃথিবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বদলে গেছে ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেই পরিবর্তিত পৃথিবীই উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের উপজীব্য। এর মধ্য দিয়েই উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা প্রার্থিত পৃথিবীর প্রাপ্তির চর্চা করেন, যে পৃথিবী ক্ষমতাবানের কব্জা থেকে নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করে সকল মানুষের সমতা ও কল্যাণকে নিশ্চিত করে।

উপনিবেশবাদের আধিপত্যে উপনিবেশের ব্যক্তি-মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত হয়, তার কথা বলার কর্তৃত্ব রহিত হয়; মূলধারায় স্থান হারিয়ে তার কোনো নিজস্ব কণ্ঠস্বর থাকে না। প্রান্তবর্তী এই মানুষদের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ ও কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান সংহত করার বিষয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। উপনিবেশবাদ জাতিসত্তার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের মানুষের মধ্যে বিষয়-বিষয়ী, নিজ-অপর, কেন্দ্রীয়-প্রান্তীয় –– এসব সমীকরণে যে বৈষম্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে, উত্তর-উপনিবেশবাদ

সেই বৈষম্যকে মুছে দিয়ে বিশ্বব্যাপী সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন তৈরি করতে সচেষ্ট। উত্তর-উপনিবেশবাদ ঘৃণা ও প্রতিশোধের নীতিকে পরিহার করে, সহিংসতার পথকে এড়িয়ে চলে, মানবিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

প্রাচ্যের মানুষকে দুর্বল হিসেবে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে উপনিবেশবাদ তাদেরকে চিত্রিত করেছে 'মেয়েলি প্রকৃতির'; আর তার বিপরীতে নিজেদের উপস্থাপন করেছে প্রবলপ্রতাপ 'পুরুষ' হিসেবে। স্পষ্টত ঔপনিবেশিক শাসন ছিল পুরুষতান্ত্রিক, প্রাধান্যসুলভ। উপনিবেশী শাসনে উপনিবেশের পুরুষ যেমন নিষ্পেষিত; তেমনি নারীও বহু শতাব্দী ধরে নিষ্পেষিত পুরুষতন্ত্রের দ্বারা। উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বে স্থানীয়দের অবদমিত মনে করা হয়; তাই নারীও এই অবদমনের শিকার। নারী এখানে দ্বিগুণ অবদমিত – একবার পুরুষতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা, আরেকবার স্থানীয় পিতৃতন্ত্রের দ্বারা।[৩২] ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে নারীর সংগ্রাম, নারীর উন্নয়ন তৎপরতা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ-কাঠামোতে নারীর অবস্থান ইত্যাকার প্রসঙ্গ উত্তর-উপনিবেশবাদের অন্যতম বিষয়বস্তু।[২০]

স্মর্তব্য, উপনিবেশকের জ্ঞানভাষ্য উপনিবেশিতের মনোজগতে যেমন আমূল রূপান্তর সাধন করেছে, তেমনি উপনিবেশিতদের দ্বারাও উপনিবেশক প্রভাবিত হয়েছে। উপনিবেশক সংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন চলে এসেছে, এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে সংকর আত্মপরিচয়ের (Hybrid Identity) বাস্তবতা। এই সংকর অবস্থার মধ্যে উপনিবেশী সংস্কৃতি অনেক বেশি শক্তিশালী হলেও স্থানীয়দের উপস্থিতিও শনাক্তযোগ্য। সংস্কৃতির এই সংকরায়ণের প্রবণতা ভেঙে দেয় উপনিবেশক-উপনিবেশিতের দ্বিমেরু (binary opposition) বিন্যাস যা উপনিবেশিতের জন্য বাড়তি শক্তি ও সুবিধার প্রতীক। মানুষের দেশান্তর ও মিডিয়া টেকনোলজির বিশ্বব্যাপী বিস্তারের ফলে সংস্কৃতির একটি মিশ্র বা পরিবর্তিত রূপ গড়ে উঠেছে, যা এখনো চলমান। উত্তর-উপনিবেশবাদ সংস্কৃতির সংকর প্রকাশের এই বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে বোঝার চেষ্টা করে।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি দেশে দেশে উপনিবেশ-মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করেছে এবং উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা লাভে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে উত্তর-উপনিবেশী যুগে উপনিবেশ-মুক্ত স্বাধীন দেশে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ভয়ানকভাবে হিংসাত্মক; জাতীয় মুক্তির পথেও এক অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক। উত্তর-উপনিবেশবাদ তাই জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় রাশটানার প্রয়োজনীয়তায় গভীর গুরুত্ব প্রদান করে। এই তত্ত্বে যা কিছু নিজস্ব ও দেশজ তা-ই গ্রহণীয়, আর যা কিছু পাশ্চাত্য প্রভাবজাত তা-ই নিন্দনীয় ও বর্জনীয়, এই নির্বিচার ও যুক্তিবিরহিত বোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। উত্তর-উপনিবেশবাদে কোনো একচক্ষুতা নেই; এই তত্ত্বায়নের গভীরে রয়েছে বিশ্ববীক্ষণের বিস্ময়কর সামগ্রিকতা। এই তত্ত্ব শুধু উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায়ই মুখর থাকে না; নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়; ঔপনিবেশিক ভাষ্যের প্রতারণা ও মিথ্যে ধরিয়ে দিতে গিয়ে আত্মজ্ঞান, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার দ্বিধাহীন একাগ্রতায় নিবিষ্ট হয়; উগ্র-জাতীয়তাবাদের একরৈখিক জাত্যভিমান ও উগ্র নির্মমতা যে আত্মবিনাশকেই ত্বরান্বিত করে সে বিষয়ে সতর্ক করে।

মানবমুক্তির রেনেসাঁসীয় প্রত্যয়ের ব্যর্থতার গর্ভ থেকে শোষণমুক্ত সমতাভিত্তিক বিশ্ব নির্মাণের সুগভীর শপথ-দৃপ্ত পথে মার্কসবাদের আবির্ভাব হয়েছিল। মার্কসবাদের এই সাম্যের ভাবনা উত্তর-উপনিবেশবাদের একটি প্রণোদনার দিক। বলাবাহুল্য উত্তর-উপনিবেশবাদের তাত্ত্বিকেরা হয় মার্কসবাদী, নয় মার্কসবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত; তবে মার্কসবাদের সীমাবদ্ধতার সমালোচনায়ও তাঁরা মুখর। *The world the text and critic* গ্রন্থের শুরুতে এডওয়ার্ড সাইদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন: 'I have been more influenced by Marxist than by Marxism or any other ism.'। সমাজতন্ত্রের পতনের পর কার্যত বিশ্ব পরিণত হয়েছে পুঁজিবাদের উন্মুক্ত ময়দানে। সাম্রাজ্যবাদের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক তৎপরতা যখন কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন পাশ্চাত্যের মনীষীমহল ব্যক্তিক প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ধরনের চিন্তার তত্ত্বীয় নাম উত্তরাধুনিকবাদ। পশ্চিমের উত্তরাধুনিকবাদের প্রাচ্যে বর্ধিত রূপই হলো উত্তর-উপনিবেশবাদ। উত্তর-

উপনিবেশবাদের তত্ত্বকাঠামোতে বিশ্বকে পুঁজিবাদ মুক্ত করা নয়; বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এর প্রভাবকে খাটো করাই বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ তত্ত্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আসল প্রতিরোধটি হবে সাংস্কৃতিক এবং তা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায়; কাজটি করবেন বুদ্ধিজীবীগণ। কারণ যে কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষে সংস্কৃতিই হচ্ছে নিজেকে রক্ষার জন্য চূড়ান্ত শক্তি। প্রাচ্য চূড়ান্তভাবে নতজানু হয়েছে তার সংস্কৃতির ওপর পাশ্চত্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক পীড়নে; পশ্চিম প্রাচ্যের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে জ্ঞানকে ব্যবহার করেই। তাই সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে জ্ঞানকেই হাতিয়ার করতে হবে; জ্ঞান দিয়েই জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতাকে মোকাবিলা করতে হবে। উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধে রাজনীতিকরা ব্যর্থ হয়েছেন; তাই কাজটি বুদ্ধিজীবীদেরই করতে হবে। বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞানান্বেষী হবেন এবং সমাজে যারা দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ক্ষমতাহীন, যাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। কাজটি করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবী শুধু সমালোচনাই করবেন না, তিনি বিরোধিতাও করবেন; প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে যে বিরোধ অনিবার্য। বুদ্ধিজীবীগণ সাধারণ মানুষের জন্যই কথা বলবেন, কিন্তু সমগ্র জনগোষ্ঠী তাঁর শ্রোতা নয়, তিনি কথা বলবেন বিশেষ জনগোষ্ঠী, পেশাজীবী ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে, যারা জনমত গঠন করেন। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় সরাসরি পরিবর্তন আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যে কারণে তাঁর অবস্থান হবে ভয়ঙ্কর সব ঘটনার সাক্ষী হিসেবে। বুদ্ধিজীবীরা কখনো প্রতিষ্ঠিতদের আরামে থাকতে দেবেন না; তাই বিপ্লবী না হলেও তাঁর ভূমিকা হবে অভ্যুত্থানকারীর মতো। তিনি নিজের বৈদগ্ধ্য ও বিতার্কিক দক্ষতাকে ব্যবহার করে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন; ব্যবস্থার পরিবর্তনে যতটা সুযোগ পান তার সদ্ব্যবহার করবেন। উত্তর-উপনিবেশবাদ প্রাচ্যবাদী বিভাজনে ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর মেরামত চায়, জ্ঞানভিত্তিক নৈরাজ্যে পৃথিবী যে এক গভীর মানবিক সংকটে নিপতিত হয়েছে তার অবসান চায়। এ তত্ত্বের গভীর প্রত্যয় – উত্তর-উপনিবেশী পৃথিবীর সংস্কৃতি একরৈখিক ও এককেন্দ্রিক হবে না, হবে বহুমুখী ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ; সেখানে থাকবে আদানপ্রদান, শোনা যাবে বিচিত্র কণ্ঠস্বর। একারণেই প্রাচ্যের সংস্কৃতির নিজস্বতা ও বহুমুখিতাকে চাপা দেয়ার পশ্চিমি সাংস্কৃতিক-রাজনীতি রুখতে প্রাচ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক সংগ্রামটাকে উত্তর-উপনিবেশবাদ সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এভাবেই উত্তর-উপনিবেশী চিন্তা বিশেষ স্থান-কালের সীমা পেরিয়ে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন।

১.১.৮

উত্তর-উপনিবেশবাদের সক্রিয়তার ক্ষেত্র

উত্তর-উপনিবেশবাদের কাজ বহু বিস্তৃত; উপনিবেশবাদ-বিরোধী তত্ত্ব হিসেবে এর চিন্তাভাবনা একাডেমিক ক্ষেত্র ছাপিয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, স্থাপত্যকলা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পরিবেশবিদ্যা সর্বত্র সক্রিয় আছে।ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে সমরশক্তিসহ প্রশাসকরা চলে গেছে, কিন্তু উপনিবেশোত্তর জীবনে সাংস্কৃতিক উপস্থিতি প্রবলভাবে রয়ে গেছে;পশ্চিমা জ্ঞানকেন্দ্রগুলো প্রাচ্যে যে জ্ঞানের ম্যাজিক তৈরি করে গেছে তা স্বাধীন দেশগুলোতে উপনিবেশবাদ চর্চাকে প্রবলভাবে জিইয়ে রেখেছে। পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে; তাতে প্রাচ্যের জনজীবনে অসংখ্য অসংগতি তৈরি হচ্ছে। উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব ক্রমাগত এসব বিষয়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। পশ্চিম ঔপনিবেশিককাল জুড়েই প্রাচ্যকে 'Othering process'-এর জালে মুড়িয়েছে, যার মূলকথা হচ্ছে পশ্চিম 'মুখ্য' (superior), আর পূব হচ্ছে 'উন' (inferior)। পূবের উনজনদের সংস্কৃতি, উনজনদের সবকিছুকে কেন্দ্রের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে উপনিবেশী চিন্তা, যেটা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি কতভাবে প্রাচ্যকে 'অপরায়ণ'-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের সংস্কৃতি তাদের কতখানি উপকারে লাগছে অথবা তার মালিকানা তারা কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে সে প্রশ্নটিও জাগছে। প্রাচ্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক যে পরিবর্তন হয়েছে সেটাতে তাদের কতখানি ভাল-মন্দ হয়েছে সেই বিচারটাও চলছে। আদর্শবাদের নামে পশ্চিম যে আদর্শগুলো প্রাচ্যের সামনে প্রচার করেছে

সেগুলো তারা কতভাবে গ্রহণ করেছে এবং কত প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেছে সেটি নিয়েও উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তকরা ভাবছেন।

দশকের পর দশক ধরে পুঁজিবাদ তার সীমাহীন ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করতে পৃথিবীর বুকে শিল্প-স্থাপনার অনিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। প্রকৃতিকে জয় করার নামে চলেছে প্রকৃতি ধ্বংসের উন্মত্ততা। বন্য প্রাণীদের বাধ্য করেছে নিজেদের গুটিয়ে নিতে। এই সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সংযোগ বেড়েছে; আর বন্য প্রাণীদের দেহে থাকা সার্স-ইবোলা-জিকা-করোনার মতো শত শত অনুজীব মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে, যা মহামারির কারণ হয়ে উঠছে। মহামারির একেকটি ধাক্কা আমাদের শিল্পায়নের মাত্রা কমিয়ে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান দিচ্ছে, যাতে প্রাণীদেহের অনুজীব প্রাণীর দেহেই থাকে। সংক্রামক রোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজেদের সুরক্ষার জন্য যৌক্তিক মূল্য হিসেবে ভোগের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় বৈশ্বিক নীতি প্রণয়নের বিষয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ সোচ্চার। উত্তর-উপনিবেশবাদ আগামীদিনের এমন এক বৈশ্বিক সিস্টেম তৈরিতে তৎপর, যে সিস্টেমের কেন্দ্রে থাকবে প্রকৃতি ও মানুষের স্বাস্থ্য; যা অর্থবহ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মায়াহরিণের পিছনে ছুটতে গিয়ে বিশ্বকে অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে, এই প্রবৃদ্ধি মানুষকে বাঁচায় না, মানুষকে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাতলানো পথে তথাকথিত বিশ্বায়নভুক্ত অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলোর মুক্তি নেই, নিজের সমস্যার সমাধান নিহিত নিজের অন্তর্গত শক্তি আর সামর্থ্যের মধ্যে। প্রত্যেক দেশেরই রয়েছে নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত স্বাতন্ত্র্য, জনগণের চিন্তা ও কর্মের দক্ষতা এবং মূল্যবোধের নিজস্ব ধরন।টেকসই উন্নয়নের জন্য চাই স্বনির্ভরতা; এই স্বনির্ভরতা অর্জন সম্ভব নিজস্ব প্রাকৃতিকসম্পদ ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মধ্য দিয়েই। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে ও উন্নয়নকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে রাষ্ট্রের কর্মযজ্ঞে সমগ্র জনগণকে শরিক করতে হবে। আত্মপ্রত্যয়ী ও কর্মদক্ষ জনগণের সর্বাত্মক তৎপরতায় দেশজ উৎপাদনসামর্থ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পশ্চিমা মুনাফা ও প্রবৃদ্ধিমুখী শিল্পায়ন মডেল বাদ দিয়ে জনগণের মৌলমানবিক চাহিদাপূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। পুঁজিবাদী কায়দায় মুনাফার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া নয়, বরং মুনাফা-বিমুখ সহানুভূতির ব্যবস্থাই জনগণের জীবনমানের উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্তকরণের বিকল্প উন্নয়ন মডেল উত্তর-উপনিবেশবাদ হাজির করে।

উত্তর-উপনিবেশবাদ তিনভাবে সক্রিয় হতে পারে: ১. চিন্তার ক্ষেত্রে, ১. সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ও ৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে। উত্তর-উপনিবেশবাদে চিন্তার সক্রিয়তাটাই আসল। মানুষ যদি চিন্তা না করে, ক্রমাগত প্রশ্ন করে চিন্তার ক্ষেত্রগুলি আবিষ্কার না করে তা হলে সেই মানুষটি প্রতিবাদও করতে পারবে না। উপনিবেশিকতাকে আমরা যত প্রশ্ন করব, চ্যালেঞ্জ জানাব ঔপনিবেশিকতার নিগড় থেকে বের হওয়ার পথটা ততই প্রশস্ত হবে। প্রশ্নের খাতিরে প্রশ্ন নয়, একটু প্রস্তুতি নিয়ে একটি বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসার আগ্রহ থেকে প্রশ্ন করাটাই হলো উত্তর-উপনিবেশিকতা। আমরা সংস্কৃতি দিয়ে কীভাবে পশ্চিমা আধিপত্যকে প্রতিরোধ করতে পারি সে ভাবনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাবেক উপনিবেশে পশ্চিমা উপনিবেশবাদের প্রচলনটা টিকেই আছে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। তৃতীয় হচ্ছে শিক্ষা; কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সক্রিয় চিন্তার মানুষ তৈরি করা। শিক্ষা মানুষকে ক্রমাগত ঋদ্ধ করে, আলোকিত করে, মানুষের চিন্তার জানালাগুলোকে খুলে দেয়, প্রশ্ন করতে শেখায়। উত্তর-উপনিবেশবাদ আমাদের শেখায়, কীভাবে নিজের ভালোটুকু বেমালুম বিসর্জন না দিয়ে পরের ভালোটুকু গ্রহণ করা যায়।

উত্তর-উপনিবেশবাদ কোনো সাহিত্য-সমালোচনা রীতি নয়, এটি একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব; তবে সৃজনীসাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনায় এ তত্ত্বটি দারুণভাবে কার্যকর। এ তত্ত্ব প্রাক্তন বা বর্তমান উপনিবেশে রচিত সাহিত্য পাঠ করা ও লেখার উপায় নিয়ে কাজ করে; সেই সাহিত্যে উপনিবেশকের সংস্কৃতি কীভাবে উপনিবেশিতের ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে বিকৃত করে এবং উপনিবেশিতদের নিকৃষ্ট হিসেবে চিত্রিত করে, তা পুঙ্খাপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করতে চায়। এককালের উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী এখন তার রচিত সাহিত্যে যেভাবে ওই বিকৃতি এড়িয়ে তার স্বতন্ত্র আত্মতা খাড়া করতে চায় এবং তার অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিতে অতীতকে নিজের জিনিস বলে দাবি করে, তা বুঝে দেখা যথাযথ উপায়ে জোরদার করাও এ তত্ত্বের জরুরি কাজ। এছাড়া এ তত্ত্ব সীমানা পেরিয়ে খোদ উপনিবেশকের দেশে রচিত সাহিত্যেও হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের প্রত্যক্ষ রূপ, প্রতিরোধের নানা চিত্র, উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার মুহূর্তের টানাপড়েন, তৃতীয় বিশ্বের সাম্প্রতিক বিচিত্র পরিস্থিতি, জাতিগত দ্বন্দ্ব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশ্বায়নের প্রভাব, স্বৈরাচার ও সামরিক শাসনের বাস্তবতা—প্রাক্তন উপনিবেশসমূহের গত দুই শতাব্দীর সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এসব বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক পর্যালোচনার অংশ হিসেবেই উত্তর-উপনিবেশবাদী সমালোচনারীতির প্রবর্তন ও প্রসার। সমাজ-রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক নানা উৎস - অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতিতত্ত্ব, ভাষা – এসবের সমন্বয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ যেমন একটি যৌগ তত্ত্ব হিসেবে জীবন ও জগৎকে দেখার একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে, তেমনি এ সাহিত্য সমালোচনারীতিটিও বহুমাত্রিক, অন্তর্ভেদী ও গভীর; আন্তর্বাচনিক (intertextual) ও আন্তর্তাত্ত্বিক (intertheoretical)।

আমাদের বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য হলো উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা, যেখানে উপনিবেশায়নের গভীর প্রভাবে ক্ষতবিক্ষত দেশকাল-সমাজ-সংস্কৃতি ও মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং শোষণ-বঞ্চনা-নিগ্রহের অচলায়তন ভেঙে মানুষের মর্যাদাপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস আন্তরিক নিষ্ঠায় শিল্পিত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. John McLeod-এর অভিমত: 'Imperialism is an ideological concept which upholds the legitimacy of the economic and military control of one nation by another. Colonialism, however, is one form of practice which results from the ideology of imperialism, and specifically concerns the settlement of one group of people in a new location. Imperialism is not strictly concerned with the issue of settlement, it does not demand the settlement of defferent places in order to work.' (*Beginning Postcolonialism*, First South Asia Edition, Manchester University Press, 2007, p.7-8)।

২. 'Modern colonialism did more than extract tribute, goods and wealth from the countries that it conquered – it restructured the economies of the latter, drawing them into a complex relationship with their own, so that there was a flow of human and natural resources between colonised and colonial countries. This flow worked with two directions – slaves and indentured labour as well as raw materials were transported to manufacture goods in the metropolis, or in other locations for metropolitan consumption, but the colonies also provided captive markets for European goods. Thus slaves were moved from Africa to the

Americas, and in the West Indian plantations they produced sugar for consumption in Europe, and raw cotton was moved from India to be manufactured into cloth in England and then sold back to India whose own cloth production suffered as a result. In whichever direction human beings and materials travelled, the profits always flowed back into the so-called `mother country'. … The essential point is that although European colonialisms involved a variety of techniques and patters of domination, penetrating deep into some societies and involving a comparatively superficial contact with others, all of them produced the economic imbalance that was necessary for the growth of European capitalism and industry. Thus we could say that colonialism was the midwife that assisted at the birth of European capitalism, or that without colonial expansion the transition to capitalism could not have taken place in Europe.' (Loomba: 2001: 4)।

৩. 'কয়েক শত বছর ধরে পুঁজিবাদ অনুন্নত বিশ্বে যুদ্ধবাদী ক্রিমিনালের মতো আচরণ করেছে। নিজের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, স্বর্ণ ও হীরার মজুদ বাড়ানোর জন্য পুঁজিবাদের প্রধান পদ্ধতি ছিল (শাস্তি হিসেবে) দ্বীপান্তর, হত্যাযজ্ঞ, বেগার খাটানো আর ক্রীতদাসত্ব।...সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের সামরিক শক্তি, প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা সার্ভিসের কাজ ছিল দেশের সম্পদ আবিষ্কার করা এবং মূল দেশে তা পাচার করা।' (ফানো, ২০১৭ : ৭৫-৭৬)।

৪. 'the good merciful God cannot be black: He is a white man with bright pink cheeks. From black to white is the course of mutation. One is white as one is rich, as one is beautiful, as one is intelligent.' (Fanon, 2008: 36)।

৫. 'black = ugliness, sin, darkness, immorality'. (Fanon, 2008: 149). 'the black man is the symbol of Evil…. The torturer is the black man, Satan is black, one talks of shadows, when one is dirty one is black – whether one is thinking of physical dirtiness or of moral dirtiness. …the black man equivalent of sin. In Europe, whether concretely or symbolically, the black man stands for the bad side of the character. … Blackness, darkness, shadow, shades, night, the labyrinths of the earth, abysmal depths, blacken someone's reputation; and, on the other side, the bright look of innocence, the white dove of peace, magical, heavenly light.' (Fanon, 2008 : 145-46)।

৬. 'Negro is the link between monkey and man – meaning, of course, white man.' (Fanon, 2008 : 18)।

৭. 'the black/ (brown) man makes all the animals behave *like a lower order of human intelligence, the kind that the Negro himself can understand*. The black man naturally feels that *he is in closer touch with the `lower animals' than with the white man, who is so far superior to him in every respect*.' (Fanon, 2008: 134)।

৮. 'The white man wants the world; he wants it for himself alone. He finds himself predestined master of the world. He enslaves it. An acquisitive relation is established between the world and him.' (Fanon, 2008: 97)।

৯. 'The real aim of colonialism was to control the people's wealth: what they produced, how they produced it, and how it was distributed. … Colonialism

imposed its control of the social production of wealth through military conquest subsequent political dictatorship. But its most important area of domination was the mental universe of the colonised, the control, through culture, of how people perceived themselves and their relationship to the world. Economic and political control can never be complete or effective without mental control. To control a people's culture is to control their toos of self-definition in relationship to others. For colonialism this involved two aspects of the same process: the destruction or the deliberate undervaluing of a people's culture, their art, dances, religions, history, geography, education, orature and literature, and conscious elevation of the language of the coloniser. The domination of peoples by the languages of the colonising nations was crucial to the domination of the mental universe of the colonised.' (Thiong'o, 2007: 16)।

১০. ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তনিও গ্রামসি প্রস্তাবিত হেজেমনি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'Hegemony is economical-ideological domination–always-incomplete, always-becoming, vulnerable, flexible, and hospitable to change—enacted as it is by a dialectic of *both consent and coercion*. Hegemony is generally consensual; but hegemony can also be coercive if coercion itself can be reproduced as consent.' (Hussain A.T.M. Azfar; *The Point to (ex)change it: Toward a Political Economy of Land, Labour, Language, and the Body*, 2003 : 205)।

১১. 'White men consider themselves superior to black men.' (Fanon, 2008 : 3)।

১২. 'Its predominant strategic function is the creation of a space for a `subject peoples' through the production of knowledges in terms of which surveillance is exercised and a complex form of pleasure/unpleasure is incited. It seeks authorization for its strategies by the production of knowledges of colonizer and colonized which are stereotypical but antithetically evaluated. The objective of colonial discourse is to construe the colonized as a population of degenerate types on the basis of racial origin, in order to justify conquest and to establish systems of administration and instruction.' (Bhaba, 1994: 70)।

১৩. ফ্রান্ৎস ফানোঁ তাঁর *Black skin White mask* গ্রন্থে জাতিবিদ্বেষী ইতিহাসের ছাঁচে কৃষ্ণাঙ্গরা কীভাবে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা ব্যবচ্ছেদিত হয়েছে তার একটি খতিয়ান তুলে ধরেছেন। সাদা বালক কৃষ্ণাঙ্গ দেখে আঁৎকে ওঠে: 'Mama, see the Negro! I'm frightened!' (Fanon, 2008: 84)। কারণ কৃষ্ণাঙ্গ সম্পর্কে তার মনস্তত্ত্বে নির্মিত হয়েছে নিম্নোক্ত প্রতিরূপ: 'নিগ্রো হলো জীবজন্তু, নিগ্রো ক্ষতিকর, নিগ্রো ঘৃণ্য, নিগ্রো কুৎসিত ... হাড়কাঁপা শীতে নিগ্রো কাঁপছে, সুদর্শন বালকটি শিউরে ওঠে। কারণ সে ভাবছে নিগ্রোটি রোষে কাঁপছে, সাদা বালকটি নিজেকে মায়ের কোলে সমর্পণ করে। 'মা, নিগ্রোটি আমাকে চিবিয়ে খেতে চায়'।' (ফানো, ২০১৭ : ৮৬)। এভাবে জাতিদ্বেষে আক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণাঙ্গরা আদিম দৃশ্যপটে চিত্রায়িত হয়।

১৪. 'Always with reference to the superiority of an expanding Europe, colonized peoples were represented as lesser less human, less civilized, as child or savage, wild man, animal, or headless mass. […] As we saw in Kipling's `On the City Wall', the representation of Indians (or Africans, black West Indians, Aborigins, etc) as unfit to rule or to manage their own resources was one such ideological mechanism, […] According to this approach, the naming of other peoples as irrational, barbarian, Indian, animal-like, childlike, effeminate –was simultaneously an act of evolution, usually of down grading.' (Boehmer, 2005: 76)।

১৫. হোমি কে. ভাবা এই মানুষগুলোরই একটি চিত্র এঁকেছেন নিম্নোক্তভাবেঃ '[h]ybridity is the sign of the productivity of colonial power, its shifting forces of fixities; it is the name for the strategic reversal of the process of domination through disavawal (that is, the production of discriminatory identities that secure the `pure' and original identity of authority). Hybridity is the revaluation of the assumption of colonial identity through the repitition of discriminatory identity effects. It displays the necessary deformation and displacement of all sites of discrimination and domination. It unsettles the mimetic or narcissistic demands of colonial power but reimplicates its identification back upon the eye of power. For the colonial hybrid is the articulation of the ambivalent space where the rite of power is enacted on the site of desire, making its objects at once disciplinary and disseminatory... a negative transparency.' (Bhaba, 1994: 112)।

১৬. আমিনুর রহমান; ইম্পিরিয়ালিজম থেকে পোস্টকলোনিয়ালিজম ; বেগম আকতার কামাল (সম্পাঃ), বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সামলোচনাতত্ত্ব, ২০১৪ পৃ. ১৯৫।

১৭. 'These nations (today reffered to as 'settler' nations) consisted of large European populations that had settled overseas, often violently displacing or destroying the indigenous peoples of these lands. …The 'settler' peoples of these nations agitated for forms of self-government which they achieved as dominions of the British Empire.' (John McLeod: p. 9)।

১৮. জ্য পল সার্ত্রে বলেন : 'তার (বসত্কারের) উচিত, যাদের কাছ থেকে সে লুট করছে তাদেরকে হত্যা করা। কিন্তু তা সম্ভব নয়, যেহেতু, তাদেরকে তার শোষণও করতে হবে। যেহেতু হত্যাকে সে গণহত্যায় এবং দাসত্বকে পশুবৎ অধঃপতনে নিয়ে যেতে পারে না, তাই সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে; যন্ত্রটা উল্টো কাজ করে, এবং একটা অকাট্য, অবশ্য-গতি তাকে ব্যুপনিবেশনের (decolonization) দিকে ঠেলে দেয়।" (ফানো, ২০১৭ : ২২৫)।

১৯. Robert J. C. Young-এর অভিমতঃ "Since the early 1980s, postcolonialism had developed a body of writing that attempts to shift the dominant ways in which the relations between western and non-western people and their worlds are viewed.' (Young, 200 : 2)।

২০. 'In seeking to learn to speak to (rather than listen to or speak for) the historically muted subject of the subaltern woman, the postcolonial intellectual *systematically* 'unlearns' female privilege. This systematic unlearning involves learning to critique postcolonial discourse with the best tools it can provide and not simply substituting the lost figure of the colonized.' (spivak, : 91)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলায় উপনিবেশায়নের স্বরূপ

১.২

দেবেশ রায় উপনিবেশবাদের সর্বগ্রাসী বাস্তবতা সম্পর্কে বলেছেন: 'উপনিবেশের জীবনের কোনো কিছুকেই সাম্রাজ্য তার ক্ষমতাপ্রয়োগের লক্ষ্যের পরিধির বাইরে যেতে দেয় না–– সে একটি গ্রামের নামই হোক, আর একটি সভার বিবরণই হোক।' (দেবেশ রায়, ১৯৯০: ১৫)। উত্তর-উপনিবেশবাদের গোড়াতেই রয়েছে প্রতিবাচনিক তাগিদ; এর যুক্তিপ্রক্রিয়ায় পশ্চিমের সঙ্গে পার্থক্য প্রতিপন্ন করার প্রয়োজনীয়তা সুগভীর। এই নিরিখে উপনিবেশবাদের খোলস উন্মোচনে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব কতিপয় বিষয়ে গভীর তদন্ত করে –– প্রথমত, কেন উপনিবেশ স্থাপন করা হলো; দ্বিতীয়ত, উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে কী কী কৌশল প্রয়োগ করা হলো এবং তৃতীয়ত, উপনিবেশ স্থাপনের ফলে কী কী অভিঘাত তৈরি হলো; উপনিবেশগুলোর জীবনব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, শিক্ষাচিন্তায়, সমাজব্যবস্থায়, বিচারব্যবস্থায়, চিকিৎসাব্যবস্থায় কী ধরনের রূপান্তর ঘটলো। বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের ইতিহাসকে আমরা এই ক্রমেই অনুসন্ধান করবো। কিন্তু তার আগে আমাদের বুঝতে হবে উপনিবেশিত বাংলার প্রাক্-ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটি কেমন ছিল। এটা বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের মাত্রা ও স্বরূপ বোঝার পক্ষে সহায়ক হবে। উত্তর-উপনিবেশবাদের শেকড়-সন্ধানী অভিপ্রায়ের জন্যও তা অতীব জরুরি।

১.২.১

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের বাংলার সমাজ-কাঠামো

১.২.১.১

প্রাচীনযুগ

প্রাচীন ভারতের পরিচিতি একটি 'গ্রামীণ সমাজ' হিসেবে; কিন্তু কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*[১] বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার সামলানো আর জটিল সমাজব্যবস্থার বিচিত্র সমস্যার সমাধানের ইতিবৃত্তে পরিপূর্ণ। কৌটিল্য দুধরনের প্রজাতন্ত্রের (corporation) কথা বলেছেন, প্রথমটিতে রাজা পদবিধারী ব্যক্তির প্রাধান্য থাকতো, আর অন্যটিতে থাকতো এমন শ্রেণী-পেশার লোকের সমাবেশ, যারা কৃষি, ব্যবসা ও অস্ত্রবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল। ভারতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের মধ্যে গ্রামীণ সম্প্রদায় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাশ্চাত্যের আদলে বাণিজ্যকেন্দ্রিক শহর ও নগর গড়ে ওঠেনি; নগরগুলো ছিল মূখ্যত প্রশাসনিককেন্দ্র ও তীর্থস্থান।

ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ; চার্লস মেটকাফ যাকে অভিহিত করেছেন 'ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র' (little republic) বলে। গ্রামগুলো ছিল রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক যন্ত্র; দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প গ্রামেই কেন্দ্রীভূত ছিল।[২] ভূমিকেন্দ্রিক এ সমাজব্যবস্থায় কৃষি-উৎপাদন ও ভূমি-রাজস্ব-ই ছিল এর মেরুদণ্ড। রাজশক্তি ও ধর্মের যৌথ স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত বর্ণপ্রথায় স্থিরীকৃত হয়েছিল ভূমিব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। পুরোহিত, যোদ্ধা, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক কর্তব্য ধর্মীয় আইনে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্ণভুক্ত জনবিন্যাসে 'ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন, অন্যের যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব এবং দান-দক্ষিণা গ্রহণ ও প্রদান; ক্ষত্রিয়দের কর্ম হচ্ছে অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন, দান-দক্ষিণা প্রদান, সামরিক দায়িত্ব পালন এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধান; বৈশ্যদের বৃত্তি হচ্ছে অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজন, দান-দক্ষিণা প্রদান, কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য; শুদ্রদের পেশা হচ্ছে দ্বিজদের সেবা প্রদান, কৃষি ও পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারুকার্য এবং রাজদরবারে চারণকবির ভূমিকা পালন। ... অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান-দক্ষিণা প্রথম তিন জাতিবর্ণের অভিন্ন পেশা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বেলায় যথাক্রমে ব্যতিক্রম হচ্ছে অধ্যাপনা, সামরিক কর্ম এবং কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। আর বৈশ্য ও শুদ্রের মধ্যে অর্থকরী কাজের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, শুধু যেটুকু অমিল দেখা যায় তা হলো এই যে, শুদ্ররা দ্বিজদের সেবা করে। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শুদ্রদের অধ্যয়নে একেবারেই কোন অধিকার নেই, অধ্যাপনার তো কোনই প্রশ্নই ওঠে না।' (রংগলাল, ২০০১ : ৬০-

৬১)। আদিতে সামাজিক-বিভাজন কর্মের বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হলেও কালক্রমে তা জন্মসূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। বৈশ্যের উৎপাদন ও শুদ্রের শ্রমের ওপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও শাসক ক্ষত্রিয় শ্রেণির নিরঙ্কুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বর্ণপ্রথার প্রবর্তন হয়েছিল। দৈবনির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের গুরুত্ব এতটাই প্রবল ছিল, যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারতো না। পরজন্মে সুখভোগের আশায় কোনো কলহের অবতারণা না করেই নিম্নবর্গের মানুষেরা নিষ্পেষণ ও শোষণকে মেনে নিয়েছিল।

অর্থশাস্ত্রে প্রতিফলিত ভারতে কৃষকদের জমিতে স্বত্ব ছিল না, জমির মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের; জমি এমন লোককেই দেয়া হতো যে তার সদ্ব্যবহারে সক্ষম। এ ধারণা আধুনিককালের 'জমি তার লাঙল যার' ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।[৩] *অর্থশাস্ত্রে* বিম্বিত প্রাচীন ভারতে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছিল। অর্থশাস্ত্রে দু ধরনের খনির উল্লেখ রয়েছে—সমুদ্রখনি (ocean mines) এবং ভূমিখনি (land mines); উভয়শ্রেণীর খনির দায়িত্বে বিশেষজ্ঞ-তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত থাকতো। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারত উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতে গণিত, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকাশ বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। ধর্ম ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও সংস্কারমুক্ত ও মুক্তমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিও সমানভাবে সক্রিয় ছিল। কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে বাস্তব উপযোগিতার কারণে এই বিজ্ঞানচর্চাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।[৪] গণিতে প্রাচীন ভারতীয়রা তিনটি অবদান রেখেছিলেন-- সংখ্যাতত্ত্ব, দশমিক পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহার। শিল্প ও স্থাপত্যে প্রাচীন ভারতের অবদান উল্লেখযোগ্য। একক শিলাখণ্ডে রচিত অশোকের স্তম্ভগুলি মসৃণ পালিশ ও উজ্জ্বলতার জন্য বিখ্যাত। উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ মৃৎপাত্রেও অনুরূপ পালিশ দেখা যায়। স্তম্ভ ও মৃৎপাত্রের ওপর প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের এই দক্ষতার রহস্য আজও অজ্ঞাত। অজন্তার গুহা মন্দির ও গুহাচিত্রের চিত্রকলার প্রতি বিশ্বের শিল্পপ্রেমিকরা প্রকাশ করেছেন বিস্ময়াবিষ্ট অভিনন্দন। অতীত ভারতে বেদান্ত, সাংখ্য, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রশাসিত ধার্মিকতার বিপুল প্রসার ঘটেছে; তবে এর বাইরেও ভারত মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক বস্তুবাদী জীবনচর্যার এক উর্বরক্ষেত্র—– চার্বাকের লোকায়ত দর্শন, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম তার প্রমাণ।[৫] কপিলের সাংখ্য দর্শনে বস্তুবাদের পরিচয় মেলে। এ দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। এই দর্শনের মতে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেননি, প্রাকৃতিক কারণেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে; জীবজগৎ মানবজীবন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব বিরোধী। ক্ষত্রিয়দের মতো বৈশ্যরাও মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধকে সমর্থন জানিয়েছিলেন নিজেদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। এই ধর্ম মানুষকে তাগিদ দিয়েছিল কুসংস্কারের বদলে যুক্তিকে মান্য করতে, শিখিয়েছিল কোনও ঘটনাকে তর্ক ও বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে বিশ্বাস করতে। এভাবে বৌদ্ধধর্ম সাধারণ মানুষের মনে এক যুক্তিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, যা ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এক বিপ্লব বলে চিহ্নিত হতে পারে।

প্রাচীন ভারতের বিশাল ঐতিহ্যের মধ্যে গর্ববোধ করার মতো একটি বিষয় গণমত প্রকাশের স্বীকৃতি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত কেন্দ্রীয় বিষয় হলো গণ-আলোচনা। অমর্ত্য সেন বলেন: 'গণতন্ত্র কেবল ব্যালট ও ভোটদানের ব্যাপার নয়; গণ-বিতর্ক ও গণ-মতপ্রকাশ এর এক অন্যতম লক্ষণ, যে কারণে গণতন্ত্রকে অনেক সময়ে বলা হয় 'আলোচনাসাপেক্ষ প্রশাসন'।' (অমর্ত্য, ২০১৬: ৫২-৫৩)।

কারিগরি শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ এ সময় অসামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল। কারিগরি শিল্পকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই বণিকরা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ নাগরিক জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতো। এমন কিছু পাইকারি বণিক ছিল যারা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সব ধরনের পণ্যই বিক্রি করতো। রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ছিল অবারিত। শশাঙ্কের রাজত্বকালের [আনুমানিক ৫৯০-৬২৫ খ্রি.] পর বাংলার ইতিহাসে

এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ শুরু হয় এবং তা এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাংলাদেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই মাৎস্যন্যায় অবস্থার ঘটে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। পালরাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (৭৫০-৭০) ছিলেন সম্ভবত বাংলার জনগণ বা বাংলার প্রধান নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত রাজা। পালবংশ যখন বাংলার উত্তর, উত্তদর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে রাজত্ব করেছিল, তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেছে চন্দ্র-বর্ম বংশ। বাংলায় পাল রাজত্ব প্রায় চার শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পাল সাম্রাজ্যে সামন্ত বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং দুর্বলতার সুযোগে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে আগত সেনবংশ বাংলায় রাজত্ব কায়েম করে। সেনরাজ বিজয় সেন (আনুমানিক ১০৯৮-১১৬০) সমগ্র বাংলাকে একাধিপত্যে এনে নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পাল আমলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজ-শাসনের সূচনা হয়[৬] এবং সেন আমলে এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পুরোহিততন্ত্রের প্রতিপত্তি সেন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বহু ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ সেনযুগে রচিত হয় এবং এসব শাস্ত্রগ্রন্থই বাংলার ব্রাহ্মণতন্ত্রের ভিত্তি। এযুগে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সমাজকাঠামোর শীর্ষে আর বাংলাদেশে যত বর্ণ ছিল তা সবই শূদ্র ও সংকর। এরা আবার তিন উপশ্রেণিতে বিভক্ত ছিল––উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অধম সংকর; কয়েকটি নিম্নবর্ণ ছিল যারা অন্ত্যজ নামে অভিহিত হতো। অন্ত্যজরা ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য। প্রাচীন বাংলায় ধর্মশাস্ত্রে পুরুষের বহুপত্নীগ্রহণ অনুমোদিত ও স্বামী-স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদ অননুমোদিত ছিল। স্বামীর অনুগতা স্ত্রী হওয়াই ছিল বাঙালি নারীর আদর্শ এবং বৈধব্য ছিল নারী জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ। তবে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না। (দ্রষ্টব্য: আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), ২০০৮: ৫৬)।

১.২.১.২

মধ্যযুগ

ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযানের সূত্রপাত অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় (৭১১-১২ খ্রিষ্টাব্দ), মুহাম্মদ বিন কাশেমের নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা দখলের মধ্য দিয়ে। সুলতান মাহমুদ ১১০০ থেকে ১১২৭ সালের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন, প্রতিবারের আক্রমণেই লক্ষ্য ছিল ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন, শাসন কায়েম নয়। ভারতবর্ষ জুড়ে মুসলিম শাসন বিস্তৃততর ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামল ছিল মূলত পূর্ববর্তী সামন্ততন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা; ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সংস্কৃতির শাসকের অধীনে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল কোনো রূপান্তর ঘটেনি।

ঐতিহ্যগতভাবেই ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ ছিল কৃষি; জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই ছিল কৃষি-সম্পৃক্ত, শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল সীমিত। মুসলিম আমলে ভূমি ছিল জাতীয় সম্পত্তি; পাশ্চাত্য অর্থে জমির ওপর কারোর 'de facto ownership' ছিল না।[৭] জমি-জমা 'was entirely under the management of Qualish or exchequer office'[৮]; কৃষকরা রাষ্ট্রকে খাজনা দিত ভূমি-রাজস্ব হিসেবে। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য এবং রাজস্বের এই পরিমাণকে ন্যায্য বলেই মনে করা হত। জমিদার ছিল বংশানুক্রমিক রাজস্ব-সংগ্রাহক আর রায়ত ছিল ভূমির বংশানুক্রমিক ভোগ-দখলকার; জমি ভোগ করতে পারলেও তা সহজে হস্তান্তর করতে পারত না, জমি হস্তান্তর ছিল খুবই সীমিত, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে সরকারের পূর্বানুমতিতে। মুসলিম শাসনামলে কৃষি অর্থনীতির পাশাপাশি অর্থনীতিতে অকৃষিখাতেরও একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হতে থাকে। ফলত সামন্ত-কাঠামোর মধ্যেই খুব ধীরে হলেও বাজার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে। কারিগর ও কারুশিল্পীরা সমাজের প্রয়োজনীয় ব্যবহার-দ্রব্য তৈরি করত; তার বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে তারা পেতো ফসলের একটি ভাগ অথবা নিষ্কর জমি। ধীরে ধীরে কারুশিল্পীদের একটি বড় অংশ শহরে বা কারুশিল্পী বসতিতে বাস করতে শুরু করে। সামন্ত-ভূস্বামীদের ফরমায়েস অনুযায়ী তারা ব্যবহার-সমাগ্রী নির্মাণ করত এবং তৈরিকৃত জিনিসপত্র নগদমূল্যে হাটবাজারে বিক্রি করতো। মোগল আমলে ভারতে বস্ত্রবয়ন ছিল সবচেয়ে উন্নত শিল্প। সূতি ও রেশমের বস্ত্র, এমব্রয়ডারি করা ও

ছাপা কাপড়, স্বাভাবিক ও রঙ-করা কাপড় উৎপন্ন হতো বিপুল পরিমাণে। প্রায় একশ ধরনের কাপড়ের উল্লেখ আছে সম্রাট আকবরের পোশাকের তালিকায়। আগ্রায় গৃহনির্মাণ, গুজরাটে মর্মর-পাথর ও বাংলায় জাহাজনির্মাণ শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। এছাড়া অন্যান্য ধরনের কারিগরি পেশায়ও দক্ষ ছিল ভারতীয়রা; যেমন খনি থেকে লোহা ও অলৌহ নানা ধাতু তোলা, লবণ ও শোরা উত্তোলন, গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য খনি থেকে পাথর কাটা, কাগজ ও মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার তৈরি, উদ্ভিজ্জ তেল উৎপাদন ও নানা ধরনের মিষ্টান্ন তৈরি ইত্যাদি।

মোগল আমলে ভারতের কারুশিল্পের উৎকর্ষ বিশ্বজনীন খ্যাতি অর্জন করে। বিশেষত বাংলার তাঁতবস্ত্র গোটা প্রাচী পৃথিবীতে অত্যন্ত সমাদৃত ছিল। সূতিবস্ত্র, উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য এবং শ্রমশক্তির আয়তনের নিরিখে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে, কৃষির বাইরে, সম্ভবত সর্ববৃহৎ শিল্প ছিল। (ইরফান, ২০১৭: ৪১)। কাপড়-ছাপাই চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ এদেশে একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প কৌশল হয়ে উঠেছিল।[৯] উন্নত শিল্পপণ্যের টানেই ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতে, বিশেষত ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ছুটে আসে।[১০] মোগল আমলে যোগাযোগব্যবস্থারও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ফলে ১৬৫০ সাল থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং ভারত-ইউরোপ বাণিজ্য মজবুত ভিত্তি পায়।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি সম্পর্কে ইসলামি দুনিয়া শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ; আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতের অনেকখানি অংশে যখন ইসলামের সংস্পর্শ সূচিত হয়, তখন ইসলামের বৈজ্ঞানিক পরম্পরায় অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট। এরপরও মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে শ্রমসাশ্রয়ী প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। মধ্যযুগে ভারতীয় প্রযুক্তিতে সবচেয়ে ফলপ্রসূ যন্ত্র হলো সুতো বোনার চরকা (spinning wheel), যার ব্যবহারে ভারতে বস্ত্র উৎপাদন ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। (ইরফান, ২০১৭: ৪৫)। হিমায়ন (refrigeration) সম্পন্ন করার জন্য সোরা ব্যবহার করার পদ্ধতি মধ্যযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। আবুল ফজলের বর্ণনামতে সম্রাট আকবর নিজেই এর আবিষ্কারক। ১৫৮৫ সালের আগেই এর আবিষ্কার হয়েছিল; এবং এক্ষেত্রে ভারত ইউরোপে হিমায়নের জন্য রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের সময়কালের চেয়ে এগিয়েছিল। মধ্যযুগে ভারতের দুটি আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একটি হলো সংক্রামক বসন্ত রোগের জন্য প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ঘটনা। মোগল আমলের একটি বিশিষ্ট উদ্ভাবন ছিল স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত কাঠামো বা 'pre-fab structures'। এই কৌশলে বাড়ি নির্মাণে কাঠের থাম ও কড়িবর্গা সংযুক্ত করা হতো এদের মাথায় 'স্ত্রী' ও 'পুরুষ' ফিটিংসহ লোহার খাপ দিয়ে, যাতে এগুলো সহজে খুলে ফেলা যায়। দেওয়াল ও ছাদ তৈরি হতো বুনট বাঁশের চাদর দিয়ে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলার সমাজ-কাঠামোয় 'a Muslim population speaking Bengali came into existence.'[১১] 'জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় যেমন আগে একবার ব্যাপক হারে বাংলার কৃষক, ব্যবসায়ী ও কুটির-শিল্পী শ্রেণির লোকের জাতি-বর্ণ-বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, ঠিক তেমনি ঐ সকল সামাজিক গোষ্ঠীর লোকজন আবার একই ভাবে জাতি-বর্ণ-বিরোধী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। তবে ঐ পটভূমিতে বাংলার হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তরের লোকেরা, যারা লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মকে আর আশ্রয় করতে পারল না, অথচ নবাগত ইসলাম ধর্মকেও বরণ করল না, তারা তৎকালীন বাংলার সমাজ-কাঠামোর এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে 'Ritualistically pure, and qualitatively important category of castes, the so-called Nabasakh or Nine-part group' হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখল।' (রংগলাল, ২০০১: ৭৫-৭৬)। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ধর্মান্তরিত হলেও সমাজকাঠামোয় মৌলিক কোন পরিবর্তন আসেনি; কারণ বহিরাগত মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় খুবই নগণ্য এবং এদের একটি অংশ স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ভেতর লীন হয়ে গেছে। এছাড়া তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও কোন তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি ঘটেনি। স্বল্পসংখ্যক বহিরাগত ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী ও আমলাদের নিয়ে একটি অভিজাত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং এ অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয় প্রাক্-মুসলিম যুগের হিন্দু

অভিজাতশ্রেণী।[১২] আর এর পাদমূলে অবস্থান করে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বৃহত্তর কৃষক ও কুটির-শিল্পী শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রচর্চার একচ্ছত্র আধিপত্য ও অসন্তুষ্টির বেড়াজাল ভেদ করে অন্ত্যজ শ্রেণির হিন্দুরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে এবং মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় সক্ষম হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের এই রূপান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রাহ্মণরা মুসলিম শাসনের প্রতি প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে বিক্ষুব্ধ ছিল। 'রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্রাহ্মণ ও মুসলমানদের সমঝোতার চেয়ে কায়স্থদের কর্মধারা মুসলমান শাসকদের জন্য বেশি ফলপ্রসূ ছিল। হিসাব-সংরক্ষণ, রাজস্ব ও কৃষি বিষয়ক খুঁটিনাটি প্রভৃতি কাজে কায়স্থেরা বেশ দক্ষ ছিল। মুসলমান ও ব্রাহ্মণেরা এসব কাজ জটিল ভেবে এড়িয়ে যেত। ফলে কায়স্থেরা রাজস্ব বিভাগের চাকুরিতে প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ... কায়স্থ কর্মচারীরা মুসলিম শাসকদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কখনো আত্মপ্রকাশ করেনি। রাজস্ব-বিভাগে আধিপত্য এবং তাদের উপর সুলতানদের নির্ভরতার ফলে অধিকাংশ রাজস্ব-কর্মচারী মুসলিম শাসকদের অধীনে জায়গিরদারি ও জমিদারি লাভ করেন।' (কে. এম. মহসীন, আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), ২০০৮: ৫১০)। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে হিন্দু কায়স্থদের মধ্য থেকে একটি ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটে এবং বাংলায় একধরনের লগ্নি পুঁজির বিকাশ ঘটে।

আঠার শতকের শুরুতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর কেন্দ্রীভূত সামন্তশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাংলার শাসনব্যবস্থায় বণিকরা নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। জগৎশেঠ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ঢাকা থেকে দিল্লী পর্যন্ত পূর্ব ও উত্তর ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরেই জগৎশেঠের ব্যাংকের শাখা ছিল। বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি জগৎশেঠ পরিবারের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যে, বাংলা থেকে দিল্লীর সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্বের এক কোটি টাকা জগৎশেঠের হুণ্ডির মাধ্যমে পাঠানো হত। ১৬৯২ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে বাংলার ব্যবসায়ীরা সেখানে সমবেত হতে থাকে। ১৭১৭ সাল নাগাদ কলকাতায় 'under the protection of the English Flag'[১৩] বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় মোগল অমাত্য ও হিন্দু বেনিয়ারা একযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে। ১৭২০ সালের মধ্যে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, কাশিমবাজার ও পাটনায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অসংখ্য ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। সতের শতকের শেষার্ধে ও আঠার শতকের প্রথমার্ধে বাংলার জিনিসপত্রের রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৪] বাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যে লগ্নি পুঁজির বিকাশ ঘটতে থাকে ধনী হিন্দু বণিক শ্রেণিই তা করায়ত্ত করে। ব্রিটিশদের সঙ্গে দেশীয় যে সকল বণিক প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন গুটিকয়েক মুসলিম ব্যবসায়ী বাদে সবাই ছিলেন হিন্দু। সামন্ততন্ত্রের ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা এই পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সামন্ত শাসকশ্রেণির বিরোধ ছিল অনিবার্য। সামন্ততন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে ব্যক্তি-পুঁজির স্বাধীন বিকাশের প্রয়োজনে বাংলায় কোম্পানির উপস্থিতিকে তাঁরা অপরিহার্য বিবেচনা করেছে। কোম্পানি ও দেশীয় পুঁজিপতিদের ভাগ্য ও সমৃদ্ধি যখন এক হয়ে গেছে তখন তাদের স্বার্থের প্রতিবন্ধক নবাবকে হটানো তাদের যৌথ-দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। কোম্পানি-বানিয়ার এই অভূতপূর্ব পার্টনারশিপে ভর করেই বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন হয়। ক্ষমতা-পাগল কতিপয় রাজকর্মচারী ও অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীদের নিশ্চিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে রবার্ট ক্লাইভ সদলবলে পলাশীর প্রান্তরে হাজির হয় এবং ২৩ জুন, ১৭৫৭ তারিখে পলাশীর মাঠে যে নামমাত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে নবাবের পরাজয় ছিল অবধারিত।

১.২.২

বাংলা তথা ভারতবর্ষে উপনিবেশায়নের স্বরূপ

সভ্যতার সুপ্রাচীনকাল থেকেই সম্পদের প্রাচুর্যের কারণেই ভারতবর্ষ ছিল বাকি বিশ্বের কাছে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। হাজার হাজার বছর ধরে বাণিজ্যতরী নিয়ে ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলেছে কত নাম জানা-না-জানা জাতিগোষ্ঠীর বণিকেরা; কত বিচিত্র বর্ণের, ধর্মের ও সংস্কৃতির রাজা-মহারাজা, রথী-মহারথীদের পদভারে প্রকম্পিত হয়েছে ভারতবর্ষের মাটি; বহিরাগত শাসকের ধর্ম-মূল্যবোধ-সংস্কৃতিতে জারিত হয়েছে ভারতের পূর্বতন ধর্ম-মূল্যবোধ-সংস্কৃতি।

ভারতবর্ষে গ্রামজীবন ছিল সমাজকেন্দ্রিক, যূথবদ্ধচারিত্র্যের, গোষ্ঠীভাবনা তাড়িত। ব্যক্তি এখানে নিজেই নিজের নয়, সমাজের; তার শরীরটাও সামাজিক ও সাম্যবাদী শরীর। শুধু ঐহিক মানুষ নয়, পারত্রিক মানুষেরাও এ সমাজের বাসিন্দা। এ সমাজ প্রকৃতিগতভাবে সার্বভৌম, রাষ্ট্র তার চোখে অনুপ্রবেশকারী শক্তি; সমাজে রাষ্ট্রের উপস্থিতি অনধিকার-প্রবেশের মতো। ব্রিটিশ-পূর্ব শাসকেরা এই 'সমাজে'র অভ্যন্তরে ঢোকার প্রয়াস চালায়নি। একারণেই ভারতবর্ষ আদৌ কোন একক শাসনের অধীনে আসেনি; এবং শাসক পরিবর্তন বিষয়ে সমাজের কোন মাথাব্যথাও ছিল না। এমত-সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধটা একেবারেই মৌলিক ধরনের; এবং সাংঘর্ষিক। পশ্চিমা পুঁজিবাদের বিকাশের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শাসকদেরকে ভারতীয় 'সামাজিক বন্ধনকে আত্মসাৎ, দমন বা শিথিল করে বা প্রয়োজনবোধে হটিয়ে দিয়ে' সেখানে সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্যের একটি 'আধুনিক রাষ্ট্র' গড়ে তুলতে হয়েছে। 'শান্তি বজায় রাখা' বা 'আইন-শৃঙ্খলা' রক্ষা করা, 'আর্থিক উন্নতি' ও 'জনস্বাস্থ্য' রক্ষা করা –– এসব স্বনির্বাচিত কর্তব্য পালনের নামে রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনের ওপর সর্বাত্মক কর্তৃত্ব জারি করে। জনকল্যাণের ভান করে ভারতীয় গোষ্ঠীজীবনে রাষ্ট্রের উপস্থিতিকে অনিবার্য ও অবারিত করে তোলে। রাষ্ট্রিক মতাদর্শের পরিচর্যায় ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর কাঠামো থেকে বের করে ব্যক্তিস্বার্থের ময়দানে টেনে আনে, ফলত সমষ্টিগত স্বার্থচেতনা (কল্যাণভাবনা) ভারতবর্ষের চিরায়ত জীবন থেকে অপসৃত হয়। ব্রিটিশ আধিপত্যে 'সমাজ ভারত'-এর 'রাষ্ট্র ভারত'-এ রূপান্তরণ শুধু ক্ষমতার হাত-বদল ছিল না বা সাময়িক পরিবর্তনও ছিল না, এটি ছিল একেবারেই স্থায়ী ও মৌলিক পরিবর্তন। ব্রিটিশ শাসনের আওতায় 'সমাজ' থেকে 'রাষ্ট্রে' পরিবর্তিত হওয়ার বিশালায়তন এ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিই ভারতবর্ষের উপনিবেশায়ন হিসেবে চিহ্নিত এবং ভারতের নতুন রাষ্ট্রিক পরিচিতিটা দাঁড়িয়েছে 'উপনিবেশ'। 'এই পরিবর্তন একদিনে হয় না। পুরাপুরিও ঘটে না কোন সময়। পরিবর্তনের পথটিও সর্বত্র মসৃণ নয়। স্থান-কালভেদে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ... এই অসম ও বন্ধুর পরিবর্তন-প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে রাষ্ট্রের হাতে 'অস্ত্র' থাকে নানা ধরনের –– আইনব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, আর্থনীতিক ব্যবস্থা।'[১৫]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছে শাসকদেশের স্বার্থের চারণভূমিতে, এদেশের জনগণ হয়েছে নিজদেশে পরবাসী, শাসকদের শ্রমদাস। এ শাসন ছিল নির্ভেজাল দস্যুতা; স্বার্থপরতায় জর্জরিত ও বর্বরতায় ক্লেদাক্ত। তাদের তৎপরতা শুধু দেশ দখল ও শাসনে সীমাবদ্ধ না থেকে গড়িয়েছে উপনিবেশিত জনগণের মনোজগৎ পুনর্গঠন পর্যন্ত। অর্থাৎ অসভ্যকে সভ্য করার দায়িত্বও তারা তাদের শাসনে অন্তর্ভূক্ত করেছে। একে তারা গাল ভরা নাম দিয়েছে 'আলোকায়ন মিশন'। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল একটাই––অন্যায় ও জুলুমের শাসনকে ন্যায়ের আবরণে মুড়িয়ে তাকে গ্রহণযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী করা। নিজেদের শাসনের পক্ষে তারা প্রচুর যুক্তি উৎপাদন করেছে; আর এ যুক্তির প্রধানতম ভিত্তি হলো জ্ঞানের অগ্রগামিতা। এই যুক্তিতে নিজেদের শাসনকে তারা উপস্থাপন করেছে মূর্খের ওপর জ্ঞানবানের শাসন হিসেবে।[১৬] এ যুক্তিতেই 'অবোধ, পশুপ্রতিম'[১৭] ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর অবৈধ দখলদারিত্ব ও সম্পদ লুণ্ঠনকে তারা অধিকার হিসেবেই বিবেচনা করেছে; আর তাতে উপনিবেশিত জনগণের প্রতি আচরণে মানবিক দায়বদ্ধতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়নি।

উপনিবেশিত জনগণকে ঔপনিবেশিক শাসনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে তৈরি করা হয় কঠোর সব আইন-কানুন এবং গড়ে তোলা হয় আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থার সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো। ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের বাস্তব প্রয়োজনকে সামনে রেখে উপনিবেশের দীর্ঘদিনের জীবনধারা, রীতিনীতি, আচার-প্রথা, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করে পুনর্নির্মাণ/নবনির্মাণের জবরদস্তি চালিয়েছে। ধর্ম, ভাষা, প্রথা সবকিছুতেই তারা পরিশোধনের নামে হস্তক্ষেপ করেছে। আবার জনগণকে শান্ত রেখে নির্বিঘ্নে শাসন করার কৌশল হিসেবে কখনো কখনো স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে আপসও করেছে। উপনিবেশায়নের জটিল ও দীর্ঘ পথপরিক্রমায় পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে কখনো কখনো কৌশলী বাঁক পরিবর্তন করতে হয়েছে; বার বার শাসননীতি পরিবর্তন করতে হয়েছে; কখনো কখনো শাসননীতি উল্টো দিকে হেঁটেছে। বাংলা দিয়েই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত;

অনিবার্যত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উপনিবেশায়নের একটি পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল বাংলা; ঔপনিবেশিক শাসনের উন্মত্ততা প্রথমাবধি বাংলার ওপর দিয়েই পরিচালিত হয়েছে। প্রায় দুই শত বছরের দীর্ঘস্থায়ী ঔপনিবেশিক শাসনের সবচেয়ে বড় ভূক্তভোগী বাংলা দেশ।[১৮]

১.২.৩

শাসনতান্ত্রিক উপনিবেশায়ন

১.২.৩.১

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (প্রতিষ্ঠা ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতে এসেছিল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে; বাংলা অঞ্চলে কার্যক্রম শুরু করে ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে কুঠি নির্মাণের মাধ্যমে। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে সুতানুটিতে কুঠি স্থানান্তর এবং ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আত্মরক্ষার অজুহাতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা ও এর সুবাদে বাংলায় ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা মৌজার জমিদারি লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বিদেশি বণিকরা শাসকশ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হয়। এরপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতাকে ইউরোপীয় মডেলে সুরক্ষিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলে এবং এ নগরীকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যের আড়ালে ইংরেজরা রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক বঙ্গ তথা ভারতরাজ্য ছিল কলকাতা-বসতিরই পরিকল্পিত সম্প্রসারণ। (সিরাজুল ইসলাম, ১৯৯৯: ৪)।

১.২.৩.২

পলাশী যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

আঠার শতকের গোড়ায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মোগল সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের সূত্রপাত হয়; সুযোগটা কাজে লাগায় আঞ্চলিক রাজ্যের শাসকেরা; কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও তাঁরা প্রায়-স্বাধীন শাসকের মতোই রাজ্য-শাসনে লিপ্ত হয়। দিল্লীর নিয়োগ-কৃত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব-মানা স্থানীয় শাসকরা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করে; ক্ষেত্রবিশেষে দিল্লীর প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন নবাব। ফলত রাজ্যগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্কের টানাপোড়েন তৈরি হয় এবং অর্ধ-স্বাধীন নবাবী শাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে পুরনো আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করতে। এছাড়া এ সময়টাতে বিশ্বব্যাপী চলছিল এক বিরাট বিবর্তনের পালা; সামন্তবাদ ভাঙছিল, পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সময় ছিল সমাগত। রেনেসাঁ ও বিজ্ঞানের হাত ধরে যন্ত্রশিল্পের উদ্ভবের যুগ এগিয়ে আসছে। একচ্ছত্র সামন্ততন্ত্রের বুক ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠছে প্রাক্-পুঁজিবাদী ঘরানার শাসনব্যবস্থা: অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, লগ্নিপুঁজি, সুদের বাণিজ্য সবই চলছিল; শক্তিশালী দালাল শ্রেণিও গড়ে ওঠেছিল, সমানতালে চলছিল দুর্নীতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী পুঁজির সঙ্গে যুক্ত ছিল ব্রিটিশ রাজপরিবারের পুঁজি। ভারতবর্ষে ইংরেজ পুঁজি আর মুনাফা বাণিজ্যকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য ইংল্যান্ডের রাজকীয় নৌবহর ও ফৌজ মাদ্রাজে হাজির হয়। মাদ্রাজে পৌঁছেই ব্রিটিশবাহিনী অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তেলেঙ্গা দরিদ্র জনজাতিকে নিয়ে গড়ে তোলে দুর্ধর্ষ 'তেলেঙ্গাবাহিনী'। পলাশীর যুদ্ধে এরাই ছিল ইংরেজদের মূল শক্তি। কিন্তু ধূর্ত ইংরেজরা দিল্লীর সম্রাটকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, বাণিজ্য ভিন্ন তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর সম্রাট ফররুখশিয়র ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের বিশাল বাজারে নিষ্কর বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে ফরমান জারি করে। এ ফরমান ছিল প্রকারান্তরে নিজের দেশকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার শামিল; বাকি ছিল ধীর ও কৌশলী পদক্ষেপে গন্তব্যে এগিয়ে যাওয়া।

অন্যান্য আঞ্চলিক রাজ্যের মতোই দিল্লী থেকে দূরবর্তী অর্ধ-স্বাধীন সুবা বাংলার নবাব দরবারেও পুরনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী জমিদারশ্রেণি ও আমলা শ্রেণির সঙ্গে নতুন শক্তি হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণির সমাবেশ ঘটে। জমিদার-আমলা-বেনে––এই ত্রয়ী শক্তি রাজনির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; তাদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বাংলার নবাবয়েত। বিশেষত ইউরোপীয় বাণিজ্য-ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিশ্রেণির সম্পদ ও সহযোগিতার

ওপর নবাব অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুজাউদ্দীন খাঁ ও ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে আলীবর্দী খাঁ সিংহাসন লাভ করেন তাদের সমর্থন ও আশীর্বাদে। এই ত্রিভুজশক্তির সামবায়িক তৎপরতায় মোগল-শাসনকেন্দ্র দিল্লী থেকে বহু দূরবর্তী সুবা বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় একটি স্বাধীনতার আবহ তৈরি হয় এবং বাংলার অর্থনীতিতে ব্যাপক সমৃদ্ধি আসে। তবে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর এই আপাত-ঐক্যের ভেতরেই ছিল সুগভীর ফাটল। বিশেষ করে, পুঁজিপতি শ্রেণির আধিপত্যে বাংলার নবাবীতন্ত্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার পুরাতন বৃত্তটা ভেঙে পড়ে। এই ত্রিভুজ-শক্তির ক্ষমতান্ধ অবিমৃষ্যকারিতায় বাংলার রাজনীতি ষড়যন্ত্র-আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আলিবর্দী খাঁর উত্তরসুরী হিসেবে সিরাজউদ্দৌলার মনোনয়ন ও ক্ষমতারোহণের পর। ইংরেজ বণিকেরাও বাংলার নবাবি মসনদ নিয়ে অন্তর্ঘাতের অপেক্ষাতেই ছিল; কারণ তারা জানত, বাইরের আঘাতে মুর্শিবাদের নবাবী রাজশক্তি ভাঙা অসম্ভব। নবাব উৎখাতে ইংরেজ বণিকদের প্রতি দরবারের রাজপুরুষদের সহযোগিতার আত্মঘাতী আহ্বান তাদের সামনে বিশাল সুযোগ এনে দেয়। ফলশ্রুতিতে বাংলার ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতিতে এক প্রভাবক শক্তি হিসেবে ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশ্য আগেই দেশের অভ্যন্তরে ভূমিস্বত্ব অর্জন ও সার্বভৌম বসতি স্থাপনের সুযোগ এবং কোম্পানির ব্যবসায় পুঁজিলগ্নির সুবাদে নবাব দরবারের মুৎসুদ্দি-আমলাদের সঙ্গে গড়ে ওঠা আঁতাতের সুবাদে বাংলার ক্ষমতা-কেন্দ্রে ইংরেজদের প্রবেশের সুযোগ অবারিত ছিল।[১৯] কোম্পানির সামরিকশক্তির পক্ষে নবাব-বাহিনীর বিরুদ্ধে একক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। বাংলায় ব্রিটিশদের টিকে থাকার লড়াই এবং দিল্লীর সম্রাট ও নবাব দরবারের অমাত্যদের নবাবকে গদিচ্যুতকরণের ষড়যন্ত্র একবিন্দুতে মিলে যায়। স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক অমাত্য, জমিদার এবং পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতার গোপন চুক্তি ও আর্থিক লেনদেন ইংরেজদেরকে পলাশীর প্রান্তরে টেনে আনে। পুঁজিপতি জগৎ শেঠ ও ব্যবসায়ী উমিচাঁদদের টাকা, সেনাপতি মীর জাফরের ক্ষমতার লোভ এবং ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ এক হয়ে কলকাতা, কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদে গড়ে ওঠা ভয়ানক অক্ষশক্তি মোর্চার সঙ্গে অনভিজ্ঞ তরুণ নবাব সিরাজের পরাজয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধ (১৭৫৭) নাটকের শেষদৃশ্যটি উন্মোচিত হয় মাত্র।[২০] এই যুদ্ধ ছিল বণিকশ্রেণির সঙ্গে রাজশক্তির যুদ্ধ, বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সংঘর্ষ। এই পাতানো যুদ্ধের আপাত ফল হিসেবে নবাবের আসনে মীর জাফরের অভিষিক্তি প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটায়। কিন্তু পলাশীর পরিবর্তন প্রজাসাধারণের কাছে দিনশেষের রূপকথা হয়েই থাকেনি; তা কেবল উপরতলাকেই লণ্ডভণ্ড করেনি, নিচতলার জগৎটাকেও দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ই বাঙালির ইতিহাসের প্রথম পরাজয়; এই প্রথম সে পরাজিত হলো সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদের হাতে।[২১] বাঙালি পরিগণিত হয় ইউরোপের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থান্ধ-প্রেরণায় সৃষ্ট ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার নতুন রাজ্যের প্রজা।

১.২.৩.৩

পলাশী যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি — শাসনহীন শাসন

পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় আপাতত বাংলায় নবাব বদলের সামরিক মহড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত গড়ায়নি; কিন্তু এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।[২২] হাজার বছরের পরিক্রমায় যে সরকারপদ্ধতি, যে শাসনব্যবস্থা, যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে বাংলার জনগণ অভ্যস্ত ছিল, পলাশী তার ইতি টানে এবং ভিত্তি রচনা করে এক নতুন প্রতিষ্ঠানের — ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের। পলাশীর অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষ শাসন জারি না করলেও বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজদের নিরঙ্কুশ প্রভাব; শাসন-ক্ষমতা কার্যত ইংরেজদের করতলগত হয়। নতুন নবাব মীর জাফর শাসক হিসেবে ছিল চরম অদক্ষ এবং মূলত ইংরেজদের ক্রীড়নক; সর্বদা ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনে ও অনৈতিক দাবিপূরণে ব্যতিব্যস্ত। 'Society of Trade' নামের লুণ্ঠন সমিতির ব্যানারে ইংরেজরা লবণ, সুপারি, তামা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পণ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য কুক্ষিগত করে। রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সারাদেশে বাণিজ্যের নামে

পরিচালনা করে লুণ্ঠনযজ্ঞ ও কায়েম করে ত্রাসের রাজত্ব।[২৩] ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে তারা বেপরোয়া লুণ্ঠন ও সম্পদ পাচারেই ব্যস্ত ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রতি বছর দেশের রাজস্বের সিংহবাগই কোম্পানি ও এর কর্মচারীরা কুক্ষিগত করে। লর্ড ক্লাইভ একাই ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে দুবারে বাংলা থেকে প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড হাতিয়ে নিয়ে ব্রিটেনে বিপুল সম্পদ ও আভিজাত্য ক্রয় করেন। তাঁর নির্লজ্জ অর্থ আত্মসাৎ ও লুটপাটের কারণে খোদ ব্রিটেনেই 'লর্ড ভালচার' খেতাব জুটেছিল। এককথায়, পলাশীর অব্যবহিত ফল ছিল বাংলার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির চূড়ান্ত পতন।

১.২.৩.৪

কোম্পানির দেওয়ানি লাভ — উপনিবেশায়নের সূচনাবিন্দু

মীর জাফরের অথর্বতায় তার ইংরেজ মুরুব্বিরাই শাসক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়; ইংরেজ-আনুকূল্যে বাংলার নবাব হয়ে বসেন মীর কাশিম। কিন্তু স্বাধীনচেতা এই নবাব ক্ষমতায় আসীন হয়েই ইংরেজ-রাহু থেকে বাংলাকে মুক্ত করার প্রয়াস চালান। দেশীয় দুর্নীতিবাজ আমলা, লুটেরা গোমস্তা ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন, যারা ছিল কোম্পানির ঘনিষ্ঠ সহচর। এছাড়া তিনি কোম্পানির সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব সেনাবাহিনী শক্তিশালী করায় মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়নের সুগভীর প্রয়াস। কিন্তু ধূর্ত ইংরেজরা তাদের বিপদ আঁচ করতে পেরে দ্রুতই নবাব-উৎখাতের তৎপরতা চালায় এবং বক্সারের (১৭৬৪) যুদ্ধে মীর কাশিমকে হটিয়ে বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় তাদের আধিপত্য কণ্টকমুক্ত করে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে আইনি-পরিকাঠামোর অধীনে বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় ব্রিটিশদের অনুপ্রবেশ ঘটে।[২৪] দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলায় কোম্পানির চরিত্র পুরোপুরি বদলে যায়; ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।[২৫]

দ্বৈতশাসন ছিল প্রকৃতপক্ষে শাসনহীনতা; দুঃশাসন ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ। একটি বাণিজ্যিক সংগঠন হিসেবে মুনাফাই ছিল ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে আইনি-কাঠামোর মধ্যেই অফুরন্ত মুনাফার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। অবাধ লুটতরাজ, বেপরোয়া রাজস্ব আদায় ও বিনা শুল্কে একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রভাবে দেশীয় কৃষি ও শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কৃষক-বণিক-শিল্পীসহ সাধারণ প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে এক চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয়।[২৬] মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাংলায় নেমে আসে মানবেতিহাসের এক ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষ, যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসেবে কুখ্যাত হয়ে আছে। এ দুর্ভিক্ষে না-খেয়ে মারা যায় দেড় কোটি মানুষ। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় থামেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল; অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয় যারা মরে গিয়েছিল তাদেরটাও। কোম্পানির কর্মচারীরা চাল মজুত করে আর চালের ব্যবসা-লব্ধ বিপুল মুনাফা ব্রিটেনে পাঠায়। কোম্পানির কর্মচারিদের এ সময় লন্ডনে পাঠানো অর্থের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষাধিক পাউন্ড। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ঐতিহাসিকগণ কোম্পানির এ সময়ের কর্মকাণ্ডের নাম দিয়েছেন 'Plassey Plunder'। শাসনক্ষমতার পক্ষপুটে পরিচালিত শোষণ কতটা শোচনীয় হতে পারে বাংলায় দ্বৈতশাসন তার ভয়াবহ নমুনা।

১.২.৩.৫

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত – চিরস্থায়ী উপনিবেশায়নের পদক্ষেপ

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার দূরপ্রসারী লক্ষ্যের প্রাথমিক প্রয়াস ছিল দেওয়ানি শাসন করতলগত করা। কিন্তু দেওয়ানি মুখোশের আড়ালে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বাংলায় নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান। 'With the acquisition of "Diwani" the company took a giant stride into the cockpit of Indian continental political struggle. This acquisition also had paved the way for the establishment of the British imperialism in India.'[২৭] ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুগল আমলের ঐতিহ্যবাহী প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাদি উচ্ছেদ করে সম্পূর্ণ নতুন আদলের শাসনপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কোম্পানি সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ইউরোপীয় ঘরানায় বাংলার

ভূমি-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ছিল তার প্রাথমিক উদ্যোগ। হেস্টিংস যার সূচনা করেছিলেন দুই দশকের নানা পরীক্ষা, গবেষণার পর কর্নওয়ালিশের হাতে তা পরিণতি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারির পক্ষে কর্নওয়ালিসের যুক্তি ছিল যে, জমিদারকে জমির মালিকানা দিলে এবং তার পরিশ্রমের ফলভোগের নিরাপত্তা দিলে জমিদারেরা আপন স্বার্থেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদভূমিতে পরিণত করবে। স্পষ্টতই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল একটি ব্যাপক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রকল্প।[২৮] বাংলার ভূমি-ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত এ বন্দোবস্তে জড়িয়ে ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বার্থ-সংরক্ষণের যাবতীয় কলাকৌশল।

১.২.৩.৬

আইন ও বিচারব্যবস্থার উপনিবেশায়ন

১.২.৩.৬.১

আইন

শাসনের তরিকা হচ্ছে আইন; শাসনের ক্ষেত্রে আইন হাতিয়ার ও পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। ভিনদেশে ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ আইনই হলো চূড়ান্ত কথা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসম্মত সহিংসতা ও শাস্তিদানের ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোম্পানির শাসকেরা গোড়া থেকেই ছিল সচেষ্ট। অখণ্ড এক সার্বভৌমত্বের আধুনিক ধারণা কায়েম করার পথে এই নয়া আইনসিদ্ধতার গুরুত্ব কোম্পানির কাছে ছিল অপরিসীম। স্বৈরতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আইন প্রকৃতিগতভাবে হবে কঠোর; প্রয়োগের ক্ষেত্রে হবে অনমনীয়; আর এর পেছনে থাকবে শাসিত জনগোষ্ঠীর অনুমোদন।[২৯] ব্রিটিশ প্রণীত আইন ছিল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত; এর জন্ম ঔপনিবেশিক অবস্থার মধ্যে; এই আইনের লক্ষ্য ছিল – ১. খাজনা আদায় করা, ও ২. যতটা সম্ভব সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া মোটামুটি নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক শাসন বজায় রাখা।[৩০] শাসন শান্তিপূর্ণ না হলে কর আদায় বিঘ্নিত হবে, যা কোম্পানির উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই নয়। একটি অজানা, অচেনা জনগোষ্ঠীকে শাসনোপযোগী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোম্পানির ছিল প্রবল উদ্বেগ ও দ্বিধা। প্রথমদিকে কোম্পানি মোগল আমল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আইন, প্রতিষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা, এমনকি খেতাবগুলোরও ধারাবাহিকতা বহাল রাখে। ১৭৭২ সালের হেস্টিংস প্ল্যানে যে আইনের রূপরেখা দাঁড়ায়, তাতে দেশীয় রীতিনীতি, প্রথা, সর্বোপরি ধর্মীয় বিধিবিধানেরই প্রাধান্য।[৩১] বস্তুত এই আইনের পুরো কাঠামোটিই তৈরি হয়েছে ব্রিটেন থেকে আমদানি করা ফৌজদারি, দেওয়ানি আইনের আদলে; ব্রিটিশ আইনের পকেটে পকেটে হিন্দু ও মুসলিম আইন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। ফলত এই আইন হয়ে ওঠে ইউরোপীয় ভাবধারার ব্যক্তিকরণ (indivisuation) ও ভারতীয় ভাবধারার ধর্মীয়করণের এক অদ্ভুত মিশ্রণ।

ঔপনিবেশিক আইন প্রণীত হয়েছে ঔপনিবেশিক গরজে; মুনাফা, আধিপত্য ও শাসনের স্থিতি নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। এই কারণেই তাদের প্রয়োজন হয়েছে এমন এক ধরনের আইনের, যার সাহায্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে জনগণকে স্তব্ধ করে রাখা যাবে। অনিবার্যতই এই আইনে উপনিবেশিত জনগণের কল্যাণ-ভাবনা একবারেই কাকতালীয় ব্যাপার। শাসকেরা সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা সম্বলিত, সহজবোধ্য এবং সমস্যার সহজ নিষ্পত্তিতে সহায়ক গাইড বই ধরনের আইন চেয়েছে। এই আইন ধর্মগ্রন্থানুসারে পরিপূর্ণ শুদ্ধ হওয়া জরুরি ছিল না, কাজ চালানোর মতো মোটামুটি সঠিক হলেই চলত। এই আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি ও জীবনাচরণ সম্পর্কিত প্রাচ্যতত্ত্বীয় জ্ঞান-উৎপাদনের সম্বন্ধ জড়িত। ১৭৭২ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুতে হিন্দু ও মুসলিম আইন সম্পর্কে ব্রিটিশদের জ্ঞান ছিল শূন্যের কোটায়; কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন তারা এদেশ ছেড়ে যায় তখন তারা আইনের এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। তাদের উৎপাদিত আইনই হয়ে উঠল হিন্দু-মুসলিমের জীবন-যাপনের পাথেয়; উপনিবেশোত্তর যুগেও ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনই কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বিচার-ব্যবস্থার একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে বহাল রইলো। বিদেশি ও বিধর্মী বিচারকদের মুসলিম ও হিন্দু আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিচার কাজে আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আদালতে হিন্দুদের জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও মুসলমানদের জন্য মৌলভী নিয়োগ করা হলো।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় অনুশীলনকে চাপা দিয়ে ব্রিটিশরা একটি একক ও সমজাতীয় (simplistic and homogenous) আইন প্রবর্তন করে, যা ভারতের সর্বত্র সমানভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এই আইন ছিল 'সার্বভৌমিক'–– অর্থাৎ, তা ব্রিটিশ ভারতের এক্তিয়ারে যারা বাস করে জাতপাত, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনি-সমতার ধারণা তৈরি করে সামাজিক মর্যাদা ও সাম্প্রদায়িক পরিচয় নির্বিশেষে একটি 'বিমূর্ত ও সর্বজনীন' প্রজার, যা ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর উপজাতক; আর এর নাম 'আইনের স্বৈরাচার'। (সুমিত, ২০১৯ : ২৮)।

১.২.৩.৬.২

বিচারব্যবস্থা

ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কাঠামোগতভাবে মোগল আমলের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে হেস্টিংসের ব্যবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। মোগল আমলে জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রশাসন ও বিচারপ্রশাসন ছিল আমিলের হাতে। বিচারকার্যে আমিল কাজী, মুফতি ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শ নিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারও বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বড় বড় জমিদারের হাতেও কিছু বিচারক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। হেস্টিংস মোগল আমিল ও ফৌজদারের জায়গায় জেলা কালেক্টরকে স্থাপন করলেন। জেলা কালেক্টর হলেন একাধারে জেলা পর্যায়ের প্রশাসক ও বিচারক। মোগল বিচার সংস্থাপন ছিল গ্রামপঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা আমিল পর্যন্ত বিস্তৃত। সামাজিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বিচারব্যবস্থা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই বিচারব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের মুখের কথার বিশেষ মূল্য, যা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা বাড়ায়। বিচারব্যবস্থার এই গণভিত্তি সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় ও মজবুত করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থায় মানুষের মুখের কথা মূল্যহীন হয়ে গেছে, সাক্ষ্য হয়ে গেছে শপথনির্ভর ও লিখিত। এই বিচারব্যবস্থায় একটি পুরো জনগোষ্ঠী অবিশ্বস্ততার দায়ে দণ্ডিত হয়ে গেল, জনগণের নিজের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। এই বিচারিক কাঠামোর মধ্যেই উপনিবেশিত জনমানসে পাকাপোক্ত হয় নিজেকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন বিবেচনা করার বাতিক। মামলা রুজু থেকে শুরু করে আইনজীবী নিয়োগ, সাক্ষী, কোর্টের আমলা ও কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান, বছরের পর বছর মামলা চালিয়ে যাওয়া–এসব হয়রানিমূলক ও ব্যয়বহুল চক্রে পরিণত হয় বিচারব্যবস্থা। সর্বোপরি, দেশীয় প্রথা-আচার ও ভাষা সম্পর্কে বিচারকদের অজ্ঞতা, জালিয়াতিপূর্ণ সাক্ষ্যের স্তূপ থেকে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থতা ও পরিপ্রেক্ষিত-বর্জিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া পেরিয়ে বিচারপ্রাপ্তি বহুদূরের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বিচারব্যবস্থায় কোর্ট-আমলাদের প্রভাবিত করে ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যয়বাহুল্যের ফাঁদে ফেলে শক্তিমানেরা আদালতকে ব্যবহার করে দুর্বলের ওপর অত্যাচার ও শোষণ চালানোর হাতিয়ার হিসেবে। ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থায় জেলা জজকে ফৌজদারি ক্ষমতা এবং কালেক্টরকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বিচার ও প্রশাসন একই হাতে ন্যস্তকরণের পেছনে শাসকশ্রেণির অর্থনীতি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল। এই বিচারব্যবস্থায় 'মানুষের জীবন-সম্পত্তি-অধিকার ততটুকুই ছিল নিরাপদ, যতটুকু ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ'। (সিরাজুল ইসলাম, ১৯৯৯: ২১১)। স্পিয়ারের নিম্নোক্ত কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যে ধরা পড়েছে ঔপনিবেশিক আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র: 'The courts were to the public a great penny in the slot machine whose working passed man's understanding and from which anything might come except justice.' (Spear, *The Twilight of the Mughals,*1951 : 95)।

১.২.৩.৭

আমলাতন্ত্র

ভারতবর্ষে আমলাবাহিনী ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নীরব কর্ণধার। 'নিজের ভিতরে সরকারি ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্বের সমন্বয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশাল এক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।'

(জ্ঞান প্রকাশ, ফকরুল চৌধুরী (সম্পাঃ), ২০১১: ৩৫০)। এটা হলো সরকারের এক বিশাল কর্তৃত্ববাদী কারখানা, যা আইন দ্বারা সংগঠিত ছিল। শাসক-শাসিতের মধ্যে ব্যবধান টেনে শাসিত শ্রেণিকে আজানু অবনত করে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণত শ্বেতাঙ্গদের সমন্বয়ে গঠিত, ভারতীয়রা এখানে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষিত। এধরনের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে একচেটিয়া ব্রিটিশ করায়ত্তে এনে এর উদ্বৃত্ত রাজস্ব স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা নিষ্কণ্টক করা এবং ভবিষতে ঔপনিবেশিক শাসনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে শাসক-শাসিতের মধ্যস্থ এমন কোনো সচেতন শ্রেণির বিকাশ রোধ করা। আমলা হিসেবে নিয়োগ পেত ষোল থেকে একুশ বছরের টগবগে যুবকেরা; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে শাসকসুলভ দম্ভ ও অহমিকায় শানিত করা হতো; জনগণের ওপর প্রভুত্ব করার বিপুল ক্ষমতা তাদের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল। সিভিল প্রশাসনে নিয়োগের জন্য ক্যাম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং পরীক্ষাকেন্দ্র লন্ডনে হওয়ায় দেশীয় অভিজাতদের মধ্যেই সিভিল সার্ভিসের চাকরি সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আজানু-অনুগত এই ভারতীয় আমলাদের নানাবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্রিটিশ মেজাজেই গড়ে তোলা হয়; ভারতীয় হয়েও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল না; শ্বেতাঙ্গ আমলাদের মতোই তাঁরাও নিজেদেরকে জনগণের প্রভু বলেই বিবেচনা করতো।

ঔপনিবেশিক কারণে ব্রিটিশ সরকার সচেতনভাবে ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে একটি দুর্লঙ্ঘ্য-দুর্নিবার সংগঠনে পরিণত করে। ক্রমান্বয়ে তারা একটি স্বার্থপরতার নেটওয়ার্কে পরিণত হয় এবং নিজেদের আধিপত্য ও স্বার্থ-সুরক্ষায় সম্মিলিত শক্তি হিসেবে সক্রিয় হয়। যে ক্ষমতাকাঠামোয় আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে, সেই কাঠামোয় সরকারের যেকোনো পরিবর্তন ও সংস্কার-উদ্যোগকে নস্যাৎ করা তাদের সাধারণ স্বভাবে পরিণত হয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমলাতন্ত্রের লাল-ফিতার দৌরাত্ম্যে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজো গভীর স্থবিরতায় আবর্তিত এবং তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির আগ্রাসনে জনজীবন দিশেহারা। প্রভুত্বমূলক মানসিকতা ও অন্ধ স্বার্থপরতার কারণেই তাঁদের পক্ষে জনবান্ধব হওয়া সম্ভব হয়নি।

১.২.৩.৮

পুলিশ প্রশাসন

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুলিশি শাসন ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ; কেন্দ্রীয় সরকার এখানে সকল নিয়ন্ত্রণের উৎস। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার সঙ্গে মুনাফার প্রসঙ্গ জড়িত, সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা এখানে গৌণ বিষয়। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ও জবরদস্তির শাসন গ্রহণে জনগণকে বাধ্য করার জন্য এবং শাসনকে নিরাপদ করার জন্য পুরো দেশকেই একটি কারাগারে পরিণত করার প্রয়োজন হয়; গড়ে তুলতে হয় পুলিশি রাষ্ট্র। দ্বৈতশাসনের নৈরাজ্যে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও অপরাধপ্রবণতা সর্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করে; জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায়, ঔপনিবেশিক শাসনকে শাসিত শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য এবং ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল অপরিহার্য শর্ত। ওয়ারেন হেস্টিংস দায়িত্ব গ্রহণ করেই জননিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন; মোগল আমলের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার পরিবর্তে জেলা কালেক্টরের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন কমিটি অব সার্কিট। উদ্দেশ্য ছিল ত্রাস সৃষ্টি করে অপরাধ দমন এবং দেশের আনাচে-কানাচে ব্রিটিশ রাজত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। 'ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যই প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীর। এ প্রয়োজন ব্রিটিশের পূর্ববর্তী সরকারের ছিল না। মোগল সরকারের স্থায়িত্বের ভিত্তি ছিল স্থিতিশীলতা, আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের ভিত্তি ছিল ভীতিপ্রদ পুলিশ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যথার্থই ছিল একটি পুলিশরাষ্ট্র, যেজন্য জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারকে করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।' (সিরাজুল ইসলাম, ১৯৯৯:

২২৬)। তখনকার বিচারকার্যও পরিচালিত হতো পুলিশের মর্জির দিকে মুখ রেখে; কারণ, 'বিচারকবর্গের পদোন্নতি নির্ভর করত পুলিশ রিপোর্টের উপর'। (আবুল হাশিম, ২০১২: ২২)।

১.২.৪

অর্থনৈতিক উপনিবেশায়ন

১.২.৪.১

প্রাথমিক যুগের লুণ্ঠন ও দেশীয় পুঁজির উৎখাত

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল পুরোপুরি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান; দূর দেশে ব্যবসা করতে এসে উপনিবেশ বিস্তারের মূল অভিপ্রায়ই ছিল অপরিমিত মুনাফায় নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করা। গোটা ঔপনিবেশিক শাসনই ছিল ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে কেন্দ্রীভূত; একারণেই রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক শাসনকে 'সম্পদের শাসন' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। পলাশী জয়ের পরে সরাসরি দেশ-শাসনে না-গিয়ে দেওয়ানি শাসন করায়ত্ত করার পেছনে ছিল তাদের মুনাফার মনোবৃত্তি।[৩২]পলাশীর অব্যবহিত পরের সময়টা ছিল অবাধ লুটপাটের; নবাবের রাজকোষ থেকে শুরু করে কৃষকের পর্ণ-কুটির পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এই মাতাল লুণ্ঠনযজ্ঞ। এর পাশাপাশি চলতে থাকে নবাবের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বাণিজ্যের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের, বিশেষত ফরাসিদেরকে হটিয়ে দিয়ে বাংলার বহির্বাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক তৎপরতা; এর সঙ্গে চলে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকে দেশীয় বণিকদের উৎখাতের যজ্ঞ।

দেশীয় পুঁজি ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী; রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশীয় পুঁজিকে উৎখাত করা হলো ব্রিটিশ পুঁজির বিকাশের প্রয়োজনে। প্রাক্-পলাশী যুগে ভারতবর্ষে জগৎশেঠের পুঁজির ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য; কোম্পানির পুঁজির চেয়ে শেঠজির পুঁজি ছিল অনেক বৃহৎ। জগৎশেঠ নিজেই ছিলো ঋণপ্রদানকারী এক দানবীয় ব্যাংক। ইংরেজ ক্যাপ্টেন ফেন উইক-এর তথ্যমতে, 'লন্ডনের লমবার্ড স্ট্রীটের সব ব্যাংকারকে একত্রিত করলেও জগৎশেঠের মতো বড় ব্যাংকার হয় না।' (নতুন দিগন্ত, সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা-২০১৯: ২৭)। বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে দেশীয় পুঁজির কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বাণিজ্যে দেশীয়দের যতটুকু উপস্থিতি ছিল তার প্রায় পুরোটাই ছিল মধ্যস্বত্বভোগী দালালির। ব্রিটিশদের আনুকূল্যে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়েই গড়ে ওঠে নতুন ধনপতি শ্রেণি।

বেপরোয়া খাজনা বৃদ্ধি ও উৎপীড়নমূলক আদায়, চাষীদের দিয়ে জোরপূর্বক পণ্য উৎপাদন ও নামমাত্র মূল্যে ক্রয় বাংলার কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপন্ন করে তোলে। দেওয়ানি শাসনের মাত্র চার বছরের মধ্যেই বাংলায় নেমে আসে মহা-দুর্ভিক্ষ; দিনের আলোয়, কি রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার কঙ্কালের মিছিল চলে এক মুঠো ভাতের আশায়। মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মানুষ (সংখ্যাটি দেড় কোটি) না-খেতে পেয়ে পশু-পাখির মতো মরে গেছে।[৩৩] লুণ্ঠনের ধকল সইতে না পেরে ধ্বংস হয়ে গেছে হাজার বছরের জীবনযাত্রা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে বাঙালি সমাজের সনাতন কাঠামো।

১.২.৪.২

ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক পুনর্গঠন

পলাশী-উত্তর প্রাথমিক লুটপাটের পর ব্রিটিশরা মনোযোগী হয় ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বিকাশের চাহিদা মোতাবেক ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে। শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েই বাণিজ্য ক্ষেত্রে মোগল যুগের আরোপিত বাধাগুলো অপসারণ ও শোষণকে মসৃণ করার উপযোগী আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার লুণ্ঠনলব্ধ অর্থেই আঠার শতকের শেষার্ধে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। উনিশ শতকের শেষনাগাদ ভারত পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব-অর্থনীতির এমন এক খোপে ঢুকে পড়েছিলো, যার কাজ হলো শিল্পোন্নত পশ্চিমকে, বিশেষ করে ব্রিটেনকে, খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচামাল সরবরাহ করা আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যে নির্মিত সামগ্রী-রপ্তানির একটা বাজার হিসেবে কাজ করা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ, বিশেষত ১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানে ভারতবর্ষ পুনর্বিজয়ের পর ভারতে অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ চরম মাত্রা লাভ করে।[৩৪] উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকেরা বারবার ব্যবসায়িক উদ্যোগের ওপর জোর দিয়েছিল; কিন্তু ব্রিটিশসংস্থাগুলো ব্যবসা, অর্থলগ্নি আর শিল্পোদ্যোগ সকল ক্ষেত্রের পথ আগলে রাখায় উদ্যোগগুলোর অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশীয় বিত্তবানেরা ব্রিটিশ-পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না নেমে নিজেদের পুঁজি সরিয়ে নেয় গ্রামে––জমিদারী ক্রয়ে। কারণ ঝুঁকিবহুল ব্যবসায়িক উদ্যোগের চেয়ে খাজনা-নির্ভর নিশ্চিন্ত আয়ের পথে বিনিয়োগই ছিল বেশি আকর্ষণীয়; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনিকাঠামোর মধ্যে দিয়েছে অবাধ রায়তশোষণের মাধ্যমে ঝুঁকিমুক্ত বিলাসবহুল জীবনযাপনের নিশ্চয়তা। এই কৌশলে দেশীয় প্রতিযোগী পুঁজি হয়ে ওঠে ব্রিটিশ পুঁজির সহযোগী: এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায় যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি ব্রিটিশ-স্বার্থের বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে জমিদাররা ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণ পৌঁছে দিয়েছে গহীন তৃণমূলে। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলায় একটি 'mercantile aristocracy'-র বদলে একটি নতুন 'landed aristocracy' প্রাধান্য লাভ করে।[৩৫] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়েও ভারতীয় অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক ভিত্তি মজবুত হয়নি; যেটুকু হয়েছে তাতে শিল্প নয়, ব্যবসায় ও লগ্নি পুঁজিরই প্রাধান্য ছিল।[৩৬]

১.২.৫

জ্ঞান ও রাজ্যশাসন — সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন

১.২.৫.১

প্রাচ্যবাদী চর্চা—উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মনোজগতে সংক্রমণ

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে নির্বিচারে পাখির মতো মানুষ মারার দক্ষতা ও নিষ্ঠুরতায় দেশ-দখল সম্পন্ন হওয়ার পর জারিকৃত ঔপনিবেশিক শাসনকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য দরকার ছিল শাসিতের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন; আর একারণেই 'প্রাচ্যতত্ত্ব' ছিল উপনিবেশবাদের লক্ষ্যভেদী হাতিয়ার। বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ইত্যাকার বিচিত্র শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে তৈরি করা হয় শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের এক মহাবয়ান (Grand discourse)। এ বয়ানের প্রতিপাদ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্য করে তোলা: 'ইউরোপীয়রা অন্যান্যদের থেকে উন্নত হওয়ার জন্য নির্বাচিত মানবগোষ্ঠী, আর এটাই ভবিতব্য'; আর লক্ষ্য ছিল, ইউরোপীয়রা এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে বর্বর ও সভ্যতাশূন্য জনগোষ্ঠীকে সভ্যকরণের মহান দায়িত্ববোধ (white man's burden) থেকে; শাসিতের পক্ষে শাসিত হওয়াই ন্যায্য ও মঙ্গলজনক––এ বিশ্বাস উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মনে গেঁথে দেওয়া। ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের মিথটি ভারতবাসীকে এমনভাবে দ্রবীভূত করেছে যে, তাঁরা কায়মনোবাক্যে ব্রিটিশ শাসনকে আশীর্বাদ মনে করেছেন।[৩৭] 'ঔপনিবেশিক আধুনিকতা'-র তত্ত্বায়নে ঔপনিবেশিক শাসন বৈধতা পেলো। ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই ব্রিটিশ জ্ঞানকেন্দ্রগুলো ভারত-আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠে। উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, উইলকিনস, জন শোর, চার্লস গ্রান্ট প্রমুখ প্রাচ্যবিদের গবেষণায় প্রাচীন ভারতকে উপস্থাপন করা হলো সমস্ত আধুনিকতার ক্লাসিক্যাল সূত্র হিসেবে; আর তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজেদের শরিকানা। 'উইলিয়াম জোনস ইন্দো-ইউরোপীয়, কিংবা 'আর্য' জাতিরূপ নিয়ে যে-পুরাণকথা চালু করে দিলেন, তার মধ্যে ব্রিটিশ প্রভুদের সঙ্গে ভারতীয় প্রজাদের –– অন্তত তাদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে––একটি আত্মীয়তার ইঙ্গিত ছিল।' (সুমিত, ২০১৯: ২৩)। বহু তর্ক-বিতর্ক ও দেশীয় অভিজাতদের ব্যাপক আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ এবং ইংরেজি-শিক্ষার পোষকতার সিদ্ধান্ত নেন। হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রথম দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন 'ধনিক ও সম্ভ্রান্ত গোঁড়া হিন্দুসমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি'। (বিনয়, ২০১৬: ২১)। এখানে ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন চর্চার প্লাবন সৃষ্টি হয়। ডিরোজিও-র ভাবশিষ্যদের কাছে ইউরোপীয় রেনেসাঁ-লব্ধ জীবনদর্শন ছিল মুক্তির এক অনিঃশেষ উৎস। ইউরোপীয় আলোর আকস্মিক বিচ্ছুরণে তাঁদের দিশেহারা

অবস্থা; কেউ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অমানবিক বলে হিন্দুধর্মকে তুমুল সমালোচনায় বিদ্ধ করে এর সংস্কারের দাবি তোলেন; কেউ কেউ হতাশার সঙ্গে নিজধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, কেউ কেউ নাস্তিক্যবাদে ঝোঁকেন, আবার কেউ কেউ বেদ, গীতার সারার্থ উদ্ঘাটন করে একেশ্বরবাদী 'ব্রাহ্ম' ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। এতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও 'আধুনিক' সভ্যতার দূত হিসেবে ব্রিটিশ শাসকদের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। আবার পশ্চিমি শ্রেষ্ঠত্বের অভিঘাতে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৃহদংশকে উদ্দীপ্ত করেছে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে। একই সময়ে আলাদা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত শিক্ষিত মুসলমানরাও আত্ম-অন্বেষী প্রেরণায় নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মনোযোগী হয়। এভাবে উনিশ শতকীয় সাত দশকের ইন্টেলেকচুয়াল উত্তেজনার পর রাজনৈতিক নেতারা যখন দৃশ্যপটে এলেন, তখন তাঁরা কথা বললেন পরস্পর অসহিষ্ণু দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে; সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্বজনীন ঐক্যবোধের বিষয়টি উপেক্ষিত হলো। ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের এই আগ্রাসী প্রয়াসে নারীর মনস্তত্ত্বে প্রান্তিকতা গভীরভাবে সংক্রমিত হয়: 'neither subject, nor object, but ground – such is the status of women in the discourse on *sati*.' [৩৮]। অবশ্য উপনিবেশিত সমাজে শুধু নারী নয়, পুরুষও পরাশ্রয়ী, কর্তৃত্বহীন।

১.২.৫.৩

শিক্ষা— ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্প্রদায়িকতার বনেদ:

শিক্ষা উপনিবেশায়নের একটি শক্তিশালী উপকরণ; এর মধ্যে রয়েছে মানুষের মগজ নিয়ন্ত্রণের অনিঃশেষ শক্তি এবং ক্ষমতা বিস্তারের বশীকরণ মন্ত্র।[৩৯] ব্যারিংটন ম্যাকলে ভারতবর্ষে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন, যেখানে অজ্ঞ ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষা দেয়া হবে ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্য থেকে; যারা 'রক্তে ও বর্ণে' হবে ভারতীয়, আর 'রুচিতে, মতাদর্শে, নৈতিকতায় আর জ্ঞানবত্তায়' হয়ে উঠবে 'ইংরেজ'। ম্যাকলের শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় দোভাষীশ্রেণীর অসাধারণ উৎপাদন হয়েছে; কিন্তু তাঁদের 'রুচি, অভিমত নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ঠিক ইংরেজের মতো' হয়নি। তাঁদের গড়ন হলো 'দো-আঁশলা' শ্রেণির–– মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের এক বিচিত্র মিশ্রণ। মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ তাঁদের মনোজগতে সক্রিয় ছিল; পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, উদারতাবাদ ও বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজম কোনো কিছুই বাঙালি মধ্যবিত্তের মর্মমূলে পৌঁছেনি।

মেকলের নিকটাত্মীয় ট্রেভেলীয়ন ভারতে ব্রিটেনের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন: 'The existing connection between two such distant countries as England and India, can not, in the nature of things, be permanent: no effort of policy can prevent the natives from ultimately regaining their independence. But there are two ways of arriving at this point. One of these is, through the medium of revolution; the other, through that of reform. In one, the forward movement is sudden and violent; in the other, it is gradual and peaceable. One must end in a complete alienation of mind and separation of interests between ourselves and the natives; the other in a permanent alliance, founded on mutual benefit and good-will.

The only means at our disposal for preventing the one and securing the other class of results is, to set the natives on a process of European improvement, to which they are already sufficiently inclined. They will then cease to desire and aim at independence on the old Indian footing. A sudden change will then be impossible; and a long continuance of our present connection with India will even be assured to us.'[৪০] ট্রেভেলীয়ানের ভবিষ্যদ্বাণীকে শিরোধার্য মেনেই সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে ব্রিটিশদের ছত্রচ্ছায়ায়; এমনকি রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের বাতলানো পথে; উপনিবেশোত্তর যুগের শাসকদের শাসননীতিও তাই গভীরভাবে ব্রিটিশ মূল্যবোধ-লালিত।

১.২.৫.৪

জাতিবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশিত জনসমাজ :

প্রাচ্যবাদ, অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিম অ-পশ্চিমকে নির্মাণ করেছে বৈপরীত্যের ভাবচিত্রে; দ্বিমেরুর ভাবরূপে 'অপর'-এর নির্মাণপ্রক্রিয়ায় জড়িয়ে ছিল 'পরিবর্তনহীনতা আর পরিবর্তন', 'শুচিতা আর ভ্রষ্টাচার', 'অচলাবস্থা আর প্রগতি', 'অবনতি আর উন্নতি', 'গ্রামীণ আর শহুরে' ইত্যাকার অজস্র তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার কথার ছাঁচ। বিপরীত-দ্বৈতের কাঠামোয় ফেলে জনসমাজকে বিভক্ত করার প্রয়াস উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, এটি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিরও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্প্রদায়গত বিভাজন ছাড়াও একই সম্প্রদায়ের মধ্যে উঁচু-নীচুর অজলচল বিভক্তি, গ্রাম ও শহরের, এমনকি গ্রাম থেকে আসা শহরে আসা মানুষের সঙ্গে শহুরে মানুষের মধ্যেকার ভাষা ও মূল্যবোধগত প্রতিতুলনার হাজারো বয়ান দেশীয় জনসমাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ছিল চরম জাতিবৈষম্যতাড়িত। প্রাচ্যবাদী ক্ষমতা-জ্ঞানে ভর করে ঘোষণা করা হলো: যে-ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে তারা এক নিকৃষ্ট প্রজাতির সদস্য। নিজেদের প্রভুজাতির মর্যাদা সম্পর্কে ব্রিটিশরা এতটাই সচেতন ছিল যে, ট্রেনে বা স্টিমারের সংরক্ষিত কামরায় কোনো দেশীয় ––এমনকি নেটিভ সমাজের উঁচুমহলের লোক হলেও–– ভুল করে প্রবেশ করলেও, সে তা হাড়ে হাড়ে টের পেতো। সম পদে ইউরোপীয়দের সমান বেতনে নেটিভ কর্মকর্তা নিয়োগে ব্রিটিশদের বিরোধিতা ছিল খোলাখুলি। জাতিবৈষম্যের আর্থিক দিকটা ছিল আরও গুরুত্বপুর্ণ; সম্ভাব্য ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের ঐক্যগঠনে গায়ের রং একটি বড়ো অনুঘটক। ইউরোপীয় বণিকেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে খুবই ন্যায্য মনে করতো, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আপস ও সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতো 'যৌথ একচ্ছত্রতা'।

ঔপনিবেশিক শাসকদের অভ্যন্তরীণ মিত্র হিসেবে জমিদাররাই ছিল দেশীয় সমাজের শীর্ষবিন্দু। এদের সঙ্গে যুক্ত ছিল বেশ কয়েক স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণি। এই স্বল্পসংখ্যক প্রভাবশালীর পদতলে অবস্থান করেছে বিপুলসংখ্যক বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। এরা 'গ্রামের শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক।' (সুমিত, ২০১৯: ১৬০)। এই নিপীড়িত বৃহৎ জনগোষ্ঠী ছিল উপনিবেশিত অভিজাতশ্রেণির কাছে এক দুর্মর 'অপর'।

ইংরেজ আমলে সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, হিন্দুরা সেভাবে হয়নি। মোগল আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাজকার্য ও সেনাবাহিনীতে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর পুরনো জমিদারদের স্থলে যে নতুন জমিদার শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটে তাঁরা হিন্দুসমাজ থেকেই আগত। বৃহৎ জমিদারিগুলোর টুকরো টুকরো ভগ্নাংশে নতুন জমিদারদের বিপুল সমাগম সামাজিক নেতৃত্বে হিন্দুপ্রাধান্য নিরঙ্কুশ হয়।[৪১] জমিদার ও রায়তের মাঝে কয়েক স্তরের মধ্যস্বত্বভোগীর প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু; তদুপরি জমিদারি আমলা, নায়েব ও গোমস্তারাও ছিলেন প্রায় সর্বাংশে হিন্দু। অপরপক্ষে রাজকার্য ও সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে অভিজাত মুসলমানরা এক চরম অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়। মোগল আমলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিচার ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমাজে নেতৃত্বদানকারী একটি মুসলমান জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল; তা ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে ভেঙে পড়ে। বাংলার জনকাঠামোর শীর্ষবিন্দুতে স্বল্পসংখ্যক হিন্দু অভিজাতদের অবস্থিতির নিচে বিস্তীর্ণ পাদমূল জুড়ে যে বিশাল দারিদ্র্যদীর্ণ, সহায়সম্বলহীন, মূর্খ প্রজাকূল নিতান্ত পশুর মতো বেঁচেছিল, তারা মূলত মুসলমান রায়ত ও নিম্নবর্গের হিন্দু। বহুমুখী শোষণের শেষপ্রান্তে যে উচ্ছিষ্টটুকু থাকতো, তা দিয়েই কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করতো সম্পদের প্রকৃত উৎপাদকেরা; প্রায়শই দুর্ভিক্ষের কোপে পড়ে তাদের বরণ করতে হতো গণমৃত্যু।

১.২.৫.৫

প্রাচ্যতাত্ত্বিক ইতিহাস––সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক বিভাজন

ভারতবর্ষে সামরিকপন্থায় মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে দেশজয় করা সম্ভব হলেও একই কায়দায় দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। শাসনক্ষমতার স্থিতির জন্য জয়-করা দেশে জনভিত্তির প্রয়োজন ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা সেই ভিত্তি পেয়েছে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মধ্যে।[৪২] ব্রিটিশরা এই বিভাজনকে দাঁড় করাতে এবং তা চাঙা রাখতে পুরো শাসনামল জুড়েই কূটকৌশলের জাল বিস্তার করে গেছে। এর জন্য তাদেরকে ফাঁদতে হয়েছে একটি প্রাচ্যতত্ত্বীয় আখ্যান: 'বহু পরিশ্রমে প্রাচ্যবাদী বিদ্যাচর্চা চরম প্রভাবশালী এক মোক্ষম বাঁধা-ছাঁদ বানিয়ে দিয়েছিল––সেখানে প্রাচীন যুগের 'হিন্দু' কৃতিত্বের পর মধ্যযুগে আসে মুসলিম 'অধঃপতনে'র যুগ আর তারপর ঔপনিবেশিক ছত্রচ্ছায়ে সম্ভবত ঘটে 'জাগরণ' কিংবা 'পুনর্জাগরণ'। ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলিম আর ব্রিটিশ এই তিন যুগে সাজিয়ে দেওয়ার ফল হয়েছে মোটের ওপর সর্বনাশা––কী সারস্বত বিচারে, কী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ... রাজনৈতিক দিক থেকে এর ফলে হিন্দু ইতিহাস আর মুসলিম ইতিহাসকে যেন আলাদা আলাদা গোত্রে ফেলা হয়েছে, যা খুঁচিয়ে তুলেছে হরেকরকম সাম্প্রদায়িক বাঁধা ছাঁদকে।' (সুমিত, ২০১৯: ২১-২২)। ইংরেজরা নিজেদের শাসনামলটিকে ধর্মীয় পরিসরে আবদ্ধ করেননি বিজ্ঞান ও যুক্তি পরিশ্রুত 'আলোকপ্রাপ্ত' সভ্যতার প্রতিভূ শাসক হিসেবে পরিচয়টাকে শানিত করার অভিপ্রায়ে। ঔপনিবেশিক 'ইতিহাস ডিসকোর্স'টির পেছনের গূঢ় কারণটা হচ্ছে 'ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ একত্রে কী অর্জন করেছে সেটা: এটি হচ্ছে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে জাতি-রাষ্ট্রগুলির বৈশ্বিকীকরণ।'[৪৩]

সম্প্রদায় হিসেবে ভারতে হিন্দু অভিজাতদের আধিপত্যের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মুসলমানরাই; ভারতবর্ষে মুসলমানদের ছয়-সাতশ বছরের শাসনের ইতিহাস তাদের জন্য ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত। ইংরেজদের কাছে ক্ষমতা হারানোর পর প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়েই মুসলমানরা অবতীর্ণ ছিল ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের অসম লড়াইয়ে। আর ভদ্রলোকশ্রেণির বিবেচনায় ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান মানেই মুসলিম শাসনের পুনর্জাগরণ। অনিবার্য কারণেই মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ে তাদের ভূমিকা ছিল ইংরেজ-মিত্রের। এমনকি তারা ১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানেরও বিরোধিতা করেছে এবং বিদ্রোহ-দমনের সাফল্যে উল্লাস প্রকাশ করেছে।[৪৪] মহাঅভ্যুত্থানের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে 'আলংকারিক' মোগল শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ-রাজের প্রত্যক্ষ শাসন। সিপাহী বিপ্লবের পরাভবে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রত্যাবর্তনের ন্যূনতম সম্ভাবনারও যখন তিরোহিত, তখন সকল সংশয়-শংকা ত্যাগ করে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের 'হিন্দু' পরিচয় ঘোষণা করে; কোনোপ্রকার দোলাচল ছাড়াই প্রকাশ করে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ; আর বাঙালিয়ানা মানেই হিন্দুত্ব।[৪৫] দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানিময় ইতিহাসের গর্ভে ইউরোপীয় ভাবাদর্শ-লালিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে হিন্দু নেতৃত্বাধীন স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের দূরাভাস। নবোদ্দীপ্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত তখন জাতিসত্তা অন্বেষণ ও পুনর্গঠনের এক সুগভীর তাড়নায় প্রাণিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত শিক্ষিত বাঙালির নিজস্ব ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার মডেলে, যার মধ্যে সত্যের চেয়ে উদ্দেশ্যটাই ছিল মূখ্য বিবেচ্য। ভারতীয় পুরাণ আর ইতিহাসের উপাদানের মিশ্রণে লিখিত এই 'পুরাণেতিহাস'কে বলা হলো 'জাতীয় ইতিহাস' এবং এই ইতিহাসের মধ্যেই অনুসন্ধান করা আত্মপরিচয়সূচক 'জাতীয়তা'। এই জাতীয়তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ হলো: 'বস্তুত জাতীয়তার অর্থ হিন্দু জাতীয়তা, এই ধারণাটিকে কোনও প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় মতাদর্শের ভগ্নাবশেষ বলে ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ধারণাটি সম্পূর্ণ আধুনিক। আধুনিক অর্থেই তা যুক্তিবাদী; অযৌক্তিক আচার-ব্যবহার কুসংস্কার বিরোধী। আধুনিক অর্থেই তা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক; রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কট্টরপন্থী এবং সমাজনীতি নির্ণয় ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। এই মতবাদের মূল আবেদন ধর্মীয় নয়, রাষ্ট্রীয়। সেই অর্থে এর যুক্তির কাঠামো সেকুলার।... এই মতবাদে 'হিন্দুত্ব' ধারণাটির আদপেই কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। 'হিন্দু' হওয়ার জন্য কোনও বিশেষ ধর্মীয় আচার বা বিশ্বাস বা চিহ্নের প্রয়োজন নেই। হিন্দুদের মধ্যে অজস্র সাম্প্রদায়িক পার্থক্য এই মতবাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এমন-কি বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের মতো বেদবিরোধী ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্মকেও অনায়াসে হিন্দু বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। একই ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বর্ণসমাজের বাইরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলিকেও হিন্দুজাতির অংশ বলে দাবি

করা চলে; কিন্তু ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্ম নিশ্চিতভাবে এই জাতীয়তার বাইরে।... যুক্তিটা আসলে ঐতিহাসিক উৎপত্তির যুক্তি। বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম 'হিন্দু', কারণ তা ভারতে উদ্ভূত। ইসলাম বা খ্রিস্টানধর্ম ভারতীয় নয়, বিদেশি। এখানে 'ভারত' বলতে সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাবিশিষ্ট সার্বভৌম রাষ্ট্রই বোঝাচ্ছে।...জাতীয়তাবোধের জন্ম থেকেই আমাদের ইতিহাসকল্পনায় এই সার্বভৌমত্বের ধারণা এসে গেছে। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই যে সার্বভৌমত্বের ভৌগোলিক সীমা আর নাগরিকত্বের পরিচয় নিয়ে কোনও দ্বিধা বা অসঙ্গতি সে বরদাস্ত করতে পারে না। হিন্দু জাতীয়তাবাদ গত একশো বছর ধরে এই আধুনিক ঐতিহাসিক যুক্তি ব্যবহার করেই নিজেকে প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে দাবি করে চলেছে।'[৪৬] জাতি-জাতীয়তার ধারণা থেকে জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার সময়ই সাম্প্রদায়িকতা বিকশিত হতে থাকে এবং ১৮৭০ সাল থেকে সাম্প্রদায়িকতা একটি মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। 'হিন্দু মেলা'কে ঘিরে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের সংকল্পে যে জাতীয়ভাবের প্রকাশ ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। হিন্দু স্বাজাত্যবাদীদের দেশের মালিকানা সম্পর্কিত প্রচারণার বিপরীতে মুসলমানরা আত্মরক্ষামূলক বর্ম হিসেবে বেছে নেয় সাম্প্রদায়িকতাকেই।[৪৭] অর্থাৎ, এটা হলো আক্রমণাত্মক সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মরক্ষামূলক সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু আত্মরক্ষামূলক হলেই যে তা নির্বীর্য-নিরীহ হবে এবং নিতান্তই প্রতিবন্ধীরূপে প্রকাশ পাবে—এই ভাবনা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রাচ্যতত্ত্বীয় পৌনঃপুনিক প্রচারে আত্মপরিচয় নিয়ে হতদরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানদের মনস্তত্ত্বে ভর করে এক গভীর হীনম্মন্যতা ও উন্মূলতা।[৪৮] হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী তৎপরতার বিপরীতে দুর্বল মুসলমানদের প্রাথমিক ভূমিকা ছিল মৌনতার; ভাবটা অতীত কুকর্মের দায়গ্রস্ত অপরাধীর। আর সময়টা ছিল শাসক ইংরেজদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে তাদের শক্তিসঞ্চয়ের কাল। অস্তিত্বসংকটে বিপন্ন মুসলমানরা বুঝতে পারে, টিকে থাকতে হলে বিরোধিতা ছেড়ে ইংরেজদের সঙ্গে গড়তে হবে মৈত্রীর বন্ধন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের এই পর্বে এসে ব্রিটিশদের মিত্রত্বের ধারণায় পরিবর্তন আনা জরুরি ছিল। দীর্ঘদিনের মিত্র হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি চাকরি-বাকরি, সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে ইতোমধ্যেই দেন-দরবারে মেতে উঠেছে এবং তাদের সদ্যোংকুরিত জাতীয়তাবোধ অচিরেই স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে মোড় নেবে, তা সাম্রাজ্যরক্ষায় কঠোর হুশিয়ার ইংরেজদের অনুধাবন করতে কালবিলম্ব হয়নি। বিভাজনের রাজনীতির পাড় খেলোয়াড় ব্রিটিশরা শুরু করে মিত্রবদলের অন্তঃসলিলা তৎপরতা। এরপর মুসলমান-ইংরেজ মিত্রতা কালক্রমে যত গভীর হয়েছে, হিন্দু-ইংরেজ সখ্য তত আলগা হয়েছে। ইংরেজদের প্রশ্রয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিযোগিতার চেহারা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে; শিক্ষার বিষয়বস্তু ও সুযোগ নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্রতার মনোভাব তীব্রতর হয়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পরে পূর্ববঙ্গে এক ধরনের হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যের ঐতিহাসিক সূত্রপাত ও বিস্তারের লক্ষণ দেখা যায়। 'ভারতীয় হিন্দু এক জাতি'-তত্ত্বে বাঙালি হিন্দুরা যখন বিলীন হতে থাকে, তখন অভিন্নভাষী শত শত বছরের প্রতিবেশী মুসলমানরা পরিণত হয় বিদেশি জনগোষ্ঠীতে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমানদের উপলব্ধির জগৎ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একাত্ম হয়ে যায়। গ্রামে জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান—প্রজাদের জমিদার-বিরোধী আন্দোলনকে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও দাঙ্গা হিসেবে প্রচার পায়। পূর্ববঙ্গের গ্রাম-গঞ্জ থেকে কলকাতায় আগত মুসলমানদের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদের আচরণ ছিল ঘৃণাসূচক ও অবজ্ঞাপূর্ণ। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অভিজ্ঞতা ছিল অপমানজনক ও তিক্ততামিশ্রিত। এমতাবস্থায়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিস্তার লাভ করে। সাম্প্রদায়িকতা তখন নিজেই এক অপরিসীম রাজনৈতিক ক্ষমতা। সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ যতো শক্তিশালী হয়েছে উচ্চবর্গের হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ততো মজবুত হয়েছে; নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণ হয়েছে তাদের অধিকতর বশংবদ। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলে মুসলমান নেতৃত্ব আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশ্রয় নেয়। একইভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্যে হিন্দু নেতৃত্ব সন্ত্রস্ত অনুভব করে এবং বৃহত্তর হিন্দু জাতীয়তাবাদে আশ্বাস খোঁজে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের

অন্তিম দশকে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও অবিশ্বাস গণস্তরেও গভীর ক্ষত তৈরি করে। তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম নেতারা যখন হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আচরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে 'সকল মুসলমানের স্বার্থ এক'––এই জাতীয়তাবাদী প্রচার চালায়, তখন দ্রুতই গরিব মুসলিম প্রজারা বড়লোক মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাই কেবলি একজন জিন্নাহ-র ওপর সাম্প্রদায়িকতার উৎপাদন ও দেশবিভাজনের সমগ্র দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া প্রকৃত ইতিহাসকে আমলে না-নেয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বহিঃপ্রকাশ। যদিও মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মরক্ষার অজুহাতে জিন্নাহ যে পলায়নী রাজনীতির কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল চরম রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও প্রতিক্রিয়ার অন্ধ গোয়ার্তুমিতে ঠাঁসা এবং মুসলমান জনগোষ্ঠীর মঙ্গলচিন্তার আবরণে জনগণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম জাতির জনক হওয়ার উগ্র বাসনা। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনীতির কুশীলবেরা নিজ সম্প্রদায়ের গণস্তরে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এই পথেই অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা। বারুদে ভরা বাক্যবাণে জনগণকে দাঙ্গায় উস্কিয়ে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে; দুই সম্প্রদায়ের কোনো অভিজাতের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি; রক্তের প্লাবন ছুটেছে গরিব জনতার সস্তা দেহ থেকে; বাস্তু ও সম্পদ হারিয়ে ছিন্নমূল হয়েছে অগণন মানুষ; তছনছ হয়ে গেছে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন শান্তির স্পর্শমাখা অসংখ্য জীবন। ঔপনিবেশিক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকে জন্ম নেয়া স্বজাতিদ্রোহী, স্বার্থপর অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বভাবজাত স্বার্থান্ধ রাজনীতির পথ বেয়ে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তা ঔপনিবেশিক বিভক্তির ছকে বাঁধা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা; লক্ষ-কোটি হতভাগ্য মানুষের কাছে তা একান্তই পার্টিশন। বিভক্তিতে অর্জিত সমাধান এক অনিঃশেষ সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করেছে ভারতবর্ষের আপামর মানুষের জীবনকে। ফলত, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও ঔপনিবেশিক দুর্ভোগগুলো থেকে জনগণের মুক্তি মেলেনি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' প্রাচীন ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা-বর্ণনায় ভরপুর। এটি ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইহজাগতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বাস্তব সাফল্য কতটুকু অর্জিত হয়েছিল তার এক অনুপম প্রমাণ-চিত্র। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে বলেছেন: ' In the famous Arthasastra, Kautilya's book on political and economic organization, written in the fourth century B.C.. it is mentioned (i.e. materialism) as one of the major philosophies of India." (J. Nehru, The Discovery of India, London, 1960, pp 86)। গ্রন্থটি সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ লাহার মন্তব্য: 'The Arthasastra describes some of the features and activities of the civil government of the ancient Hindus. It outlines secular and practical achievements of the ancient Hindus, as distinguished from the spiritual and intellectual.' (Law. N.N. Studies in Ancient Hindu Polity – Based on the Arthasastra of Kautilya. pp. v-vii.)।

২. 'পালি সাহিত্যে তিন ধরনের গ্রামের উল্লেখ আছে। প্রথম ধরনের গ্রামগুলি ছিল চিরাচরিত গ্রামের মতো, যেখানে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো। এ ধরনের গ্রামের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক এবং প্রতিটি গ্রামের একজন করে গ্রাম-প্রধান ছিলেন, যাঁকে বলা হতো ভোজক। দ্বিতীয় ধরনের গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল শহরতলি এলাকায়। এক একটি গ্রাম এক এক ধরনের কারিগরি শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ...নিশ্চিতভাবেই এই গ্রামগুলি অন্যান্য গ্রামের বাজার হিসেবে কাজ করতো এবং শহর ও দূর-দূরান্তের গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতো এই গ্রামগুলি। তৃতীয় ধরনের গ্রামগুলি প্রান্তিক গ্রামরূপে পরিচিত ছিল, যেগুলি গ্রামাঞ্চলের সীমান্ত অঞ্চলে , এমনকি অরণ্যের কাছে বা অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। এই ধরনের গ্রামে যারা বাস করতো তাদের অধিকাংশের পেশা ছিল পশুপাখি শিকার। এদের অধিকাংশই ছিল ছিল খাদ্য সংগ্রাহক।' (রামশরণ, ২০১৯ : ১৬৭-৮)।

৩. 'Lands may be confiscated from those who do not cultivate them and given to others; or they may be cultivated by village labourers and traders, lest those owners who do not properly cultivate them might pay less (to the government). If cultivators pay their taxes easily, they may be favourably supplied with grains, cattle and money.' (R. Samasastry, *Kautilya's Arthasastra*, translated with an Introductory note by Dr. J.F. Fleet, Bangalore, 1975, p 51-53)|

৪. 'বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতা* নামক গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির রচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দী। তিনি বলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য তিনি প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। প্রাচীন গ্রিসের জ্যোতির্বিজ্ঞান যদিও ভারতীয় বিজ্ঞানীদেও বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছিল, তবু একথা মানতেই হবে যে, ভারতই এই বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কার করেছিল। বরাহমিহিরকৃত উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের বিভাজন কৃষির জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল। ... বিভিন্ন ঋতু, এবং আবহাওয়া, জলবায়ু সম্পর্কে বরাহমিহিরের পর্যবেক্ষণ কৃষিকাজের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ছিল। তিনি জলবায়ুর উপর নির্ভর করেই কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন।' (রামশরণ, ২০১৯: ৩১৫)।

৫. 'মূল ভারতীয় রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে বিস্তারিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও দীর্ঘ সমর্থনমূলক বিবৃতি। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিস্তারিত ও দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কও এগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও, এগুলিতে আছে , একদিকে ধার্মিকতার পক্ষভুক্ত ও অন্যদিকে সাধারণ সংশয়বাদেও দৃঢ় সমর্থকদের মধ্যে নান তর্ক-বিতর্ক। সন্দেহগুলি কখনও অজ্ঞেয়বাদের রূপ নিয়েছে, আবার কখনও নিরীশ্বরবাদের। ... বস্তুত, সমগ্র ভারত ইতিহাস জুড়েই বিভিন্ন রূপের নিরীশ্বরতা আজকের দিন পর্যন্ত শক্তিশালীভাবে সমর্থিত হয়ে এসেছে। সংশয়বাদী ও বস্তুবাদী 'লোকায়ত' দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ থেকেই, সম্ভবত আড়াই হাজার বছর আগে, বুদ্ধের জীবনকালেই। উপনিষদেও এইরকম চিন্তাধারার কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদ বহু শতাব্দী ধরেই গুণগ্রাহী ও সরব সমর্থক পেয়ে এসেছে এবং এগুলি উত্তরোত্তর বেশি করে ধী-চর্চাগত সংগ্রামে উন্মুখ চার্বাকের ভাষ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ডি এন ঝা একে 'ভারতীয় চিন্তার অন্তঃস্রোত' বলে বর্ণনা করেছেন।' (অমর্ত্য, ২০১৫: ১৯-২০)।

৬. 'এ-যুগে (পাল) ব্রাহ্মণদের সম্মান ও প্রতিপত্তি রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল ক্ষেত্রেই ছিল। সমসাময়িক ভূমিদান-লিপিগুলির সাক্ষ্যে আমরা জানি যে এ-যুগে রাজারাজড়ারাও ব্রাহ্মণদের অনেক ভূমিদান করেছেন। ... পালযুগে রাষ্ট্রই ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার ধারক ও পালক এবং বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই ছিল। এ-যুগে সাংসারিক ক্রিয়াকর্মে বৌদ্ধ গৃহীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মতো প্রচলিত বর্ণশাসন মেনে চলতেন। তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে পালযুগের ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল ও নমনীয়।' (শাহানারা হোসেন, আনিসুজ্জমান (সম্পাঃ) : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ৪৯)।

৭. আইনানুগ অর্থে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন: 'the legal view itself only means that the land-owner can do with the land what every owner of commodities can do with his commodities. And this view, this legal view of free private ownership of land, arises in the ancient world only with the dissolution of the organic order of society, and in the modern world only with the development of capitalist production. It has been imported by Europeans to Asia here and there.' (K. Marx, Capital, vol. iii.(Moscow,1971) p. 616।

৮. Syed Golam Hossain, Seir Mutaquerin (View of Modern Times), vol. I, (Calcutta, 1780), p. 40)।

৯. 'মুঘল ভারতে কাপড় ছাপাইয়ের বেশ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। আকবরের অভিজাত আবদুর রহিম খান-খানান (Abdur Rahim Khan-Khanan) ১৫৯০-এ যখন সিরন্জে (Sironj) অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি এমন কয়েকজন দক্ষ কারিগরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যারা ছিটকাপড়ে

(Chintz) ছাপার ফলকে (tarrahii chit) নতুন নতুন নকশা তৈরি করেছিলেন। এবং ১৬৬৭-তে, তাভার্নিয়ের একই জায়গায় দেখতে পেয়েছিলেন কীভাবে 'বিদেশি বণিকরা যেমন নকশা দিতেন, সেই অনুযায়ী কারিগররা সুতির ছাপার কাজ করেছেন।' Thevenot (১৬৬৬) এমনই লেপের (quilt) ওপর ছাঁচের (mould) মাধ্যমে রং চাপানোর কথা বলেছেন। ছাঁচ বলতে তিনি সম্ভবত নকশা ছাপার ফলককেই (stamping block) বুঝিয়েছেন। নিঃসন্দেহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরেজ কারিগরেরা স্বয়ং কাপড়-ছাপাইয়ের কাজ শুরু করেছিল, ভারতীয় কাপড়-ছাপাই শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। ... মধ্যযুগের ভারতবর্ষে আরেক ধরনের বস্ত্রবয়নের কথা শোনা যেতে থাকে, 'জরবাফত্' (Zarbaft/সোনার সুতা দিয়ে বোনা) বা 'কিংখাব' (gold-brocade)। 'মিফ্তাহ্-উল ফুজালা'য় 'জরবাফত্'কে বলা হয়েছে 'সোনার জরি ও রেশম সুতো মিশিয়ে বোনা কাপড়'। বারণী, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকা বস্ত্রের তালিকার সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন 'হরেক কিসিমের জরবাফত্ বস্ত্র'কে। নিঃসন্দেহে এই কাপড় আরও নয়নাভিরাম ও উন্নত মানের হয়েছিল, যখন 'শাফসাহাঙ্গ' বা draw plate (মিফ্তাহ্-উল ফুজালায় এর বর্ণনা ও চিত্ররূপ রয়েছে)-র ব্যবহার শুরু হয়।' (ইরফান, ২০১৭ : ৫১-৫৩)।

১০. ১৫৩৭ সালে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলায় আসে। হুগলি ও চট্টগ্রাম হচ্ছে তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় আবাসস্থল। পূর্ব ভারতে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানি গঠিত হয়। ১৬২৫ সালে ডাচরা বাংলায় ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করে।

১১. দ্রষ্টব্যঃ S.K. Chatterji, *Languages and Literature in modern India*, (Calcutta, 1963), pp 156-61.

১২. 'মুসলমান শাসকেরা প্রশাসনের বাস্তব দিক–– যেমন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা, অপরিচিত জায়গা এবং সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে হিন্দু সামন্ত প্রভুদের গ্রামাঞ্চলে প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করার ক্ষমতা অর্পণ করেন। আস্তে আস্তে কিছু কিছু এলাকা জায়গির হিসাবে মুসলমানদের হাতে আসে।' (কে.এম মহসীন, আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), ২০০৮ : ৪৫)।

১৩. Peary Chand Mitra, "*Notes on Early Commerce in Bengal*" The Calcutta Review, vol. lxxii. (1881) pp. 114.

১৪. 'There were 55 ships of a total tonnage of 2,400 employed by the Company in its Eastern trade in the decade 1641-50. This rose to 99 ships with a tonnage of 31,140 in 1658-67, 172 ships with a tonnage of 59,151 in 1698-1707 and 180 ships with a tonnage of 87,200 in 1648-57. The total British imports of Indian cottons which were the principal item of export of India at the time showed a five-fold increase between 1698 and 1720, the export of white calicoes during the period rising from 247,214 pieces in 1698 to 1,299,685 pieces in 1720. Thereafter this position was maintained till 1951." (Bal Krishna, *Commercial Relations between India and England*, (London, 1924), pp. 235, Appendix pp. 308-09).

১৫. দীপেশ চক্রবর্তী; *শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি* ; গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ); নিম্নবর্গের ইতিহাস, পৃ. ১৬২।

১৬. চার্লস ডারউইন এ যুক্তির প্রবক্তা; তিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রমাণ হাজির করে বলেছেন যে, যোগ্যতমই টিকে থাকে, অযোগ্যরা বিলুপ্ত হয়; আর অযোগ্যরা যদিবা টিকে থাকে তবে তা যোগ্যতমের অধীনে, তার মর্জির নিয়মে, স্বকীয়তা বিকিয়ে দিয়ে। এই যুক্তিতেই ভারতের অধম, নিকৃষ্ট ও নির্বোধ উপনিবেশিত জনগণ অগ্রসর ব্রিটিশ শাসকের শাসন মেনে নেবে, দাসত্ব করবে এবং ব্রিটিশদের দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকবে।

১৭. 'English interference having placed the spinner in Lancashire and the weaver in Bengal, or sweeping away both Hindoo spinner and weaver, dissolved these small semi-barbarian semi-civilized, communities, by blowing up their economical basis, and thus produced the greatest, and to speak the truth, the only social

revolution ever heard of in Asia.' (Karl Marx; The British Rule in India, New-York Daily Tribune, 25 June 1853).

১৮. 'It was in Bengal that the western intrusion was the deepest and the colonial presence the longer.' (Nandy, 1989 : 27).

১৯. পেশকাশের বিনিময়ে সম্রাট ফররুখশীয়র ইংরেজদের বিস্তীর্ণ এলাকার ভূ-স্বত্ব এমন কিছু অধিকার প্রদান করেন যা সরাসরি সার্বভৌমত্বকে আঘাত করে। একটি বিদেশি শক্তিকে আঞ্চলিক অধিকার ছেড়ে দেয়া এবং দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেয়া ছিল শাসকশ্রেণির এক চরম অদূরদর্শিতা। পার্শ্ববর্তী চীন ও বার্মায়ও ইউরোপীয়রা দেশের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপনের সুযোগ পায়নি। চীনে কহং নামে একটি তালিকাভূক্ত দালালশ্রেণি বিদেশিদের পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য পরিচালনা করত। তাদের মাধ্যমে রপ্তানি-পণ্য একটি নির্দিষ্ট স্থল-বন্দর কেন্টনে সরবরাহ করা হতো এবং বছরে মাত্র দুবার বিদেশিরা কেন্টনে ব্যবসা করতে আসতে পারতো। মৌসুম শেষে বিদেশিদের বন্দর ছেড়ে যেতে হতো। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত মুগল শাসকদের নিজস্ব ধারণায়ও ছিল বিরাট গলদ। বাদশাহ, শাহানশাহ, শাহ আলম, আলমগীর ইত্যাকার উপাধিধারী মুগল শাসকরা নিজেদের বিশ্বমালিক মনে করতেন, তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বের সব মানুষই তাঁর প্রজা। যথোপযুক্ত নজরানা ও পেশকাশ দিয়ে আনুগত্য স্বীকার করলেই বিশ্বের যে-কেউ তাঁর রাজ্যে বাস করতে পারে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। একারণেই আরব, ইরান, আফগানিস্তান ছিল মুগল ফৌজ ও আমলাতন্ত্রের সেরা প্রবেশন-ক্ষেত্র। একই প্রক্রিয়ায় মুগল সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রে অসংখ্য ইউরোপীয়ের সমাগম ঘটেছিল। এক কথায় মুগল শাসনাধীনে ভারত হয়ে ওঠেছিল বিশ্বমানুষের এক মিলনমেলা। কিন্তু চতুর ব্রিটিশরা মুগল শাসকদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত এই শৈথিল্যের সুযোগ নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে দেশের শাসন ও প্রতিরক্ষা কাঠামোতে প্রবেশ করে এবং ক্ষমতাকাঠামো দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

২০. 'পলাশী যুদ্ধ ঘটেছিল বাণিজ্যিক কারণে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে যোগদান করতে এসেছিল আর্মেনীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ বণিকরা। স্থাপন করেছিল তারা স্থানীয় শাসক ও বণিক শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক। অচিরেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এই সম্পর্কে। সেই দ্বন্দ্বেরই নিরসন চেষ্টা ছিল পলাশী। কিন্তু পলাশী-ঘটনারাজি আর বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাণিজ্য রূপান্তরিত হলো রাজনৈতিক আধিপত্যবাদে। স্থাপিত হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে এবং ভারত থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।' (সিরাজুল, ১৯৯৯: ২৩)।

২১. 'The British were the first conquerors superior, and therefore inaccessible to Hindu civilization. They destroyed it by breaking up the native communities, by uprooting the native industry, and by leveling all that was great and elevated in the native society.' (Karl Marx, *The Future Results of British Rule in India*, New York Daily Tribune, 3 August. 1853)।

২২. 'In order to establish territorial sovereignty over the country, the company adopted the policy of gradual acquisition; the Britishers in India were advised accordingly, the factories were converted into forts and the English merchants into warriors.' (J.C. Sinha Hunter, Economic Annals of Bengal, ch. 2: p. 24)।

২৩. ব্রিটিশ প্রাইভেট ব্যবসায়ী উইলিয়াম বোল্টস-এর ভাষ্যে ওঠে আসে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় কোম্পানির নৈরাজ্যের চিত্র: 'ইহা অতীব সত্য যে কোম্পানির বিনিয়োগনীতি ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রাইভেট ব্যবসা এমন অত্যাচার-উৎপীড়ন সৃষ্টি করে যে, এর কবল থেকে কোনো তাঁতী-কারিগরের রক্ষা পাবার উপায় নেই। দেশের প্রত্যেকটি উৎপাদনের ওপর ইংরেজের একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাদের বানিয়া ও দালালদের সহায়তায় নিজেরাই স্থির করে জিনিসের সরবরাহের পরিমাণ ও মূল্য। ... তাঁতীদের বলপূর্বক বাধ্য করা হয় আগাম গ্রহণ করতে। আগাম নিতে অস্বীকার করলে এমনও শোনা যায় যে তাঁতীকে ডেকে এনে গাঁইটে আগাম গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাতে বিদায় করা হয় এবং বলা হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে দিতে। ... একবার আগাম গ্রহণ করলে তাঁতীর উপায় নেই অন্য কারও কাছে বাজারমূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করার। গোমস্তরা তার সরবরাহকৃত বস্ত্রের ওপর যে মূল্য

ধার্য করে তা বাজারমূল্যের চাইতে শতকরা পনের থেকে চল্লিশ ভাগ কম। তাঁতীরা যেন পালিয়ে না যায় বা গোপনে অন্যের কাছে বস্ত্র বিক্রয় করতে না পারে সেজন্য তাদের ওপর নিয়ত খবরদারি করার জন্য পিয়ন নিযুক্ত করা হয়।' (সিরাজুল, ১৯৯৯: ৪৬ থেকে উদ্ধৃত)।

২৪. ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান রাজনীতির অবস্থা এই যে, স্বাধীনতা প্রয়াসী নবাব মীর কাশিম চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত, কোম্পানির কৃপায় গদীতে আসীন মীর জাফরের নাবালক পুত্র নাজমুদ্দৌলা, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা কোম্পানির কৃপাপ্রার্থী, সাম্রাজ্যহীন সম্রাট শাহ আলম সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় সুজা-উদ-দৌলার হাতে প্রায় বন্দি; দেশীয় রাজশক্তিগুলো অবক্ষয়ের আবর্তে জীবন্মৃত; আঞ্চলিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কোম্পানিই এ অঞ্চলের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা। এই অবস্থায় চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমগ্র এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সরাসরি ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল শুধু কোম্পানির সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজরা সার্বভৌমত্ব ঘোষণার পথে না গিয়ে মুগল সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির নীতি গ্রহণ করে; দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক নগদ ২৬ লক্ষ টাকা ও সুবা বাংলার নবাবকে ৫৩,৮৬,১৩১ টাকার বিনিময়ে রবার্ট ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রার্থনা করলেন। সম্রাট শাহ আলম এ প্রস্তাবকে অপূর্ব সুযোগ হিসেবেই গ্রহণ করেন। একারণে অনেক ঐতিহাসিক ও রাজনীতি-বিশ্লেষকই ইংরেজদের কর্মকাণ্ডকে 'বিদেশি বণিক হিসেবে তাদের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য, রাজ্যবিস্তার নয়' বলে রায় দিয়েছেন। এতে চাপা পড়ে গেছে আধুনিক উপনিবেশবাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ধূর্ত কৌশল এবং এটি ঔপনিবেশিক প্রচারণারই সাফল্য। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির এ পদক্ষেপ সুবা বাংলা শাসনে তাদের অনিচ্ছা নয়, বরং তা ছিল ভবিষ্যতের শাসনকে মজবুত ভিত্তি দানের কৌশল হিসেবে 'ধীরে চলো নীতি'। ঐতিহাসিকগণ এক্ষেত্রে কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন : প্রথমত, ভারতের মোগল শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত ও রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ; সুতরাং তড়িঘড়ি ক্ষমতারোহণে ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি। মোগল কর্তৃপক্ষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ বাঁধিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে ওই শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল ও অকার্যকর করা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেছে। দ্বিতীয়ত, পলাশী যুদ্ধোত্তর অস্থিতিশীল পরিবেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে দায়-দায়িত্বমুক্ত বেনামী শাসনে অপরিমিত মুনাফা অর্জনের সুযোগ অবারিত হয় কোম্পানির সামনে। সার্বভৌমত্ব ঘোষণার দায় ও দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ইংরেজ বণিকরা এই বিপুল মুনাফাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে চায়নি। তৃতীয়ত, সার্বভৌমত্ব ঘোষণার পক্ষে প্রয়োজনীয় নিজস্ব লোকবল ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। কোম্পানির কর্মচারী ৭৬ জন, ফোর্ট উইলিয়ামে অফিসার ও সৈন্য মিলিয়ে ২৬০ জন, সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ঘাঁটিগুলোতে আরো ২৪০ জন, কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শখানেক ইংরেজ – এই হলো সাকুল্যে ইংরেজ লোকবল। সার্বভৌমত্ব ঘোষণা না-করার ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানই বাস্তব কারণ। অধিকন্তু কোম্পানি সম্পূর্ণত একটি বণিক সংগঠন; স্বদেশে বা বিদেশে তাদের শাসন করার কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না; দখলকৃত দেশের ভাষা, আইন-কানুন ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত – যা একটি দেশ শাসনের জন্য অপরিহার্য। চতুর্থত, এদেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির কোম্পানিগুলো ইংরেজ-কোম্পানির সরকারকে মেনে নেয়ার কোনো কারণ ছিল না, অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সংঘাত ছিল অবধারিত। এমতাবস্থায়, দেশীয় মুগল শক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তির সম্মিলিত আক্রমণের মুখোমুখি হওয়া ছিল অনিবার্য, যা তাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনত। পঞ্চমত, ইংরেজদের পক্ষে স্থানীয় কোনো সহায়কশক্তিও তখনো গড়ে ওঠেনি। এসব সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনকর্তা হিসেবে নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার জন্য তারা কিছুটা সময় নেয়। বলাবাহুল্য, বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইংরেজ বণিকদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সুপরিকল্পিত ও দূরদর্শী। (দ্রষ্টব্য, W.K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the fifth report* (Indian Studies Edition, 1962) pp. 163-65.)।

২৫. 'Robert Clive not only laid the foundation of British Empire in India but also transferred the traders into the sovereign masters of Bengal; the most fertile and prosperous province of India.' (J.C. Sinha Hunter, Economic Annals of Bengal, ch. 2: p. 23)।

২৬. দেশি-বিদেশি বণিকদের যৌথ-শোষণের ভয়াবহতার চিত্রটি কার্ল মার্কসের বর্ণনায় নিম্নরূপ: 'The East India Company, as is well-known, obtained, besides the political rule in India, the exclusive monopoly of tea-trade, as well as of the Chinese trade in general, and of the transport of goods to and from Europe. But the coasting trade in India and between the islands, as well as the internal trade of India, were the monopoly of the higher employees of the Company. The monopolies of salt, opium, betel and other commodities were inexhaustible mines of wealth. The employees themselves fixed the price and plundered at will the unhappy Hindus (i.e. people of India, not Hindus as such—R.Sen). The Governor General took part in this private traffic. His favourites received contracts under conditions whereby, they, cleverer than the alchemists, made gold out of nothing. Great fortunes sprang up like mushrooms in a day; primitive accumulation went on without the advance of a Shilling. The trial of Warren Hastings swarms with such cases. Between 1769 and 1770, the English manufactured a famine by buying up all the rice and refusing to sell it again, except at fabulous prices.' (Karl Marx, Capital, vol. i. (Moscow, 1977) p. 704-05.)|

২৭. J.C. Sinha Hunter, Economic Annals of Bengal, ch. 2. p. 24.

২৮. এরিক স্টোকসের মতে, 'The Permanent settlemewnt of Bengal (1793) was a frank attempt to apply the whig philosophy of government.' (Stokes, 1959: 5)।

২৯. এ প্রসঙ্গে এন্ডারসনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'Most British intellectuals of the early colonial period stressed the importance of law in regulating social life. `The rule of law' was a common piece of ideological baggage that linked law to public sentiments as well as political order. Law was more than an arm of sovereignty: it was employed as a proto-sociology that could guide policy.' (Anderson, 1996 : 5)।

৩০. 'The imperatives of the Company's account-books required that administrators remain mindful of two broad goals first, to extract economic surplus, in the form of revenue, from the agrarian economy, and second, to maintain effective political control with minimal military involvement.' (Michael R. Anderson, *Islamic Law and the Colonial Encounter in British India*, 1996, p-2)।

৩১. এ প্রসঙ্গে এন্ডারসন বলেন: 'The Hastings Plan of 1772 established a hierarchy of civil criminal courts, which were charged with the task of applying indigenous legal norms in all suits regarding inheritance, marriage, caste, and other religious usages or institutions. Indigenous norms comprised the laws of the Koran with respect to Muhammadans and the laws of the Brahmanic `Shasters' with respect to Hindus.' (Anderson, 1996: 2)।

৩২. 'Immediately after acquisition, the company started using its newly acquired possession for commercial benefits. With this motive in mind land revenue rates were enhanced, weavers were harassed, inland duties on Indian goods were increased; all these changes had adversely affected agriculture and impoverished the people.' (J.C. Sinha Hunter, Economic Anals of Bengal, ch. 2. p. 26).

৩৩. 'গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না...গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল, কুক্কুর।' –– দুর্ভিক্ষের এই বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসের।

৩৪. ১৮৬৩ সালে বড় লাটের সাধারণ পরিষদে অর্থ বিভাগের সদস্য চার্লস ট্রেভেলিয়ন এমন এক দিনের স্বপ্নের কথা উপস্থাপন করেন যখন ভারতীয় তাঁতীরা শ্রেণিগতভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃষকে পরিণত হবে এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্যের ক্রেতায় পরিণত হবে। (দ্রষ্টব্য : ইরফান, ২০১৭: ১০০)।

৩৫. দ্রষ্টব্য: Kalikinkar Datta, Survey of India's Social life and Economic Condition in the Eighteenth Century (1707-1813), (Calcutta,19610. P.120)।

৩৬. 'In 1939-40 there were 10,368 joint stock companies registered in British India with a paid-up capital of Rs. 2885 million. Of these, there were 498 plantation companies, mostly foreign, with a paid-up capital of Rs. 135.3 million; 297 mining companies, again most of them foreign, with a capital of Rs. 726.9 million. Many of these also, particularly companies owning jute Mills which numbered 82 with a paid-up capital of Rs. 204.7 million, were foreign-owned. As against that, there were 1,797 banking, 601 insurance and 4,728 Ôtrading and manufacturing companies with paid-up capital respectively of Rs. 222.5 million, Rs. 41.7 million and Rs. 1,070 million.' (Quoted in B. M. Bhatia, *History and Social Development*, vol. I (Delhi, 1974), p. 275.)
ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অগ্রগতির আরেক নির্ঘণ্ট হচ্ছে শ্রমিকের কর্ম-সংস্থানের পরিমাণ : 'The average daily number of workers employed in various industries in both public and private sectors was 1.75 million in 1939. The total population of British India at the 1931 census was 271.5 million. The industrial workers thus formed only 0.6 per cent of the population. (Quoted in B. M. Bhatia, *History and Social Development*, vol. I (Delhi, 1974), p. 275.)।

৩৭. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার থরথর কাব্যিক আবেগে পলাশীর পতনদৃশ্য বর্ণনার পর ঘোষণা করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আবাহন: 'When the sun dipped into the ganges behind the blood-red field of Plassy, on that fateful evening of June, did it symbolize the curtain dropping on the last scene of a tragic drama? … Today the historian, looking backward over the two centuries that have passed since then, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the like of which the history of the world has not been seen elsewhere. On 23rd June, 1757, the middleages of India ended and her modern age began…Education, literature, society, religion, man's hand work and political life, all felt the revivifying touch to the new impetus from the west….
In this new Bengal originated every good and great thing of the modern world that passed on to the other provinces of India. From Bengal went forth the English educated teachers and the Europe-inspired thought that helped to modernise Bihar and Orissa, Hindustan and Deccan. ঘোষণা করা হলো, It was truly a Renaissance…' (*The History of Bengal*, vol-ii, Edited by Sir Jodunath Sarkar, The University of Dacca, 1976 : 497-98)।

৩৮. Lata Mani, *The Debate on SATI in Colonial India*, Source: Cultural Critique, No. 7. The Nature and Context of Minority Discourse II (Autumn, 1987), pp. 153)।

৩৯. রণজিৎ গুহ বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন উদ্ধৃত মন্তব্যে: 'Although colonialism and many-sided thurst of liberal politics made it out to be so, there was more to education than was thus conceived. It stood not only for enlightenment but also authority—a fact which it has been the function of ideology in all its forms, including historiography, to hide both from the educators and the educated. In other words, it was an ideological effect that made both the propagators and the beneficiaries of education regard the latter as a purely cultural transaction and ignore that aspect of it which related directly to the power.' (Guha 1988 : 15).

৪০. Charles Edward Trevelyan; *On the Education of the People of India*; London; LONGMAN, OMRE, GREEN, & LONGMANS, 1838: p. 192-93)।

৪১. সাহেব-বাঙালিদের সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মর্মন্তুদ বিচ্ছিন্নতার একটি খণ্ডচিত্র পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিকথায়: 'যখন মহানন্দা নদীর ভিতর স্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা 'ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে' 'ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে' বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল।... লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। স্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত, যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। ... আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইন্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে।' (রাজনারায়ণ বসু, ১৯০৯: ৩৫-৩৬)।

৪২. 'The British did divide India along communal lines, especially between1757 and 1920. Therefore no actual break occurs in Britain's overall posture of divided rule. It continued. Separate electorates were established. When Muslims would resist British rule, as they did between 1757 and 1857, they were discriminated against in favour of bringing up Hindus. When Congress became organised, more Hindu nationalist figures were there than Muslim ones. Then they favoured Muslims against the Congress. So there was a whole set of divide-and-rule policies that the British followed for nearly two centuries.' (Ahmad, 2016: 6)।

৪৩. দীপেশ চক্রবর্তী: *উত্তর-উপনিবেশিকতা এবং ইতিহাসের নির্মাণ*; ফকরুল চৌধুরী (সম্পাঃ); উপনিবেশিকতা ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ : আগামী প্রকাশনী ; পৃ.২৭২।

৪৪. প্রভাবশালী পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর-এর ২০/৬/১৮৫৭ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ নিম্নরূপ : 'বিশেষতঃ বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বাঙ্গালি প্রজা নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারা নিরন্তর কেবল শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর প্রতুল প্রত্যাশা করে, যাহাতে রাজপুরুষদিগের রাজলক্ষ্মী ভারতবর্ষে চিরস্থায়ীনী হয়েন, একাগ্র চিত্তে তাহারই অভিলাষ করে, স্বপ্নেও কখনো অমঙ্গল চিন্তা করে না, কারণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালি ব্যূহ যেরূপ সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগ পূর্ব্বক সমানন্দে বাস করিতেছে, কস্মিনকালে তদ্রূপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? ... সংপ্রতি অবোধ সেনারা বুদ্ধিও বিকার বশতঃ যে কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সেই কাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড বলি না, কেননা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিকট ভাণ্ড, সেইরূপ বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস জাতির নিকট এই কাণ্ড অতি ক্ষুদ্র।' (বিনয়, ১৯৬২: ২২৬-২৮)।

৪৫. দেবেশ রায় বলেন: 'ইংরেজি শিক্ষিত গোষ্ঠী বাঙালিয়ানার যে যুক্তিকে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করেছে, তা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নয়, অপরদিকে একটি গোষ্ঠীরই 'জাতি'র সমার্থক হওয়ার চেষ্টা। পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে গোষ্ঠীস্বার্থেই যে তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদ'কে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তারই যেন সূচনা।' (দেবেশ, ১৯৯০: ২৯০)।

৪৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়; *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*; নিম্নবর্গের ইতিহাস পৃ. ১৫৩-৫৪।

৪৭. 'সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক হয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুও অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িক হবে। সংখ্যাগুরুর মানসিকতা সর্বদাই নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করবে সংখ্যালঘুর মানসিকতাকে এবং সংখ্যাগুরুর অসহিষ্ণুতাই সংখ্যালঘুকে অসহিষ্ণু করবে।' (সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ১৪০৯: ১১১)।

৪৮. 'দীর্ঘকাল তাঁরা মনঃস্থির করতে পারেননি ... ধর্মের উৎপত্তিস্থল মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখবেন; না শতাব্দীর পর শতাব্দী যে অঞ্চলে বাস করছেন—সেই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করবেন। ভাষার ব্যাপারেও ছিলো তাঁদের একই ধরনের অস্বচ্ছ ধারণা। দীর্ঘকাল তাঁরা স্থির করতে পারেননি তাঁদের ভাষা কি আরবি, না ফারসি। না কি, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশের যে ভাষা—সেই হিন্দুস্তানি বা উর্দু।' (গোলাম মুরশিদ, ২০১৯: ২০৪)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অখণ্ড বাংলায় বিউপনিবেশায়ন ও দেশভাগজনিত পূর্ব-বাংলায় নব্য-উপনিবেশায়ন

১.৩

'ভারতে ইংরেজ রাজ কায়েম করা হয়েছিল ছোট ছোট যুদ্ধ জয় ও সেগুলোর সাফল্যকে সংহত করার, অর্থনীতি ও সমাজকে ঔপনিবেশিকতার নাগপাশে বেঁধে ফেলার এক দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।' (বিপান,২০১৪: ২৪)। প্রাক্-ব্রিটিশপর্বের রাজনৈতিক পরিবর্তনে কেবল শাসকগোষ্ঠীরই পরিবর্তন হতো, সমাজদেহ থাকতো অনড়। কিন্তু ব্রিটিশরা শাসকচক্রের উৎখাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিটি স্তর-উপস্তরে ছড়িয়ে দেয় আধিপত্যের উপদ্রব। নতুন ভূমিব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ভারতীয় জনসমাজকে ওলটপালট করে দিয়েছিল; নিক্ষেপ করেছিল দীর্ঘস্থায়ী ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশায়। ভূমি-রাজস্বের যথেচ্ছাচার বৃদ্ধি[১] এবং ব্রিটিশ পুঁজির বিকাশের স্বার্থে স্থানীয় শিল্পের সমাধি রচনা আপামর জনগোষ্ঠীকে এক গভীর দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করে।[২] ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির কারণে ঋণের জালে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হলো কৃষক; নতুন বিত্তবান ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে জমিদারি ও প্রতিপত্তি হারালো পুরনো জমিদারেরা; পুরনো ভূস্বামী ও আমলাতান্ত্রিক অভিজাতদের পতনে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পথে বসলো বিদ্বান, ধর্মপ্রচারক, পুরোহিত, পণ্ডিত, মৌলভী, শিল্পী, সাহিত্যিকগণ; পুরনো পুঁজিপতি ও কারিগরশ্রেণির ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জটিল ফাঁসে দমবন্ধ ও দিশেহারা অবস্থা। এছাড়া খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়ে মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-প্রথা-মূল্যবোধে আঘাত মানুষের চেতনাবোধকে নির্মমভাবে আহত করেছে। ফলশ্রুতিতে উপনিবেশায়নের প্রতিটি পদক্ষেপেই সর্বস্তরের জনগণ ছিল বিক্ষুব্ধ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এসেছে বিচিত্র অঙ্গন থেকে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে 'সার্বিকভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতির ও অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিত বদলে গিয়েছিল। ... সমাজ ও সংস্কৃতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোম্পানি বাহাদুরের, বিদেশি শাসককুলের সর্বেশ্বরতা জাহির করার চেষ্টা সংঘর্ষ ও সংঘাতের জন্ম দিয়েছে, দেশজ ক্ষেত্রে বিনা প্রতিরোধে সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়েনি। এই প্রতিরোধ সময় সময় স্পষ্ট, অনেক ক্ষেত্রেই তির্যক, অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রকাশ হয়েছে প্রতীকী আচরণে, চিন্তার নানা বিচিত্র প্রকাশে।' (গৌতম, ২০১৮ : ১২)।

পলাশি, মুঙ্গের, উদয়নালা, বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশের মুষ্টিমেয় অভিজাত শাসকশ্রেণির ওপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছিল; কিন্তু দেশবাসীর ওপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করতে তাদেরকে আরও অর্ধ-শতাব্দীকাল সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তনে সহজাতভাবে উদাসীন সাধারণ জনতা কোম্পানি শাসনের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপে স্থানীয় শাসন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও অর্থনৈতিক জীবন ভেঙে পড়লে ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী বিদ্রোহের সূত্রপাত পলাশি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহও ব্যাপক-বিস্তৃত রূপ লাভ করে। কদাচিৎ বছর গেছে যে বছরে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়নি; দেশের কোনো না কোনো অংশে বড় ধরনের সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্যতিরেকে কোনো দশক পার হয়নি। ১৭৬৩ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে শত শত ছোটখাট বিদ্রোহ ছাড়াও চল্লিশটির অধিক বড় ধরনের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। 'ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ১০০ বছরে একের পর এক অসামরিক বিদ্রোহ ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসবের নেতৃত্ব দিয়েছেন সিংহাসনচ্যুত রাজা ও নবাবরা কিংবা তাদের বংশধরেরা, ছিন্নমূল ও দরিদ্রের মতো জীবনযাপনে বাধ্য হওয়া জমিদার, ভূস্বামী ও পলিগাররা (দক্ষিণ ভারতের ভূম্যধিকারী সেনাপতিরা), বিজিত ভারতীয় রাজাদের রাজ্যগুলোর পূর্বতন পোষ্য ও রাজকর্মচারীরা। ভূমি-রাজস্বের মাত্রাধিক চাপে নিষ্পেষিত কৃষক, সর্বস্বান্ত কারিগর ও সৈন্যদল ভেঙে দেওয়ার ফলে কর্মহীন সৈনিকেরাই ছিল এসব বিদ্রোহের মেরুদণ্ড, গণভিত্তি ও লড়াকু বাহিনী।' (বিপান, ২০১৪: ২৪)। ১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থান ছিল শতাব্দীকাল

পরিব্যাপ্ত সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বে পরিচালিত সর্ববৃহৎ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। সিপাহি-জনতার এই অভ্যুত্থান শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং পরিণামে কোম্পানির শাসনের অবসান আর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-রাজের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রূপান্তর সাধনের পাশাপাশি এই বিদ্রোহ ভারতের উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে; আর সেটি হলো সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের হাত থেকে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাতশ্রেণির হাতে নেতৃত্বের হস্তান্তর। সিপাহী বিপ্লবোত্তর ভারতীয় রাজনীতি ও ক্রমে ঘনীভূত স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে 'শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণি'র একচ্ছত্র প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পষ্টতই প্রায় দুই শতাব্দব্যাপী ব্রিটিশ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন তিনভাগে শনাক্তযোগ্য––(১) কোম্পানির শাসনামলে সংঘটিত কৃষক-জনতার আন্দোলন, ও (২) কোম্পানি-রাজশাসনের যুগসন্ধিক্ষণের সিপাহি-জনতার মহাঅভ্যুত্থান ও কৃষক-জনতার আন্দোলন, ও (৩) ব্রিটিশ-রাজ আমলে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

১.৩.১

কোম্পানি শাসনামলে সংঘটিত কৃষক-জনতার আন্দোলন

বাংলায় ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রপাত ১৭৬০ সালে, ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দিয়ে। বাংলার ধর্মভিত্তিক সমাজ-কাঠামোয় ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল সমাজের একাংশের আধ্যাত্মিক নেতা; সমাজে তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। শাসনকাজকে নির্বিঘ্ন করতে মোগল শাসকেরা তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের নীতি অবলম্বন করতো। রাষ্ট্রীয় নীতি যতক্ষণ ধর্মীয় জীবনের জন্য নিরাপদ ছিল ততক্ষণ শাসনব্যাপারে তারা থাকতো উদাসীন; ধর্ম বিপন্ন হলেই তারা গড়ে তুলতো সশস্ত্র প্রতিরোধ। সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ-জুলুম নেমে এলে তার প্রতিবিধানকে ফকির-সন্ন্যাসীরা নিজেদের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য মনে করতো। ঔপনিবেশিক শাসন লাখেরাজ সম্পত্তিহরণ, মুষ্টিসংগ্রহে বাধাপ্রদান, ধর্মীয় আইনে বিচারকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্তকরণ ও সংঘবদ্ধ তীর্থযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ ফকির-সন্ন্যাসীদের স্বাধীন আধ্যাত্মিক জীবনকে ব্যাহত করে, যা তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। তদুপরি কোম্পানির রাজস্বনীতির ধ্বংসাত্মক শিকার জমিদার, তালুকদার, জোতদার, বিশেষ করে সর্বস্বান্ত রায়তশ্রেণি শেষ ভরসা হিসেবে ফকির-সন্ন্যাসীদের শরণাপন্ন হলে তারা সর্বশক্তি নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মজনু শাহের সাংগঠনিক দক্ষতা ও ইংরেজ-বিরোধী নেতৃত্ব এবং তার সঙ্গে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর মেধা ও কর্মতৎপরতা শক্তির সম্মেলনে পরিণত করেছিল। 'এটা ছিল ফরাসী প্রজাতন্ত্রেরই মতো একটা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।' (হোসেন, ১৯৯৯ : ৯৩)। এ বিদ্রোহ উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীভূত হলেও তা বর্ধমান, ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহসহ প্রায় সমগ্র বঙ্গেই বিস্তৃত হয় এবং রক্তক্ষয়ী পাগলপন্থি বিদ্রোহের (১৮২৫-১৮৩৩) মাধ্যমে এ অধ্যায়ের অবসান ঘটে। ফকির-সন্ন্যাসীদের এ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক; এ বিদ্রোহের ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক চেতনাবোধ; এ সংগ্রাম ছিল মূলত ব্রিটিশ শাসন-সৃষ্ট অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও নির্যাতিত কৃষককুলের মুক্তির লক্ষ্যে ব্রিটিশ-বিতাড়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। বস্তুত বাংলার কৃষক-জনতার প্রতিটি বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা ছিল পুরোভাগে, তবে সেখানে ধর্ম বিদ্রোহের এক উপাদান মাত্র, তার ভূমিকা 'প্রধানত সংহতি রক্ষায়'; কেবল 'বিদ্রোহের যৌথ-সিদ্ধান্ত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত'। (গৌতম, ২০১৮: ১৫)। বাংলার বিদ্রোহী জনতার অবিরাম বিদ্রোহের মধ্যে চুয়ার বিদ্রোহ (১৭৬৬ থেকে ১৭৮৩ পর্যন্ত এবং পরে ১৭৯৫ থেকে ১৮১৬ পর্যন্ত), রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), বাঁকুড়ার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৮৫), যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৮৩৯-৪২), ওহাবি আন্দোলন (১৮৩০-৩১), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮২০-১৮৫৭), তুষখালির কৃষক বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফরায়েজি-ওহাবি আন্দোলন ছিল কৃষক-জনতার বিদ্রোহের বৃহত্তর বিকাশ। বিধর্মী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া বা কথিত ওহাবি আন্দোলনের জন্ম। এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র সকল স্তরের

মুসলমানেরা। মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক প্রবণতাসমূহ দূর করার ওপর এরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলেও শিখ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদেরকে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভি তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের মূল নেতা এবং সশস্ত্র যুদ্ধের প্রধান পরিচালক ছিলেন। সৈয়দ আহমদ নিহত হওয়ার পরও (১৮৩১) তার অনুগামীরা নিরলসভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্নিবার আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৮৬৩ সালে আম্বালা বিপর্যয়ের পর বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে ব্রিটিশরা বিচারের নামে প্রহসন চালায়। এগুলো সংক্ষেপে (১) ১৮৬৪ সালের আম্বালা বিচার, (২) ১৮৬৫ সালের পাটনা বিচার, (৩) ১৮৭০ সালের মালদা বিচার ও রাজমহল বিচার। এ সমস্ত বিচারের রায়ে শত শত মুসলিম মুজাহিদকে ফাঁসি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে যে অল্পকয়েক জন নেতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের মধ্যে মীর নিসার আলি বা তিতুমীর একজন। তাঁর সূচিত আন্দোলন ছিল 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া'র বাংলা দেশ অধ্যায় এবং অনুগামীরা 'হিদায়তি' বলে অভিহিত হতেন। ইসলামের বিশুদ্ধতাই এই আন্দোলনের মূলকথা; আল্লাহর একত্বে চরম আনুগত্য ও নবীর জীবনানুসরণ হিদায়েতিদের আদর্শগত ভিত্তি। 'তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া'র বিদ্রোহের প্রধান তত্ত্ব হলো 'জেহাদ'। 'জেহাদ সাধারণ কোন লড়াই নয়, জেহাদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষে লড়াই করা।' (গৌতম, ২০১৮ : ২৮৯)। ধর্মের পোশাকে তিতুমীরের বিদ্রোহ ছিল একটি কৃষক আন্দোলন। বারাসতের উত্তরাঞ্চলে 'যমুনা আর ইছামতী নদীর দুধার ধরে ১৮ বা ২০ মাইল দৈর্ঘ্য আর ১৪ মাইল প্রস্থ তিতুর বিদ্রোহের এলাকার আয়তন।' (গৌতম, ২০১৮: ২৬২)। সমাজের অন্ত্যজরাই ছিল তিতুর বিদ্রোহের প্রাণশক্তি: 'তিতুর সামাজিক আবেদন অবশ্য ছিল গ্রামের নিম্নকোটির আদত মানুষদের কাছে। বারবার বলা হয়েছে যে জাতিতে তারা ছিল জোলা আর কৃষক। এদের অনেকেরই উপাধি কারিগর। এদের মধ্যে অনেকে তাঁত বুনত আর নগণ্য রায়ত ছিল।' (গৌতম, ২০১৮: ২৬১)। তিতুমীরের বিদ্রোহে ছিল একটি ভ্রূণ রাষ্ট্রের রূপরেখা এবং তার প্রকাশ ছিল ফৌজে––কৃষক ফৌজ––ইটপাটকেল, লাঠি, তলোয়ার ইত্যাদি থেকে শত্রুর কাছ থেকে লুঠে পাওয়া বন্দুক এদের অস্ত্র; আর এই ফৌজের দক্ষতা অনস্বীকার্য।

সরকারি আর জমিদারি ক্ষমতার আরেক মূর্তি নীলকর সাহেব। কুঠিয়ালরা যুগপৎ জমিদারও ছিল; প্রবল প্রতাপী এই কুঠিয়ালরা ছিল রায়তদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। গ্রামের সম্পন্ন কৃষক আর লাঠিয়ালের মাধ্যমে তারা খাজনার চাপ আর নীল চাষের পাট্টা এবং ঋণের ফাঁদে রায়তদের বেঁধে ফেলেছিল। রায়ত-বিদ্রোহ তাই কুঠিয়ালদেরও সন্ত্রস্ত করে তোলে। অভিন্ন কায়েমি স্বার্থের টানে সরকার, জমিদার ও কুঠিয়ালদের মধ্যে এক সুগভীর সংহতি গড়ে ওঠে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নৃশংস কায়দায় বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। তাই বিদ্রোহের মুহূর্তে আক্রমণের বর্শামুখ আঞ্চলিক জমিদারকে ছাপিয়ে ধাবিত হয় ইংরেজ সরকারের দিকে। তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের যুদ্ধে জমিদার ও রাজশক্তির পরাজয় হয়। ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে, জমিদার ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে শহিদ হন তিনি। অনেক ঐতিহাসিকই এ যুদ্ধকে চিহ্নিত করেছেন, কালের বার্তা উপেক্ষা করে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের চিহ্নায়ন ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার গভীর প্রভাবের ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে এই লড়াই ছিল ভবিষ্যৎ জনযুদ্ধের মহৎ দৃষ্টান্ত। এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে গৌতম ভদ্রের মূল্যায়ন ব্যঞ্জনাবাহী: 'ঔপনিবেশিক শাসন সৃষ্টি করে এক ত্রিশঙ্কুর জগৎ, সেখানে সবই উল্টো। তাই 'উদারনীতিবাদ' আর 'যুক্তিবাদে' সিদ্ধ ভারতপথিক' রামমোহন তাঁর সব তীক্ষ্ম সমালোচনা আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েও ইংরাজ শাসনে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখেন, ইংরাজ সুবিচারে তাঁর আস্থা অটুট থাকে। 'যুক্তিবাদ' এখানে ইংরাজ শাসকের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি হয়। বারাসতের গণ্ডগ্রামে তাঁরই সমসাময়িক জোলাদের নেতা তিতু গড়ে তোলেন ধর্ম সম্প্রদায়, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা প্রবল, যেখানে সম্প্রদায় আর কৌম গড়ে ওঠে তথাকথিত যুক্তি দিয়ে নয় বরং ইমান আর বিশ্বাস দিয়ে। সম্প্রদায়ের ভাষা আর ক্ষমতার চিহ্ন সবই সামন্ততান্ত্রিক স্তরভিত্তিক বিন্যাসে বিধৃত হয়েছে। ... অবস্থার চাপে গ্রামসমাজের কায়েমি ক্ষমতা আর সামূহিক ক্ষমতার টানাপড়েনে সেই তরিকা হয়ে ওঠে কোম্পানিরাজের প্রতিস্পর্ধী, গড়ে তোলে বাঁশের কেল্লা।

তিতুমীরের দেহ খুঁজে পাওয়া যায় না। ... আর 'ভারতপথিক' রামমোহন রায়ের সমাধিস্তম্ভ তৈরি হয় ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে। আরো পরে ১৮৫৭ সালের অগ্নিমুহূর্তে বারাসাতের ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাদরদি জেলাশাসক ইডেন প্রথমে যে কাজটি করেন তা হল তিতুমীরের গ্রামের আর পরিবারের উপর খবর নেওয়া আর নজরদারি রাখা, কারণ তিতুমীরের ছেলেকে লোকে শাহজাদা বলছে, তার নামে নানা গুজব রটছে। ঐতিহাসিকেরা ভুল করতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে চরম সঙ্কটের সময়ে কে তার সম্ভাব্য শত্রু-মিত্র তাকে চিনতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ভুল করেনি।' (গৌতম, ১৯৯৮ : ২৯৯)।

তিতুমীরের বিদ্রোহের পর তৎকালীন বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন নামের আরও একটি দুর্বার আন্দোলন ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ [১৭৭১-১৮৪০] এবং এর প্রাণশক্তি ছিল বাংলার নির্যাতিত কৃষক, কারিগর ও সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষেরা। ফরায়েজি শব্দের অর্থ 'আল্লাহর আদেশ অনুসরকারী'। তাঁর প্রচারিত মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, যা জমিদারদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মদ মুহসিন, ডাকনাম দুদু মিঞা। তিনি পিতার মতবাদ প্রচার করেন এবং জমিদার ও কুঠিয়ালদের শোষণ এবং বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরায়েজিরা ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন ও স্বাধীন বঙ্গে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদার ও নীলকরদের খাজনা বন্ধ করে দেয় এবং অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা সহ বাংলার সর্বত্র এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ফরায়েজিদের আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকার শেষপর্যন্ত নিয়মিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং জেল-হুলিয়াসহ নানা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে ফরায়েজিরা সিপাহিদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে ঢাকা ও বাকেরগঞ্জ থেকে কোম্পানির শাসন উচ্ছেদ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার দুদু মিঞাকে বন্দি করে এবং দীর্ঘ কারাবাসে অসুস্থ হয়ে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কারান্তরালে মৃত্যুবরণ করেন।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবৈধ অনুপ্রবেশে বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ আদিবাসীদের বনের জীবনও এলোমেলো হয়ে যায়। আদিবাসীদের পুরনো কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসীরা উনিশ শতক জুড়ে শত শত জঙ্গি আন্দোলন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান গড়ে তোলে। এসব অভ্যুত্থানের গণভিত্তি ছিল ব্যাপক; নৃকূলগত বন্ধনই ছিল এ বিদ্রোহগুলোর এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আদিবাসী বিদ্রোহগুলোর মধ্যে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৬৬) উল্লেখযোগ্য। ব্যাপ্তির বিবেচনায় সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল বিশাল ও অনড় বীরত্বব্যঞ্জক। ৬০,০০০ সাঁওতাল যোগ দিয়েছিল এ বিদ্রোহে; বিদ্রোহ দমনে সরকার একজন মেজর জেনারেলের অধীনে অনেকগুলো রেজিমেন্টের সমন্বয়ে এক বিশাল সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, হত্যা করে পনের হাজারের বেশি সাঁওতালকে, ধ্বংস করে অসংখ্য গ্রাম।[৩]

বাঙালি কৃষক-জনতা ও আদিবাসীদের 'প্রায় বিরামহীন এসব বিদ্রোহ সামগ্রিকভাবে ব্যাপক হলেও বিস্তারের দিক থেকে সেগুলো ছিল পুরোপুরি স্থানীয়, একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন।' (বিপান, ২০১৪: ২৬)। দেশের নানা প্রান্তে সংঘটিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহগুলোকে একের পর এক নির্মম রক্তক্ষয়ী পন্থায় দমন করে ব্রিটিশরা পুরো দেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। তবে 'এসব অসামরিক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক শক্তিশালী ও মূল্যবান স্থানীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। এগুলোর ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখানেই।' (বিপান, ২০১৪: ২৭)। সংগ্রামের এই ঐতিহ্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল পরবর্তীকালের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে।

১.৩.২

কোম্পানি-রাজশাসনের যুগসন্ধিক্ষণ : সিপাহি-কৃষক-জনতার আন্দোলন

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৯), যা 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে অভিহিত, বিদেশি শাসন নির্মূলনের প্রথম সর্বভারতীয় বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস। ১৮৫৭ সালের ১১ মে তারিখে মিরাট থেকে আসা একদল সিপাহির দিল্লি দখলের

মাধ্যমে এ বিদ্রোহের শুরু; এক মাসের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন অংশে: কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, এলাহাবাদ, বেরিলি, জগদীশপুর ও ঝাঁসিতে। 'কোম্পানির মোট ২,৩২,২২৪ জন সিপাহির মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নিজ নিজ বাহিনীর প্রতি আনুগত্য দেখাতে অস্বীকার করলেন।' (বিপান, ২০১৪: ১৬)। সিপাহিদের নিজেদের মধ্যে নেতা ছিল না বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পেনশনভোগী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকেই তাঁরা নেতা মানলেন; তাঁরা নেতৃত্বের জন্য শরণাপন্ন হলেন বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের হাতে নির্যাতিত অভিজাত ও সামন্তপ্রভুদের । ইংরেজ শাসন যে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়েছিল তার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী ছিল সিপাহিরা। 'সুতরাং এই বিদ্রোহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আর তাই একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম। আমজনতার সঙ্গে সিপাহিদের স্বার্থের মিলই এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য।' (বিপান, ২০১৪: ১৯)। এ বিদ্রোহের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নমাত্র ছিল না; ভারতে সাম্রাজ্যশাসনের মূল অস্ত্র 'devide et impera' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।[৪] ব্রিটিশ শাসনের অবসানই ছিল এ অভ্যুত্থানের লক্ষ্য। সিপাহি-জনতার সম্মিলিত আক্রমণে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ সেনাবাহিনী চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়; বহু ইংরেজ সেনা অফিসার সিপাহিদের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারায়, অনেকেই প্রাণভয়ে পলায়ন করে। কিন্তু সিপাহি-জনতার অমিত সাহস আর অপরিসীম আত্মত্যাগ সত্ত্বেও এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে প্রথমে পতন ঘটে দিল্লির (১৮৫৭-র ২০ সেপ্টেম্বর), ভেঙে যায় বিদ্রোহের মেরুদণ্ড; এরপর বিদ্রোহীদের একের পর এক ঘাঁটি দখল করে নেয় ইংরেজরা। 'ব্যর্থতা সত্ত্বেও তা এক মহান উদ্দেশ্যসাধন করেছে: জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তা ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। এই বিদ্রোহ যে কাজটি করতে পারেনি পরবর্তিকালে মুক্তি সংগ্রাম তা করেছে।' (বিপান, ২০১৪: ২৩)। এই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়দের ঘৃণার তীব্রতা অনুধাবন করতে পেরেছে; ফলশ্রুতিতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ঔপনিবেশিক শাসননীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, যা ছিল উদারনীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গণতন্ত্র, সর্বোপরি আমলাতান্ত্রিক বিধিবদ্ধ শাসনের খোলসে মোড়ানো আরও বেশি কর্তৃত্ববাদী, আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক।

মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই সংঘটিত 'নীল বিদ্রোহ' (১৮৫৯-৬২) পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জনগণের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। অবশ্য এর পটভূমি তৈরি হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে সূচিত শিল্পবিপ্লবে বস্ত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিতে বস্ত্র-রঞ্জক হিসেবে নীলের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে নীলের ব্যবসা, গুণমানে বিশ্বখ্যাত বাংলার নীলে[৫] ছেয়ে যায় বিশ্বের বাজার। ১৮১০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় নীল চাষ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। যশোর ও নদীয়া জেলা ছিল নীলচাষের প্রধান কেন্দ্র; এছাড়াও খুলনা, চব্বিশ পরগণা, বগুড়া, রাজশাহী মালদহ, নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় নীলচাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। কিন্তু এই নীলই হয়ে ওঠে বাংলার কৃষকদের এক অবর্ণনীয় শোষণ ও নির্যাতনের কারণ। দাদন দেওয়ার নামে কৃষকদের কাছ থেকে অজ্ঞাতশর্তে পরিপূর্ণ চুক্তিপত্রে নেওয়া হতো টিপসই[৬] যা কৃষকদের পরিণত করতো নীলকরদের ভূমিদাসে। কুঠিয়ালরা নীলচাষের জন্য সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলো বাছাই করতো এবং তাতে নীল ছাড়া অন্য শস্য উৎপাদন ছিল নিষিদ্ধ।[৭] কুঠিয়ালদের ইচ্ছেমতো নীলচাষে কৃষকদের অস্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে তাদের ওপর নেমে আসতো অকথ্য অত্যাচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতেও প্রতিকার মিলত না। ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়মেই আদালতে অভিযুক্ত কুঠিয়াল আসন পেত বিচারকের পাশে আর অভিযোগকারী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো কাঠগড়ায়। এমনকি কুঠিয়ালদের নিয়োগ দেওয়া হতো অবৈতনিক সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে। প্রতিটি নীলকুঠিতে ছিল কয়েদখানা, অবাধ্য প্রজাদের 'শ্যামচাঁদ' দিয়ে প্রহারের পর দিনের পর দিন আটকে রাখা হতো। অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠলে কৃষকরা নীলচাষ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নীলচাষে বাধ্য করতে কুঠিয়ালরা নির্মম নির্যাতনের কৌশল নিলে কৃষকেরা সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহে শরিক হয়েছিল সকল ধর্ম-বর্ণের, সকল স্তরের নারী-পুরুষ; অর্থাৎ এই জনপদের সমুদয় মানুষ সম্মিলিত হয়েছিল নীল বিদ্রোহে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তিতুমীরের

'হামকল বাহিনী' ও ফরায়েজি আন্দোলনের 'দুন্দুভি বাহিনী'। এজেন্ডা আলাদা হলেও এই বাহিনীত্রয়ের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন––অত্যাচারী জমিদার ও কুঠিয়ালদের পতন ঘটানো।

কৃষক বিদ্রোহের উত্তাল পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থান ছিল স্পষ্টতই কুঠিয়ালদের পক্ষে; বিদ্রোহ দমনে তারা অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদী কায়দা––উপর্যুপরি হামলা-মামলা ও পুলিশি নির্যাতন। কিন্তু অস্তিত্ব-সঙ্কটে বিপন্ন কৃষকদের বেপরোয়া আক্রমণে অচিরেই তাদের এ কৌশল ব্যর্থ হয়। এরপর ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহ-দমনে একদল পদাতিক সেনাও নিয়োগ করে। এতে কৃষক আন্দোলন আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে; নীলচাষ বন্ধ করার পাশাপাশি বন্ধ করে দেয় খাজনা প্রদান। ফলত তালুকদার ও নীলকরেরা লাটের খাজনা সরকারের তহশীলে সময়মতো পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার খাজনা পরিশোধের সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের তীব্রতার প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতে বাংলার ছোট লাট গ্রান্ট সাহেব যশোর জেলার কুমার ও কালিগঙ্গা নদীপথে ৫০/৬০ মাইল ভ্রমণ করেন। সমস্যা-সমাধানে ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৬০ সালে কমিশন (ইন্ডিগো কমিশন) গঠন করে। তদন্ত শেষে কমিশনের রিপোর্ট ছিল: 'The whole system is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound.'[৮] কিন্তু নীলচাষীদের প্রতি ঔপনিবেশিক সরকার সহানুভূতি প্রকাশ করেই তার দায় শেষ করেছে[৯]; নীলকরদের অত্যাচার বন্ধে কোনো কার্যকর আইন প্রণয়ন করেনি; কেবল একটি ইশতেহার জারি করে এ ব্যাপারে সরকারের নিরপেক্ষতার কথা জানান দিয়েছে।

১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থান-উত্তর পর্বে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন সাম্রাজ্যিক যুগে প্রবেশ করে এবং সমসাময়িক অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সাম্রাজ্যবিস্তারের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। বিদেশে হানা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় সেনাবাহিনীর কলেবর বাড়ানোর, খরচও বাড়ে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু '১৮৭৩-এর পর পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় সুদীর্ঘ এক ভাটার টান শুরু হয়।' (সুমিত, ২০১৯ : ১১)। সোনার সাপেক্ষে রুপার মুদ্রার মান হু-হু করে কমতে থাকে; ফলশ্রুতিতে ভারতের কোষাগারের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, শুরু হয় আর্থিক টানাটানি। এর থেকে উত্তরণের জন্য শুরু হয় পুরনো কর-কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া; আর এর জন্য স্থানীয় ব্যাপারে ব্যাপক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক শিকলটাকে আরও আঁটসাঁট করে নেয়। ভূমি রাজস্বই তখনো এককভাবে সরকারের রোজগারের সবচেয়ে বড়ো উৎস। ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে স্থানীয় পুঁজিকে ভূমিক্রয়ে উৎসাহিত করা হয়। এই প্রবণতা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তীব্র আকার ধারণ করে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় জমির দামও দ্রুত বাড়ে এবং তা কৃষি উৎপাদনের সাধারণ দরকেও অতিক্রম করে যায়। জমিতে বিনিয়োগকে লাভজনক করতে ভূমিকর বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং জমিদাররা যথেচ্ছ হারে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করে। নগদ অর্থে খাজনা পরিশোধের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষকরা উচ্চসুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ক্রমবর্ধমান খাজনা ও সুদের দায়ে জমির মালিকানা হারিয়ে বর্গাচাষীতে পরিণত হয়। এভাবে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকে যায় কৃষকের নিয়তি। এই নতুন মাত্রার জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রজারা 'কৃষক সংগঠন' গড়ে তোলে এবং জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৮৭০-এর দশকে বাংলার পাবনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে জমিদারদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে কৃষকদের প্রথম সংগঠনভিত্তিক আন্দোলন।

১৮৮০-র দশকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কর-বসানোর বাড়বাড়ন্ত উদ্যোগে বনরাজস্বও বাড়ে। তার অর্থ, চারণভূমি আর জ্বালানির ওপর উপজাতির এবং তথাকথিত নীচজাতির খাদ্যসংগ্রাহকরা, পশুচারণকারীরা, জুমচাষীরা যুগ যুগ ধরে যে-অধিকার ভোগ করে আসছিল তা এসময় খর্ব হয়। ১৮৮০-র দশকে মাদ্রাজে এবং ১৮৯০-র দশকে আসামে অরণ্য-আইন আর পশুচারণের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে।

১৮৫৭ পরবর্তী কৃষক আন্দোলনগুলোর শক্তি ও দুর্বলতার একটি তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন বিপানচন্দ্র: '১৮৫৭-র পরবর্তী কৃষক প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো হামেশাই ছিল নিজেদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কৃষকদের সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। এটা অত্যধিক ও অসহ্য নিপীড়ন, অযৌক্তিক

ও অস্বাভাবিক বঞ্চনা ও শোষণের ফল এবং কৃষকদের বিদ্যমান, প্রতিষ্ঠিত অবস্থার পক্ষে বিপদস্বরূপ। ... এসব আন্দোলনে ভারতীয় কৃষকেরা অপরিসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মানসিকতার, উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক ক্ষমতার এবং এমন সংহতির পরিচয় দিয়েছেন যা ধর্ম ও জাতপাতের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগসুবিধাও আদায় করে নিতে পেরেছেন। ... ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক আন্দোলনগুলোর উপনিবেশবাদ সম্পর্কে-- ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সম্পর্কে -- এবং আন্দোলনগুলোর নিজেদের সামাজিক কাঠামো স্পষ্ট কানো ধারণা ছিল না।' (বিপান, ২০১৪ : ৩৭-৩৯)। তবে দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রান্তবর্তী কৃষক-জনতার এই আন্দোলনগুলো ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনতার অধিকার আদায়ের তেজোদীপ্ত মোকাবিলা, যার মধ্যে নিহিত ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগী অনুপ্রেরণা।

১.৩.৩

বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১.৩.৩.১

বাঙালি বুদ্ধিজীবীশ্রেণির গড়ে উঠার পটভূমি ও তাঁদের মানসগড়ন

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শত বছরের শাসনকাঠামোর স্থানীয় স্তম্ভ ছিল জমিদারশ্রেণি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে এই জমিদারশ্রেণির হাতেই পুঞ্জীভূত ছিল ভূমিব্যবস্থাপনার সর্বময় ক্ষমতা। জমিদারির পাশাপাশি তাঁরাই কোম্পানির বাণিজ্য সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার মানদণ্ডে তখন তাঁরাই বাঙালি জনগোষ্ঠীর অভিজাতশ্রেণি এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে তাঁদের হাতেই সমর্পিত ছিল সমাজনিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব। এই শ্রেণি থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একটি ইংরেজি-জানা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। ১৮৩৫ সালে রাজভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রতিষ্ঠা পেলে ইংরেজি-জানা এই শ্রেণিটি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হয়। বলাবাহুল্য জমিদার-বণিক-চাকরিজীবীর সমন্বয়ে এই অভিজাতশ্রেণিটি ছিল হিন্দু-অধ্যুষিত। তবে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দু হিসেবে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত জমিদারশ্রেণির অবস্থান অক্ষুণ্ন ছিল। এরপর বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীশ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছে এই বুদ্ধিজীবীশ্রেণির গড়ে উঠা এবং তাঁদের মানসবৈশিষ্ট্যের নিয়মে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বটি মুখ্যত পালন করেছে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শেখানোর আড়ালে খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও স্থানীয় মানুষদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরণ। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে, কেউ নিবেদিত হয়েছে ধর্মান্তরণ-প্রতিরোধী ধর্ম-সংস্কারে; বৃহদংশ জনগণ যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের কাজে। ঔপনিবেশিক শাসন যতো পুরনো হয়েছে, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস ততো তীব্র হয়েছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা হিন্দুত্ববাদে পর্যবসিত হয়েছে। হিন্দুত্ববাদ জন্ম দিয়েছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের; অর্থাৎ হিন্দু রাষ্ট্র, নিদেনপক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে হিন্দু-নেতৃত্বের রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন।

বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির ইংরেজি শিক্ষা দাপ্তরিক প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যখন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই বাঙালির শিক্ষিত মানসে একটি রূপান্তর ঘটে যায়; আর তা হলো ইউরোপীয় ভাবধারায় নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। ইউরোপীয় শিক্ষা বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করে আত্মবোধন; ঔপনিবেশিক শাসনে নিজেদের সীমাবদ্ধতা ও পরাধীনতা সম্পর্কে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। পরাধীনতার শৃঙ্খলই তাদের স্বাধীন আত্মবিকাশের পথে একমাত্র বাঁধা– এ উপলব্ধি তাদের মধ্যে এক গভীর গ্লানিবোধ তৈরি করে। এছাড়া চাকরিক্ষেত্রে ও প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারে তাদের প্রতি ব্রিটিশদের আচরণ ছিল বর্ণবৈষম্যমূলক, প্রভুত্বব্যঞ্জক; প্রতিনিয়ত তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো যে, তারা পরাধীন দেশের নাগরিক এবং ব্রিটিশ রাজত্বে তাদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের। মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার বীক্ষণ থেকেই তাদের

মধ্যে গড়ে ওঠে আত্ম-কর্তৃত্ব বা স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা। নবলব্ধ চেতনায় স্নাত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে কৃষক-জনতার আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং তাতে সমর্থন প্রকাশ করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীর এই রূপান্তর শুরু হয় উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে এবং সিপাহি-জনতার মহাঅভ্যুত্থানের পর তা স্পষ্ট অবয়ব লাভ করে। নীল বিদ্রোহ ও সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে। কৃষক-জনতার এই আন্দোলনগুলোর বিশেষ তাৎপর্য এই যে, এগুলো ছিল গতিশীল নেতৃত্বে পরিচালিত ও লক্ষ্যভেদী; এবং সমাপ্ত হয়েছে, সীমিত হলেও, লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদের পতাকাবাহী এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণির মধ্যে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের নানামুখী অসঙ্গতি, বিশেষত অর্থনৈতিক শোষণের সমালোচনায় তাঁরা মুখর হন। ক্রমান্বয়ে তাঁরা উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই পরিস্থিতিতে এবং ১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির আমূল রূপান্তর ঘটে। উল্লেখ্য, ইংরেজদের সংজ্ঞাপিত 'সিপাহী বিদ্রোহ' ছিল সুস্পষ্টভাবেই সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জমিদার ছাড়া আর কাউকে ইংরেজরা বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে পায়নি। তদুপরি বুদ্ধিজীবীশ্রেণি অভ্যুত্থানকালে মৌনতার ভূমিকা পালন করলেও অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে তাঁদের ভূমিকা সরব বিরোধিতার। অভ্যুত্থান দমনের পর ব্রিটিশদের প্রথম উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভারতে প্রত্যক্ষ রাজশাসন প্রতিষ্ঠা। 'এই সাম্রাজ্যটি এক সযত্নরচিত শিখরাকার স্তর-কাঠামোয় বিন্যস্ত ছিল। সেই কাঠামোর মাথায় ছিলেন বড়োলাট (ভাইসরয়) আর রাষ্ট্রসচিব। বিমূর্ত এক ধরনের পার্লামেন্টের খাপছাড়া নিয়ন্ত্রণে এঁরা কাজ করতেন।' (সুমিত, ২০১৯: ২)। পিতৃসুলভ বদান্যতার ফিনফিনে চাদরে ঢাকা এই সাম্রাজ্য ছিল এক নিখাদ স্বৈরতন্ত্র। যে কোন ধরণের আন্দোলনকে দমনের লক্ষ্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। '১৮৫৯ সালে, তারপর ১৮৭৯ সালে গঠিত দুটি কমিশন জোর দিয়ে কতগুলো বুনিয়াদি নীতির কথা বলে, যার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে সেনাবাহিনীকে। সেটা এই যে: সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ গঠিত হবে ইউরোপীয়দের নিয়ে, ১৮৫৭-র আগে যা ছিল ১৪ শতাংশ; গোলন্দাজ বাহিনীর ওপর নিখাদ ও একচ্ছত্র ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে (১৯০০ সালের আগ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের হাতে যে রাইফেল দেওয়া হতো তা ছিল নিম্নমানের); আর স্যার জন স্ট্রাচি যাকে বলেছেন 'জল-অচল খোপে ভাগ করার নীতি' সেই নীতি অনুসরণ করতে হবে, ' ... যাতে জাতিরূপ, ধর্ম, জাতপাত বা স্থানীয় সহানুভূতির সম্মিলনে মনোভাবের কোনো বিপজ্জনক একাত্মতা দানা বাঁধতে না পারে।' (দ্রষ্টব্য : সুমিত, ২০১৯ : ১০)। শুধু সেনাবাহিনী গঠনে নয়, ভারতীয় জনগণের সর্বস্তরে হিংসাত্মক বিভাজন ও বিভেদ ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই সময়ের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল শাসননীতি। এই নীতির আলোকে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শাসকগোষ্ঠী একটি মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এই মুসলমানদেরকেই তারা শতাব্দীকাল জুড়ে চলমান বৈরিতা ও বৈষম্যে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দিয়েছে; অন্যদিকে প্রাচ্যবাদী চর্চার মাধ্যমে 'নির্মম', 'বর্বর', 'উগ্রভাবে সহিংস', 'আদিমপ্রবৃত্তির', 'আধুনিকতাবিমুখ' ও 'বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ' আখ্যা দিয়ে মানসিকভাবে ভেঙেচুরে দিয়েছে। ব্রিটিশ-বিরোধিতার অংশ হিসেবেই বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী এক শতকের বেশি সময় ধরে ইংরেজি শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে। এটা মোগল আমলের ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান অভিজাতদের ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না-পারার ফলশ্রুতি। পৌনে এক শতাব্দীর প্রস্তুতির পর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজি-জ্ঞানই হয়ে ওঠে চাকরি পাওয়ার মানদণ্ড। এর ফলে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে মুসলমান জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব হারিয়ে সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। বাংলা ভূখণ্ডে মুসলমানদের অবস্থা হয় শোচনীয়। ১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী কার্যত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশূন্য এক ভূমিহীন কৃষকসমাজে পরিণত হয়।

সাম্রাজ্যিক গরজে বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নামে সরকার পরিচালনায়

নেটিভদের জড়িয়ে নেওয়ার পদক্ষেপে। মনোনয়ন, প্রতিনিধিত্ব আর নির্বাচনের প্রণালিগুলো ছিল সাম্রাজ্যের কাজে ভারতীয়দের জুতে নেওয়ার পদ্ধতি। ক্ষমতার আপাত এই বিকেন্দ্রায়ণের পদক্ষেপে ব্রিটিশ শাসকদের দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হয়––এক. ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সামলানো ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে আঁটসাঁট করা; দুই. অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের শত্রুতামূলক সম্পর্ককে প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রদান। ১৮৮৫ সালে মুলতান, লাহোর প্রভৃতি শহরে চালু হয় ধর্মীয় সম্প্রদায়-ভিত্তিক আলাদা আলাদা নির্বাচকমণ্ডলি। এরপর সারা দেশে আলাদা আলাদা নির্বাচকমণ্ডলি গড়ে তোলার ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তীব্র হয়ে ওঠে; কারণ সব নেতাই তখন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দিকে বিশেষ নজর দিতে উৎসাহিত হয়, এমনকি বাধ্য হয়। লর্ড ক্রস ১৮৯২ সালে যে-ভারতীয় পরিষদ বিধি প্রবর্তন করলেন তাতে সাম্রাজ্য পরিষদের ষোলজন সদস্যের মধ্যে দশজন বেসরকারি লোক। ঔপনিবেশিক কর্তারা স্থানীয় সংস্থাসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, বাণিজ্যসভা, জমিদার সভার সঙ্গে পরামর্শ করে এই সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা পেলো। পারিষদরা বাজেট নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্ন করার অধিকার পেলেন, কিন্তু সংশোধনী আনার ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ বা অধিকতর প্রশ্ন করার ক্ষমতা পেলেন না। এই সাংবিধানিক সংস্কার-প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল সরকারি নীতির দুটো প্রধান সূত্র: কিছুকাল পর পর নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কাছে টানার চেষ্টা এবং নানান কায়দায় বিভেদ-ও-শাসন কৌশলের প্রয়োগ করা। এই লক্ষ্যটি তেমন সফল হলো না; কারণ অল্পসময়ের মধ্যেই লালমাহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজশা মেহতা, গোখলে, এমনকি তিলকের মতো জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রাদেশিক ও সাম্রাজ্য-পরিচালন পরিষদে ঢুকে পড়েন, যাঁরা নর্দমা উন্নয়নের কাজে নিজেদের কর্মক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ না রেখে কয়েক বছরের মধ্যেই শাসন-সংস্কারের দাবি তোলেন। এ সময়েই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯০৪ সাল নাগাদ গোটা কংগ্রেস একযোগে বড়োসড়ো সাংবিধানিক সংস্কারের দাবি তোলে। কংগ্রেসের বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের এই ধৃষ্ঠতার জবাব হিসেবে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের তুমুল প্রতিরোধের মুখে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' (১৯১১) হলেও বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের বিভাজনের রাজনীতি সময় পরিক্রমায় তীব্রতর হয়।

সম্প্রদায়গত মনোভঙ্গির জন্মদানে ও প্রসারে সেই সময়কার লেখকদের রচনা অনিবার্য ছায়া ফেলেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের গরজে গড়ে তোলা মুসলিম-বিদ্বেষী প্রাচ্যবাদী ইতিহাসবিদ্যা হিন্দু শিক্ষিতমানসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ধর্মীয় চিন্তা ও আচারাদি সংস্কারে নিবেদিত মনীষী লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবচেয়ে উজ্জ্বল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সাহিত্যকর্মে হিন্দু-মুসলমানের উত্তেজনা উসকে দেওয়ার উপাদান ছিল সুপ্রচুর। বিশেষত তাঁর 'বন্দে মাতরম' গানটি ভারতীয়দের চিন্তা ও মননে এক স্থায়ী স্মৃতিসৌধ। গানটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রাজনৈতিক বিষয়সংবলিত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে ধৃত। ১৮৭০-১৯০০ পর্যন্ত সময় আসলে বিগত সত্তর বছরের ধর্মোন্মাদনার পূর্ণ বিকাশের সময়। ভারতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাজনীতির চেয়েও পুরনো; ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল নয়, তা ছিল ঔপনিবেশিক আদর্শবাহিত শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার বিচ্ছুরণ। যে অনমনীয় ও জেদি অধ্যবসায়সহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা 'পৃথক রাজনীতি' নিয়ে এগিয়ে গেছে, তার চরিত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে উনিশ শতকের রাজনীতি-পূর্বযুগের বুদ্ধিজীবীরা।

১.৩.৩.১

মধ্যবিত্তের বিকাশ ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কোম্পানি সরকার ভারতে সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিতের উপর স্থাপন করতে ও বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইংরেজি ভাষানির্ভর একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় পেরিয়ে ১৯৩৭ সালে এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজি ভাষা রাজভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত

হয়। এরপর ভারতে আমলাতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে দেশজুড়ে একটি কেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত হয় উডের ডেসপাচ। বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে। কোম্পানির ছকে বাঁধা, মতলবে গড়া এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইংরেজিবিদ্যা কেরানির চাকরির ছাড়পত্র পাওয়ার দৌড়ে সীমাবদ্ধ; বৃত্তিতে পরাশ্রয়ী ও মানসিকতায় ধর্মাচ্ছন্ন। তবে কেউ কেউ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন এবং যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল সর্বমানবিক জীবনদর্শনে উদ্দীপ্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।[১০] কিন্তু কতিপয় বুদ্ধিজীবীর প্রগতিবাদী মুক্তবুদ্ধির চর্চা অচিরেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে। এসময় ইংরেজি শিক্ষিত ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীও বেকারত্বে দিশেহারা; যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বর্ণবৈষম্যের নিয়মে চাকরিক্ষেত্রে তাঁরা অযোগ্য। সংখ্যানুপাতে অন্যান্য পেশায় যুক্ত হওয়ার সুযোগও সীমিত। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ কর্মহীনতায় চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থায় নিপতিত।[১১] সকল ক্ষেত্রেই উঠতি বণিক ও শিক্ষিত ভারতীয়রা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার যন্ত্রণা পদে পদে অনুভব করছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধি করেন যে, পরাধীনতাই তাঁদের আত্মবিকাশের প্রধানতম বাঁধা; স্বাধীন আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতার বিকল্প নেই। জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব থেকে।

বাংলায় জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছিল দুটি পর্যায়ে––প্রথম পর্যায়ে (১৮৬০-৭০) স্থানীয় জমিদার ও বণিকরা গড়ে তুলেছিলেন সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন; দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৮০) সেটি রূপ নিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনে।

১.৩.৩.১.১

প্রথম পর্যায়:

ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রথম সংগঠন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১)। এ সংগঠন গড়ে উঠেছিল বণিক-মুৎসুদ্দি-জমিদার-বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। এ সংগঠনের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না; নিজেদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আশু ফললাভের উদ্দেশ্যের মধ্যেই এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় মুসলমান অভিজাতরাও নিজেদের স্বার্থরক্ষার টানে 'মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে (১৮৫৬) আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় জমিদার-উচ্চবিত্তদের স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠানে; ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি এর মধ্যে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে পায়নি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের মধ্যে; আর অনিবার্যকারণেই বাংলায় ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে। নিজেদের চাহিদা অনুসারে জাতীয়তাবাদীরা গড়ে তোলেন র‍্যাডিকাল সংগঠন *ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন* (১৮৭৬)। তবে সংগঠন গড়ে উঠার আগেই ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তাঁরা জাতীয় আন্দোলন গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন; এবং এ আন্দোলনে উদারনৈতিক গণতন্ত্রপন্থিদের প্রভাব ছিল একচ্ছত্র। জাতীয় আন্দোলনের মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল একটা বামপন্থি র‍্যাডিকাল অংশ। তাঁরা ছিলেন ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, ছোট ছোট কারখানার মালিক, অফিসের কেরানি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল-মুহুরি ইত্যাদি স্বল্প আয়ের মানুষ। জাতীয় আন্দোলনে তাঁরাও ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জনগণের আন্দোলনকে তাঁরা নিজেদের আন্দোলন বলেই ভাবতেন। হিন্দু উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় আন্দোলনগুলো ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের সমালোচনা ও দাবি-দাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমিত, অন্তত তা সরাসরি উপনিবেশ-বিরোধিতা ছিল না; কিন্তু আপাতনিরীহ আন্দোলনগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা ভবিষ্যতের অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছিল।

'ঔপনিবেশিকতন্ত্রের ভাগীদার' ভূম্যধিকারী ও মূলধন বিনিয়োগকারী বাঙালি/ভারতীয় ধনিক শ্রেণি যুগপৎ ছিলেন ধর্মীয় নেতা বা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। উনিশ শতকের ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষকালে পশ্চিমি 'আধুনিকতা'র সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁদের আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদার দ্যোতক। প্রাচীন শৌর্য-বীর্য, ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-চিকিৎসা-প্রযুক্তিবিদ্যা ও ধ্রুপদী জ্ঞানের স্মৃতি জাগিয়ে বাঙালি হিন্দুকে স্বাজাত্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্বে উদ্বুদ্ধ করা ছিল ঐতিহ্য উদ্ভাবন ও পুনরুজ্জীবনের মূলমন্ত্র। মুসলমান অভিজাতরাও মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রতিষ্ঠা করেন নানা ধরনের সংঘ––মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি (১৮৬৩), ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা (১৮৬৪), ইন্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), সেন্ট্রাল মোহামেডান এসাসিয়েশন (১৮৭৬)। এসব সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করা এবং সম্প্রদায়গত বিভেদের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।

১.৩.৩.১.২

দ্বিতীয় পর্যায়:

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। রাজনীতিতে আগ্রহী আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগের পাশাপাশি এতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ আই.সি.এস. অফিসার এ. ও. হিউম। প্রতিষ্ঠালগ্নে এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭২ জন। সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন বঙ্গসন্তান উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬)। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমাসীন ভারতীয় অভিজাতশ্রেণির চারিত্রিক দ্বৈততা ও দোদুল্যমানতা প্রতিফলিত হয়েছে কংগ্রেসের পুরো ঔপনিবেশিককালের কর্মকাণ্ডে––একদিকে তাঁরা গণ-আন্দোলনের 'বিপদ'-এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা করেছে; অপরদিকে জাতীয় আন্দোলনে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল গণ-আন্দোলনকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্তপাত এড়িয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীন 'ভারত' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল কংগ্রেসের উচ্চাশী নেতৃত্বের অভিপ্রায়; প্রবল কর্তৃত্ববাদী ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোয় কোনো পরিবর্তন তাঁদের কাম্য ছিল না।

ব্রিটিশপন্থি ব্রাহ্মণ অভিজাত বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন উনিশ শতকের কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যমণি। শ্রেণিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তাঁরা ছিলেন দোটানায় ভাসমান। 'একদিকে যেমন ইংরেজ-আনীত 'আধুনিকতা', 'দেশীয় উন্নতি', 'প্রগতি' প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতেন শিক্ষিতশ্রেণীর মানুষেরা, তেমনি অন্যদিকে ভয় ছিল যে এই সকল আইডিয়ার বল্গাহীন চর্চায় 'ভারতীয়ত্ব'ই না লোপ পায়। আসলে ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় 'ভারতীয়ত্ব'ই ছিল আত্মসম্মানের জায়গা।'[১২]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশে দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণির শরিকানা এক নতুন মাত্রা দান করে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনার মূল বয়ানটা ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য ও সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য। ভারতের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা, অবশিল্পায়নের মতো মারাত্মক ক্ষতিকারক বিষয়গুলোর জন্য ঔপনিবেশিক পলিসিকে দায়ী করে উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামকে চাঙ্গা করা হয়। ঔপনিবেশিক বৈষম্যনীতির কারণেই চাকরি-বাকরি ও নানাবিধ পেশায় ভারতীয়রা চরমভাবে বঞ্চিত। ভারত যদি স্বাধীন রাষ্ট্র হতো তাহলে এই অবনতির প্রক্রিয়া ঠেকানো যেত। এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ঔপনিবেশিক পলিসি পরিবর্তনের জোরালো আওয়াজ তুলে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তীতে তা বাঁক নেয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শোষণ-কাঠামোর এই চিত্রটা কখনোই নিরেট অনড় ছিল না, এই কাঠামোয় জুতসইভাবে জুড়ে বসেছিল একশ্রেণির ভারতীয় এবং বাগিয়ে নিয়েছিল প্রচুর সুযোগ-সুবিধা। পশ্চিম ভারতকেন্দ্রিক একটি প্রভাবশালী শিল্প-পুঁজিপতি শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। উনিশ শতকে ভারতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি তাদের হাটবাজারি মহলেই সেঁধিয়ে ছিল; ইউরোপীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ করা এবং তাদের আমদানি-করা মাল সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া ছিল এই মুৎসুদ্দিদের কাজ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তারা আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পজগতে ঢুকতে শুরু করে এবং বেশ বড় মাপের সাফল্য অর্জন

করে। এ-সাফল্যের পেছনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি ভূমিকা রেখেছে; এবং এ-কারণেই ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পপতিদের অবস্থান ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। ভারতে জাতীয় জাগরণ ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির পৌরহিত্যে; উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিকালীন প্রায় দুই দশকের তুঙ্গস্পর্শী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ছিল বাংলা। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার সাম্রাজ্যবাদী গরজে কার্জন বঙ্গবিভক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উনিশ শতকীয় উপনিবেশায়নের ধরনের কারণেই বাঙালি পুঁজি শিল্পোদ্যোগে নিয়োজিত না হয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-কাঠামোতে বন্দি হয়; বাঙালি অভিজাত শিক্ষিতশ্রেণি চাকরি-বাকরি ও বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণিতে রূপান্তরিত। নগদ অর্থের ঘাটতি বিশ শতকের সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাকে পশ্চাদপদ অবস্থানে ঠেলে দেয়। বিশ শতকের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উজ্জীবনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য-ও-শিল্পপুঁজির উপস্থিতি; বিশেষত চল্লিশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত দশকে এসে রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুখী করার রসদ ও প্রণোদনা জুগিয়েছে দুই সম্প্রদায়ের পুঁজিপতিরা। অখণ্ড ভারতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি সর্বভারতীয় আর্থ-কাঠামোয় হিন্দু আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা হিন্দু পুঁজিপতিদের ভাবনায় খেলা করতো। তুলনামূলক কম প্রতিপত্তিশালী মুসলিম পুঁজিপতিরা হিন্দু-পুঁজির আধিপত্যে থাকাটাকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনা করেছে; তারা এমন একটি স্বাধীন দেশের কল্পনা করেছে যেখানে তাদের পুঁজি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই অবাধ বিকাশের সুযোগ পাবে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বৈষম্যনীতির পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতাই তাদেরকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক-কাঠামো গড়নে প্ররোচিত করে। এ-মানসিকতায় ইউরোপীয় বুর্জোয়ার সর্বজয়ী আত্মপ্রত্যয় ছিল না, ছিল কেবল বিভক্তির আশ্রয়ে নিজের নিরাপদক্ষেত্র তৈরি করার পলায়নপর চাতুর্য।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও প্রথম যুগের নেতৃত্বে বাঙালি হিন্দু-উচ্চবর্ণের অবস্থান ছিল পুরোভাগে; কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালি মুসলমানের অবস্থান প্রথমাবধি প্রান্তিক। কারণ উনিশ শতকের পুরো পরিসরে বাংলার সমাজকাঠামোয় হিন্দু-উচ্চবর্ণের আধিপত্য যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন মুসলমান সমাজ কার্যত মধ্যশ্রেণিহীন; দারিদ্র্যে জর্জরিত ও অশিক্ষাদীর্ণ; এবং ফলত নেতৃত্বশূন্য। তবে উত্তর ভারতের দিল্লিকেন্দ্রিক মোগল শাসনঘনিষ্ঠ মুসলমানদের একাংশ নিজেদের প্রভাববলয় নিয়ে টিকে ছিল। সেখানকার উচ্চবর্গ গঠিত ছিল মুসলিম আশরাফ ভদ্রশ্রেণির দ্বারা, যাদের উর্দু সংস্কৃতি ছিল সমৃদ্ধ; শিক্ষাদীক্ষা, প্রশাসন ও বিজ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল উর্দু। ১৮৫৭-র উত্তরকাণ্ডে ব্রিটিশরা সাম্রাজ্যিক গরজেই সেখানে হিন্দু উচ্চবর্গের পাশাপাশি মুসলমান অভিজাতশ্রেণির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক তৈরি করে। একই সঙ্গে হিন্দি-উর্দু ভাষা-বিতর্ক উসকে দিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে চাঙ্গা করে তোলে। হিন্দি-হিন্দু ঊর্ধ্বচাপটাকে জনমোহিনী রূপে উপস্থাপন করতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার ও অভিব্যক্তির সঙ্গে সংলগ্ন করে এবং ফারসি শব্দগুলোকে ধুয়েমুছে পরিচ্ছন্ন করে হিন্দিকে 'শুদ্ধ হিন্দি'র রূপ দান করা হয়। স্পষ্টতই দুই ভাষার পারস্পরিক সহাবস্থান সংঘাতে রূপ নেয় এবং এর সঙ্গে মিশে যায় সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য। চাকরির প্রশ্ন জড়িত থাকায় মুসলমান শিক্ষিত সমাজ হিন্দি ভাষার এই সংস্কৃতমুখী প্রসারে বিক্ষুব্ধ হয় এবং ফারসি-লিপির উর্দু ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে মান্যতা দেয়। ফলে বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমানদের রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে উর্দু ভাষা। এ পর্যায়ে উর্দুভাষী অভিজাত মুসলমানদের নেতৃত্বে হিন্দু-প্রাধান্যের কংগ্রেসের রাজনীতির বাইরে আলাদা রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬)। আত্মপরিচিতির ব্যাপারে বাংলাভাষী দরিদ্র মুসলমানরা উত্তর ভারতের আশরাফ মুসলমানদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে এবং উর্দুভাষী অভিজাত মুসলমান নেতৃত্বকে অসংকোচে বরণ করে নেয়। এভাবে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের আশরাফদের আধিপত্য অবিসংবাদিত হয়ে ওঠে এবং বাংলার মুসলিম সমাজ পরিণত হয় বহিরাগত মুসলিম-অভিজাতদের স্বার্থান্ধ রাজনীতির বিমূঢ় ক্রীড়নকে।

একই সময়ে প্রবল সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আবির্ভাব ও তার গৃহীত নীতিসমূহ আন্দোলনের পরিস্থিতিকে তুঙ্গস্পর্শী করে তোলে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী-প্রাধান্যের কংগ্রেসী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে একদিকে

তিনি দমন-পীড়নের চিরাচরিত কৌশল অবলম্বন করেন; পাশাপাশি বিভক্ত-বঙ্গের পূর্ববঙ্গ ও আসামকে একত্র করে মুসলিম-প্রাধান্যপুষ্ট একটি আলাদা প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান বিভাজনভিত্তিক এই বঙ্গবিভক্তির কেন্দ্রীয় উপজীব্য ছিল পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে হিন্দু উচ্চবর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে সামর্থ্যবান করে তোলা এবং স্বাধীনতা-প্রত্যাশী বাঙালি বুদ্ধিজীবীশ্রেণির অর্থনৈতিক শেকড় উপড়ে ফেলে তাদেরকে নতজানু হতে বাধ্য করা। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ উল্টো; দীর্ঘদিনের কৃপাধন্য বর্ণহিন্দুরা ব্রিটিশবিরোধী ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলে। কারণ কলকাতাকেন্দ্রিক এই অভিজাতগোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যের ভিত্তিভূমি ছিল পূর্ববঙ্গের জমিদারি; বঙ্গবিভক্তি তাদের কায়েমি স্বার্থের জন্য ছিল এক বিপর্যয়কারী অশনিবার্তা। এছাড়া কলকাতাবাসী প্রচুর সংখ্যক চাকরিজীবী ও পেশাজীবীর পৈতৃক ভিটে ছিল পূর্ববঙ্গে এবং সেখানকার সম্পত্তি ছিল তাদের আয়ের অন্যতম উৎস; কলকাতা ত্যাগ করে জন্মউৎসে প্রত্যাবর্তন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কার্যত বঙ্গবিভক্তি পূর্ববঙ্গের এই শ্রেণির মানুষগুলোকে উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝুঁকিতে ফেলে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে ঘিরে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিবিদেরা বিশ শতকের প্রারম্ভেই উদারপন্থি ও চরমপন্থি—এই দুইভাগে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের উদারপন্থি নেতৃত্ব ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নিতে তৎপর ছিল। কিন্তু চরমপন্থিরা বঙ্গভঙ্গবিরোধী গণআন্দোলনকে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অতিক্রম করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। অহিংস বিক্ষোভের তুলনায় সন্ত্রাসবাদীদের বুলেট ও বোমার জঙ্গি আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি ও পক্ষপাত ছিল সুস্পষ্ট। বিক্ষোভ দমনে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর জুলুম বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়লো যুবশক্তির সংকল্পের দৃঢ়তা; ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর আত্মঘাতী হামলা পরিচালনায় হয়ে ওঠে বেপরোয়া। পূর্ববঙ্গের অনেক প্রবীণ মুসলমান বঙ্গভঙ্গকে মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের শতবর্ষব্যাপী পরিচালিত অন্যায়-জুলুমের প্রায়শ্চিত্ত ও নিজেদের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করলেন। তদ্‌সত্ত্বেও স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে পরিচালিত আন্দোলন পূর্ববঙ্গের তরুণ মুসলমানদের মধ্যে আশানুরূপ আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু অভিজাতশ্রেণির আন্দোলনের তীব্রতায় ঔপনিবেশিক প্রশাসন ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের প্রবর্তনা বিশ শতকীয় রাজনীতিতে এক প্রবল উত্তেজনাময় অধ্যায়। এ শতকের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই অনুশীলন সমিতি (১৯০৩) ও 'যুগান্তর' (১৯০৬) নামে দুটি তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী দলের আবির্ভাব ঘটে। বিদেশি প্রভুত্বের কবল থেকে মাতৃভূমি উদ্ধারের কাজে এ সন্ত্রাসবাদীরা ছিলেন আত্মোৎসর্গীকৃত; এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম ছাড়া ব্রিটিশদের উৎখাত করা সম্ভব নয়—এটাই ছিল তাঁদের দৃঢ়মূল বিশ্বাস। ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রধান ঘাঁটি। তবে এই আন্দোলনের চরিত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী হলেও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা ছিল তীব্র নেতিবাচক। সন্ত্রাসবাদিতায় দীক্ষিত মুসলিম কর্মীরা ক্রমে ক্রমে সক্রিয় বিপ্লববাদ ত্যাগ করে। শপথ, প্রতিহিংসা আর সন্ত্রাস—এই তিন ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বিপ্লববাদের আদর্শ। সভ্যদের শর্তহীন আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে পরিচালিত হতো গুপ্তহত্যা ও বিভীষিকা তৈরির কাজ; আর বিশ্বাসঘাতকতার সুস্পষ্ট শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। বর্ণিত দুর্বলতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সশস্ত্র উপায়ে উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদীদের মহান আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সংঘটিত বঙ্গবিভক্তি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিরোধ আন্দোলনে রহিত হলেও এর ফলাফল হলো একটা স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিভাজন। বঙ্গবিভাজন রদ ছিল স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বের এক চরম ব্যর্থতা; এটিকে তিনি বিবেচনা করেছেন ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে। নবাব আলী চৌধুরী, স্যার এ. কে. গজনভী, স্যার আব্দুর রহিম প্রমুখ মুসলিম নেতারা বাংলার অখণ্ড রূপে আস্থাশীল ছিলেন না, প্রদেশের মুসলমানদের বা মুসলিম-বাংলার নায়কত্বই ছিল তাঁদের কাম্য। ফজলুল হক ছিলেন বাংলার প্রথম নেতা, যিনি নেতৃত্ব স্থাপনে ব্রিটিশ রাজশক্তির অনুগ্রহের চেয়ে মুসলিম জনসাধারণের

ওপর বেশি নির্ভর করতেন। বঙ্গবিভাজনের অভিঘাতে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষার হার বাড়ে এবং ঢাকাকেন্দ্রিক একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। হিন্দু জমিদারদের অধীন জোতদার, তালুকদারদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল এই মুসলিম উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই শ্রেণিটি হিন্দু জমিদারদের কোনো না কোনোরূপ প্রজা; তাই এঁদের গড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি পরিচিতি পেল প্রজা পার্টি নামে। এই পার্টি মুসলিম লীগের স্পর্শ এড়িয়ে কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গেই ঐকমত্য পোষণ করে। তাঁদের নেতৃত্বে সূচিত হয় একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচিভিত্তিক অনাধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রজা আন্দোলন প্রধানত মর্যাদালাভের লড়াই হওয়ায় এর নেতারা চাষী, তাঁতি, মিস্ত্রী, মজদুর প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে তৎপর হয়, ঠিক যেভাবে বর্ণ-হিন্দুরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতো মুসলমান ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের তুলনায়।

বঙ্গবিভাজনের গোড়ার দিকে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে আলিগড়কেন্দ্রিক মুসলিম নেতাদের প্রণোদনায় স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় ভারতীয় মুসলমান নেতাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সম্মেলনেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। 'মুসলিম লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভাব জোরালো করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল রাজ্য সরকারে চাকরিতে হিন্দু আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিপরীতে মুসলমানদের দাবী পেশ করা এবং এইভাবে মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষিত করা।' (মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ২০১৩: ১২৬)।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রম বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকলেও সংগ্রামশীল রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল স্থগিত; তবে রাজনীতির সুকৌশল প্রয়োগ ছিল অব্যাহত। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়, যার মূল উপজীব্য ছিল স্বতন্ত্র নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিভিন্ন আইনসভার সম্প্রদায় অনুসারে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচন ও সংখ্যা নির্ধারণ প্রণালি। এই প্যাক্টের শর্তানুসারে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে বেশি প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ লাভ করে; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার মুসলমানেরা: শতকরা ৫৪ জনের বিপরীতে তারা প্রতিনিধিত্ব পেল শতকরা ৪০ জন। এই প্যাক্ট স্বাক্ষরে বাঙালি মুসলমান নেতার অনুপস্থিতিই ছিল এর মূল কারণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারত নামের দুটো রাষ্ট্র সৃষ্টির ধারণার অবতারণা ঘটে।[১৩] এ সময় পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ও কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত ছিল হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিজাতশ্রেণির মধ্যে এবং সেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছিল তাদের শ্রেণিস্বার্থেরই প্রতিফলন; সাধারণ জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছিল নিদারুণ উদাসীনতা।

১.৩.৩.১.৩

নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতি ও বিভাজনের বিস্তার

উনিশ শতকে সূচিত উপনিবেশবাদবিরোধী ভারতীয় রাজনীতি ছিল ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী ঘরানার[১৪] এবং 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শিকভাবে সত্যিকার অর্থে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ নয়, তেমনি তার দার্শনিক ভিত্তিও সুদৃঢ় নয়। এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত পোষণ করে যে, ভারতীয় সমাজের গোড়াতে রয়েছে ধর্মীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত সম্প্রদায়।' (জয়া চ্যাটার্জী, ২০১৮ : *বাঙলা ভাগ হল*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা : ১)। এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে হিন্দু অভিজাতদের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। এই জাতীয়তাবাদীরা যে ভারতীয় জাতির কথা বলেছেন তাতে মুসলমানরা ছিল গভীরভাবে ব্রাত্য। মহাত্মা গান্ধী এই ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদকে তুমুলভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন[১৫]; তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান হবে, হিন্দুরা হবে প্রকৃত হিন্দু। গান্ধীজীর জীবন ছিল প্রাচীনকালের সন্ন্যাসীর মতো; তিনি ভারতে রাম-রাজত্বের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সাধারণ হিন্দুরা তাঁর আদর্শে আগ্রহী হলো, তাঁকে দেখলো অবতার হিসেবে; কিন্তু মুসলমানরা তাঁর প্রতি বিরূপ হলো।[১৬] এসময় ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবে

এলিট জাতীয়তাবাদীদের আধিপত্য খর্ব হয়; বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিদের ইংরেজ অনুকারী (mimic Anglicism) রাজনীতির অবসান ঘটে। বিশ শতকের বিশের দশকে নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে কলকাতার কর্তৃত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে, প্রান্তিক শহরগুলো থেকে উত্থান ঘটে নতুন নেতৃত্বের। পূর্ববঙ্গের জনপরিসরে, বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৯২১) আলিগড়-কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ভাববিশ্ব থেকে বাঙালি মুসলিম মননকে একটি মুক্তমন প্রগতিশীলতার দিকে ধাবিত করে। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেমন কলকাতাকেন্দ্রিক অভিজাতগোষ্ঠীর প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছে, তেমনি প্রত্যাখ্যান করেছে সাম্রাজ্যবাদী কায়েমি স্বার্থের ক্রীড়নক আলীগড় আন্দোলনের নেতৃত্বকেও। এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিল তুলনামূলক প্রগতিশীল––আলিগড় আন্দোলনের পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার বিপরীতে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান ছিল যৌথনির্বাচনব্যবস্থার পক্ষে। ১৯২০-৩০-র দশকে 'মুসলমানি বাংলা' বিতর্ক বাংলার রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 'মুসলমানি বাংলা'র প্রতি সংস্কৃতপ্রেমী লেখকদের তীর্যক কটাক্ষবাণ মুসলমানদের কাছে ছিল পরিচয়-গর্বের বিষয়, যা তাদেরকে অধিকতর স্বাতন্ত্র্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় বিনির্মাণের এই সাংস্কৃতিক প্রয়াস তখনো সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়ানোর কাজে প্ররোচিত হয়নি।

ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে মহাত্মা গান্ধীর আগমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে; এই আগমনের ভিত্তি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবাদপ্রতিম নেতৃত্ব। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল অহিংস গণ-আন্দোলন। কংগ্রেসের রাজনীতিতে এসেই তিনি গ্রামের প্রান্তিক মানুষদেরকেই রাজনীতির কেন্দ্রে টেনে আনলেন; কারণ গণমানুষের শরিকানা ছাড়া তাঁর গণআন্দোলন সফল করা সম্ভব ছিল না। প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন––স্বাধীনতার প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা তৈরির লক্ষ্যে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং বিলেতি বস্ত্র ও সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জন, তাঁতের কাপড়ের ব্যবহার এসবকে উৎসাহিত করলেন। মুসলমানদের সমর্থনলাভের প্রত্যাশায় খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করলেন, যদিও এ আন্দোলন ছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্করহিত ভারতীয় মুসলমানদের আবেগীয় তাড়নামাত্র। এ সময় গান্ধীবাদের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উত্থান ঘটে। এর মধ্যে ১৯২৩–২৫-এ প্রতিষ্ঠিত চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ দল, ১৯২৩-২৫ এবং ১৯৩০-৩৫ এই পর্বের বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৯৩০ থেকে এম.এন. রায় ও মুজফ্‌ফর আহমদের অনুগামী বামপন্থি দল উল্লেখযোগ্য। এ সময় কংগ্রেসের মূখ্য ভূমিকা ছিল নানাবিধ স্বার্থের বিরোধে মধ্যস্থতাকারীর। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেসকে এমন একটি দল হিসেবে দেখানো হয়েছিল (represented) যেখানে শ্রমিক ও মালিক, শ্রম এবং পুঁজি, উভয় পক্ষই অংশীদার। কংগ্রেসের এই প্রয়াসকে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ বলেছেন, 'খাদক ও শোষিতকে একত্র করার খিঁচুড়ি ব্যবস্থা'। মূলত ১৯২০-র দশকে কংগ্রেস সম্পর্কে এই ধারণার প্রচার করা হয়েছিল রুশবিপ্লবের সাফল্যে উদ্দীপ্ত উদীয়মান বামপন্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ১৯২৩-২৫ সময়-পরিসরে আইনসভায় স্বরাজ দলের কার্যকর উপস্থিতি ১৯১৯-র দ্বৈতশাসনতন্ত্রের অসারতা প্রমাণে ও আইনসভাকে ভিতর থেকে অচল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়। ভারতীয় রাজনীতির এপর্বে এসে নানাবিধ মেরুকরণ, বিশেষত সাম্প্রদায়িকতা, যখন দানা বেঁধে উঠছিল তখন বাঙালি চিন্তকগোষ্ঠীর মনন একটি গভীর প্রশ্নে আলোড়িত হয়েছিল–– ভারতীয় সভ্যতা কোন্ সূত্রে একত্রে বাঁধা? বহুত্বের সংহতিতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আস্থা স্থাপন করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশও গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের' আদর্শে। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতিসত্তার অবয়ব। তিনি ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নিরসনে তৎপর হন এবং সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মধ্যে নিহিত সমঝোতার ক্ষেত্রগুলোকে ব্যবহার করে স্থায়ী সমাধান সন্ধান করেন। এ লক্ষ্যে প্রণীত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (জুন, ১৯২৪) ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আনুপাতিক হারে সরকারি চাকরি ও আইনসভার সদস্যপদ

বণ্টনের স্বীকৃতি ছিল এই পরিকল্পনায়।[১৭] প্রজাস্বত্ব সংস্কারে কংগ্রেস-স্বরাজি নেতাদের স্বার্থান্ধ বিরোধিতায় মুসলিম জোতদার ও ছোটোখাটো জমিদারেরা প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয় এবং কংগ্রেস ত্যাগ করে 'কৃষক-প্রজা পার্টি' নামের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। শিরোনামে 'কৃষক-প্রজা পার্টি' হলেও এ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণির সমর্থনপুষ্ট ছোট শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ধনী কৃষকদের স্বার্থকেই পুষ্ট করেছেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ড প্রজাদের নিম্নতর শ্রেণিকে খুব অল্পই সাহায্য করেছে।

কংগ্রেসের অবক্ষয়ী রাজনীতির বিপরীতে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তিরিশের দশকের মাঝামাঝি অবধি বাঙালি মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী আবেগের তীব্র বিস্ফোরণ; কিন্তু বিপ্লবীরা ছিলেন হিন্দু 'ভদ্রলোক' শ্রেণির এবং মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। বিপ্লবী রণনীতির কারণেই সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বজনীন অংশগ্রহণের অবকাশ ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সেন্যবাহিনী ও প্রশাসন প্রবল দমন-পীড়ন ও বিচারিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট থেকেছেন। জনসংযোগ যেখানে কংগ্রেসের রাজনীতিকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে সেখানে জনবিচ্ছিন্ন গুপ্ত-যুদ্ধে কিংবদন্তিতুল্য আত্মত্যাগের মহিমা সত্ত্বেও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এসময় বাংলায় কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদীরা দল হিসেবে যতটা, তার চেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিলেন একটি মতাদর্শের (ideology) ধারক হিসেবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রশাসন পুঁজিবাদবিরোধী আর্থ-সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে বামপন্থাকে নিষিদ্ধ ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমা পুঁজিবাদের দেশীয় শরিক হিসেবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বামপন্থি রাজনীতির নিশ্চিহ্নকরণে ঔপনিবেশিক শাসকদের তৎপরতাকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। বাংলায় বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই প্রতিনিধি; এবং তাঁরা নিজেদের শ্রেণিচেতনার বাইরে যেতে পারেননি। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে এই বিষয়টিকেই সামনে এনেছেন : 'সমাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা কোনোরূপ সংগ্রাম বা বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চায়। বিপ্লবাত্মক ও ভঙ্গুর উপাদান বাদ দিয়ে সমাজের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটাই হচ্ছে তাদের কাম্য।' (কামরুদ্দিন, ২০০২: ৩১-৩২)। এই চারিত্র্যের কারণেই মানবেন্দ্রনাথ রায়–– একমাত্র বাঙালি যিনি 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন ও তত্ত্ববাদী কমিউনিস্ট হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন––আর্য ব্রাহ্মণত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং 'নয়া মানবতা'[১৮] নামে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। এতদসত্ত্বেও ১৯৪০ দশক নাগাদ বামপন্থিরা বাংলার রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে বিকাশ লাভ করে, কিন্তু ১৯৪১-এ হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টির 'গণযুদ্ধের তত্ত্ব' পরিস্থিতিকে দ্রুত বদলে দেয়। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অক্ষশক্তির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ নয়, বরং কমিউনিস্ট আন্দোলনবিরোধী যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করে এবং ব্রিটিশ-মিত্র হিসেবে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।[১৯] ফলত ব্রিটিশ ভারতের শেষ দশকে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারত উপমহাদেশীয় রাজনীতির কেন্দ্র থেকেই হারিয়ে যায় বলে মনে করা হয়।[২০]

বিভেদ ও বিভক্তির রাজনীতি : ১৯৩৬-১৯৪৭ পর্ব

'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ'-এর ভিত্তিতে 'ভারত শাসন আইন' (১৯৩৫) প্রণীত হয়েছিল স্বাধীনতার দাবিতে ফুঁসে ওঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বাগে আনার প্রয়োজনে। এই শাসনতন্ত্রের গঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের, যার অধীনে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা হবে দেশীয় রাজ্যসমূহের সংযোজনের ওপর নির্ভরশীল; তবে যতদিন তা না হবে ততদিন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাই কার্যকর থাকবে। এই শাসনতন্ত্রের নির্বাচনী ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্য নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভাজনই ছিল মূলনীতি; যা ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায়কে স্থায়ী ও শত্রুতামূলক বিভাজনে প্ররোচিত করেছে। নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে নির্বাচনী রাজনীতি ক্ষমতা-প্রত্যাশী অভিজাতদের সামনে স্বপ্নপূরণের দ্বার খুলে দেয়। তবে নির্বাচনের ময়দানে উপস্থিত ছিল বহুপাক্ষিক স্বার্থের

বিচিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী; এই বহুপক্ষ আবার মোটাদাগে দুই পক্ষে বিভক্ত––প্রথম পক্ষ হিন্দু অভিজাতশ্রেণি, যারা ক্ষমতার একচ্ছত্র দাবিদার; আর দ্বিতীয় পক্ষ মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি, যারা প্রথম পক্ষের সঙ্গে ক্ষমতার সমান-অংশীদারত্ব প্রত্যাশী। প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জনগোষ্ঠীর আন্তঃসম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বের পাশপাশি আন্তঃগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বও চরম রূপ ধারণ করে। দুই সম্প্রদায়ের উচ্চবর্গের নেতৃবৃন্দই ভোটের রাজনীতির মেরুকরণে সাম্প্রদায়িক ঐক্যবৃদ্ধিতে যত্নবান হয়। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার প্রতিযোগিতায় অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র সাধারণ মানুষকে বিচিত্র প্রতিশ্রুতির বাগ্মী-কৌশলে মোহগ্রস্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলে। ধর্ম, নগদ অর্থ, মিথ্যাচার, প্রতারণা হয়ে ওঠে নির্বাচন-জয়ের মোক্ষম অস্ত্র। এই ক্ষমতা-প্রত্যাশী রাজনীতিকরা 'সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মূল্যবোধই গ্রহণ করেছিলেন। এদের কাছে রাজনীতি ছিল এমন এক খেলা যেখানে বিরোধী পক্ষের ক্ষতির ফায়দা লুঠতে হয়।' (আশিস নন্দী, ২০১৬: ৭৯)।

'ভারত শাসন আইন' (১৯৩৫)-এর অধীনে ব্রিটিশ শাসকদের অভিপ্রায় অনুসারে ভারতবর্ষের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থার দিকে ধাবিত হয়; কংগ্রেস ক্রমান্বয়ে জমিদার-মহাজন ও পুঁজিপতিদের শ্রেণিস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তার সর্বজনীন চারিত্র্য হারায়। কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীল ও অকংগ্রেসি ধনীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে; সৎ ও নিবেদিত-প্রাণ নেতারা তখন কংগ্রেসে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। কলহ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বহিষ্কারের অন্ধগলিতে কংগ্রেসের রাজনীতি তখন দিশেহারা। এ সময় কংগ্রেস পরস্পরবিরোধী দুটি ধারায় বিভক্ত: একপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকদের সমর্থনপুষ্ট রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা; আর দ্বিতীয়পক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল গোষ্ঠী। সুভাষ বসুর উৎসাহ ছিল সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায়; তিনি চেয়েছিলেন যুবসমাজকে কংগ্রেসে টেনে এনে কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের একটি ঘাঁটি তৈরি করা। সুভাষ বসু অনুধাবন করেছিলেন যে, গান্ধীর অহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সহিংস শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়; আর যদি শান্তিপূর্ণ পন্থায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়ও, তা হবে ব্রিটিশদের শর্তে, যা ফলপ্রসূ স্বাধীনতা হবে না। তাই সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের বিতাড়নের পাশাপাশি পুরো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটিকেই ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর গান্ধীবাদবিরোধী এই মতাদর্শ তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছার বিপরীতেই সুভাষ বসু পর পর দুবার (১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে) সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধীর বিশ্বস্ত ও অনুগত কংগ্রেসিরা–– বিশেষত নেহরু, প্যাটেল ও তাঁদের অনুসারীরা––সুভাষ বসুর দলানুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং কংগ্রেসের রাজনীতিকে বিশৃঙ্খল করার দায়ে অভিযুক্ত করে বহিষ্কার করেন। উল্লেখ্য, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষ বসুর দ্বন্দ্ব কেবল মতাদর্শিক ছিল না, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের নেতৃত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইও ছিল। সুভাষ বসুর বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাঙালিশূন্য হয়ে পড়ে এবং উত্তর ভারতকেন্দ্রিক গান্ধীপন্থিদের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় সুভাষ বসু প্রতিষ্ঠা করেন নতুন রাজনৈতিক দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক'। গান্ধীপন্থিদের এই আপাত বিজয়ের অন্তরালে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল হিসেবে মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তারপরও গান্ধী ডাক দেন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান-জাপানি বাহিনীর যৌথ আক্রমণে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা, জাপানি বাহিনী ভারতের দোরগোড়ায় এবং খোদ লন্ডন শহর জার্মান বাহিনীর তীব্র বোমাবর্ষণে লণ্ডভণ্ড, এমন উত্তাল ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতার সুস্পষ্ট শর্তে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাব দেন;[২১] কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন সাম্রাজ্যবাদী অহমে: 'I have not become His Majesty's First Minister to preside over the liquidation of the British Empire to a half-naked Indian fakir.' (Ahmad, 2016: 7)। কংগ্রেসের সাহায্য গ্রহণ দূরের কথা, উল্টো কংগ্রেস-নিধনে ব্রিটিশ সরকার নৃশংসতার আশ্রয় নেয় এবং দমন-পীড়নের মুখে সর্বভারতীয় 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের অবসান ঘটে। সুভাষপন্থিদের কংগ্রেস ত্যাগের পাশাপাশি মুসলিম লীগের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন বর্জন এই আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। এই আন্দোলনকে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ

বিরোধী আন্দোলন হিসেবে দেখেনি, দেখেছে মুসলমান বিরোধী আন্দোলন হিসেবে। গান্ধীর প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিদ্বেষকে জিন্নাহ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি ব্রিটিশ-মিত্রতার স্বাক্ষর রাখেন।[২২]

ভারত ছাড় আন্দোলনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেস পুরনো গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে প্রত্যাবর্তন করে এবং নেতৃত্বে আসীন হয় হিন্দুত্ববাদী নেতারা। এই ব্যর্থতার বৃত্তে কংগ্রেস যখন দিশেহারা, তখন সুভাষ বসু ফরোয়ার্ড ব্লকে অনুগতদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং অস্থায়ী প্রবাসী সরকার ও Indian National Army (INA) গঠন করে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে অক্ষশক্তি, বিশেষত জাপানের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ব্রিটিশদের পরাভূত করেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্যোগী হয়েছিলেন; কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামও ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হয় এবং কংগ্রেস সেই সাফল্যের দাবিদার হলেও কেবল কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন নয়, সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুভাষ বসুর আহ্বানে ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্য আজাদহিন্দ ফৌজে (INA) যোগদান করে এবং অভূতপূর্ব বীরত্বে ব্রিটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বগাথা ব্রিটিশদের কঠোর গোপনীয়তা আইনের কড়া নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারতীয় জনগণ জানতে পারেনি। উল্লেখ্য, 'ভারতে কংগ্রেস যখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও বিভাজনের আশঙ্কা নিয়ে নাজেহাল হচ্ছিল, সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার তখন দৃষ্টান্তমূলক রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ স্থাপন করেছিল।' (সব্যসাচী, ২০১৮: ২৫২)। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের দায়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর যে তিন সদস্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তাঁরা ছিলেন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ধর্মাবলম্বী। ১৯৪৬ সালে তাঁদের বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতের সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে অসাধারণ ঐকমত্য তৈরি হয়। ছাত্র, শিল্পাঞ্চল ও পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের পাশাপাশি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভূতপূর্ব সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। ভারতীয়দের এই ঐক্যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ব্রিটিশ সরকার এবং আদালতের শাস্তি প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। এছাড়া ভারত সরকার ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে, সন্দেহ ক্রমান্বয়ে প্রবল আশঙ্কায় পরিণত হয় এবং অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই আশঙ্কা দিল্লিতে ও লন্ডনে সরকারি মহলে শীঘ্র ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। (দ্রষ্টব্য : সব্যসাচী, ২০১৮: ২৫৪-৫৫)।

সুভাষ বসুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রগতিশীল নেতৃত্বের বাইরে বাংলার কংগ্রেসের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতাদের তাঁবেদারিতে; প্রাদেশিক স্তরে ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভে বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আনুগত্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। স্বার্থান্ধ এই রাজনীতিতে আনুগত্য, স্বজনতোষণ, গোষ্ঠীপ্রীতি, জমিদারি ও ব্যবসায়িক স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। নির্বাচনী রাজনীতিকে ঘিরে দুর্নীতি ব্যাপক মাত্রা লাভ করে; নির্বাচনের ব্যয়বহন ও পার্টির তহবিলে অর্থপ্রদানে সক্ষম ধনাঢ্য ব্যক্তি ও জমিদাররাই মনোনয়ন লাভে অগ্রাধিকার পায়।[২৩] প্রজাস্বার্থবিরোধী ও হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির স্বার্থঘেঁষা ভূমিকার কারণে মুসলমান জনগোষ্ঠী কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে এবং কংগ্রেস বর্জন করে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতিতে যোগদান করে।[২৪] ১৯৩১ সালের রোয়েদাদে বিধানমণ্ডলে মুসলিম আসন বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃত্তে নিজেদের অফুরন্ত সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে। ১৯৩৫ সাল নাগাদ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দুটো রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে––এর মধ্যে রাজনৈতিক দল হিসেবে 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' (UMP)-র প্রাধান্য সুস্পষ্ট, আর দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে 'প্রজা সমিতি'––পরবর্তীতে 'কৃষক প্রজা পার্টি' (KPP)-র তখন উত্থানপর্ব। পুরনো মুসলিম লীগ তখন মৃতপ্রায়[২৫]; সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদানে বাংলার স্বাধীনচেতা মুসলিম নেতৃত্বের অনাগ্রহই এর মূল কারণ।[২৬] UMP ছিল সম্পদশালী, উচ্চবিত্ত জমিদার ও অভিজাত মুসলিমদের দল; আর 'কৃষক প্রজা পার্টি' (KPP) ছিল বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের, এককথায় গণমানুষের প্রতিনিধিত্বকারী দল। শ্রেণিস্বার্থের কারণেই দুই দলের মধ্যে

দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। আর এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়েই ইস্পাহানির দূতিয়ালিতে বাংলার রাজনীতিতে জিন্নাহর অনুপ্রবেশ ঘটে। জিন্নাহর কৌশলী তৎপরতায় UMP মুসলিম লীগে বিলীন হয়ে যায় এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে 'মুসলিম লীগ' একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। চরিত্র বিবেচনায় মুসলিম লীগ ছিল কংগ্রেসের অপর পিঠ––ক্ষমতা-প্রত্যাশী অভিজাত মুসলিমদের গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিভূ। কৃষক-শ্রমিক-প্রজার স্বার্থের বিষয়ে মুসলিম লীগের উদাসীনতা ছিল নির্মম পর্যায়ের; সাম্প্রদায়িকতা ছিল এ দলের মূল হাতিয়ার। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ও উদ্দেশ্য বুঝতে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে Star of India পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়-র অংশবিশেষ পাঠই যথেষ্ট: 'একটা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই ভোট দিতে হবে––এই প্রদেশে মুসলমানদের আধিপত্য সঙ্গত, তাই মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। প্রত্যেক সৎ মুসলিম প্রজা প্রার্থীদের [KPP প্রার্থীদের] বিপক্ষে লিগ প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন।'[২৭] অপরপক্ষে 'কৃষক-প্রজা পার্টি' হলো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এলিটিজমের বাইরে বাংলার গণমানুষের প্রথম দল। এই দলের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতাই ছিলেন নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ; জে.এল ব্যানার্জী ও নরেশ সেনগুপ্তের মতো প্রগতিমনা হিন্দু নেতারাও সমবেত হয়েছিলেন দলটিতে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার এই দল ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক স্বার্থরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে যখন কংগ্রেসের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালায় এবং মুসলিম লীগ ইসলামকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় নিবেদিত, তখন কৃষক-প্রজা পার্টির প্রচারণা ছিল সম্পূর্ণভাবে গণমানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচিনির্ভর: ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি প্রথা বিলোপ, প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন, খাজনা ও ঋণ মওকুফ, মহাজনি আইন বাতিল, সুদমুক্ত ঋণ চালু, খাল খননের মাধ্যমে সেবা সুবিধা সৃষ্টি, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, প্রতি থানায় হাসপাতাল স্থাপন, শাসন ব্যয় হ্রাস, সকল নিষ্পেষণমূলক আইন বাতিল ও রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান ইত্যাদি। তবে তখনকার আদর্শবিমুখ স্বার্থান্ধ রাজনীতির শর্ত মেনে কৃষক প্রজা পার্টিতেও দুটি আলাদা গোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল––এক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল ছোট শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত নেতৃবৃন্দ, যারা ছিলেন ছোট চাষী, ভাগচাষী এবং নিম্ন প্রজাদের দাবিদাওয়া বিষয়ে সোচ্চার; দলের অপর গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন শিক্ষিত শহরবাসী, জোতদার ও অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকেরা; দলে এ গোষ্ঠীর প্রাধান্যই ছিল সুস্পষ্ট।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে বিন্যস্ত ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কোনো দলই চূড়ান্ত ও নিঃসংশয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি; পাওয়া সম্ভবও ছিল না।[২৮] ৫৪টি আসন পেয়ে কংগ্রেস বৃহৎ দলের পরিচিতি বজায় রাখে; ৪৩টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয় মুসলিম নির্বাচকদের দ্বারা নির্বাচিত নির্দলীয় প্রতিনিধিরা; তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে ছিল যথাক্রমে মুসলিম লীগ (৩৯ জন) ও কৃষক-প্রজা পার্টি (৩৬ জন)। অদলীয় মুসলিম প্রতিনিধিরা সুবিধামতো দুই দলের একটিতে ভিড়ে যায়। ফলত মুসলিম লীগের প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০ এবং কৃষক-প্রজা পার্টির ৫৮। জোট সরকার গঠনের এই অনিবার্য বাস্তবতায় কৃষক প্রজা পার্টির নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠনে তৎপর হন। এ প্রস্তাবিত সরকার হতো অসাম্প্রদায়িক চেতনার এবং বাংলার রাজনীতিতে ক্রমবিকাশমান সাম্প্রদায়িকতা রোধের নিয়ামক। কিন্তু এই জোট সরকার গঠনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনমনীয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে তাঁদের বাংলাবিদ্বেষ, বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকে অকার্যকর করার দুরভিসন্ধি ছিল অন্যতম কারণ। কংগ্রেসের এই প্রহসনমূলক প্রত্যাখ্যানে বিক্ষুব্ধ-বিরক্ত ফজলুল হক সাম্প্রতিক নির্বাচনের তিক্ততা ও আদর্শগত ব্যবধান ভুলে মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট গঠনে উদ্যোগী হন। ফজলুল হকের প্রস্তাব ছিল মুসলিম লীগের কাছে ভবিষ্যৎ রাজনীতির বিবেচনায় এক অপূর্ব সুযোগ। লক্ষণীয় বিষয় হলো নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক সমীকরণ বিবেচনায় কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির সম্মিলিত সাফল্য ছিল সুস্পষ্ট; কিন্তু গোষ্ঠীস্বার্থের প্ররোচনায় বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল স্পষ্টভাবে বিভক্ত। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জিন্নাহ নির্বাচনে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ব্যর্থতার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল অবাঙালি বণিকসম্প্রদায়ের গোষ্ঠীস্বার্থ থেকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় ফজলুল হকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও

আপসহীন মনোভাব। মুসলিম লীগ কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা দলের সম্মিলিত শক্তির বিপদ উপলব্ধি করে ফজলুল হককে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদানে স্বীকৃত হয়; কিন্তু মন্ত্রিপরিষদে মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও বিপুল জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদানের শর্তে। বিপ্রতীপ মতাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী দল মুসলিম লীগে যোগদান এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ–– ফজলুল হকের এই আপসমূলক কর্মকাণ্ডে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনীতির মূলোচ্ছেদ ঘটে। উক্ত মন্ত্রিসভায় কৃষক-প্রজা পার্টি থেকে স্থান পায় ফজলুল হক সহ মাত্র দুজন, মুসলিম লীগের চারজন এবং সংখ্যালঘু হিন্দু ও তফসিলি সম্প্রদায়ের পাঁচজন––সম্প্রদায় বিবেচনায় ছয়জন মুসলমান ও পাঁচজন হিন্দু; এবং গোষ্ঠী বিবেচনায় ছয়জন জমিদার, একজন শিল্পপতি এবং চারজন আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। উল্লেখ্য, এ মন্ত্রিসভায় বামপন্থিদের ঠাঁই হয়নি। প্রজাস্বার্থে আজীবন নিবেদিত ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ছিল স্পষ্টতই অভিজাত-প্রধান, বিভিন্ন গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে গণমানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন ছিল চরম উপেক্ষিত: মন্ত্রীদের বেতন কমানো হয়নি, জমিদারি প্রথা রদ হয়নি, সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি, বিনা বেতনে শিক্ষার কোনো আইন হয়নি।[২৯] হক মন্ত্রিসভা কার্যত পরিণত হয় মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভায়। মুসলিম লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের আপস ও ঘনিষ্টতায় নিজ দল কৃষক-প্রজা পার্টি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং খুব দ্রুতই মুসলিম লীগের মধ্যে বিলীন হতে থাকে। একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হকও 'সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদের' তকমা নিয়ে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ব্রিটিশদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একচ্ছত্র কর্ণধার খাজা নাজিমুদ্দিন নির্বাচনে ফজলুল হকের কাছে বিধ্বস্ত[৩০] হয়ে বাংলার রাজনীতিতে কার্যত অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েন। তাঁর রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য ফজলুল হকের পতন অপরিহার্য ছিল। আর নিখিল ভারত মুসলিম লীগে জিন্নাহর একচ্ছত্র নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে ফজলুল হকই ছিলেন একমাত্র বাধা। উল্লেখ্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সীমাহীন বিরোধ সত্ত্বেও একটি জায়গায় ছিল আশ্চর্য মিল, সেটি হলো উভয় দলই নেতৃত্বের পুরোভাগে উত্তর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিল এবং তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দুজন বাঙালি। কংগ্রেসে যেমন সুভাষ বসু, মুসলিম লীগে জিন্নাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। এই দুই বাঙালি নেতাই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার ও কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। আপসকামিতা সত্ত্বেও স্বভাবগতভাবে স্বাধীনচেতা ফজলুল হক সরকার-পরিচালনায় জিন্নাহর অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রয়াসকে তুমুল সমালোচনায় বিদ্ধ ও প্রতিহত করেছেন। সর্বত্র আনুগত্য-প্রত্যাশী জিন্নাহ ফজলুল হকের অবাধ্যতায় বিক্ষুব্ধ হন। অবধারিতভাবে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব ব্যাপক আকার ধারণ করে। বাংলার নেতৃত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংঘাত ছাড়াও লিগের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল প্রকট; এ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেরুকৃত ছিল দুভাবে––প্রথমত, ঢাকাগোষ্ঠী ও কলকাতাগোষ্ঠীর বিভাজন, দ্বিতীয়ত, রক্ষণশীল অভিজাত ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তের মধ্যকার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা। জিন্নাহ ফজলুল হককে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগান।[৩১] ক্রমশ গণবিচ্ছিন্ন ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব-প্রত্যাশী বিত্তশালী নেতৃবৃন্দকে জিন্নাহ পৃষ্ঠপোষকতা দেন এবং তাঁদের যোগসাজশে ফজলুল হককে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ও গদিচ্যুত করতে জনবিক্ষোভ ও অনাস্থা প্রস্তাব মঞ্চস্থ করেন। লীগ-ওয়ালা মন্ত্রীদের ক্রমাগত অসহযোগিতা ও বিরোধিতায় কোণঠাসা ফজলুল হক একপর্যায়ে (১৯৪১ সালে) পদত্যাগে বাধ্য হন। কিন্তু মুসলিম লীগের সকল কূটকৌশল ও বাংলার গভর্নর হার্বার্টের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ফজলুল হক হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থন নিয়ে পুনরায় সরকার গঠনে সক্ষম হন। 'প্রগতিশীল জোট' নামে পরিচিত এ জোটের প্রগতিশীলতা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং এ সরকার ক্ষণস্থায়ী হলেও একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪১ সালেও বাংলায় মুসলিম লীগ ততটা শক্তিশালী ছিল না এবং বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা খুবই সম্ভব ছিল। মুসলিম লীগ ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ক্রমাগত ষড়যন্ত্রে ১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা দুই বছর টিকেছিল (মার্চ, ১৯৪৩ থেকে মার্চ, ১৯৪৫);

কিন্তু দুর্ভিক্ষকালীন প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং দুর্নীতি, লুঠপাট ও স্বজনপ্রীতির দৌরাত্ম্য ছাড়া এ সরকারের স্মরণীয় কোনো অবদান নেই। এই মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী ছিলেন নাজিমুদ্দিনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের 'ঢাকা গোষ্ঠী'র বিপরীতে 'কলকাতা গোষ্ঠী'র নেতা। কিন্তু সুহরাওয়ার্দীও আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না[৩২]; ক্ষমতার রাজনীতির জন্য যা প্রয়োজন সেটা করাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মূলনীতি। নাজিমুদ্দীন ও সুহরাওয়ার্দী––চল্লিশের দশকের বাংলার এই দুই প্রধান রাজনীতিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আবুল হাশিমের পর্যবেক্ষণধর্মী মন্তব্য: 'খাজা নাজিমুদ্দীনের মতো সুহরাওয়ার্দী প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না। সাধারণভাবে তিনি খুব উদারপন্থী ছিলেন এবং অন্যের মতের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন না। খাজা নাজিমুদ্দীন একজন অতীব ভদ্রলোক ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে দয়া-মমতা বলতে কিছু ছিল না। খাজা শাহাবুদ্দীন ছিলেন তাঁর ভালোমন্দের বিচারক, পথপ্রদর্শক ও জ্ঞানদাতা।' (আবুল হাশিম, ২০১২: ৪৮)। খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমি স্বার্থবাদী নেতৃত্বের বিপরীতে উদারপন্থি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন আবুল হাশিম। তাঁর নেতৃত্বে শামসুল হক, শামসুদ্দীন, কামরুদ্দীন আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ কতিপয় ভাবপ্রবণ তরুণের একনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডে মুসলিম লীগ একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই তরুণ নেতৃত্ব ছিল বামপন্থায় অনুপ্রাণিত এবং তাঁদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি।[৩৩] স্বাভাবিকভাবেই এই কর্মসূচি মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করতে তাঁরা ষড়যন্ত্র, প্রতারণার পাশাপাশি গুণ্ডা লেলিয়ে শারীরিক প্রহারের মতো নোংরামির আশ্রয়ও নিয়েছে। এসব সত্ত্বেও বামপন্থি ধারাই এসময় বাংলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করে; এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রার্থিতায় জনবিচ্ছিন্ন উগ্র দক্ষিণপন্থিরা কার্যত প্রান্তিক হয়ে পড়ে। হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী দুই গোষ্ঠীর সঙ্গেই সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠীকে তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতেন। কংগ্রেসের প্রভুত্ববাদী মনোভাবের বিপরীতে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল আত্মরক্ষামূলক। চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় মুসলমানদের একচ্ছত্র মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেদের দাবির পক্ষে যুক্তি হিসেবে কংগ্রেসের জাতীয় চরিত্র অস্বীকার করে কংগ্রেসকে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিপন্ন করা।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল কংগ্রেসের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধ; এ নির্বচনকে জিন্নাহ ঘোষণা করেন পাকিস্তান প্রস্তাবের ওপর মুসলমান জনগোষ্ঠীর গণভোট হিসেবে; এ নির্বাচনে তিনি দেশের জন্য কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা তুলে ধরেননি। তবুও এ নির্বাচনে বাংলাসহ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে; বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টিকে চূর্ণ করে দিয়ে (নামমাত্র ৪টি আসন লাভ) মুসলিম লীগ একক বৃহত্তম দল (১২৭ আসন) হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৩৬ এবং ১৯৪৬––এক দশকের মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটি নির্বাচনে বাংলার মুসলিম ভোটারদের মনোভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক সচেতনতা সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে বাংলার অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী যেখানে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, মাত্র একদশকের ব্যবধানে সেখানে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দুদের এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের দলে পরিণত হয়। তখন দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই উদারপন্থিরা প্রান্তিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থিদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। কেন্দ্রে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে জিন্নাহই সর্বেসর্বা আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্বে জিন্নাহর আশীর্বাদপুষ্ট খাজা নাজিমুদ্দিন ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের আধিপত্য। ১৯৩৬ ও ১৯৪৬-এ অনুষ্ঠিত এই দুই নির্বাচনে মুসলিম নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হারিয়ে হিন্দু অভিজাতশ্রেণি ছিল সংক্ষুব্ধ। তাঁরা বুঝতে পারে, বাংলার রাজনীতিতে তাঁদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। মুসলিম লীগের শনৈ শনৈ প্রভাববৃদ্ধিতে তাঁরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য ধর্মনিরপেক্ষনীতির প্রতি আস্থা হারান। বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেসের বাইরে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা প্রচণ্ড শক্তিধর হয়ে ওঠে; আর প্যাটেলের একান্ত

অনুগত ডা. বিধানচন্দ্র চন্দ্র রায়ই প্রাদেশিক কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা। তাঁদের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও গুজবপ্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কংগ্রেসের উদারপন্থি নেতারা কার্যত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। উভয় সম্প্রদায়ের উগ্র নেতৃত্বে বাংলার রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ আহূত ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে। আবুল হাশিম ও তাঁর অনুগামীরা ১৬ আগস্টের কর্মসূচিকে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলে প্রচার করে, তখন খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী দাবি করে এই কর্মসূচি যুগপৎ ব্রিটিশ ও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে। বর্ণ-হিন্দুরা তাই এই কর্মসূচিকে তাদের অস্তিত্বসংকট হিসেবেই বিবেচনা করে এবং আত্মরক্ষার্থে এই কর্মসূচি প্রতিরোধের ডাক দেয়। আত্মরক্ষার সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে শত্রুর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের কৌশলকেই তারা বেছে নেয়। গড়ের মাঠের মুসলিম লীগের জনসভা শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনরত মুসলমানদের ওপর উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালায় এবং নির্বিচারে অনেক লোককে হত্যা করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আক্রমণে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা (কলকাতার জনসংখ্যার মাত্র ২৪ শতাংশ) সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে; কিন্তু এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের ঢেউ পূর্ববাংলার মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে আছড়ে পড়ে; এর বীভৎসতম প্রকাশ ঘটে কলকাতা থেকে বহুদূরের নোয়াখালি অঞ্চলে। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক সহিংসতা পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে উন্মাদনা ছড়ায়। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জমিদার, সরকারি আমলাগোষ্ঠী, এমনকি নিম্নস্তরের কর্মচারীরা পর্যন্ত নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থকরণে জনমনস্তত্ত্বে সঞ্চার করে ঘৃণামিশ্রিত আতঙ্ক। আপামর বাঙালি পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে ধর্মের নামে বা ধর্মরক্ষার নামে উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায়। 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতার সঙ্গে দীর্ঘ হওয়ায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, আমলাচক্র ও অন্যান্য কর্মচারীরা সকলেই অবাধ্য হয়ে উঠল। এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো যে, প্রত্যেকটি দফতর—প্রত্যেকটি সরকারি মহল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবার উপক্রম হল।' (কামরুদ্দিন, ২০১৪: ৭৮)। সর্বস্তরের জনতার সর্বাত্মক অংশগ্রহণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুরোদস্তুর গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের বিকল্প হিসেবে দেশভাগই হয়ে ওঠে একমাত্র সমাধানসূত্র। যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশরা পুরো ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, সেই বিভাজননীতির উগ্র ও বেহিসেবি চর্চায় ভারতীয়দের হাতেই ভারতবর্ষের বিভক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর এই সমাধানের রূপরেখা আগেই এঁকে রেখেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন; এই বিভাগের মধ্যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ষড়যন্ত্রও যুক্ত ছিল। মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কংগ্রেসকে বাধ্য করলেন; বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তিকরণের শর্তে কংগ্রেস ভারতভাগ মেনে নেয়। অবশ্য কংগ্রেসের এই শর্ত ছিল বাংলার হিন্দু অভিজাতশ্রেণির প্রত্যাশার প্রতিফলন। কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নেতৃত্ব অখণ্ড বাংলায় সংখ্যালঘু হওয়ার চেয়ে ভারত রাষ্ট্রের অধীনে সংখ্যারিষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতেই নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজেছে। কংগ্রেসের রাজনীতিতে ব্রাত্য হয়ে যাওয়া শরৎ বসু ও তাঁর কতিপয় অনুসারীই ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে অখণ্ড স্বাধীন বাংলার দাবি উত্থাপন করেন; আর মুসলিম লীগের গোটা নেতৃত্বই ছিলো অখণ্ড বাংলার দাবিতে সোচ্চার। অবশ্য বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চাওয়া ছিল বাংলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিকরণ; সেটা অখণ্ড বা বিভক্ত যেভাবেই হোক। আর ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে অবিভক্ত বাংলার সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দাবি উত্থাপন করেন মুসলিম লীগের প্রগতিপন্থি নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে জিন্নাহও অখণ্ড স্বাধীন বাংলার দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি ছিলো: 'কলকাতা ছাড়া বাংলার কী-বা মূল্য। ওরা অবিভক্ত বাংলায় স্বাধীন থাকাই ভালো; আমি নিশ্চিত যে, তারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে।' (উদ্ধৃত : সব্যসাচী, ২০১৮: ৩০৪)। কিন্তু প্যাটেলের দৃষ্টিতে স্বাধীন বাংলা মানেই বাংলায় মুসলিম লীগের আধিপত্য; সমস্ত বাংলা পাকিস্তানে চলে যাওয়া। (দ্রষ্টব্য: সব্যসাচী, ২০১৮: ৩২৯)। বলাবাহুল্য, ব্যক্তিগত ক্ষমতার নেশা ও পদ-পদবির লোভে বাংলার নেতারা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তাঁবেদারিতে ব্যস্ত ছিলো; বাঙালি নেতৃত্বের কেন্দ্র-পারবশ্যতার সুযোগে বাংলার ভাগ্যনির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে। আর স্বাধীনতার প্রাক্কালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিভাজনের রাজনীতি কতটা

হিংসাত্মক ও দ্বন্দ্বাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তার নমুনা পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রশাসক জেনারেল স্মাট্‌সের উক্তিতে (১২ মে, ১৯৪৭): 'ব্রিটেনের নিজের দিক থেকে স্বেচ্ছায় ভারত ছাড়ার ফলে সেখানে যে দেশভাগ, বিশৃঙ্খলা ও সম্ভাব্য গণযুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হবে, তার আগে ব্রিটেনের একটু বিরতি নেয়া উচিত। ... ভারতের লক্ষ লক্ষ মূক জনগণের প্রতি ব্রিটেনের এখনও একটা কর্তব্য আছে। ... এই পরিস্থিতিতে আমার যা বক্তব্য তা হল ভিন্নমত পোষণকারী যারা রয়েছে তাদের পাওয়া উচিত কেবল স্বাধীনতা বা দেশভাগের বিকল্প নয়, যদি তারা ইচ্ছুক হয় তবে তাদের ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকার বিকল্পও থাকা উচিত। এরকমও সম্ভব হতে পারে যে ভারতীয় রাজ্য (দেশীয় রাজ্য) ও সংখ্যালঘুরা, এমনকি হয়তো মুসলিমরা নিজেরাও, হিন্দুদের আধিপত্যের ভয়ে ব্রিটিশদের সংস্পর্শে থাকাই পছন্দ করবে। ... ব্রিটেন এভাবে ভারতে একটি শক্ত ঘাঁটি তৈরি করবে।' (উদ্ধৃত: সব্যসাচী, ২০১৮: ৩১৬)। স্মাট্‌সের এই পরামর্শ ছিল ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তা ছিল বাস্তবতাবর্জিত। তাই মাউন্টব্যাটেন তৃতীয় বিকল্পের না গিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেন। তবে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন নিজেদের পরিকল্পিত ছকে ও শর্তে––কমনওয়েলথে ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে। ফলত ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো আপস-মীমাংসার মধ্য দিয়ে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে, সঙ্গে বিভক্ত হলো বাংলা ও পাঞ্জাব। প্রত্যাশা করা হয়েছিল ভারতবিভক্তির মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গার অবসান ঘটবে। কিন্তু বিভক্ত স্বাধীনতার পরের সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা আরও বীভৎস হয়ে ওঠে। রক্তাক্ত দাঙ্গায় নিহত ও আহত হয় অগণিত মানুষ; জীবনরক্ষার্থে বাস্তুচ্যুতি ঘটে কোটি কোটি মানুষের। রাজনীতিতে ধর্মান্ধতা এতটা আগ্রাসীরূপ ধারণ করে যে, ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী নিহত হন স্বাধীন দেশে এক উগ্রবাদী হিন্দুর হাতে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মৃত্যু আগেই ঘটে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা-পরবর্তী উত্তাল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির খেলায় প্রান্তিক হয়ে পড়েন। ভারতের ঐক্যের বিষয়ে তাঁর মতামতগুলো তখন অবজ্ঞার বিষয়। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের প্রথম প্রহরে কংগ্রেসের নেতারা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর আর প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিত্বের পদ নিতে ব্যস্ত, তখন ভগ্নমনোরথ মহাত্মা গান্ধী দিল্লি থেকে বহুদূরের কলকাতায় গভীর নির্জনতায় মগ্ন। সাধারণ বাঙালিও এই বিভক্তিতে কম উচ্ছ্বসিত হয়নি; বিশেষত পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই দিনটিকে উদ্‌যাপন করেছে। কেবল বিষণ্ন ছিল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যারা জীবন, সম্পদ ও বাস্তু হারানোর আশংকা নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষতের সামনে দাঁড়িয়ে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মান্ধ আবেগ, 'অপর' জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা ও সমগ্র জনপরিসরের সাম্প্রদায়িকীকরণ সাধারণ বাঙালির সহজাত শুভবোধ ও জাতিসত্তাগত ঐক্যকে যেমন ভূলুণ্ঠিত করেছে; তেমনি ঐতিহ্যবাহী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকেও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা একটি সমৃদ্ধ জাতিসত্তা তার স্বাধীন আত্মবিকাশের সম্ভাবনা হারিয়ে দুই রাষ্ট্রের ধর্মপোষিত সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হওয়া এবং কলোনিয়াল কাঠামো থেকে আরেকটি আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সমর্পিত হওয়ার ক্ষতি কতটা ভয়াবহ রকমের তা অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি আন্দাজ করতে পারেনি। এই দেশভাগের পরিণতি হলো ভারতের হিন্দিবলয়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যে পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র সত্তার আত্মসমর্পণ; আর পূর্ববাংলার পশ্চিম পাকিস্তানের নতুন উপনিবেশে পরিণত হওয়া।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ সম্পন্ন হয়েছে মুখ্যত ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পার্শ্ব-ভূমিকায়। এই বিভক্তি ছিল দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের আপসহীন বিরোধের পরিণাম। বলাবাহুল্য, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ––এই দুই রাজনৈতিক দলের সর্বাত্মক নেতৃত্বে তখন একান্তই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি; ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি-সম্পর্কিত এবং ভারতের ট্র্যাজিক খণ্ডায়ন সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক গড়নের নিয়ম মেনেই। উল্লেখনীয় যে, এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে সৃষ্টি; ঔপনিবেশিক শাসনে সরকার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির সম্পর্ক ও ভূমিকা ছিল পরিপূরকের। বলাবাহুল্য, বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণির

স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁদের শ্রেণিগত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাজাত; তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে বিদ্রোহী আমজনতাকে যুক্ত করেছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে সর্বাত্মক গণভিত্তি দেওয়ার কৌশল হিসেবে; গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির অভিপ্রায়ের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক যোগ ছিল সামান্যই। এই ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেকটি ঐতিহাসিক ব্যর্থতা হলো, তা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সর্বভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ পাটাতনে দাঁড়িয়ে তা পরিচালিত হয়নি; এ আন্দোলন ছিল বরাবরই সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষে ঠাঁসা; চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে এ আন্দোলনের চরিত্র যতটা না ব্রিটিশবিরোধী ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল সম্প্রদায়বিদ্বেষী। ভারতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণতি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়নি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মনোজগৎ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গূঢ় প্রভাব ফেলেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. 'বাংলায় ত্রিশ বছরের মধ্যে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ মোগল আমলের প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই বর্ধিত রাজস্বের সামান্য একটু অংশও কৃষির উন্নতির জন্য কিংবা কৃষকদের কল্যাণের জন্য খরচ করা হয়নি।' (বিপান, ২০১৪: ২৪)।

২. 'ভারতে অবাধ বাণিজ্য জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার এবং ব্রিটেনে ভারতীয় পণ্যের উপর বৈষম্যমূলক শুল্ক ধার্য করার ফলে ভারতীয় হস্তশিল্প ধ্বংস হল, নিঃস্ব হল লক্ষ লক্ষ কারিগর।' (বিপান,২০১৪: ২৫)।

৩. সাঁওতাল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্যসূচক বীরত্বের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এল.এস.এস. ও'মালে : 'তারা বেপরোয়া সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কখন তারা হেরে গেছে তা জানতে পর্যন্ত পারেনি।তাই রাজি হয়নি আত্মসমর্পণ করতে। একবার পঁয়তাল্লিশ জন সাঁওতাল একটা মাটির কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সৈন্যদের আক্রমণের হাত তেকে সেটা রক্ষা করছিল তারা। একের পর এক গোলাবর্ষণ হতে থাকে সেই ঘরের উপর। ... সাঁওতদালরাও পাল্টা তীর ছুড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত গোলাবর্ষণ বন্ধ হলে সৈন্যরা সেই কুঁড়েঘরে ঢুকে দেখে শুধু এক বৃদ্ধ জীবিত রয়েছে। একজন সৈন্য তাকে আত্মসমর্পণ করতে বললে সেই বৃদ্ধ ছুটে গিয়ে ভাল্লার আঘাতে সৈন্যটিকে কেটে ফেলে।' (বিপান, ২০১৪: ২৯ থেকে উদ্ধৃত)।

৪. স্যার হেনরি লরেন্স এক চিঠিতে লর্ড ক্যানিংকে লেখেন : 'আমি দুটি সম্প্রদায়ের ভেদ-বুদ্ধির দিকে তাকিয়ে আছি।' অযোধ্যার লে. গভর্নর রাসেল কলভিল আক্ষেপ করে বলেছিলেন : 'বিদ্রোহের সময় ... হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কোনো সুযোগই পাওয়া যায়নি।' (হোসেন, ১৯৯৯ : ১৪৩ থেকে উদ্ধৃত)।

৫. Indigo Commission Report-এ দেখা যায় যে, 'The indigo manufactured in this side of India is of prime quality and that of lower Bengal, specially which is produced in the district of Noddea and Jessore, is probably the very finest in the whole world.' (হোসেন, ১৯৯৯ : ২৪৪ থেকে উদ্ধৃত)।

৬. এ সম্পর্কে এক ইংরেজ লেখকের মন্তব্য: ' The cold, hard and sordid, who can plough up fields of grain, kidnap recusant ryots, confine them in dark holes, beat and starve them into submission, which things have sometimes been done, can give no moral

guarantee of his incapability of filling up a blank bond, and turning it to his precuniary profit.' (The Calcutta Review. Vol. 36, March 1861. p. 40.)

৭. এ কাজে সহযোগিতা করতে সাহেবদের কুঠিতে থাকতো দেশীয় কর্মচারীদের নিয়ে একটি ছোটখাট আমলাতন্ত্র। এই সকল কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়েব বা দেওয়ান। মাসিক বেতন হিসেবে তাদের দেওয়া হতো ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। নায়েবের অধীনে থাকতো একজন করে গোমস্তা; তার দায়িত্ব ছিল রায়তদের হিসাবপত্র লেখা। এছাড়াও ছিল জমি মাপজোক করার জন্য আমিন, নীল মাপার জন্য ওজনদার, কুলির কাজ করানোর জন্য জমাদার, রায়তদের তাগিদ দেওয়ার জন্য তাগিদগীর। সর্বোপরি কৃষকদের শায়েস্তা করতে নিয়োগ করা হতো একদল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। এরা সবাই সাধারণ মানুষের কাছে ভীষণভাবে ঘৃণ্য ছিল। [দ্রষ্টব্য: হোসেন, ১৯৯৯: ২৯]।

8. Pulina Dasa (Editor), 1992, Report of the Indigo Commission, 1860, Publication Bureau, University of North Bengal.

৯. নীলদর্পণ নাটকের ভূমিকাংশে হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ছোটলাটের একটি মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যাতে নীলবিদ্রোহের যৌক্তিকতার স্বীকৃতি মেলে: 'বাঙলার প্রজা ক্রীতদাস নহে পরন্ত প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্ত্বাধিকারী। তাহাদের পক্ষে এরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়কর নহে। যাহা ক্ষতিজনক তাহা করাইতে গেলে অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী; এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীল বপনে প্রজার আপত্তির মূল কারণ।' (নীলদর্পণ ভূমিকা)।

১০. ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংসকৃতিক ক্ষেত্রে যে চরম অবক্ষয় নেমে এসেছে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তার তীব্র সমালোচনা করেন অক্ষয়কুমার দত্ত: 'তোমাদের অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষয়, বলক্ষয়, আয়ক্ষয়, ও ধর্মক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষাদান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ। অর্থোপার্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ।'

১১. সমকালের অর্থনৈতিক দুরবস্থার একটি বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থাপন করেছেন রাজনারায়ণ বসু : 'ইওরোপে এত শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, এখানে কেবল মাত্র এক চাকরী দ্বারা কি এত ভদ্রলোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে ? হাইকোর্টের একজন উকীল সম্প্রতি শামলা মাথায় দিয়ে প্রত্যহ হাইকোর্টে বেরিয়ে কিছু হয় না দেখে শেষে বরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে ধোপার কাজের এক কারখানা খুলিলে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ হয়। বস্তুতঃ জগৎশুদ্ধ লোক কি কখন কেরাণী অথবা স্কুলমাষ্টর অথবা উকীল হইতে পারে ? শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া কেহ পথ চলে না। ... শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদিগের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না, দেসলাইটী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে, আমরা আগুণ জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।' [শ্রীরাজনারায়ণ বসু, ১৭৯৬ (শকাব্দ): ৫৫-৫৬]।

১২. দীপেশ চক্রবর্তী; গৌতম ভদ্র (সম্পাঃ), ২০১৮: ১৭৪।

১৩. '১৯১৭ সালে স্টকহলমে সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এ যোগদানের পরে আলীগড়ের দুজন ছাত্র ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভাগের এক পরিকল্পনার প্রস্তাব করেন। ১৯২০ সালে মোহাম্মদ আব্দুল কাদির

বিলগ্রামী নামক জনৈক ব্যক্তি বাদাউন থেকে প্রকাশিত জুলকারনাইন নামক সংবাদপত্রে গান্ধীজীর নিকট প্রেরিত এক খোলা চিঠিতে অনুরূপ প্রস্তাব করেন।' (কামরুদ্দীন, ২০১৪: ১৮)।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদভিত্তিক এ রাজনীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ১৯২১-এ লিখেছিলেন, 'বহুদিন ধরে আমাদের পলিটিক্যাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকাননি, কেননা তাদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্প-রচিত একটা মরীচিকা, যাতে বার্ক গ্লাডস্টোন ম্যাটসীনি গারিবাল্ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি।' (রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর*, সত্যের আহ্বান, ২০১)।

১৫. 'Gandhi takes on all these Hindu symbols. Not because they're Hindu symbols but because they were the symbols of the majority people. Therefore, they had the most power to mobilize. In the process, the Muslim community got very frightened that its own cultural traditions and common culture that was being produced was being shunted aside. It wasn't so much because Gandhi was a Hindu or a communalist, but because he was an anti-imperialist opportunist who would do anything within the framework of his nonviolent philosophy that mobilize the masses.' (Ahmad, 2016: 3)।

১৬. গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের মধ্যে বিভেদাত্মক সহিংস উপাদান থাকায় এর পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সতর্ক করে বলেছিলেন: 'Look the politics that you are introducing in India is going to divide the two communities.' (Jag Parvesh Chander, ed., *Tagore and Gandhi Argue* (Lahore, India: Indian Printing Works, 1945. Qouted from Eqbal Ahmad, Confronting Empire, 2016, P.2)।

১৭. 'এই চুক্তির তিনটি শর্ত ছিল: (ক) বাংলায় আইনসভার নির্বাচনে জনসংখ্যায় হিন্দু-মুসলমান অনুপাতের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব হবে এবং ভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলির দ্বারা তারা নির্বাচিত হবেন, (খ) স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের অনুপাত এরকম হবে––মুসলিমপ্রধান এলাকায় মুসলমান ও হিন্দু প্রতিনিধির অনুপাত যথাক্রমে ৬০ : ৪০ হবে এবং অন্যান্য এলাকায় যথাক্রমে ৪০ : ৬০ হবে এবং (গ) সরকারি চাকরিও নিম্নরূপ অনুপাতে বিভক্ত হবে––৫৫ : ৪৫ = মুসলিম : অমুসলিম, এবং যত দিন আরও মুসলিম কর্মীদের নিয়োগের দ্বারা এই অনুপাত পৌঁছানো যাবে সরকারি কর্মীদের সংখ্যাতে, ততদিন ৮০ : ২০ = মুসলিম : অমুসলিম এই অনুপাতে নিয়োগ করতে হবে।' (সব্যসাচী, ২০১৮ : ১৫৬)।

১৮. [দ্রষ্টব্য: কামরুদ্দিন, ২০০২: ৩০-৩১]

১৯. সমাজতান্ত্রিক ঝোঁকবিশিষ্ট কংগ্রেসী বুদ্ধিজীবী হুমায়ুন কবীর কমিউনিস্ট রাজনীতির এসময়কার সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে : 'জনযুদ্ধের (People's War) অর্থ যদি হয় যে জনগণ নতুন অধিকার লাভের জন্য যুদ্ধে ব্রতী, তবে কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়। ... স্ট্যালিন নিজে বহুবার বলেছেন যে বর্তমান যুদ্ধ সোভিয়েত রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার যুদ্ধ... হিটলারের সঙ্গে তিনি যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন, হিটলার সেই চুক্তি লঙ্ঘন করাতেই রুশ ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধকে বিশ্বমানবের মুক্তির যুদ্ধ অথবা জনগণের অধিকার সম্প্রসারণের যুদ্ধ বলা চলে না। ... কেবল তাই নয় স্ট্যালিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশ বৎসরের জন্যে যে সন্ধি

করেছেন তার অন্যতম শর্ত যে, সন্ধিকামী শক্তি দুইটির মধ্যে কেউ অন্যের কোন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। ভারতের এবং অন্যান্য উপনিবেশের রাষ্ট্রিক মুক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন।' (হুমায়ুন কবীর, চতুরঙ্গ (আশ্বিন ১৩৫০), উদ্ধৃত শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাস (সম্পা.) বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা (কলকাতা, ১৯৯৮), পৃ. ৩৭২-৩)।

২০. গঙ্গাধর অধিকারী কমিউনিস্ট পার্টির এই ঐতিহাসিক ভুল স্বীকার করেন এভাবে: 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরুদ্ধে পার্টির নেতিবাচক অবস্থান পার্টির যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। আমাদের জনযুদ্ধের স্লোগান আমাদেরকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে এনেছিল এবং আমাদের জনসমর্থনকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।' (A. Farooqi (ed.), *Remembering Dr Gangadhar Adhikari: Selection from Writings*, Peoples Publishing House, Delhi, 2000, pp. 199-200)।

২১. মহাত্মা গান্ধী সহযোগিতার প্রস্তাবে বলেন: 'We will support the war effort, but in return you must give us a promise of independence after the war.' (Ahmad, 2016: 8)।

২২. একবাল আহমদ জিন্নাহর এই ব্রিটিশ সমর্থনকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করেছেন: 'He did so for two reasons Number one, he was die-hard anti-fascist. Jinnah couldn't imagine—he was more Anglicized than Gandhi—doing anything that would hurt the British at that particular moment. And secondly, Jinnah was also opportunistic. This was for him an opportunity to get British support for his demand for Pakistan. Britain had not been terribly kind towards him before.' (Ahmad, 2016 : 8)।

২৩. কংগ্রেসের ত্যাগী নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জির মনোনয়ন বঞ্চনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কংগ্রেস নেতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করেন; নির্বাচনে তাঁকে মনোনয়নবঞ্চিত হতে হয় তাঁরই ছাত্র এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কাছে। ধনাঢ্য ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন প্রদানের যুক্তি ছিল পার্টিকে আর্থিক সাহায্যদানের সক্ষমতা ও সর্বদাই তিনি খাদি পরিধান করেন। কংগ্রেসি রাজনীতির এই অবক্ষয় সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় (১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) লেখেন : 'প্রকৃত বিশ্বস্ত কর্মীদের কায়দা করে দূরে রেখে ধনী ও বিবেকহীন মানুষেরাই কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছে।' (উদ্ধৃত : সব্যসাচী, ২০১৮: ২৬৪)।

২৪. এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদের মন্তব্য: 'আমরা মুসলমান কংগ্রেসিরা মৌলানা আক্রম খা সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জন করিয়া নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করি (১৯২৯)। ... এইভাবে রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে, এবং সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজাসমিতিতে সংঘবদ্ধ হইলেন। এই পরিস্থিতিতে দেশপ্রিয় জে. এম . সেনগুপ্ত একদিন আফসোস করিয়াছিলেন, 'আজ হইতে কংগ্রেস শুধু মুসলিম বাংলার আস্থাই হারাইলো না, প্রজাসাধারণের আস্থাও হারাইলো'। সেনগুপ্তের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল।' (আবুল মনসুর আহমদ, ১৯৯৫: ৪৫-৪৬)।

২৫. ১৯৩৬ সালে মুসলিম অবস্থা জানা যায় বাংলার রাজনীতিতে জিন্নাহর মূল সহকারী এম.এ. এইচ. ইস্পাহানির স্মৃতিকথায়: 'প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শুধু নামেই অস্তিত্ব ছিল। অনেক বছর আগেই উদাসীনতা ও অবহেলার জন্য এর মৃত্যু ঘটেছে।' (উদ্ধৃত : সব্যসাচী, ২০১৮: ২২৫)।

২৬. দ্রষ্টব্য : Ispahani, Quaid-e-Azam jinnah as I Knew Him, p. 15-17।

২৭. Star of India পত্রিকাটি ছিল মুসলিম লীগের মুখপাত্র; পরিচালনা করতেন এম.এ. এইচ. ইস্পাহানি; এর আর্থিক সাহায্যদাতা ছিল ইস্পাহানি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, স্যার আদমজি দাউদও এর অনুদান প্রদানকারী। উদ্ধৃতাংশটুকু পত্রিকাটির 'Let not Islam be Betrayed' (ইসলাম যেন প্রতারিত না হয়) শিরোনামের সম্পাদকীয়-র অংশবিশেষ; সব্যসাচী, ২০১৮: ২৩১ থেকে উদ্ধৃত।

২৮. মোট ২৫০টি আসনের সম্প্রদায়ভিত্তিক বাটোয়ারা হলো–– মুসলমানদের জন্য ১১৯টি, ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জন্য ২৫টি, অনুন্নত জাতির হিন্দুদের জন্য ৩০টি এবং সাধারণ হিন্দু ও অন্যান্যর জন্য ৭৬টি। সুতরাং কোনো গোষ্ঠীর পক্ষেই সরকার গঠনের জন্য এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। সরকার গঠনে নির্দলীয় ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ২৫টি আসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২৯. 'জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা মন্ত্রিসভার পক্ষে সম্ভব হলো না। কারণ, দু'একজন ছাড়া মন্ত্রিসভার সভ্যরা নিজেরাই ছিলেন জমিদার। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান মুসলমান জমিদার জনৈক মন্ত্রী এক জেলা-শহরে ভূস্বামীদের সভায় বক্তৃতাকালে কিভাবে তিনি জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় করছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ক্ষুধার্ত কুকুরদের সামনে হাড় ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সে কাজ সমাধা করে আসছেন। কারণ তা না হলে ক্ষুধার্ত কুকুরেরা মরিয়া হয়ে হয়তো জমিদারদের হত্যা করবে।' (কামরুদ্দীন, ২০১৪ : ৪৫)।

৩০. 'খাজা নাজিমুদ্দীন বরিশাল জেলার পটুয়াখালী থেকে নির্বাচনে অংশ নেন এবং কৃষক প্রজা পার্টির নেতা এ কে ফজলুল হক খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলার ছোট লাট স্যার জন এন্ডারসন খাজা নাজিমুদ্দীনকে সমর্থন করার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের উপর নির্দেশ জারি করেন খাজাকে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করার জন্য। এই বিশেষ নির্বাচনী এলাকাটি ছিল নবাব পরিবারের জায়গিরভুক্ত অঞ্চল। সারা বাংলার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ফজলুল হক খাজা নাজিমুদ্দীনকে পরাজিত করেছিলেন।' (আবুল হাশিম, ২০১২: ২৫)।

৩১. এ প্রসঙ্গে আবুল হাশিমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'ফজলুল হক ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। তিনি জানতেন যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলার অধিবাসীদের খুব একটা পছন্দ করে না। ইংরেজ শাসনামলে বহুকাল বাংলাদেশ ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চারণক্ষেত্র। ফজলুল হক কখনও অবাঙালিদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। কিন্তু সুহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীন জিন্নাহর লেজুড়বৃত্তি করতেন।' (আবুল হাশিম, ২০১২: ৩৩)।

৩২. ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে সুহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক চরিত্র আবুল হাশিম উপস্থাপন করেছেন পারস্পরিক কথোপকথনকে উদ্ধৃত করে : 'একবার তিনি (সুহরাওয়ার্দী) আমাকে বলেছিলেন, 'হাশেম আদর্শের প্রতি এত নিষ্ঠা আমার মনঃপূত নয়; আদর্শ আমার কর্মজীবনে কখনও কোনো কাজে আসেনি'।' (আবুল হাশিম, ২০১২: ৪৭-৪৮)।

৩৩. আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বপালন কালে মুসলিম লীগকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক রাজনৈতিক দলে পরিণত করার লক্ষ্যে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র (১৯৪৫) প্রণয়ন করেন। এই খসড়া ঘোষণাপত্র প্রণয়নে আবুল হাশিমকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার কমিউনিষ্ট যুবক নিখিল চক্রবর্তী। ঘোষণাপত্রটিতে একদিকে ইসলামের সর্বজনীন মূল্যবোধের

অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়েছে; অন্যদিকে ছিল মার্কসবাদী দর্শনের অনুরণন। নবীভূত মুসলিম লীগ গঠনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে আবুল হাশিমের বক্তব্য : 'এতে প্রস্তাব ছিল বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে ভেঙে দিয়ে সকল সম্প্রদায়, দল ও স্বার্থের এবং অন্যান্য ভারতবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রামের সমন্বয় সাধনের। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী আসাম ও বাংলা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। ঘোষণাপত্রটিতে সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি এবং সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রে তার বাস্তব রূপায়ণ প্রস্তাবের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অন্যান্যের মধ্যে এ কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল যে, শর্তহীন আইনের শাসন হবে মূল ভিত্তি, যার উপর রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরি হবে। জনসাধারণের স্বাধীনতা ও আত্মসমর্থনের অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হবে। শ্রম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার, এই তিনটি অধিকার হলো মানুষের প্রধান অধিকার। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই সমান সুযোগের অঙ্গীকার দিয়ে প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কাজের নিশ্চয়তা দেবে। রাষ্ট্র শিক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। জমির একচেটিয়া মালিকানা, ভূমিরাজস্বের বিলোপসাধন এবং প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহন জাতীয়করণ করা হবে। মজুরদের শ্রমের ফল তাদের ভোগের সুবিধা দেওয়া হবে। এসব দাবির নিশ্য়তা প্রদানের জন্য আইনসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, বেকার-বিমা, বয়স্কদের পেনশন এবং সর্বনিম্ন বেতন ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। ভূমি রাজস্ব স্বার্থের বিলোপ এবং কৃষকদের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা হবে। কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সমষ্টিগতভাবে জমির চাষাবাদ, সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়কে উৎসাহিত করা হবে। অমুসলিমদের সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের দায়িত্ব থাকবে মুসলিম লীগের ওপর। অমুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ চলবে না। হরিজন সম্প্রদায়ের সমঅধিকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ঘোষণাপত্রটি সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং পরিপূর্ণভাবে জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের অনুকূল ছিল।' (আবুল হাশিম, ২০১২ : ৭৩-৭৪)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঔপনিবেশিক চেতনার অবশেষ এবং মুক্তির অন্বেষা

গত কয়েক শতাব্দী ধরে পশ্চিমি উপনিবেশবাদ ক্ষমতাধীন দেশগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কেবল খর্ব করেনি; মননে-মগজে ছড়িয়ে দিয়েছে পশ্চিমাচ্ছন্নতা। তাই উপনিবেশিতরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও উপনিবেশবাদের প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি; সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা।[১] 'যে মন পশ্চিমের প্রতি প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত আচ্ছন্নতায় ভোগে তার জীবনে ও মুক্তি চেতনায় ঔপনিবেশিক দ্বান্দ্বিকতা দুর্ভর এক শাস্তি।' (অমর্ত্য সেন, ২০১৬: ৯৩)।

উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর বিপুল আত্মত্যাগ ও ব্যাপক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে; আর শাসক হিসেবে অভিষিক্ত হয় বিগত শাসকদের পরীক্ষিত মিত্র অভিজাতশ্রেণি, যারা মগজে-মননে পশ্চিমা ভাবাদর্শলালিত। কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের ঔপনিবেশিকতা পুরনো আইন-আদালত-প্রশাসনিক ছকে নতুন করে চেপে বসে জনগণের কাঁধে। এভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা পায় উপনিবেশকদের পছন্দমাফিক সরকার, যা আসলে পুরনো জমিদারি বন্দোবস্তের আদলে দেশ-বিলিবণ্টনের নতুন ব্যবস্থা; যেখানে উপনিবেশবাদী কর্তৃত্বের রজ্জুতে বাঁধা থাকে নবীন দেশের সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক যে নামেই সরকার পরিচালিত হোক না কেন দেশ-শাসনে শাসকরা বরাবরই পশ্চিমের মুখাপেক্ষী, পশ্চিমকে সন্তুষ্ট রাখাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাটা পুরনোই—নিখাঁদ মধ্যস্বত্বভোগীর; উপনিবেশ-মুক্ত বিশ্বব্যবস্থায় পশ্চিমা পুঁজিবাদের দেশীয় প্রতিনিধির।

উপনিবেশকেরা যে ভূখণ্ডকে ত্যাগ করেছে তা দীর্ঘকালের দুর্নিবার শোষণে নিঃস্ব, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষায় জর্জরিত বিপুল জনগোষ্ঠীর ভারে ন্যুব্জ কঙ্কালসার দেশমাত্র। শাসন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশকেরা তাদের পুঁজি ও দক্ষ জনবল প্রত্যাহার করে নিলে নগদ অর্থ ও দক্ষ কর্মীর অভাবে দেশটির আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ থমকে দাঁড়ায়। নতুন শাসকদের অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা এবং মজ্জাগত দুর্বৃত্তায়ন পরিস্থিতিকে বিপর্যয়কর করে তোলে। অচিরেই জনগণের কাছে লব্ধ স্বাধীনতা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। জনগণের পুঞ্জীভূত হতাশা ও ক্ষোভকে পুঁজি করে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটে। ফলত ঐতিহ্যগতভাবে জনবিচ্ছিন্ন এই নেতৃত্বের মনে ক্ষমতা-হারানোর আতঙ্ক চেপে বসে; ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ক্ষমতান্ধ নেতৃত্ব হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদী। কারণ, জন্মগতভাবে পরাশ্রয়ী, সৃজনবন্ধ্যা, মধ্যস্বত্বভোগী এই শাসকশ্রেণির কাছে ক্ষমতাই হচ্ছে প্রার্থিত সচ্ছলতা-প্রাচুর্য-বিলাস-জৌলুস অর্জনের মুখ্য নিয়ামক। ক্ষমতা যেখানে জীবনের পরমার্থ, সেখানে যেকোনো প্রকারে ক্ষমতাবলয়ে থাকাটাই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র ব্রত। এই স্বার্থান্ধ রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভের কোন সমীকরণ নেই, নেই দেশাত্মবোধ বা জনকল্যাণ-ভাবনা। তাই রাজনীতি হয়ে ওঠে হিংসাশ্রয়ী ও দমনমূলক।

রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সুযোগে সদ্য স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রত্যাবর্তন ঘটে; সাহায্যের মোলায়েম নামে প্রত্যাহারকৃত পুঁজি বিনিয়োগ করে ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠনে।[২] জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে দরিদ্র দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠী সাহায্যের জন্য সাবেক প্রভুদের কাছে ধরনা দেয়। সাহায্যের শর্ত হিসেবে পশ্চিমি পুঁজি ও পণ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চায়ক আইন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যা নবীন রাষ্ট্রগুলোকে পরিণত করে মেট্রোপলিটন রাষ্ট্রের বর্ধিতাংশে।[৩] নবীন দেশে তারা নিজেদের উপস্থাপন করে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভিভাবক এবং উন্নয়ন সহযোগী বন্ধু হিসেবে। দুর্গতের ত্রাণকর্তা হিসেবে তাদের প্রতি দরিদ্র দেশের শাসক ও শাসিতের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা আরও

জোরদার হয়ে ওঠে। নতুন সরকার পশ্চিমা উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে দেশকে উন্মুক্ত করে দেয়; শিল্পোদ্যোগ বাদ দিয়ে দেশীয় পুঁজি মূলত ব্যস্ত থাকে বিদেশি পণ্যের বাজারজাতকরণে। স্থানীয় শিল্পের সীমিত বিকাশ ঘটে সস্তা শ্রমনির্ভর পণ্য পশ্চিমে জোগানের প্রয়োজনে। রাজনীতিবিদ-আমলা-পুঁজিপতিদের সমন্বয়ে একটি দুর্বৃত্তায়নচক্র গড়ে ওঠে। দুর্নীতিলব্ধ অর্থে তারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করে, বিদেশে বাড়ি কেনে, বিদেশের ব্যাংকে টাকা পাচার করে। একসময় বিদেশিরা দেশ দখল করে সম্পদ লুটে নিত; উপনিবেশোত্তর কালে দেশের অভিজাতগোষ্ঠীই সম্পদ লুট করে বিদেশে রেখে আসে।

তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিকেরা জনগণের ভোটে দেশ পরিচালনার যে দায়িত্ব পান, তাকে অনূদিত করেন ক্ষমতা হিসেবে; নিজেদেরকে চিহ্নিত করেন ক্ষমতাসীন বলে। আর এ ভাবনা থেকেই তাদের মধ্যে নিজেকে ক্ষমতাধর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভাবার রোগ চাড়িয়ে ওঠে, জনগণকে মাড়িয়ে দেওয়ার মত্ততা পেয়ে বসে। রাজনীতি চলে ঔপনিবেশিক নিয়মে বিভাজনের রাস্তা ধরে; জনগণকে একক সমগ্রে উদ্দীপ্ত করার পরিবর্তে গোষ্ঠীচেতনা বা সাম্প্রদায়িকভাবনায় বিভক্ত করে।[৪] জনগণকে জাতি, গোষ্ঠী, ভাষিক বা সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করে প্রধান জাতিগোষ্ঠীর অনুকূলে দেশের অভ্যন্তরেই প্রতিষ্ঠা করে উপনিবেশবাদ। এ লক্ষ্যে নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্যপুষ্ট সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং বিচার বিভাগ গড়ে তোলে। ঔপনিবেশিক কায়দায় স্বার্থপরতার বিভাজন বঞ্চিত জনগণের মধ্যে হিংসা-ক্রোধ ও বিদ্রোহ-বিচ্ছিন্নতার মনোভাব তৈরি করে; বৈষম্যের অনুভূতি তাদেরকে প্ররোচিত করে দেশবিরোধী ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে। দেশটিকে যখন নিজের দেশ বলে ভাবতে পারে না, তখনই একটি জনগোষ্ঠী দেশের ভেতরে নিজের দেশসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর রাষ্ট্র তখন সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের চেহারায় আবির্ভূত হয়, বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিকবাহিনীর কদর ও ব্যবহার দুটোই বাড়ে। দেশ সামরিকায়নের দিকে হাঁটে; জনগণের ট্যাক্সের টাকা ব্যয়িত হয় মারণাস্ত্র ক্রয়ে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য-দূরীকরণের মতো মৌলিক বিষয়গুলো চাপা পড়ে যায় সামরিকবাহিনীর পোষণ-তোষণের আতিশয্যে। অনুন্নত বিশ্বে নির্বাচিত সরকার নয়, সেনাবাহিনীই হচ্ছে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের বিশ্বস্ত মিত্র। সামরিক মহড়া ও প্রশিক্ষণের নামে প্রচুর আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে পশ্চিমারা তৃতীয় বিশ্বের সামরিককর্তাদের আনুগত্য কিনে নেয়। পশ্চিমের অস্ত্র, আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনে জেনারেলরা সরকারের কর্মকাণ্ডে অযাচিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তাকে পরিণত করে কাগুজে প্রতিষ্ঠানে, কখনো প্রত্যক্ষ সেনাশাসন জারি করে। নব্য উপনিবেশবাদের জিয়নকাঠি হিসেবে পশ্চিমারা বরাবরই গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে সিভিল সোসাইটি রাজপথের আন্দোলন গড়ে তোলে এবং জাতীয়তাবাদ আর শত্রু জুজুর ভয় দেখিয়ে সেনাবাহিনীকে জনপ্রিয় করে তোলে। এই ধরনের জনবিচ্ছিন্ন শাসকের জনগণের প্রতি কোন প্রতিশ্রুতি থাকে না, থাকে কেবল আত্মপ্রেম ও আত্মোন্নয়নের দায়বদ্ধতা, থাকে জনগণের প্রভু হওয়ার একাগ্র নিষ্ঠা।

ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের অনুকরণে নবীন রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায় আমলাতন্ত্র। জনসেবার চেয়ে ক্ষমতা প্রদর্শন, অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করা তাদের কর্মকাণ্ডে মুখ্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চারদেয়ালে বন্দি করে রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করে একচ্ছত্র আধিপত্য; নিজেদের প্রমাণ করে তারাই সরকার, রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। পদক্রমে তাদের স্থান সর্বাগ্রে; সব সেক্টর নিয়ন্ত্রণের গর্বিত অধিকার তাদের। তাদের অযাচিত প্রভুত্বে উপেক্ষিত হয় বিশেষায়িত জ্ঞান; নিষিদ্ধ থাকে নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন গবেষণা, নতুন জ্ঞানলাভের অভিযান। কর্তৃত্বের অবস্থানে থেকে তারা কেবল নিজেদের সুযোগ সুবিধাগুলোই নিশ্চিত করে আর অন্যদের বঞ্চনার ফাঁদে ফেলে নিক্ষেপ করে সীমাহীন হতাশায়। লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে স্থবির হয়ে পড়ে দেশের উন্নয়ন; দুর্নীতি হয়ে ওঠে সর্বজনীন। উত্তর-উপনিবেশী রাষ্ট্রে পুলিশি ব্যবস্থা চলে উপনিবেশী আইনের অধীনে, যেখানে পুলিশ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়। আদালতও চলে উপনিবেশক কর্তৃক প্রবর্তিত

আইনের অধীনে; একটি স্বাধীন দেশের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই আদালতের মাধ্যমে পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

পশ্চিমা উপনিবেশবাদ প্রাচ্যমন থেকে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করে সেখানে পশ্চিমা জ্ঞান ও ভাবধারাকে প্রোথিত করেছে; শিশুদের শেখানো হয়েছে ইউরোপীয়রা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রগতির সূচনাবিন্দু। উত্তর-উপনিবেশকালেও প্রাচ্যমনে পশ্চিমা জ্ঞানের আধিপত্য পূর্ণপ্রতাপে সক্রিয় রয়েছে। এখনো প্রাচ্য নিজেকে মাপে পশ্চিমের মানদণ্ডে, নিজেকে সাজায় পশ্চিমের আদলে, জগতকে দেখে পশ্চিমের চোখে। প্রাচ্যমনে এ ভাবনা চিরন্তন মর্যাদা পেয়ে গেছে যে, পশ্চিমের জ্ঞানকাণ্ড মানেই আধুনিক, প্রগতিশীল, সর্বজনীন। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী এখনো উপনিবেশকের ভাষায় কথা বলে; ঐ ভাষায় তৈরি সকল সূচক, সমস্ত চিন্তা তার ছায়া নিয়ে উপনিবেশিতের সকল কার্যকলাপ, চিন্তা-ভাবনা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যতদিন উপনিবেশিত উপনিবেশকের ভাষায় কথা বলবে, ততদিন উপনিবেশক উপনিবেশিতের মনোজগতে থেকে যাবে। এটি হচ্ছে প্রাচ্যের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা আর পশ্চিমের জন্য শক্তি। প্রাচ্যের আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পিত হয় পশ্চিমের অনুকরণে; সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার, ভালো সিনেমার পুরস্কার অস্কার। চিকিৎসাশাস্ত্রে পশ্চিমি সূত্রগুলো চূড়ান্ত কথা, স্থানীয় চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি ডাক্তারদের অবজ্ঞা ও উদাসীনতা সীমাহীন।

ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ভোগবাদী ও মুনাফামুখী, যার ভাববস্তু হলো: 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত স্বল্পায়তনের শিক্ষিতশ্রেণি ধনাঢ্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। হতদরিদ্র মানুষদের কাছে এই ধনীরাই পরিণত হয় 'স্বপ্নের মানুষে'; তাদের মধ্যে চলে বড়লোক-বন্দনা আর গুপ্ত অবচেতনে থাকে বড়লোক হওয়ার বাসনা। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও ঔপনিবেশিকতাসৃষ্ট দুর্বৃত্তায়ন ও স্বার্থপরতা আরও গভীর হয়েছে। সামাজিক পিরামিডের পাদদেশে শতকরা প্রায় ৭৫ জন অতি দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষ, যাদের বর্তমান ভয়াবহ এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনের যথার্থ উত্তরসূরি হিসেবে ধনতন্ত্রের পরিপোষক। ঔপনিবেশিক ও দেশীয় ধনবাদীদের মুনাফার দিকে মুখ করে রাষ্ট্রীয় সকল নীতিমালা প্রণীত হয়ে থাকে। এই মুনাফা-উন্মত্ত শিল্পপ্রয়াসে পরিবেশ-ভাবনা নির্বাসিত, জনস্বার্থ উপেক্ষিত: বন-জঙ্গল উজাড় হচ্ছে, জলাভূমি ভরাট হচ্ছে, কারখানা-বর্জ্যের নিশ্চিত গন্তব্য হচ্ছে নদীনালা, খালবিল। এই ব্যবস্থায় পুঁজির গতিতে জিডিপি বাড়ছে, ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে সম্পদ, জীবনযাপনে জৌলুসও বাড়ছে তাদের; বিনিময়ে বর্জ্যের স্তূপে চাপা পড়ছে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ; অপরিসীম দারিদ্র্য, অপুষ্টি আর দুরারোগ্য সব ব্যাধির যন্ত্রণা নিয়ে ধুঁকছে বৃহত্তর প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

উত্তর-উপনিবেশী বাস্তবতা— ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ছেদনযন্ত্রে বাংলা, পাঞ্জাব, তথা ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে (১৯৪৭); কিন্তু বিভক্তি কোনো চূড়ান্ত সমাধান দিতে পারেনি। যে শত্রুতার বাতাবরণে রাষ্ট্র দুটোর জন্ম, সেই শত্রুতার আবহ থেকে কখনোই তারা বের হতে পারেনি। বরং পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, একে অপরকে ঘায়েল করতে প্রধান দুটো দেশই আধুনিক সমরাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে; যুদ্ধাবস্থা সবসময়ই বিরাজমান। এতে দুই দেশের জনগণের কোনো উপকার হয়নি; সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে গেছে। দেশবিভাগের উন্মত্ততায় বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হয়ে এক গভীর সংকটে নিপতিত হয়েছে। এই ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষগুলো ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অন্তত বাস্তুহারা ছিল না; স্বাধীনতা

তাদের উদ্বাস্তু করেছে; কেড়ে নিয়েছে পায়ের নিচের ভূমি, মাথার উপরের ছাদ; স্বাধীনতা তাদের জীবনে বয়ে এনেছে ভয়াবহ দুর্যোগ, ঠিকানাহীনতা। স্বাধীনতা তাদেরও প্রার্থিত ছিল, কিন্তু এমন বাস্তুচ্যুতির স্বাধীনতা নয়। আর বাস্তুতে যারা টিকে থাকে, প্রতিকূল পরিবেশে তাদের অনেকেই মানসিক উন্মূলতায় ভোগে। সীমান্ত জুড়ে কাড়ি কাড়ি গোলাবারুদ দিয়ে সারি সারি সৈন্য মোতায়েন এবং দেশের অভ্যন্তরে কোন জাতি-গোষ্ঠীকে উৎখাত করলেই দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত হয় না। এর প্রতিকারের জন্য দরকার প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা এবং নিজ দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলা। হিংসা ছড়িয়ে হিংসা নির্মূল করা যায় না, নিজের সুরক্ষাও নিশ্চিত করা যায় না। তাতে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ে, সেই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদও বাড়ে, দেশের ঐক্য ধ্বংস হয়, দেশকে নির্মাণের বদলে টুকরো টুকরো করার প্রবণতা তৈরি হয়। বিচ্ছিন্নতায় নয়, যূথবদ্ধতাই মানবপ্রগতির প্রধানতম শর্ত, যৌথ উদ্যোগেই মানুষ তার অস্তিত্বে সাবলীল হয়ে ওঠে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও শিক্ষিতশ্রেণি প্রখর বিচারবুদ্ধি, নির্মল যুক্তি ও উদার মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন হতে পারেনি; সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিসদৃশ সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা নেতৃত্বে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ হলেও ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্রের বদলে ফ্যাসিস্ট জনতাতন্ত্রের (mobocracy) ঝোঁক প্রবল হয়েছে। বহুজাতিসত্তার পরিচয়কে মুছে দিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে শুরু হয় বহু সম্প্রদায় ও বহুভাষিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিলীন করে হিন্দিবলয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংসাত্মক চর্চা। আর দুই ভূখণ্ডে বিভক্ত পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ তার পূর্বাংশ পূর্ববাংলাকে পরিণত করে তার নতুন উপনিবেশে। জন্মাবধি পাকিস্তানে কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। রাজনীতিবিদদের উগ্র স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রপরিচালনায় অদক্ষতার সুযোগে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এখানে আমলাতন্ত্র ও সমরতন্ত্র জেঁকে বসে। রাজনীতিবিদদের অতিমাত্রায় ভারতবিদ্বেষ ও ভারত কর্তৃক নিরাপত্তাঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিধর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। একপর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অপসারিত করে রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বেশ্বর হয়ে ওঠে সামরিক বাহিনীর শীর্ষকর্তারা। পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব এতটাই গভীর যে, বিশ্বে দেশটি পরিচিতি পেয়েছে সামরিক বাহিনীর দেশ হিসেবে। পাকিস্তান পূর্ববাংলার ওপর আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বাঙালি জাতিকে এক সামূহিক বৈষম্যে নিপতিত করেছিল। উপনিবেশবাদ যে কায়দায় জনগণের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করেছে, একই কায়দায় এই দুই স্বাধীন দেশের শাসকেরাও নিজের দেশ ও জনগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পোড়ামাটিনীতি গ্রহণ করে। ফলত একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় স্বাধীন দেশে নতুন করে উপনিবেশিত হওয়ার বোধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে নৃগোষ্ঠী দমনে বাংলাদেশ একই কৌশলের আশ্রয়ী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সাম্প্রদায়িকতা কিছুই দিতে পারে না, সহিংসতা ও ঘৃণা ছাড়া। ক্ষুদ্রস্বার্থের সাম্প্রদায়িকতায় জাতীয় সমস্যার সমাধান নেই; দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি প্রকৃতই নির্ভর করে ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে। নেতৃত্বের উদারতাই কেবল শান্তিপূর্ণভাবে দেশের ঐক্যকে নিশ্চিত করতে পারে। ভারত উপমহাদেশের দেশসমূহের ট্র্যাজেডি হলো ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি; আর গুটিকয়েক রাজনৈতিক নেতৃত্ব যাঁদের মধ্যে সেই গুণাবলি ছিল, স্বার্থান্ধ, ক্ষুদ্রমনস্ক রাজনৈতিক নেতৃত্বের আধিপত্যে ও বিরোধিতায় সেই নেতৃত্ব বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। ফলত, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কেবল ভারতবর্ষের অতীতকেই ক্ষত-বিক্ষত করেনি; বর্তমান ও ভবিষ্যতকেও অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের দেশসমূহে শিক্ষাক্ষেত্রে পরাধীন ঔপনিবেশিক যুগের উত্তরাধিকার অন্ধভাবে বহন করে চলছে। শিক্ষাবিস্তারে ম্যাকলের পদাঙ্কই এখানে একনিষ্ঠভাবে অনুসৃত।[৪] একটি আত্মনির্ভর স্বাধীন রাষ্ট্রনির্মাণের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও চাহিদাকে সামনে রেখে গবেষণাভিত্তিক একটি সুসমন্বিত ও অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বাংলাদেশে। বহুমুখী ও বহুস্তরে বিভাজিত এই শিক্ষাব্যবস্থা যেমন কার্যত

অনুৎপাদনশীল, তেমনি বৈষম্য সৃষ্টিকারী। বাংলাদেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটি বিন্যস্ত হয়েছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও স্থানীয় একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা-সংহতকরণের উপায় হিসেবে। পুঁজিবাদের নিয়মে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা 'উন্নয়ন', 'প্রবৃদ্ধি' এসব ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত; পুঁজির প্রবৃদ্ধি-সহায়ক জনগোষ্ঠী উৎপাদনে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেশি।[৫] পশ্চিমি মডেলের শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে জনগণকে নিরক্ষরতামুক্ত করার কার্যকরী উদ্যোগ যেমন উপেক্ষিত হয়েছে, দক্ষ কর্মীলোক সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষারও প্রসার হয়নি।[৬] বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা এখনো চাকরিমুখী আর চাকরির নির্ধারকশক্তি সার্টিফিকেট। এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রাজ্ঞ, ক্ষুরধার চিন্তাশীল, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, মানবিক মূল্যবোধে শানিত, আত্মপ্রত্যয়ী, ব্যক্তিত্ববান ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি হয়েছে কমই। একারণেই রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন সর্বত্র বৈশ্বিক মানদণ্ডে আমাদের অবস্থান পশ্চাদ্‌পদ। আর রাষ্ট্রের ছড়ানো প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যারা সৃজনশীলতা ও মেধায় উৎকর্ষ অর্জন করে তারাও নিজ দেশে মেধাচর্চার যথোপযুক্ত ক্ষেত্র না পেয়ে অথবা উন্নত জীবনের স্বপ্নে পশ্চিমে পাড়ি জমায়। আর বিপুল সংখ্যক তরুণ নিজেদের 'অযোগ্যতা' ও 'অকর্মণ্যতা'-র ছাপচিহ্ন গায়ে মেখে পরিবার ও দেশের জন্য গভীর হতাশা বয়ে আনে।

শিল্পায়নে বাংলাদেশ আজও ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার পরিপোষক। স্থানীয় কাঁচামাল ও দক্ষ জনশক্তিনির্ভর যে ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা নিজস্ব শিল্পবিকাশের প্রয়োজনে ধ্বংস করে দিয়েছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পরও সেগুলোর পুনর্বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় পুঁজি উৎপাদনে না গিয়ে বরং বিদেশি পণ্যের বাজারজাতকরণে নিবেদিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাটশিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। পরিবেশবান্ধব শিল্প হিসেবে পাটশিল্পের একটি বিশ্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। অতীতে বাংলাদেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। সরকারি মিলগুলো দেওলিয়া, শ্রমিকদের বেতন বন্ধ। অথচ বৈশ্বিক পরিবেশ সচেতনতার যুগে পাটজাত পণ্যের বিশ্বব্যাপী বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছে; সামনে রয়েছে অতীতের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার এক সোনালি সম্ভাবনার হাতছানি।

শুধু বাংলাদেশ নয়, তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলো শিল্পায়নের নামে পরিবেশ ও উন্নয়নকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিছু কোম্পানি ও গোষ্ঠীস্বার্থে প্রকৃতি ধ্বংস করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার নেতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বৃহৎ পুঁজির অধীনে অনুন্নত দেশগুলোতে কৃষিখামার গড়ে ওঠেছে, পুরনো দিনের ছড়ানো-ছিটানো খাদ্যপণ্যের বাজারগুলো কর্পোরেট বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের এই যথেচ্ছাচারী বিক্রিবাট্টাকে 'কৃষি বিপ্লব' নাম দেওয়া হয়েছে। প্রগতির সমার্থক হিসেবে খ্যাতি পাওয়া এই বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অপরাধের মহাকাব্য। পৃথিবীর ২০ ভাগ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের জন্য তথাকথিত কৃষি ও খাদ্য বিপ্লব দায়ী। উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংস কতটা বিপর্যয়কর তা বাংলাদেশের মতো অনুন্নত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বন উজাড় করে, কৃষিজমি ও জলাশয় গ্রাস করে, বাতাসে বিষ ঢেলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা মোটেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ নয়, সহাবস্থানই টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

সাম্রাজ্যবাদ নিরাপত্তার অজুহাত তুলে সামরিক খাতে বিপুল বিনিয়োগকে বৈধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসতো মারণাস্ত্রেরই ইতিহাস; সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বময় বিস্তৃতি ও আধিপত্য স্থাপনের সাফল্যের নেপথ্যে তো আধুনিক মারণাস্ত্র ও সুপ্রশিক্ষিত সামরিকবাহিনীর ভূমিকাই মূখ্য। পশ্চিমি পুঁজিবাদী বিশ্ব অজেয় হয়ে উঠেছে সমরাস্ত্রের জোরেই। তাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে দেশপ্রেম মানেই সামরিক তৎপরতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত তুলে দেশে দেশে ভয়ানক মারণাস্ত্র হাতে দিয়ে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে অবাধ্য দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করতে। ভারত, পাকিস্তানের মতো সাবেক উপনিবেশিত দেশগুলোও সামরিক খাতে

বিপুল খরচে অকৃপণ; জনগণের জীবনমানের উন্নতির বিষয়টিকে উপেক্ষা করে দেশের সামরিকায়নে বিপুল পরিমাণ খরচকে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে জায়েজ করা হয়; দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণও ক্ষুধার্ত উদর ও রোগক্লিষ্ট দেহে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। দেশের সীমান্তের নিরাপত্তাই জনগণের মৌলিক চাহিদার চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। এভাবে রাষ্ট্র বা প্রশাসনিক নির্দেশে মানুষকে বন্দি করা হচ্ছে অথবা মানুষ স্বেচ্ছাবন্দি হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পূর্ববাংলা হয়ে যায় পূর্বপাকিস্তান; ধর্মের সাম্যবাদী খোলস ছেড়ে পূর্ববাংলাকে শোষণ করতে লিপ্ত হয় পাকিস্তানি শাসকেরা। এই শোষণপ্রক্রিয়ায় বাঙালি সহযোগীর অভাব হয়নি। আদমজি, বাওয়ানি, দাউদদের মতো বেনিয়া গ্রুপ ও তার সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক চক্র শোষণ করে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ প্রথমবারের মতো স্বাধীনতা অর্জন করে আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা মিশে যায় সর্বভারতীয় হিন্দি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও শোষকদের উৎপাত কমেনি; আদমজি, বাওয়ানির জায়গা দখল করেছে কিছু দেশীয় গ্রুপ। রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আমলারা সাহায্য করছে সমাজশোষণে, রাতারাতি ধনীতে রূপান্তরিত হচ্ছে কিছু মানুষ; কঙ্কালসার সাধারণ মানুষের অবস্থা তথৈবচ।

জনগণের সম্মিলিত ও সর্বাত্মক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসন থেকে মুক্তি মাত্রই সর্বার্থে মুক্তি নয়; পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের মুক্তি। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রকাঠামোর সকল ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগের পুনর্বিন্যাস; পূর্ববর্তী ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের উপযোগী একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। লেখক, প্রাবন্ধিক, জীবনশিল্পী ঔপন্যাসিক বৃহদর্থে কথাসাহিত্যিকের দায়িত্ব এই অভীপ্সাকে জীবনে, সমাজে, শিল্পে রূপায়িত করা; ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সৃজন করা। একথা স্মরণে রেখেই ১৯৪৭-২০০০ সময়পর্বে রচিত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি উত্তর-উপনিবেশবাদী অবলোকনের প্রয়াস হিসেবে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পরিকল্পিত হয়েছে। এখানে উপন্যাসের অবয়বে অনুসন্ধান করা হয়েছে বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া এবং উপদ্রুত মানুষের ঐতিহাসিক ক্ষতগুলোকে; মানুষের মুক্তির স্বপ্ন এবং স্বপ্নঘেরা আত্মত্যাগের বিপুল উন্মাদনাকে; রক্তরঞ্জিত স্বাধীন দেশে জনজীবনে ঔপনিবেশিক দুর্ভোগগুলোর প্রত্যাবর্তন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। একই সঙ্গে অনুসন্ধান করা হয়েছে স্বাধীন দেশে বিপুল জনগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক চক্রাবর্তে আটকে থাকার কার্যকারণ এবং মুক্তি-অন্বেষী পন্থা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. 'উত্তর-ঔপনিবেশিক জগতে বহু উদ্ভট প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি হলো অ-পশ্চিমি মানুষদের অনেকের নিজেদের মূলগতভাবে 'অপর' মনে করার প্রবণতা। তাঁরা তাঁদের পরিচয় নির্ণয় করতে যান প্রধানত পাশ্চাত্যের মানুষের সঙ্গে পার্থক্যের ভিত্তিতে। ... যদিও এই অ-পশ্চিমি এবং কখনও কখনও পশ্চিমবিরোধী মনোভাবগুলিতে ঔপনিবেশিক আধিপত্য থেকে স্বাধীন হবার প্রচণ্ড চেষ্টা থাকে –– যদিও সে নির্ভরতা নেতিবাচক ও বৈপরীত্যকামী। অধীনস্থ মনের দ্বন্দ্ব তীব্র পক্ষপাতদুষ্ট ও পরনির্ভরতাপ্রবণ প্রতিক্রিয়ানির্ভর আত্মবীক্ষণের জন্ম দেয়। তার ওপর এই অদ্ভুত চিন্তাধারা পশ্চিমকে 'দেখে নেবার' একটা মনোবাঞ্ছার রূপ নিতে পারে। ... অথবা এটা পাশ্চাত্য জগতের অতীত ও বর্তমান নানা অন্যায়ের অবতারণা করে সমকালীন দুনিয়ায় ন্যায়বিচার খোঁজের রূপও নিতে পারে। আবার এর রূপ হতে পারে অনেকটা সদর্থক–– যেমন 'পশ্চিমকে ধরে ফেলা'-র ইচ্ছেতে, 'পশ্চিমকে নিজের জমিতে হারিয়ে দেবার' প্রয়াসে কিংবা এমন একটা সমাজ গড়ার প্রচেষ্টায় যা দেখে 'পশ্চিমদেশীয়রাও বাহবা দিতে বাধ্য হবে'। সদর্থক পরিকল্পনাগুলিতে হয়তো সংশোধনমূলক বা প্রতিশোধকামী প্রকল্পগুলির মতো প্রতিস্পর্ধিতা বা বেহিসেবি রাগ থাকে না, কিন্তু তা হলেও এগুলি নিজস্ব পরিচয়কে গভীরভাবে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে অধীনস্থ করে তোলে। আজকের উত্তর-

ঔপনিবেশিক মনের ওপর গতকালের ঔপনিবেশিক প্রভুদের অবিরত প্রভাব এখনও প্রবল।' (অমর্ত্য সেন, ২০১৬: ৯২)।

২. উপনিবেশ ত্যাগ করলেও নবীন দেশের সঙ্গেই তাদের স্বার্থ জড়িত। কিন্তু প্রত্যাহারকৃত পুঁজি নিজদেশে বিনিয়োগ কম লাভজনক। ফলে পুঁজিবাদ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়। আসলে পুঁজিবাদের আসল স্বার্থ অনুন্নত দেশগুলোর সঙ্গেই নিহিত। পরিস্থিতিটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফানো বলেন : 'পাশ্চাত্য দেশগুলো স্বার্থপরতা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বকে পরিত্যাগ করতে থাকলে, পিছে ঠেলে দিতে থাকলে, বা নিদেনপক্ষে স্থবিরতায় আবদ্ধ করে ফেললে অনুন্নত দেশের জনগণ একটা সম্মিলিত অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে তাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করবে। ফলে পাশ্চাত্য শিল্প অতি দ্রুত তাদের বৈদেশিক বাজার হতে বঞ্চিত হবে। তাদের যন্ত্রপাতি গুদামে উৎপাদিত পণ্যের পাহাড় গড়ে তুলবে; ইউরোপীয় বাজারে ট্রাষ্ট আর অর্থনৈতিক গ্রুপগুলোর মধ্যে মারমার কাটকাট সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। ফ্যাক্টরীতে তালা লাগবে; শ্রমিক ছাঁটাই হবে, বেকারত্ব বাড়বে– এই সমস্ত কিছুই ইউরোপীয় শ্রমিককে বাধ্য করবে পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।' [ফাঁনো (অনুবাদ: আমিনুল) *জগতের লাঞ্ছিত*, ২০১৭: ৭৮]।

৩. প্রকৃতপক্ষে এই foreign aid হচ্ছে সদ্য উপনিবেশমুক্ত দেশগুলোর ওপর পুরনো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী মুখোস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবেই তুলে ধরেছেন 'foreign aid'–এর মাহাত্ম্য : 'foreign aid is a method by which the United States maintains a position of influence and control around the world, and sustains a good many countries which would definitely collapse or pass into the Communist bloc.' (বিনয়, ২০১৬ : ১৬৩ থেকে উদ্ধৃত)।

৪. 'conforms rather closely to the old colonial pattern of building up a highly educated elite with an attached lower rank of technical personnel functioning as subalterns while leaving the population at large in a state of ignorance.' (Gunner Myrdal : Asian Drama, vol. iii, 1968, Pelican edition, p.1669)।

৫. 'Most authorities are agreed that the best way of reconciling economic expendency with the technical requirements of a country is a sound growth of secondary education, providing the army of trained … persons who are so greatly needed as technicians, clerks, nurses, agricultural assistants, supervisors, foremen and businessmen, who also in all these capacities from the basis of solid citizenry.' (Adam Culre: Educational Strategy for Developing Societies, London, 1963, p. 86)।

6. 'Higher education has collapsed or is collapsing in most third-world countries. … The reasons for the decline of higher education are multiple. One has been the confused and in someways very uncreative attitude of nationalist governments toward language. On the one hand, these post-colonial states want to impose linguistic orthodoxy suitable to the nationalist mythology. In Pakistani nationalist mythology Urdu, of a Persianized variety, is official language. In India it is Hindi, of a Sanskritized variety. … These are the requirements of the nationalist orthodoxy on the one hand. On the other hand, these are all countries that are organically linked to the capitalist market, meaning they are linked to the imperial metropolis, old or new, either Britain or America, Frence or America. The result is that they have two sets of standards, one real, the other theoretical. …

Second, we all inherited a colonial system of higher education. These post-colonial governments had no will or desire to introduce an alternative system of education. The rhetoric and the structure they announced was that of independence. The reality was that of higher education based on colonial premises and systems. The educational

system in this new setting of post-colonial statehood became increasingly dysfunctional because it came under opposing, contradictory pressures.

Third, the functions of colonial education were different. … this education was supposed to produce not governors or citizens or educators or administrators of an independent state. It was all meant to produce servants of the empire. This we have continued to do to this day. But that is not the expectation from the educational system. Therefore, there is this increasing disjunction between expectation and reality.

Finally, …the world Bank, which by and large defines the preferences of post-colonial states. It discourages investments in higher education. The World Bank's line is that third-world countries don't need higher education, they need more literacy. Its policies are aimed at producing a relatively more skilled pool of workers and not people who can govern themselves.' (Ahmad, 2016: 16-17)|

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানশাসিত পূর্ববাংলাা উপন্যাস : উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণ

প্রায় দুই শত বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত বাংলার পূর্বাংশ পূর্ববাংলা পূর্ব-পাকিস্তান পরিচয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয় ভারতে। বাংলার এই খণ্ডায়নে মূলত দায়ী ছিল বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠে অসাম্প্রদায়িক পাটাতনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যর্থতা। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে শরৎ বসু, সুহরাওয়ার্দী, কিরণশঙ্কর রায়, আবুল হাসিম প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব সাম্প্রদায়িকতা-উন্মাদ নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ক্ষমতালিপ্সার কারণে ব্যর্থ হয়। উত্তর ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের আধিপত্যে দুই সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতৃত্বই সাম্প্রদায়িকতা প্ররোচিত দাঙ্গার মধ্য দিয়ে বাংলার বিভাজনকে অনিবার্য করে তোলে।

ভূপ্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ঘরানার হাজার মাইল দূরবর্তী দুই ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে জাতিগঠনের প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠী এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আর পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক। পূর্ববাংলার ছয় কোটি অধিবাসীর প্রায় সকলেই ছিল অভিন্নভাষী ও সমসংস্কৃতির মানুষ; আর পশ্চিম পাকিস্তানের চার কোটি লোক ছিল বহুজাতিক ও বহুভাষী। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীই ছিল নিজস্ব জাতিগত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ শাসনকাঠামোর অনেকে এবং পুঁজিপতি, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের বাইরে থেকে আসা মোহাজের। দুই ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই ছিলেন অজ্ঞ। তাই আধুনিক রাষ্ট্রে জাতিগঠনের মৌলিক ভিত্তি—যেমন ভাষা, সংস্কৃতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, জীবনাচার এসবকে উপেক্ষা করে ধর্মকেই তাঁরা জাতিগঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন, যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মূল দুই ভূখণ্ডের বাইরে থেকে আসা মোহাজেররা যে-কায়দায় পাকিস্তানের শাসনকাঠামোকে হস্তগত করে, তেমনি জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বহিরাগত উপাদানকেই মৌলিক ভিত্তি হিসেবে চাপিয়ে দিলেন। অন্যদিকে উত্তর ভারতকেন্দ্রিক অভিজাতশ্রেণি শাসক হিসেবে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান বলে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেদের ভাষা ও সংস্কতিকেই জাতিগঠনের মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হলেন। এই যুক্তিতেই দুই মূল ভূখণ্ডের বাইরের মোহাজেরদের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিজেদের ছাতার নিচে এনে একটি জাতিতে পরিণত করার উদ্যোগ চলে, যেখানে নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত হবে। পাকিস্তানের বহুজাতিক স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে এই কৃত্রিম জাতিগঠনের প্রয়াসকে স্বাতন্ত্র্যচেতন জাতিগোষ্ঠীসমূহ, বিশেষত বাঙালিরা মেনে নেয়নি। বাঙালিরা শাসকগোষ্ঠীর এই অপচেষ্টার মধ্যে নিজেদের অধস্তনতাকে আবিষ্কার করে এবং শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উগ্র স্বার্থান্ধতার কারণেই ভুলে যায় বহুজাতিক সমাজ নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রে জাতিগঠনের প্রত্যয় : 'একাধিক সমাজ থেকে একটিমাত্র সমাজ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, যদিও সর্বপ্রকার সমাজ দ্বারা একটা দেশ গঠিত হতে পারে।' (কামরুদ্দিন, ২০১৪: ৮৯)। পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক মোহাম্মদ আলী ছিলেন স্বভাবগত একনায়ক; তিনি কখনোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ব্রিটিশ ভাইসরয়ের মতো পাকিস্তানের একচ্ছত্র শাসনকর্তা হিসেবে নিজেকে বিবেচনা

করতেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অনুকরণে আমলাতন্ত্রকেই সর্বেসর্বা করে তুললেন। বিধানসভা ও মন্ত্রিপরিষদকে তিনি আমলাতন্ত্রের অধীন করলেন। পাকিস্তানের প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদ প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের শাসক হলেন। সরকারি কাজে অদক্ষতা এবং জিন্নাহ্‌র আমলা-প্রশ্রয়ের কারণে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর খাজা নাজিমুদ্দিন আমলা-আধিপত্যকে মেনে নিলেন। মন্ত্রিপরিষদের ওপর আজিজ আহমেদের কর্তৃত্বের নমুনা হলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই একোমোডেশন বোর্ড স্বহস্তে নেন এবং সেল্‌স ট্যাক্স কমিশনার নিযুক্ত করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রতিবাদ করলে মন্ত্রীকেই মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র চরমভাবে জেঁকে বসে। ভারত থেকে আগত প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের বিরোধিতার কারণে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সাধারণ পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। কারণ তাঁরা জানতেন, নিজেদের কোন নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা না-থাকায় নির্বাচন হলেই তাঁদেরকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হবে। যাঁরা পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে ক্ষমতাকেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অজনপ্রিয়; আইনসভায় প্রবেশ করেছেন পরোক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁরা জন-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এতটাই ব্যর্থ ছিলেন যে, নির্বাচন দিলে তাঁদের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মন্ত্রিপরিষদে তথাকথিত এমন বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের সঙ্গে জনগণের ন্যূনতম সংযোগ ছিল না। সাবেক মুসলিম লীগকে ভেঙে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নামে পুনর্গঠন করা হয়, যার কাজ ছিল খোলাখুলিভাবে সরকারের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন দেওয়া। এভাবে ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিকেরা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জারি করেন। সেনাবাহিনী ও আমলারা জানতো যে, মন্ত্রীদের কেউই জনসাধারণের প্রতিনিধি নন এবং এই সুযোগেই তাঁরা কৌশলে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব আদায় করে নেয়। পর্যায়ক্রমে রাজনীতিবিদদের সরিয়ে প্রথমে আমলাতন্ত্র দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হয় এবং সবশেষে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সামরিক যাঁতাকলে স্পৃষ্ট হয় পুরো পাকিস্তান, বিশেষত বাঙালি জাতিগোষ্ঠী। বাঙালি জাতিগোষ্ঠী পাকিস্তানের পুরো শাসনামল জুড়েই ছিল বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্যের সূত্রপাত হয় পাকিস্তানের শাসনকাঠামোতে বাঙালি নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাংলার প্রগতিশীল মুসলিম লীগ নেতৃত্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাকিস্তানের ক্ষমতাকাঠামোতে তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েন। নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় স্বার্থান্ধ, শোষণলিপ্সু অভিজাতশ্রেণির রাজনীতিকেরা। পূর্ববর্তী শাসকদের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে দমন-পীড়ন-শোষণের দক্ষতা আর স্বার্থপরতার যে মৌলিক শিক্ষা তাঁরা অর্জন করেছিলেন, শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে লব্ধ শিক্ষা ও দক্ষতার বহুমুখী চর্চায় লিপ্ত হন তাঁরা। অবধারিতভাবেই এই নব্যশাসনে সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হয়। বিশেষত, পূর্ববঙ্গে তারা কায়েম করে পূর্বতন ঔপনিবেশিক ঘরানার শাসন। বাঙালি মুসলমানকে তারা চিহ্নিত করে অধঃপতিত 'আধা মুসলমান' হিসেবে এবং ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে বাঙালি মুসলমানকে 'প্রকৃত মুসলমান' বানাতে সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে; প্রাণধর্মে উচ্ছল বাঙালি মুসলমানকে ধর্মের শেকলে বাঁধার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। হিন্দুয়ানি শোধনের কার্যক্রম শুরু হয় ভাষা দিয়ে; যুক্তি হলো মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুর ভাষা বাংলা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেতে পারে না। এই অপযুক্তির গভীরে নিহিত ছিল বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে শোষণোপযোগী প্রান্তিক কৃষক ও শিল্পশ্রমিকে স্থিত রাখা। মুক্তিকামী বাঙালি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী শাসকদের নব্য-উপনিবেশবাদী তৎপরতা রুখে দাঁড়ায়। এই প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়। এরপর জনপ্রিয়তা হারিয়ে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয় সামন্ত-প্রাধান্যপুষ্ট মুসলিম লীগ নেতৃত্ব, পরে ক্ষমতায় স্থলাভিষিক্ত হয় সামরিক একনায়কতন্ত্র। এই সামরিক শাসনে পৃষ্ঠপোষকতা জুগিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিশ্রেণি এবং পূর্বতন ঔপনিবেশিক শাসকদের নবতর সংস্করণ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী

দেশসমূহের নতুন মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অধীনে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির ওপর নেমে আসে সর্বাত্মক দমন-পীড়ন-শোষণ। কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি এই নব্য-ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ গড়ে তোলে; এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ভেতর থেকে পুনর্জাগ্রত হয় বাঙালির অন্তর্নিহিত সর্বজনীন জীবনবোধ, গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। ১৯৬১-র সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ছয়দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পথ বেয়ে ১৯৭১-এ এসে তা স্বাধীনতার সংগ্রামে পর্যবসিত হয়। একটি প্রবল রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পরিণতিতে বাঙালি তার স্বপ্নলালিত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানি অভিজাত ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি প্রভাবশালী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী পাকিস্তানি ধর্মকেন্দ্রিক মতাদর্শকে অন্ধভাবে সমর্থন করেছে এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিকামী বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং নৃশংস ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন বিনাশী অবশেষের চর্চা এবং গোষ্ঠী-স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বঞ্চনার ফাঁদে ফেলে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান একটি নেতিবাচক পরিচয় তৈরি করে। আর এই সুবাদে পাকিস্তান হয়ে ওঠে উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্ব চর্চার আদর্শ ময়দান।

পাকিস্তানি শাসনামলে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসে পূর্ববাংলার উত্তর-উপনিবেশী বাস্তবতার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তার উদ্‌ঘাটনই এই অধ্যায়ে আমাদের উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নের লক্ষ্যবস্তু।

উপন্যাসের উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণ

লালসালু[১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর অধীন পূর্ববাংলার উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম শক্তিমান ঔপন্যাসিক। প্রতিশ্রুতি ও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্যজগতে পদার্পণ করেছেন। প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর সাহিত্যকর্মের পটভূমি নিখাঁদ গ্রাম, বড়জোর মফস্বল শহর এবং চরিত্র-পাত্ররা বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণসমাজের দরিদ্র-নিরক্ষর-কুসংস্কার-নিমজ্জিত প্রান্তিক মানুষ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনীতি থেকে বহুদূরবর্তী এই মানুষদের নিয়ে রচিত আপাতনিরীহ কাহিনির মধ্যে রাজনীতির অনুসন্ধান অহেতুক বলেই ঠেকে; কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্ 'শতভাগ রাজনৈতিক সময়ের মানুষ'[২]। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বাংলা তথা ভারতবর্ষের হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাশবিক দাঙ্গা; পরিণতিতে দেশভাগের স্বাধীনতা ও ভারত-পাকিস্তানের অভ্যুদয়; সর্বোপরি ইতিহাসের বৃহত্তম বাস্তুহারা মানুষের মিছিল—ইতিহাস-কাঁপানো ঘটনাবলির তিনি প্রত্যক্ষদর্শী এবং পাকিস্তান আন্দোলনের অকপট সমর্থক। গ্রামীণ ও মফস্বলীয় পটভূমিতে রচিত 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসত্রয় আবর্তিত হয়েছে বৃহত্তর মানুষের জীবন-যাপন, স্বপ্ন-কল্পনা; যা ছিল ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক শাসনের উর্বর শোষণক্ষেত্র এবং যেখানে সংঘটিত হয়েছে বহিরাগত দুর্বৃত্ত শাসকদের শোষণ, জুলুম ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মুক্তিকামী মানুষের অবিরাম সংগ্রাম। ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসসমূহের ধারাবাহিক পাঠে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের একটি সর্বায়ব পরিচয় এবং শোষণসর্বস্ব পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত পূর্ববাংলার জনগণের সংগ্রাম দানা বেঁধে ওঠার পূর্ণায়ত পরিক্রমা। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের গভীরে রাজনীতির প্রতীকী উপস্থিতি সত্ত্বেও তাতে দাবানলের তীব্র দাহ নেই- এটা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অনন্য শিল্পসামর্থ্যের কৌশল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস *লালসালু* (প্রকাশকাল, জুলাই ১৯৪৮) রচনার শুরু অবিভক্ত বাংলার কলকাতায়, সাম্প্রদায়িক ভেদ-ভাবনাপ্রসূত তুঙ্গস্পর্শী উত্তেজনার রাজনৈতিক পরিবেশে; রচনার পরিসমাপ্তি ও

প্রকাশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায়। প্রকৃত অর্থে এটিই ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীন পূর্ববাংলার প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসটি বাহ্যত মজিদ নামক একজন ধর্মাশ্রয়ী ভাগ্যান্বেষীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি, কিন্তু মজিদের মহব্বতনগর শাসনের রূপকে বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক, উপনিবেশ-উত্তর পাকিস্তানি ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সম্ভাব্য শাসনব্যবস্থার এক অনুপম শিল্পভাষ্য। মজিদ অভাবতাড়িত জনপদের মানুষ, দেশত্যাগেই যাদের পরিত্রাণ। মজিদের দেশত্যাগের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষী ইউরোপীয়দের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার সাদৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। উন্মুলিত মজিদের প্রথম গন্তব্য 'গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল- সেখানে'। এই নির্জন অরণ্যে 'পায়ে বুট আঁটা' নতুন খোলস-পরা নব্যশিক্ষিত মুসলমান শিকারির সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে মজিদ খুঁজে পায় আত্মপ্রতিষ্ঠার অমোঘ মন্ত্র; এই শিকারি তার কাছে প্রতিভাত হয় লোভতাড়িত হিংস্র আশার ও সুযোগ সন্ধানের প্রতিমূর্তি হিসেবে; ধূর্ত মজিদ মুহূর্তেই আবিষ্কার করে নির্বিবেক জীবনসংগ্রামের পথ। সম্পদসমৃদ্ধ জনপদের সন্ধানে সে পাহাড় ছাড়ে; চমকপূর্ণ নাটকীয়তায় উপস্থিত হয় অনেকটা অবস্থাপন্ন গ্রাম মহব্বতনগরে। লিপ্ত হয় উপনিবেশ স্থাপনের এক 'সাংঘাতিক খেলা'য়। অচেনা-অজানা একটি ভূখণ্ডে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেই ভূখণ্ডের জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে সম্পদ-শোষণের কাজটি অত্যন্ত কঠিন; এর জন্য দরকার ঝুঁকি নেওয়ার অমিত সাহস, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্যের ভূখণ্ডে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজের গায়ে লাগাতে হয় শ্রেষ্ঠত্বের তকমা; স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে হয় নিকৃষ্ট ও অধঃপতিত হিসেবে; মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভেঙেচুরে তাদেরকে বশীভূত করতে হয় একান্ত আনুগত্যে। ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী বণিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসা করতে গিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনাচার ও চিন্তাভাবনার ওপর সুতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তাদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো নিয়ে বিশাল তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলে এবং সেই তথ্যভাণ্ডারস্ফুরিত জ্ঞানের প্রণোদনায়ই তারা প্রবৃত্ত হয় উপনিবেশ স্থাপনের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে। উপনিবেশ স্থাপনে সমরশক্তি প্রাথমিক অনুঘটক হলেও জ্ঞানের অগ্রগামিতাই ছিলো স্তম্ভস্বরূপ। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার দেশে দেশে উপনিবেশকেরা উন্নত মারণাস্ত্রের জোরে শাসন কায়েম করেছে; কিন্তু শাসনটা জারি রেখেছে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সম্মতির ভিত্তিতে। এ লক্ষ্যে স্থানীয়দের মনে মুগ্ধতার আবেশ তৈরি করতে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ধারক আখ্যান নির্মাণ করেছে এবং এই আখ্যানে বিমুগ্ধ প্রাচ্যজন ঔপনিবেশিক শাসনকে বরণ করেছে 'কল্যাণকর' বিবেচনায়। উপনিবেশায়নের এই সুচতুর কৌশলেই বাজিমাত করেছে মজিদ। এক্ষেত্রে মহব্বতনগর গ্রামের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ওপর ধীশক্তিজাত পর্যবেক্ষণে ভর করে সমবেত গ্রামবাসীর সামনে সে একটি বানোয়াট গল্প ফাঁদে, যার সারসংক্ষেপ হলো: এই গ্রামে সে এসেছে সুদূর গারো পাহাড় থেকে, স্বপ্নাদিষ্ট এক গুরুদায়িত্ব পালনার্থে এবং গ্রামবাসীকে এক গুরুতর পাপের কঠিন শাস্তি থেকে উদ্ধারকল্পে। স্বপ্নাদেশদাতা একজন কামেল পির এবং এই পির নিতান্ত অবজ্ঞা-উপেক্ষায় শায়িত আছেন এই গ্রামেরই এক জঙ্গলাকীর্ণ ভাঙা কবরে। গল্পটির অন্তিমে কামেল পীরের প্রতি উদাসীনতার জন্য মজিদ গ্রামবাসীকে সরোষ তিরষ্কারে ভূলুণ্ঠিত করে ফেলে; সে অবলীলায় বলে, 'আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্।' (*লালসালু*, পৃ. ৮)। একজন বহিরাগতের অযাচিত তিরষ্কারে গ্রামবাসী বিক্ষুব্ধ হয়নি, বরং লজ্জায় অধোবদন হয়েছে। সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাটিয়ে মজিদ বুঝে যায়, সে সঠিক জায়গায় এসেছে। কারণ অশিক্ষা-কুসংস্কার-দীর্ণ, আত্মচেতনাহীন মনোজমিনই উপনিবেশ স্থাপনের উর্বরক্ষেত্র। আখ্যানের পরিণতিতে মহব্বতনগর গ্রামবাসী বিনাবাক্যব্যয়ে ন্যুব্জমস্তকে নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে আগন্তুক মজিদের হাতে; তাকে অভিষিক্ত করেছে ত্রাতার আসনে, কর্তৃত্ব করার যাবতীয় অধিকার ও সম্পদ-সম্পন্নতা জুগিয়ে। মহব্বতনগরের পরবর্তী ইতিবৃত্তে মজিদই সর্বেসর্বা; আর অবশিষ্ট সকলেই স্বভূমে পরবাসী, মজিদের হুকুমমানা একান্ত অনুগত প্রজা।

মহব্বতনগরে মজিদের শাসন নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাগ্রসরতায় প্রতিষ্ঠিত; বুদ্ধির আধিপত্যে সে সকলকে নতজানু করেছে; বেঁধেছে আনুগত্যের শেকলে। যে গল্পটি সে ফেঁদেছে, তা গড়ে ওঠেছে তার প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্মদৃষ্টির নিপুণ পরিচর্যায়; যে বেনামা কবরটিকে কামেল পিরের মাজার বলে চালিয়েছে, সেই কবর চয়নেও মজিদের বুদ্ধির মুন্সিয়ানা বিস্ময়কর: 'গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাঁড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাঁড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মত। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?' মজিদের বুদ্ধি আর অভিনয়ের পারিপাট্যে নির্মিত আখ্যানটি মোক্ষম মারণাস্ত্রের মতো লক্ষ্যভেদে নিপুণ সাফল্য অর্জন করে; গ্রামের অশীতিপর প্রৌঢ় মানুষটিও হতভম্ব ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে অসহায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় মাজার; পরিত্যক্ত প্রান্তিক কবরই হয়ে ওঠে গ্রামের 'কেন্দ্র'। তবে প্রতারণার আশ্রয়ে অর্জিত ক্ষমতা আচমকা হারানোর ভীতিতে মজিদ সবসময় সন্ত্রস্ত। উল্লেখ্য, সকল উপনিবেশবাদীর কাছেই 'ভীতি' একটি ট্রমা; আর এই ভীতি-জয়ের জন্য তারা জনমনস্তত্ত্বে ভীতি ও ত্রাসকে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে দেয়। আর এ-কাজে তারা মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কঠোর কানুনিক জাল এবং ধর্মতন্ত্রকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্কৃতি ধ্বংস বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনমনস্তত্ত্বের পুননির্মাণের কৌশলটিও বিশেষ ফলদায়ক। বলাবাহুল্য, এই পুনর্নির্মাণ ছিল ঔপনিবেশিক ব্যাকরণেই প্রগতিবিমুখ; অধিকৃত জনগণকে অবশ-চেতন করার হীন-অভিপ্রায়ে পরিচালিত। যে ধর্মতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে ইউরোপীয়রা নিজদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বতোমুখী বিকাশ ঘটিয়েছে, উপনিবেশে তারা সেই পশ্চাদ্‌মুখী ধর্মতন্ত্রের পুনরুত্থানেই হয়েছে যত্নশীল। কারণ, ধর্মতন্ত্র মানুষকে ঈশ্বরের একক কর্তৃত্বে সমর্পিত এবং অলঙ্ঘনীয় নিয়তিবাদে দীক্ষিত করে; মানুষকে শেখায়, জগৎ-জীবনের সকল ঘটনাপ্রবাহই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত এবং এই নিয়তিকে প্রশ্নহীনভাবে মেনে-নেওয়াটাও ঈশ্বরের বিধান; আর ঈশ্বরের বিধানে সন্দেহ, পালনে শৈথিল্য বা অবাধ্যতার জন্য ভয়ানক পারলৌকিক শাস্তিভোগ সম্পর্কে সতর্কও করে। নিয়তি-সমর্পিত মানুষ জাগতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কামনা-বাসনার বিষয়ে হয় পরাঙ্মুখ। ধর্মতন্ত্র পারলৌকিক শাস্তির ঘেরাটোপে ফেলে নিশ্চেতন জড়তায় বন্দি করার পাশাপাশি জারি রাখে ইহজাগতিক শাস্তির কঠোর বিধি-বিধান। এভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধানের কারাপ্রাচীর তৈরি করে কার্যত মানুষের চিন্তা ও প্রশ্ন করার সামর্থ্যকেই শুষে নেয়; মানুষকে পরিণত করে এক জড়গ্রস্ত, পরবশ, নিষ্ক্রিয় সত্তায়। ধর্মতান্ত্রিক সমাজে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মবিকাশকামী, প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মানুষের জন্ম হয় না; তাই শোষণের শাসনটা হয় বেশ মসৃণ, নির্বিবাদ ও অপ্রতিরোধ্য। *লালসালু*-তে আমরা লক্ষ করি গ্রামবাসীর যে মূর্খতা ও অজ্ঞতার ভূমিতে মজিদ অর্জন করেছে অনায়াস-বিজয়, তার দৃঢ়ীকরণেই সে সমগ্র মনোযোগ ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে। ধর্মে উদাসীন জনগোষ্ঠীর মর্মে-মজ্জায় ধর্মতন্ত্রের প্লাবন ছুটিয়ে দেওয়া; অর্থাৎ, মহব্বতনগরের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনই হয়ে ওঠে মজিদের লড়াইয়ের নতুন ক্ষেত্র। মজিদের এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মের সত্যপ্রতিষ্ঠার কোনো সম্পর্ক নেই; ব্যাপারটি নির্জলা ইহজাগতিক এবং সম্পূর্ণত ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। মজিদ স্পষ্ট করেই জানে, মহব্বতনগরের ক্ষমতাকাঠামোতে সে একাকী একপক্ষ; বিপরীতে স্থানীয় পুরো জনগোষ্ঠীই তার বিপজ্জনক অপরপক্ষ; এমনকি স্থানীয় প্রভাবশালী সহযোগীও তার বিশ্বস্ত মিত্র নয়। দুই পক্ষের দ্বৈরথে প্রতিপক্ষের নিঃশর্ত আনুগত্যই হলো কর্তৃত্বের বুনিয়াদ; আর আনুগত্য বলয়িত হয় জ্ঞানবুদ্ধির প্রাগ্রসরতাকে কেন্দ্র করে। চিকন বুদ্ধির লড়াইয়ে মুহূর্তের অসতর্কতা ও ভ্রমেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে ক্ষমতার প্রাসাদ; তাই প্রতি মুহূর্তেই মজিদ বজায় রাখে টানটান সতর্কতা : 'মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোন দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুশিয়ার।' (পৃ. ৫৭)। মিথ্যায় সাজানো প্রতিষ্ঠার হাওয়াই বুনিয়াদটিকে কোনো কার্যকর ফলাফল ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে খাড়া রাখতে, মাজারের প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস-আনুগত্য ও নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখতে মজিদ নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবন করে এবং মহব্বতনগরকে পরিণত করে একটি সামাজিক কারাগারে। বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশিক শাসনে প্রতিটি উপনিবেশই একেকটি কারাগার; সেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আর সিদ্ধান্তের চারপাশে সযত্নে গড়ে তোলা হয় অবরোধের প্রাচীর। মজিদও স্বাধীনপ্রাণ মানুষকে পদে পদে ধর্মীয় কুসংস্কারের জালে বন্দি করে; প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন

আবর্তিত হয় তার ছকে-বাঁধা নিয়মে। মহব্বতনগরবাসীর কাছে মজিদের বিধান অলঙ্ঘনীয়; কারণ সে 'খোদার মানুষ', মাজার-উৎসারিত অলৌকিক ক্ষমতার বলে বলীয়ান এবং অলৌকিক ক্ষমতার জোরেই সে অন্তর্যামীও। অমিত শক্তিধর সর্বত্রগামী সত্তা হিসেবে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিষ্ঠা করে নিয়ন্ত্রণাধিকার, অর্থাৎ তার কর্তৃত্বের বাইরে কোনো কিছুকেই সে রাখতে নারাজ। তার নির্দেশে গান নিষিদ্ধ হয়, সজোরে হাঁটা হয় বারণ, হাসিতে জারি হয় অবরোধ, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যে ঘটে বিচ্ছেদ, সমাজে দাড়ি-টুপির বন্যা বয়, ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কলেমা শেখা ও সুন্নতে খাতনার হিড়িক পড়ে। তার পুনর্গঠিত সমাজ ভীতি-আতঙ্কের, স্তব্ধতার ও নিরানন্দের; মানুষের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা এখানে চূড়ান্তভাবে অবদমিত।

ধর্মের প্রতি উদাসীন জনগোষ্ঠীর মর্মমূলকে ধর্মতন্ত্রের শেকড়-বাকড়ে জড়িয়ে দেওয়ার কাজটি মজিদ শুরু করে নিজগৃহে; প্রথমা স্ত্রী রহীমার পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে। 'প্রশস্ত দেহ', 'ব্যাপ্ত-যৌবনা' রহীমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণে ছিল তার রিরংসাবহ্নি এবং স্বার্থসিদ্ধির নিখুঁত হিসাব : 'দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে ওঠেছিলো। ... সে লম্বা-চওড়া মানুষ। হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে বের করে নিয়ে আসে।' (পৃ. ৯)। এই শক্তিমত্তা নারীর সমস্ত সামর্থ্যকে নিজের ভোগ ও সমৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে প্রয়োজন তাকে মনে-মগজে অনুগত করা এবং মজিদ তা করে ধর্মতান্ত্রিক ভীতিতে রহীমার মনকে আচ্ছন্ন করে। মজিদ যখন বলে, 'অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।'(পৃ. ১০)––তখন রহীমার সমগ্র সত্তায় ভর করে পারলৌকিক শাস্তির এক গভীর ভীতি। আর 'শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়।' (পৃ. ১০)। কারণ এই খুশির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ত্রাসের শাসনে বেঁধে পুরো জনগোষ্ঠীর শ্রমসামর্থ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সাফল্য : 'গ্রামের মানুষেরা যেন রহীমারই অন্য সংস্করণ। ... রহীমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না?... ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।' (পৃ. ১০-১২)। মজিদ তাই গ্রামবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত জীবনধারাকে স্তব্ধ করতে 'বূত-পুজারী' 'গুনাগার' (পৃ. ১২) বলে তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং অপমানে-লাঞ্ছনায় মানুষকে করে তোলে পশুতুল্য অধম। সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞা কলেমা না-জানার অপরাধে 'লজ্জায় মাথা নত করে রাখে––গাধার মত পিঠে-ঘাড়ে সমান' (পৃ. ১৩)। 'জাহেলের দেশ'কে শুদ্ধ করতে বাপ-ব্যাটার খৎনা একসঙ্গে সম্পন্ন করে। মজিদ আরোপিত এই 'নির্ভেজাল কষ্ট' মানুষ ক্রোধ-দ্বেষ-প্রতিহিংসা ছাড়াই মেনে নেয় ধর্মের বিধান হিসেবে। ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে ইহজাগতিক ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করে জাগতিক ক্ষমতাকে নিঃশর্ত ও সর্বাত্মক করে তোলে: 'মহব্বতনগর গ্রামে সে-শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখা-প্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে।'(পৃ. ১৫)। তার শাসনে কল্যাণের ভান আছে, কিন্তু মুখোসের আড়ালে শুধুই স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা; তার ক্ষমতার পথের প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সে ভয়ঙ্কর হিংস্র, নির্মম প্রতিশোধপরায়ণ।

মজিদ মহব্বতনগরে যে রুহানি শাসন জারি করেছে তা যে অন্তঃসারশূন্য, বিশেষ করে মানুষের জাগতিক সমস্যা-সমাধানে অক্ষম বা কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ––এ-সত্য সময়পরিক্রমায় গ্রামবাসী সচেতনভাবে না-হোক, অবচেতনে হলেও উপলব্ধি করে। মাজার বা মজিদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নীরবে উদ্রিক্ত অবিশ্বাসসমূহ এক পর্যায়ে তার বিপর্যয়ের কারণ হবে ধূর্ত মজিদ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং আসন্ন বিপর্যয়রোধে বুদ্ধির চাতুর্যে প্রতিপক্ষকে অঙ্কুরে দমন করাতেই তার স্বস্তি। তাহেরের বাপ মজিদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতো না; বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাদের দাম্পত্য-কলহের বিষয়ে মজিদের অবহিত হওয়াকে কেন্দ্র করে : 'একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে-কথা সে বিশ্বাস করে না।'(পৃ. ১৯)।

মহব্বতনগরের অশিক্ষাদীর্ণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বুড়ো বুদ্ধিমত্তায় ও ব্যক্তিত্বে একজন অগ্রসর মানুষ; দরিদ্র হলেও আত্মসম্মানবোধ তার প্রখর। তাই একান্ত পারিবারিক সমস্যাকে বাইরে প্রকাশ তার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ও গ্লানিকর এবং এ-কারণেই হাসুনির মাকে সে প্রহার করে। এই ধরণের মানুষ মজিদের আধিপত্যের জন্য বিপজ্জনক; মজিদের বিবেচনায় 'লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।' (পৃ. ২১)। মজিদ যত প্রতাপশালীই হোক, একা তার বিচার করতে ভরসা পায় না; শাস্তিবিধানের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালীর সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। মজিদের এই অন্তর্নিহিত ভয় বুড়োর বুদ্ধিমত্তা ও শানিত ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভবের আশঙ্কাজাত। অবশেষে বুদ্ধির মারপ্যাচে মজিদ বুড়োকে ঘায়েল করে বুড়োর ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষে আঘাত করেই :

'হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

–তুমি কী মনে কর মিঞা? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে তোমার দিলে ময়লা নাই?

...মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ––এতদিন পর আজ সন্দেহ! ...

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও। ...

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছট্‌ফট্ করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে। ...

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী লোকটি কাঁদতে শুরু করে।' (পৃ. ২৩-২৪)।

মজিদের কূটবুদ্ধির কাছে পরাভূত বুড়ো শেষপর্যন্ত মজিদের উপনিবেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়। এভাবে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিয়তির অনিবার্যতাকে গেঁথে দেয় গ্রামবাসীর মর্মমূলে : 'মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ – যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে – সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। ...ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই।' (পৃ. ২৭)। কিন্তু মজিদের শিক্ষার ফাঁক গলে মানুষের মনে জাগ্রত থাকে 'দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ' জীবন-তৃষ্ণা, ভারাক্রান্ত হয় অপ্রাপ্তিজনিত বেদনাভারে। আর নিয়তির আপ্তবাক্যে মজিদ তার ক্ষমতার বন্ধ্যাত্বকে আড়াল করতে চাইলেও ফাঁকিগুলো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তাই মজিদ ও মাজারে আস্থা হারিয়ে মহব্বতনগরের মানুষ দলে দলে ছোটে আওয়ালপুরের পিরের শরণ নিতে। অস্তিত্ব-সংকটের মুখে পড়ে মজিদের প্রতিষ্ঠা; তবে 'চিকন বুদ্ধিরশ্মি'র জোরেই শেষপর্যন্ত সংকটমুক্ত হয় মজিদ। আওয়ালপুরের পীরের আস্তানায় গিয়ে তার জনসমুদ্রপ্রতিম ভক্তকুলের উপস্থিতিতে মজিদ বিস্ময়কর সাহসিকতায় পিরের কর্মকাণ্ডকে 'শয়তানি, বে'দাতি' বলে তিরস্কারে তুলোধুনো করে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে এবং মহব্বতনগরবাসীর জন্য পিরের ত্রিসীমানায় ঘেঁষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু গ্রামবাসীর মন থেকে দোটানার ভাব কাটে না; আর খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান স্ত্রী আমেনা বিবি তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে মজিদে আস্থাহীন, 'বাঁচা-মরার' কামনা-পূরণে আওয়ালপুরের পিরই তার একান্ত ভরসা; এমনকি স্ত্রীর কথায় সম্মতি দিয়ে খালেক ব্যাপারীও মজিদের প্রতি অবচেতনে-সৃষ্ট অনাস্থারই প্রকাশ ঘটায়। তবে স্ত্রীর অনুরোধ-রক্ষায় মজিদের ভয়ে ব্যাপারী গোপনীয়তা অবলম্বন করে। ঘটনা ফাঁস হলে মজিদ 'মেয়েমানুষেরও অধম' বলে খালেক ব্যাপারীর পৌরুষকেই জখম করে আর প্রবল আক্রোশে উভয়কেই নির্মমভাবে শায়েস্তা করে। শাস্তিদানে ধর্মের আবহ থাকলেও মজিদ এখানে নর-নারীর দাম্পত্য-সম্পর্কের চিরায়ত স্পর্শকাতর বিষয় 'সন্দেহ'কে ঘনীভূত করে তোলে সন্দেহাতীত ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে : 'সন্দেহের কোন কথা নাই। পানি পড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোন কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মত সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।' (পৃ. ৫৭)। মজিদের কথা অভ্রান্ত এবং তার নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়; খালেক ব্যাপারী মজিদের নির্দেশ কায়েম করে। মজিদের কুটিলবুদ্ধির রোষবহ্নিতে আমেনার সন্তান-বুভুক্ষা অনুত্তীর্ণ সতীত্ব-পরীক্ষার পথ ধরে এক ভয়ানক অপমানজনক

ও মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করে। উল্লেখ্য, উপনিবেশ-স্থাপনের স্বাভাবিক নিয়মেই মজিদ তার ক্ষমতাবলয়ের অংশ করে নেয় স্থানীয় প্রভাবশালী মাতব্বর খালেক ব্যাপারীকে; কিন্তু খালেক ব্যাপারীর ওপর সুস্পষ্ট আধিপত্য মজিদের; আর এই আধিপত্য আপাতদৃষ্টিতে ধর্মোৎসারিত হলেও কার্যত সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তির। প্রচুর বিত্তের মালিক হওয়া সত্ত্বেও খালেক ব্যাপারী মজিদের বুদ্ধির কাছে মার খেয়েছে; মজিদের প্রতি অসহায় আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য হয়েছে। মজিদ সূক্ষ্মবুদ্ধির খেলোয়াড়; তার প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত ছিল সুপরিকল্পিত ও সুগভীর চিন্তাপ্রসূত; তার প্রতিটি চাল বুদ্ধির সূক্ষ্ম নিয়মে বাঁধা, যার আগাম আভাস পাওয়াও সাধারণের পক্ষে দুষ্কর। বুদ্ধির কৌশলী খেলায় সে যে-কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে আয়ত্তে এনেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থানকে প্রতিহত করেছে নিপুণ দক্ষতায়। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সে বুদ্ধির চাতুর্যেই ভণ্ডুল করে দেয়; তার জনপ্রিয় অস্ত্র ধর্মের দোহাইও পাড়তে হয় না। 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?'––স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাহীন এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নেই হতভম্ব হয়ে যায় আক্কাস। স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে মজিদ 'পোলা মাইন্ষের বদ খেয়াল' বলে উড়িয়ে দেয়; প্রস্তাব তোলে 'দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা পাকা মসজিদ' নির্মাণের। এভাবে মজিদের কৌশলী চালে স্কুল-প্রতিষ্ঠার সভা মুহূর্তেই মসজিদ প্রতিষ্ঠার সভায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। মজিদ কেবল স্কুল প্রতিষ্ঠার বর্তমান চেষ্টাকেই বানচাল করেনি, এ ধরণের ভবিষ্যৎ উদ্যোগকেও স্তব্ধ করে দেয় : 'মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।' (পৃ. ৬৩)। মজিদ জানে উপনিবেশ স্থাপনে বুদ্ধির আধিপত্যটাই মূল পুঁজি; আক্কাসও জানে উপনিবেশ ভাঙার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকেই অস্ত্র বানাতে হবে। পশ্চিমি সভ্যতার বুদ্ধিনির্ভর আধিপত্যের মোকাবিলা করতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে––এডওয়ার্ড সাইদ একথা বলেছেন ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *Orientalism* গ্রন্থে; আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপনিবেশ-মুক্তির এই পথ বাতলেছেন *লালসালু*-তে ১৯৪৮-এ। আক্কাস উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর অগ্রসর অংশ, যে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মজিদকে মোকাবেলা করতে চেয়েছে; কিন্তু এই সংগ্রামে আক্কাস একাকী, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মজিদেরই পক্ষে; সেটা ভয়-আতঙ্ক ও ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতার কারণেই।

নিশ্ছিদ্র পাহারা সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে মজিদের প্রতারণাসর্বস্ব শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরালো হতে থাকে; প্রবল প্রতিরোধ আসে তার দ্বিতীয়া স্ত্রী জমিলার কাছ থেকে; মাজারের শাসনকে সে শুধু অবজ্ঞা করে না, প্রত্যাখ্যানও করে। মজিদের ধাপ্পাটা সে বুঝতে পারে সন্তানহারা এক মায়ের আর্তনাদে : '... কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, - সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।' (পৃ. ৭০)। কিন্তু বুড়ির শোকাগ্নি প্রশমনে মজিদ অক্ষম : 'মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে।' (পৃ. ৭০)। এই ঘটনায় মজিদের জান্তব লালসায় নির্মিত মাজারের অন্তঃসারশূন্যতা এবং মানুষের সর্বস্বহরণে মজিদের নির্লজ্জ পারদর্শিতা সম্পর্কে জমিলা নিঃসন্দেহ হয়। ফলত জমিলার মনে উদ্রিক্ত হয় মাজারের প্রতি পাথরপ্রতিম ঘৃণা ও ঔদাসীন্য। মাজারের প্রতি জমিলার অবজ্ঞার সমানুপাতে জমিলার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদাভীতি জাগানোর মজিদের কৌশলী প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু 'এতো করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের'। (পৃ. ৮২) জমিলার অনমনীয় অবাধ্যতায় মজিদ দিশেহারা বোধ করে; যে কুটিল বুদ্ধির খেলায় মজিদ একে একে সবাইকে ধরাশায়ী করেছে, জমিলার বেলায় সেই বুদ্ধি অকার্যকর; অসহায় মজিদের সরল স্বীকারোক্তি : 'আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না।' (পৃ. ৮০)। বুদ্ধির সীমানা যেখানে শেষ, আধিপত্যের লড়াইয়ে পাশবিক সহিংসতার শুরু সেখান থেকে। জমিলার অবাধ্যতা ও অবজ্ঞায় মজিদ উন্মত্ত হয়ে ওঠে, 'গোঁ গোঁ করে ক্রোধে'; টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলে মাজারের দিকে। পক্ষান্তরে জমিলাও থরথর করে কাঁপে, 'ভয়ে নয় ক্রোধে'; আর মজিদের জুলুমের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধও চলে অবিশ্বাস্য পথে : গোটা গ্রাম যার ধর্ম-সম্মোহনে বশীভূত, এক রত্তি মেয়ে জমিলা 'পিচ করে তার মুখে থু থু নিক্ষেপ করে'। এটা এক নিরুপায় নিগৃহীতের উৎপীড়নকারীর প্রতি সমস্ত সত্তা-উৎসারিত ঘৃণার প্রবল বিস্ফোরণ। কিন্তু মজিদ দমে না; বরং

অবাধ্যের প্রতি তার দমন-স্পৃহা পাশবিক হিংস্রতায় পরিণত হয়; চ্যাঙদোলা করে বাড়ির বাইরের লালসালুতে ঢাকা মাজারে এনে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিময় রাত্রির ঘোর অন্ধকারে জমিলাকে পশুর মতো দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। নিতান্ত দুর্বল এক কিশোরীর আনুগত্য-অর্জনের এই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নিষ্ঠুর চেষ্টায় প্রতিফলিত হয় উপনিবেশবাদী শক্তি তার অস্তিত্ব-সংকট নিয়ে কতটা সন্ত্রস্ত; উদ্দেশ্যপূরণে সে কতটা হিংস্র এবং স্বভাবে কতটা নীচপ্রকৃতির। মজিদের 'নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা'র মুখেও জমিলা আত্মসমর্পণ করে না, তার কণ্ঠে উদ্ধারের আর্তি বা করুণার প্রার্থনা নেই, মাজারের ভেতরে শুনশান নীরবতা। মাজারের নৈঃশব্দ্যে মজিদেরই ধৈর্যের বাধ ভাঙে; নিজেই এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপ খোলে এবং বিমূঢ়-বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে : 'লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোঝা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতন সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।' (পৃ. ৮৯)।

ঘৃণার নির্বাক বিস্ফোরণে মজিদের সাম্রাজ্য বিদ্যুচ্চমকের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মানুষ যতই দুর্বল হোক এবং তার ওপর যতই শোষণ-দমন চালানো হোক, যতক্ষণ সে পরাভব স্বীকার করে না, ততক্ষণ সে পরাভূত নয় এবং তার ওপর কোনো শক্তিরই বিজয় সম্পূর্ণ হয় না। জমিলার পরাজয় না-মানার অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে মজিদের দম্ভ, ক্রোধ এবং শাসন—সব স্তব্ধ হয়ে যায়। লক্ষণীয় বিষয়, মজিদের পরাভব এক অবলা নারীর কাছে; এর মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনার্থ নিহিত। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বাংলা তথা ভারতকে চিহ্নিত করেছে নারীর অবয়বে এবং বিপরীতে নিজেকে উপস্থাপন করেছে অমিততেজ পুরুষ হিসেবে। এই ধরনের চিহ্নায়নে অবশ্য তাদের সমর্থন জুগিয়েছে ভারতীয় মিথ। এই মিথে নারী অবলা এবং নিজেই নিজের নয়; তার মালিকানা পুরুষের এবং নিঃশর্ত আনুগত্যে পুরুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত হওয়াই তার ধর্ম। এই যুক্তিতেই উপনিবেশবাদীরা দুর্বল ভারতীয়ের শরীর-মন, কর্ম ও সম্পদের ওপর নিজের অধিকার দাবি করে এবং ছলে-বলে-কৌশলে তা আদায় করে নেয়। ধর্মের সত্য হিসেবে নারী যতক্ষণ এ ব্যবস্থাটাকে মেনে নেয় পুরুষের আধিপত্যটা ততক্ষণ টিকে থাকে; আর নারী যদি এ ব্যবস্থাটিকে শোষণ হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে পুরুষের আধিপত্যের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে; অর্থাৎ শাসনের স্থিতির জন্য শাসিতের সম্মতিটাই আসল ব্যাপার।

উপন্যাসের শেষভাগে প্রথমা স্ত্রী রহীমারও মজিদের প্রতি পর্বত-প্রমাণ আনুগত্যে ধস নামে; তার নিটোল আনুগত্যে চিড়টা আগেই ধরেছিল এবং চূড়ান্ত ধসটা ছিল অনিবার্য। রহীমা মূর্খ হলেও মানুষ হিসেবে সে নিশ্চেতন ছিল না নিঃসন্দেহে। দশ-বারো বছরের দাম্পত্যসূত্রে মজিদের সকল কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছে। মজিদের গভীর সান্নিধ্যে মানুষের সহজাত শিখন-ক্ষমতার বলেই খুব ধীরে হলেও রহীমার মধ্যে মজিদের ধূর্তবুদ্ধি ও প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়। হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদের কামনাসক্তি রহীমার দৃষ্টি এড়ায় না এবং তার গহনচৈতন্যে মজিদের অতিমানবীয়ত্ব হোঁচট খায়। জমিলাকে বাগে আনতে না-পারার অক্ষম মুহূর্তে মজিদ যখন রহীমার সাহায্য প্রার্থনা করে বলে, 'তোমারে জীগাই, তুমি কও' (পৃ. ৮০), তখন সে 'নোতুন এক মজিদ'কেই আবিষ্কার করে। যে অলৌকিক ক্ষমতার দুর্ভেদ্য উচ্চতায় মজিদ নিজেকে স্থাপন করেছিল, রহীমা আচমকাই বুঝে যায় মজিদ আদৌ তেমন কিছু নয়, হতাশা-দুঃখ-অক্ষমতায় আহাজারি করে-ওঠা তারই সমতলের এক সাধারণ মানুষ। মজিদের অলৌকিকত্বে রহীমার বিশ্বাসের অবশেষটুকু মুছে যায় জমিলার প্রতি নিষ্ঠুর তাণ্ডবে। জমিলার আনুগত্য আদায়ে মজিদ যে উন্মত্ত আচরণ করে, রহীমা তাতে ধর্মের লেশও দেখতে পায় না, রহীমার কাছে তা প্রতিভাত হয় একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের নৃশংসতা হিসেবে। উপন্যাসের অন্তিমে তাই মজিদের প্রতি রহীমার আচরণে শ্রদ্ধা-ভয় কিছুই পরিলক্ষিত হয় না; তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ-বিদ্রোহের অনলকণা : 'ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?' (পৃ. ৮৮)। রহীমা এখানেই থামে না, মজিদকে উদ্দেশ্য করে বলে : 'আপনে ওরে নিয়া আসেন ভেতরে।' (পৃ. ৮৮)। এ তো স্বামীর প্রতি অনুগত স্ত্রীর বিনীত কোনো অনুরোধ, আদেশের সুস্পষ্ট ঝংকার। হতভম্ব মজিদ রহীমার

নির্দেশ পালন করে; মজিদের পরাভব চূড়ান্ত হয় রহীমার কাছে। বলাবাহুল্য, প্রতারণাসর্বস্ব নৃশংস শাসনের বিরুদ্ধে রহীমার এই দ্রোহী উত্তরণ আপতিক নয়, এই উত্তরণ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিয়ম মেনে এবং নারীর মাতৃত্ব-উৎসারিত শাশ্বত কল্যাণবোধ থেকে। যে ক্ষমতার সৌধ মজিদ মিথ্যার ইট-পাথরে তিলে তিলে গড়ে তুলেছে অবশেষে ভেতর থেকে তা গুঁড়িয়ে যায়; অবিরাম শিলাবৃষ্টিতে সর্বব্যাপ্ত শস্যহানি তারই প্রতীকী ব্যঞ্জনা। বিপর্যয়ে মজিদ টাল খায়, কিন্তু পরাভব স্বীকার করে না; ধ্বংসস্তূপের গভীর থেকে অনমনীয় ভঙ্গিতে সে তার লড়াইটা চালিয়ে যায়, প্রতারণার বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলটাকে জারি রাখে; ধানের ধ্বংসস্তূপের সামনে আর্তনাদরত গ্রামবাসীর চোখে 'বিশ্বাসের পাথরে খোদাই-করা চোখ' রেখে অনায়াসে ধমকে ওঠে : 'নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।' (পৃ. ৯০)। মজিদরা দমে না, দমলে তাদের চলে না, নতুন রূপে নতুন নতুন বুদ্ধির কৌশলে তাদেরকে অবিরাম প্রতারণার ফাঁদ পেতে যেতে হয়; কারণ এটা উপনিবেশিতের ওপর তাদের আধিপত্য ধরে রাখার লড়াই; এর গভীরে লুকিয়ে আছে ব্যক্তিস্বার্থ প্রণোদিত অর্থনৈতিক শোষণের হিসাব। প্রতারণায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে জারি রাখতে মজিদকে সর্বক্ষণ এক অনিঃশেষ চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে; এই চাপে তার কখনো কখনো ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়েছে; কিন্তু শেষপর্যন্ত শাণিত বুদ্ধিমত্তায় ও পরম ধৈর্যে চরম প্রতিকূল অবস্থাকেও সামলে নিয়েছে। *লালসালু* উপন্যাস আমাদের জানায়, ইতিহাসের বিশেষ পর্বে এসে ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে; দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইউরোপীয় জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণসাধনে ব্যর্থ হয়েছে, জ্ঞানের পীড়নে ইউরোপ বিধ্বস্ত করেছে সমগ্র বিশ্বকে; বিশ্ব পরিণত হয়েছে তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের ময়দানে; আধুনিক জ্ঞান ইউরোপকে অপরিমিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে, বিনিময়ে নোংরাভাবে নিঃস্ব করেছে অবশিষ্ট বিশ্বকে। সময়পরিক্রমায় দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, একপর্যায়ে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশ থেকে শাসনও গুটিয়ে নিয়েছে; কিন্তু চাতুর্যের সঙ্গে সেখানে বহাল রেখেছে ঔপনিবেশিক স্বার্থ। যাদের হাতে তারা ক্ষমতা অর্পণ করেছে তারা ঔপনিবেশিকতারই ভাবশিষ্য; মননে-মগজে-ভাবাদর্শে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নতুন শাসকেরা পূর্বতন শাসকদের উত্তরসূরিমাত্র; তাদের শাসনের ধরণ, প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য সবই একই রকম। এই কারণেই মজিদকে একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসকের প্রতিভূ রূপে চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য নয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ সাম্প্রদায়িকতার বিষবীজ ছড়িয়ে বাংলা তথা ভারতকে পরিণত করে সাম্প্রদায়িকতার উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে; পরিণতিতে ভারত লাভ করে দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীনতা; বারো শ মাইল দূরবর্তী দুই বিপরীত ঘরানার ভূখণ্ডের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের। বিভক্ত বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলা অন্তর্ভুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করলেও তার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে। বাঙালি জাতিগোষ্ঠী তার রাষ্ট্রসত্তার জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের শিকার। মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের কর্মকাণ্ড ও গ্রামবাসীর অসহায়ত্ব সমকালীন পূর্ববঙ্গের প্রতীকী বাস্তবতা। *লালসালু* উপন্যাসের সামগ্রিক পরিবৃত্ত প্রতিনায়ক মজিদ-কেন্দ্রিকতায় সম্পন্ন। তার অবস্থান কোটি কোটি মানুষের বিপরীত মেরুতে হলেও বাস্তবতা হচ্ছে সে-ই সবাইকে এবং সবকিছুকে ছাড়িয়ে সর্বময়। এর জন্য দায়ী মহব্বতনগরের অধিবাসীদের শত শত বছরের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। *লালসালু* উপন্যাসের এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিস্ময়করভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশিত পূর্ববাংলার সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রায়োগিক নিষ্পন্নতার চূড়ান্ত পর্বে লিখিত এই উপন্যাসে নবসৃষ্ট রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ দর্শন উপস্থাপিত হয়েছে অনন্য শিল্পকুশলতায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে ছিল ব্রিটিশঘনিষ্ঠ অভিজাত মুসলমানেরা; আর অকুণ্ঠ সমর্থন জুগিয়েছে খেঁটে-খাওয়া সাধারণ বাঙালি মুসলমান জনতা। অভিজাত মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থের নিরাপদ সংরক্ষণ; বিপরীতে সাধারণের চাওয়া ছিল হিন্দু জমিদারদের

শোষণ-লাঞ্ছনার অবসান ও অর্থনৈতিক দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভ। নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক শিক্ষালালিত 'আধুনিক' নামাঙ্কিত মুসলমানেরা, *লালসালু*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যাদের পরিচয় এঁকেছেন অনন্য শিল্প-কুশলতায় : 'এক সরকারি কর্মচারী ...পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।' (পৃ. ৫)। এরা ম্যাকলে পরিকল্পিত নকল মানুষ, যারা স্বভাবে কপট, স্বার্থপরতায় ধূর্ত, শোষণ-দমনে ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতোই পারদর্শী এবং প্রভুর কায়েমি স্বার্থরক্ষায় নিবেদিত। এদের হাতে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত—এবিষয়ে নিশ্চিত হয়েই ঔপনিবেশিক শাসকেরা উপনিবেশ ত্যাগ করে। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নব্য শাসকেরা জনমানুষের ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ-দমনের ধারাবাহিকতাই বজায় রাখে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অভিজাত মুসলমান নেতৃত্বের কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল না; মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই ছিল তাদের একমাত্র দাবি। স্বাধীনতার পরেও এর শাসকগোষ্ঠী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে কোনো আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বা রূপরেখা হাজির করতে পারেনি এবং সেই সদিচ্ছাও তাদের ছিল না। এমতাবস্থায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোয় পূর্ববাংলা পরিণত হয় এক নতুন উপনিবেশে; পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর মতোই নতুন শাসকেরা বাংলার জনগণকে শোষণোপযোগী অধস্তন হিসেবেই বিবেচনা করে। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ধর্মই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রশাসনের চালিকাশক্তি; বাঙালিকে প্রকৃত মুসলমান বানানোর লক্ষ্যে চলে হিন্দুয়ানিমুক্ত করার সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পুনর্নির্মাণযজ্ঞ। উদ্দেশ্যের বিচারে এই ধার্মিকতা ছিল মুখোশমাত্র; জনগণকে প্রতারণায় বিভ্রান্ত করে ক্ষমতাকাঠামো দখল ও অর্থনৈতিক শোষণের উপায়। এই রাষ্ট্রকাঠামোর অংশ হিসেবেই ধর্মের মুখোশে মজিদ অবলীলায় মিথ্যা বলে; আক্কাসের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নাকচ করে দেয় 'তোমার দাড়ি কই মিঞা?'- এই প্রশ্নবাণে; অর্থাৎ যার দাড়ি নেই ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে তার বক্তব্য থাকার অবকাশ নেই। এখানে 'গরিব মানুষ, খাইবার পাই না' 'বেহুদা' কথা মাত্র; এই রাষ্ট্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বায়বীয় বিষয়ের প্রতি আনুগত্য। স্বৈরতান্ত্রিক শাসক চায় আপন ইচ্ছা বাস্তবায়নের অপরিমিত ক্ষমতা, সকলের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও জনগণের নিঃশর্ত আনুগত্য। কর্তৃত্বে প্রতিবন্ধকতা বা আনুগত্যে অনীহা ও শৈথিল্য স্বৈরতন্ত্র সহ্য করে না; মজিদও সহ্য করেনি, অবাধ্যের ওপর হিংস্র দমন-পীড়ন চালিয়ে তার ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করে তুলেছে। মজিদ চেয়েছে মহব্বতনগরের সম্পদ ইচ্ছেমতো আত্মগত করার অধিকার এবং এক্ষেত্রে গ্রামবাসীর অসংকোচ সম্মতি। ধর্মের আনুগত্যে বেঁধে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে অবাধে শোষণ করার প্রতীক হয়ে ওঠে রহীমা। রহীমার সর্বস্ব-নিংড়ানো সম্পদেও মজিদের সন্তুষ্টি আসে না; ভোগ ও শোষণের নতুন ক্ষেত্র চাই তার। মজিদ রহীমাকে বলে, 'বিবি আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম?' (পৃ. ৬৬)। মজিদ রহীমার সম্মতি চায়, কিন্তু সম্মতিটা অনিবার্য নয়; মজিদের ইচ্ছেটাই চূড়ান্ত। নতুন মসজিদ নির্মাণ ও দ্বিতীয় বিয়ে প্রায় একই সময়ে সম্পন্ন হয়। নববধূ জমিলাকে সদ্য রাষ্ট্রের মতোই ধর্মের বর্মে সাজাতে উদ্যোগী হয়। 'দুলার বাপ'-এর বয়সী মজিদকে স্বামী হিসেবে বরণে জমিলা বাধ্য হয়; এটি যেন পাকিস্তানের আধা-ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনকে পূর্ববাংলার অসহায় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার শামিল। জমিলাকে আনুগত্যের শৃঙ্খলে বাধতে মজিদ ধর্মের ফাঁদ পাতে; তার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মনিরপেক্ষ মনোজমিনে ধর্মের বীজ রোপণে মজিদ নিয়োগ করে তার সর্বশক্তি। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় মূহ্যমান জমিলা অনুভব করে, 'সে যেন খাচায় ধরা পড়েছে।' (পৃ. ৭৫)। এই বন্দিত্বের অনুভূতি তার মধ্যে আত্মজাগরণ ঘটায়; ধর্মসহযোগে মনস্তাত্ত্বিক পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে সে স্বকীয় জীবনধারাপুষ্ট আত্মপরিচয়কে রক্ষা করে অনন্য দৃঢ়তায়। পাকিস্তানি শাসকদের বাঙালি সংস্কৃতির ইসলামিকরণের প্রয়াস এবং এর আড়ালে পরিচালিত দমন-পীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর অনমনীয় প্রতিরোধের আগাম রূপায়ণ ঘটেছে মোদাচ্ছের পিরের কবরে জমিলার পদাঘাতে। জমিলা এখানে 'একরত্তি মেয়ে' নয়, হয়ে ওঠে পাকিস্তানি শোষণ-অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বাঙালি জাতিসত্তায় উদ্বুদ্ধ এক অপরাজেয় জনগোষ্ঠীর প্রতীক। কবরে পদাঘাতযুক্ত অচেতন জমিলার বুকে নারীসুলভ চিহ্নের অবলুপ্তি জমিলার নারী থেকে একজন পরিপূর্ণ প্রতিবাদী মানুষে উত্তরণের ব্যঞ্জনাবাহী। শতাব্দী পরম্পরায় বহিরাগত শাসনে দুর্বল-নিঃস্ব 'নারীপ্রতিম' বাঙালি

জাতির ঐতিহাসিক আত্মজাগরণ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের চিত্রটি জমিলার রূপকে আভাসিত। চিত্ত যার স্বাধীন, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যে বিভোর, কোনো অপশক্তির দমন-পীড়নই তাকে পরাভূত করতে পারে না। মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা একবার জেগে উঠলে সর্বস্ব বাজি রেখে সে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামটি চালিয়ে যায়––এই কথা জমিলার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। জমিলার ক্ষোভ যে-ধূমায়িত সম্ভাবনা জাগায়, তারই পরিণতিতে মাজারের গায়ে তার অসচেতন পদস্পর্শ মহব্বতনগরের অগণিত মানুষের জাগরণ-প্রত্যাশাকেই সংকেতিত করে তোলে। উল্লেখ্য, উপনিবেশবাদী কৌশলগুলো দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে আমাদের সমাজ মনস্তত্ত্বে কত গভীরভাবে গেঁথে গেছে এবং ঔপনিবেশিক ধাচের শোষণ-জুলুম-প্রতারণা স্বাধীন দেশে কতভাবে সক্রিয় আছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজসমীক্ষার আকর গ্রন্থ হিসেবেও *লালসালু* বিশেষ মূল্যবান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক অসংগতি ও তার অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ধারণা ছিলো সুস্পষ্ট। উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থান্ধ নীতি ও ভুল রাজনীতি জনমানুষের, এমনকি রাষ্ট্রের নিজের, অস্তিত্বকে কীভাবে বিপন্ন করে তুলতে পারে *লালসালু*-তে নির্মিত হয়েছে তার আগাম-ভাষ্য। এ বিষয়ে ড. ভীষ্মদেব চৌধুরীর শনাক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'ওয়ালীউল্লাহ ধর্মের ভিত্তিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, ধর্মকে ব্যবহার করে কায়েমি স্বার্থবাদী ধর্মতান্ত্রিকতার উন্মুল বাসনা ও মারমুখী শোষণকৌশলকে শিল্পিত করে তুললেন। ভাষার প্রশ্নে অসন্তোষও যখন দানা বেঁধে ওঠেনি, আনন্দের উচ্ছ্বাস আর স্বপ্নময় ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় যখন এক অখণ্ড ধর্মীয় জাতীয়তার তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় সংহতির রক্ষাকবচ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, তখন লালসালুর আত্মপ্রকাশ এক মহা বিস্ফোরণ; দীর্ঘ আন্দোলন, আশাদীপ্ত বিশ্বাস আর রাষ্ট্রীয় সংহতির নিয়ামক ধর্মের রাজনৈতিক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংকেতিত প্রতিবাদ, নিশ্চিতভাবে অনতিদূর ভবিষ্যৎ-দর্শনও।'[৩] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই অনতিদূর দর্শন আরও বাঙ্ময় হয়েছে তাঁর পরবর্তী উপন্যাসদ্বয় *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে।

ক্রীতদাসের হাসি[৪]

শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২) সম্পর্কে সমালোচক মহলের ঐকমত্য এই জায়গায়–– উপন্যাসটি 'প্রতীকাশ্রয়ী' (সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০১০ : ১১৫) এবং তাতে প্রতিফলিত হয়েছে পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক শাসনে পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিষ্পেষিত হওয়ার চিত্র। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের মতামতও অভিন্ন। রূপকাশ্রয়ে পাকিস্তানি শাসককে বোকা বানানোর পরিতৃপ্তি আছে ঔপন্যাসিকের আত্মভাষ্যে : 'ক্রীতদাসের হাসি–সবই কল্পনা। কাচের ঘরের আসবাবের মত। সবই নানা মাত্রায় বিস্তারিত– আরব্য উপন্যাসের কথা ত ছুতো হিসেবে ব্যবহৃত। তদানীন্তন পাকিস্তানের কথা স্মরণ রেখো। আইয়ুব শাহীর দাপট– এ স্বৈরাচারী ব্যারাকে জন্ম জান্তাদের ধমক-চমক-দম্ভ-আস্ফালনে গোটা দেশ রুদ্ধশ্বাস। তখন লেখা এই বই। তাই আর্তনাদেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। তবে আমি (তখনকার জনসংখ্যা) পূর্ব-পাকিস্তানের ৮ কোটি বাঙালির পক্ষ থেকে ওই রাজত্বের মুখে থুথু দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলুম। ... ১৯৬২ সনে ক্রীতদাসের হাসি বছরের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে পুরস্কৃত হয়। আইয়ুব খান নিজ হাতে আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন। পরে যখন ওদের আক্কেল গজাল, তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। বইটা বাজেয়াপ্ত করা যায় না আর। প্রেসিডেন্টের মুখ থাকে কী ভাবে? বহুকাল পরে আটাশ বছর পরে– আমি আজো মাঝে মাঝে দুষ্টামির হাসি হাসি পুরাতন দিন স্মরণে। একদা আমি শাসকদের আহম্মক বানাতে পেরেছিলাম।' (শিরিণ আখতার, ১৯৯৩:)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যে সামরিক স্বৈরতন্ত্র চেপে বসে দেশ জুড়ে, বিশেষত পূর্ববাংলায়। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে সূচনাতেই শাসনক্ষমতা জনবিচ্ছিন্ন অভিজাত সামন্তগোষ্ঠী এবং পুঁজিপতিশ্রেণির মুঠোবন্দি হয়। সামরিক ও বেসামরিক আমলারাও এই ক্ষমতাবলয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় বিশেষ মর্যাদায়। শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থপরতায় চরমভাবে উপেক্ষিত হয় সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার তথা সামগ্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এক উপনিবেশ থেকে আপাতভাবে মুক্ত হয়ে অচিরেই পূর্ববাংলা পরিণত হয় আরেক নব্য-উপনিবেশে। অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর প্রতি

বাঙালি জনগোষ্ঠীর সমর্থন তলানিতে নেমে আসে এবং ক্রমপুঞ্জীভূত বিক্ষোভের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সনে ভাষা-আন্দোলনে, অতঃপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ দলীয় অভিজাতগোষ্ঠী শাসনক্ষমতা থেকে নির্বাসিত হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা হয় তিরোহিত। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করতে তাই তাঁরা ষড়যন্ত্রের পথে সামরিক শাসনকে ত্বরান্বিত করে। দুশো বছরের ঔপনিবেশিক স্বৈরতন্ত্রকেও ছাপিয়ে গেলো এই সমরতন্ত্র। ব্রিটিশ শাসনে সামরিক বাহিনীর ওপর সিভিল প্রশাসনের কর্তৃত্ব ছিল সুবিদিত, কিন্তু পাকিস্তানে সিভিল প্রশাসনকে ডিঙিয়ে সেনাবাহিনীই হয়ে ওঠে সর্বময় কর্তা, সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার পর সেনাপ্রধান আইয়ুব খান হন শাসনক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। রাজনীতি নিষিদ্ধ করে এবং পার্লামেন্ট ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে অস্ত্রের শাসনকে জবাবদিহি ও আইনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়। কয়েক বছর পর সেনাশাসনের মেকি গণতন্ত্রায়ণের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রভাবশালী মহলকে ক্ষমতাকাঠামোয় জুড়ে নিয়ে স্বৈরশাসনে পুরো দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আইয়ুবশাহী স্বীয় ক্ষমতাকে একচ্ছত্র ও নিশ্ছিদ্র করার লক্ষ্যে সশস্ত্র নিষ্ঠুরতায় স্তব্ধবাক্ করার পাশাপাশি প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে বাঙালি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আনুগত্য-ক্রয়ের কৌশল গ্রহণ করে। জনবিরোধী স্বৈরশাসকের বিলানো সুযোগ-সুবিধাকে পরমার্থ বিবেচনায় ভ্রষ্ট রাজনীতিজীবীদের অনেকেই আত্মবিক্রয়ের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং বাঙালি-শোষণের অপকৌশলকে বিবেকের দংশন ছাড়াই সমর্থন জুগিয়ে যায়। এই অন্ধ আনুগত্য যে নির্জলা দাসত্ব, তা সম্পদলোভী ও ক্ষমতান্ধ একাংশ মধ্যবিত্তশ্রেণির অগভীর জীবনচেতনায় ধরা পড়েনি। এই শ্বাসরুদ্ধকর চরম বৈরী পরিবেশেও মধ্যবিত্তশ্রেণির বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বৈরশাসনবিরোধী সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি গণনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের জাতীয়তাবাদী পরার্থপর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় শোষিত মুক্তিকামী সাধারণ জনতা এবং দানা বেঁধে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালির ক্রমপুঞ্জীভূত ক্ষোভ ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয় এবং স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আইয়ুবী স্বৈরশাসনের প্রথম চার বছরের পটভূমিকে নিভৃত-চেতনায় ধারণ করেই রচিত হয়েছে *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাস। 'অভিশপ্ত বগ্‌দাদ' (পৃ. ৩৭০) এখানে পূর্ববাংলা আর খলিফা হারুনুর রশিদে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান প্রতীকায়িত। হারুনুর রশিদ একজন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আগ্রাসী শাসক; ক্ষমতাই তার কাছে চূড়ান্ত কথা : 'মশ্‌রুর, খেলাফৎ ত পাও নি। বুঝবে না রাজত্বের লোভ কত। ওই লোভের আগুনের কাছে হাবিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব— সব পুড়ে যায় সেই আগুনে।' (পৃ. ৩২৭) । আর ক্ষমতার মাপকাঠি হলো শক্তি : 'বল— লোক-বল, অস্ত্র-বল, অর্থ-বল সব নীতির মাপকাঠি।' (পৃ. ৩২৭)। ক্ষমতা আর বিত্তবলে তিনি আমির থেকে ফকির পর্যন্ত সকলকে বাঁধতে চেয়েছেন আনুগত্যের জিঞ্জিরে, মননে-মগজে পরিণত করতে চেয়েছেন বশীভূত ক্রীড়নকে। তার ক্ষমতাবলয়ের পরিধি কায়িক শ্রমশোষণের সীমা পেরিয়ে মানুষের 'সুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ' (পৃ. ৩২৭) পর্যন্ত বিস্তৃত। তার মর্জিই হয় 'ইনসাফ' (পৃ. ৩২৩), সিদ্ধান্ত অলঙ্ঘনীয়। তিনি আইনের কঠোর অনুশীলনকারী, কিন্তু সেই আইন তৈরি হয় তার ফরমায়েস অনুসারে; ধর্মবেত্তাও ধর্মের ব্যাখ্যা দেন খলিফার চাহিদা মেপে। অবাধ্যতা ও তার মর্জি-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড এই দাম্ভিক শাসকের কাছে গুরুতর অপরাধ এবং তার জন্য ভয়ংকর শাস্তি অবধারিত। তার ক্রূরতা থেকে রক্ষা পায়নি বিশ্বস্ত উজিরে আজম জাফর বার্মেকী এবং সহোদরা আব্বাসাও। তার স্বেচ্ছাচারপ্রসূত শর্তভঙ্গের অপরাধে তাদেরকে বরণ করতে হয়েছে নির্মম ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড। আইনের শাসনের অন্তরালে সক্রিয় ছিল খলিফার উগ্র জাত্যভিমান ও অবাধ্যতাজনিত উন্মত্ত ক্রোধ : 'আব্বাসা আমার সঙ্গ ছাড়বে? না-না। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত, কবরে দাফন হোলো তার। সোজা কথায়, পুঁতে ফেললাম। কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের প্রতি মহব্বৎ—কিন্তু আমি কি?... জাফরের কি রকম শাদী দিলাম? 'আকদ' হলো অথচ রসুমৎ হবে না কোনদিন। শক্ত শর্ত। কঠিন কারার। ... শর্তভঙ্গের কঠোর শাস্তিও দিলাম। আব্বাসী কওমের খুন বার্মেকী কওমের সঙ্গে মিশে নাপাক হবে—না, তা হতে দিতাম না মশরুর্—।' (পৃ. ৩২৫)। বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা তাকে ভয়ানক নৈঃসঙ্গ্যে নিক্ষিপ্ত করে; প্রবল পরাক্রমশালী 'বগ্‌দাদ-অধীশ্বর সুখ-ভিক্ষুক' (পৃ. ৩২৮)। সুখান্বেষী বাদশাহ গোলামের সুখেও অসূয়াতাড়িত; গোলামের প্রণয়-উৎসারিত সুখ ও হাসিকে অধিগত করার

মত্ততায় মেতে ওঠেন তিনি। হাবসী তাতারী ও রূপবতী বাঁদি মেহেরজানকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে ঘোষণা করেন তার রাজত্বের 'স্বাধীন নাগরিক' (পৃ. ৩৪৪) হিসেবে। মোহাফেজের উক্তিতে : 'রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যে ভিক্ষুক ছিল, তৃতীয় প্রহরে সে আমীর। এ শুধু বগ্‌দাদেই সম্ভব।' (পৃ. ৩৪৫)। এই মুক্তির বিনিময়ে ছিন্ন করেন তাতারী-মেহেরজানের প্রণয়সিক্ত দাম্পত্য-সম্পর্ক। বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রমত্ত ভোগের সম্ভার দিয়ে তাতারীকে প্রেরণ করেন বাদশাহি প্রমোদ বাগিচায়; আর মেহেরজানকে ফিরিয়ে নেন নিজমহলে। খলিফার এই আপাত ঔদার্যের অন্তরালে ছিল নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও উগ্র ভোগলিপ্সা। তাতারীর প্রতি শর্ত ছিল বাদশাহি ঐশ্বর্যভোগের বিনিময়ে প্রাণদ হাসিতে বাদশাহর বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রশান্তি সঞ্চার করবে। আর বাঁদি মেহেরজানকে 'বেগম'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন তার সৌন্দর্যভোগের উগ্র বাসনায়। পরস্ত্রী-দখলের অনৈতিক কর্মকে নৈতিকতা প্রদানের নির্লজ্জ যুক্তিও তিনি তৈরি করিয়ে নিয়েছেন আলেম আব্দুল কুদ্দুসের ফতোয়ায় নির্ভর করে : 'মেহেরজান কেনা বাঁদি। মালিকের হুকুম ছাড়া তার কোনো শাদী হতে পারে না। যদি হয়, তা না-জায়েজ (শাস্ত্রসিদ্ধ নয়)। মজকুর বাঁদি মেহেরজান গোলাম হাবসী তাতারীর বিয়ে না-জায়েজ।' (পৃ. ৩৪৭)। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল তাতারীর প্রাথমিক অভিব্যক্তি কৃতজ্ঞতাসূচক হলেও অচিরেই সে উপলব্ধি করে তার দাসত্ব-মুক্তি গভীরতর দাসত্বে শৃঙ্খলিত। এতদিন কেবল তার শরীরই ছিল দাসত্বে আবদ্ধ, দিবসের আলোয় তার কায়িক শ্রমেই ছিল খলিফার অধিকার। অন্ধকারনিবিষ্ট রজনী ছিল একান্ত তারই অধিকারে, সেখানে সে ছিল স্বাধীন হৃদয়বৃত্তির অধীশ্বর, দয়িতার বাহুবন্ধনে তার হাসি সেখানে ঝরনাধারার মতো কলকলিয়ে উঠতো। নতুন ভূমিকায় তার হাসিটি নিজের জন্য নয়, অন্তরোৎসারিতও নয়, নিতান্ত ফরমাশি, খলিফার মনোরঞ্জনের জন্য নিবেদিত। এটা তাতারীর কাছে হাসির দাসত্ব হিসেবে বিবেচিত। তাতারী হুকুম করার অধিকার পেয়েও কাউকে হুকুম করে না; কারণ খলিফার দান-করা আমিরি তার কাছে গোলামি। তার উপলব্ধি হলো––'যোগ্যতা-মেহনৎ ব্যতিরেকে যারা পুরস্কার প্রার্থী––তারাই হচ্ছে দুনিয়ার আসল গোলাম।' (পৃ. ৩৫০)। তার বিবেচনায় বাদশাহ হারুনুর রশীদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত সকলেই গোলাম–– 'আমি গোলাম ছিলাম, খুব নীচুদরের গোলাম। কিন্তু তুমি-ও গোলাম, আমিরুল মুমেনীনের গোলাম। অবিশ্যি উঁচুদরের গোলাম।' (পৃ. ৩৪৯)। শরীরী দাসত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও হৃদয়ের দাসত্ব-বরণে তাতারী ছিল অনীহ ও বিদ্রোহী। একজন দুর্বৃত্ত স্বৈরশাসকের অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তিদানের দাসত্বকে অনড় দৃঢ়তায় সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাতারীর বন্ধ হাসি উন্মুক্ত করতে ভোগের পসরা সাজিয়েও ব্যর্থ হয়ে খলিফা বেছে নিয়েছেন অমানুষিক নির্যাতনের পথ। এতে তাতারীর দ্রোহ আরও তীব্র হয়েছে; হাসি বন্ধ করার পাশাপাশি বন্ধ করেছে কথা বলাও। আত্মদম্ভী খলিফা বাজিতে হেরে যাওয়ার অপমান থেকে রক্ষা পেতে তাতারীকে একটিবার হাসার কাতর মিনতিও প্রকাশ করেন। ধৈর্যচ্যুত খলিফা তাতারীর মুখে হাসি ফোটানোর চূড়ান্ত চেষ্টা হিসেবে প্রণয়িনী মেহেরজানকে তার সামনে হাজির করেন। 'বেগম-সাহেবা'-বেশী মেহেরজানের অনুরোধও তার স্তব্ধতা ভাঙাতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে অনুশোচনাদগ্ধ মেহেরজানের প্রণয়িনী রূপে প্রত্যাবর্তনে তাতারীর স্তব্ধতা ভাঙে। তাতারীর নির্বাক্ বিদ্রোহ প্রচণ্ড গর্জনে বিস্ফোরিত হয়–– 'শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব––! কিন্তু–– কিন্তু–– ক্রীতদাসের হাসি–– না–– না–– না––না––' (পৃ. ৩৮৩)। লক্ষণীয় যে, খলিফার প্রতি সম্বোধনে তাতারীর কোনো শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমবোধ নেই; কেবলি নামোল্লেখিত এই সম্বোধনে হারুনর রশীদের বাদশাহি অস্বীকৃত। তাতারীর কাছে হারুনর রশীদ আর 'জাঁহাপনা' 'আমিরুল মুমেনীন' নন; মনুষ্যত্ববোধহীন, ক্ষমতাদম্ভী একজন উৎপীড়ক মাত্র। স্বৈরাচারী উৎপীড়নের মাত্রা যখন সীমা লঙ্ঘন করেছে, তখন নিয়মানুগত শান্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি এমনি করেই আইয়ুব খানের ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে এবং গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর স্বৈরশাসকের পতন ঘটিয়েছে। এদিক থেকে *ক্রীতদাসের হাসি* বাঙালি জাতির রাজনৈতিক উত্থানের এক ভবিষ্যৎদর্শী উপন্যাস। তাতারী আমাদের জানায় যে, কোনো মানুষের চিত্ত যতক্ষণ স্বাধীন, ধ্রুব সত্যে অবিচল থাকে, ততক্ষণ কোনো অশুভ শক্তিই তাকে পরাভূত করতে পারে না। তার বিবেচনায় একজন স্বাধীনচেতা সংগ্রামশীল মানুষের পরিচয় হলো–– 'মানুষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে পিছু হটে না। জন্তুরা যেমন লেজ গুঁটিয়ে পালায়, তেমন পালায় না।' (পৃ. ৩৬১)। সত্তার স্বাধীনতা ও চিত্তের শুদ্ধতা মানুষের গভীর জীবনবোধ থেকে

উৎসারিত এই বোধের জাগরণ ঘটে সংস্কৃতির কর্ষণে। কবি-সাহিত্যিকগণ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমাজের অগ্রসর অংশ; সত্য, ন্যায় ও সৌন্দর্যের সাধনায় তাঁরা একাগ্র। লোভ, মোহ, মাৎসর্যপ্রসূত পারবশ্য থেকে তাঁরা একদিকে নিজের চিত্তকে মুক্ত রাখেন, অন্যদিকে মানুষকে বুদ্ধি আর বোধিতে শানিত করে তোলেন, উদ্দীপিত করেন স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ববোধে। বিবেকী দায়বদ্ধতায় তাঁরা রচনা করেন মানবমুক্তির জপমালা; শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তাঁরা একদিকে স্বৈরাচারী শাসককে সংশোধিত হওয়ার সতর্কবার্তা দেন, অন্যদিকে উৎপীড়িত মানুষকে আত্মবোধন ও মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। *ক্রীতদাসের হাসি*-তে খলিফা হারুনর রশীদের ক্ষমতান্ধ আত্মম্ভরী শাসনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধটি গড়ে তোলেন সভাকবি আবু ইসহাক, আবুল আতাহিয়া, আবু নওয়াস। হাসির উৎস সম্পর্কে কবি আবু ইসহাকের বক্তব্য হলো-- 'ভালো কথা হচ্ছে রুহের (আত্মার) প্রতিধ্বনি-- সেখানেই জমে থাকে, তারপর ঝর্ণার মতো বেরোয়। অনাবিল হাসি হচ্ছে ভালো কথারই শারীরিক রূপ।' (পৃ. ৩৪৩)। কবি আতাহিয়া ও আবু নওয়াসও হাসি-ক্রয়ের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে খলিফাকে সতর্ক করেন, কিন্তু ক্ষমতা-মদমত্ত খলিফা ছিলেন হাসিকে ক্রয়যোগ্য পণ্য প্রমাণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। বাজিতে হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় জিঘাংসা-উন্মত্ত খলিফা বুসায়না-হত্যার দায়ে তাতারীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলে বিবেকের তাড়নায় কবি আবু নওয়াস এই ভুল বিচারের প্রতিবাদ করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ বাদশাহ অবাধ্যতার দায়ে কবি নওয়াসকেও কতলের আদেশ দেন। কবি নওয়াস স্বৈরশাসকের ক্ষমতাদম্ভকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অকুতোভয়ে উচ্চারণ করেন কবির অঙ্গীকার ও মানবতার জয়ধ্বনি-- 'বগ্‌দাদকে আপনি যেমন ভালবাসেন, তেমনি আমিও ভালবাসি। কিন্তু আপনার বগ্‌দাদের কোনো ঐশ্বর্যই টিকবে না। টিকে থাকবে শুধু বগ্‌দাদের বিবেক ও বিবেক-সাধনা। ও কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে থাকলেও ও কণ্ঠধ্বনি অনাগত মানুষ শুনবে। তারা বগ্‌দাদকে বাঁচিয়ে তুলবে। তাই আজ অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালুম। ... বগ্‌দাদের প্রেম আমাকে বানিয়েছে কবি, বগ্‌দাদের প্রেম আমাকে করে তোলে শহীদ। কবিরা নিত্যকার শহীদ-- কারণ জীবনকে সব সময় তারা পেছনে ফেলে চলে। জীবন থেকে জীবনান্তর। কবিমাত্রই রক্তবীজ, বিবেকের নিষ্কাম সাধক।' (পৃ. ৩৭৪)। জনরোষের ভয়ে প্রবল ক্ষমতাধর খলিফা পিছু হটেন, আত্মবিক্রয়ে অস্বীকৃত তাতারীর আত্মত্যাগী দ্রোহে কবি নওয়াসের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় খলিফার চূড়ান্ত পরাভব-বার্তা : 'আমেরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।' (পৃ. ৩৮৩)। স্মরণীয় যে, উপন্যাসটি রচিত হয়েছে একষট্টি ও বাষট্টির সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা আন্দোলনের অল্পকাল পরে; এবং এই সাংস্কৃতিক জাগরণের কয়েক বছরের মধ্যেই সূচিত হয় বাঙালির ছয়দফাকেন্দ্রিক স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, যার পরিণতিতে বাঙালির আরাধ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। তাতারীর মানবিক গুণাবলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রেমিকা ও জননী হিসেবে নারীর প্রতি তার অসামান্য শ্রদ্ধাবোধ। বুসায়নার সঙ্গে তার কথোপকথনে বিম্বিত হয়েছে নারীর শাশ্বত মহিমা : 'নারীর বিবসনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হওয়ার অধিকার আছে; তা-ও শুধু প্রেমে। একটি মানুষ যার সান্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অর্থবান হয়-- তেমন মানুষের জন্যে। ... তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও তো সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য এত সস্তা নয়। যে-নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-জাতির শিশুকে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে, যে নারী শাশ্বত মানবতার জননী--বসুন্ধরার অঙ্গীকার, সে অত সস্তা হয় না, বুসায়না।' (পৃ. ৩৫৯)। তাতারীর সংস্পর্শে রূপপোজীবিনী বুসায়নার মধ্যে মহিমান্বিত নারীসত্তার জাগরণ ঘটে এবং আত্মহননের মধ্য দিয়ে যৌনপণ্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি অর্জন করে। আর এভাবেই খলিফা হারুনর রশীদের স্বৈরতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যে, কবি নওয়াসের বক্তব্যে, তাতারীর অন্তরোত্থিত দ্রোহে এবং বুসায়নার আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে আমরা পেয়ে যাই আবরুদ্ধ নব্য-উপনিবেশ পাকিস্তানে উত্তর-উপনিবেশবাদী অভিজ্ঞান।

চাঁদের অমাবস্যা[৫]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাসে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী পরিচয় এবং এর নিপীড়ন-সর্বস্ব শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধ আন্দোলনকে রূপকায়িত

করেছেন 'বড়বাড়ি'র আধারে। উপন্যাসটিতে বড়বাড়ির সঙ্গে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তঃমিল নিপুণ সামঞ্জস্যে গ্রথিত। ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়া পত্তনের যুগে ব্রিটিশ শাসকেরা ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক ও অপ্রতিহত করার লক্ষ্যে অব্যবহিত পূর্ববর্তী মুসলিম শাসক ও শাসন-সম্পৃক্ত অভিজাত অংশকে আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল করার পোড়ানীতি গ্রহণ করে। ফলত বাংলার অভিজাত মুসলমানরা রাজকার্য ও জমিদারি থেকে উৎখাত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সংকট-উত্তরণের লক্ষ্যে কালক্রমে ব্রিটিশ-শাসনের সঙ্গে জুড়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষভাগে সাম্প্রদায়িক বিভাজননীতির অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় এই অবক্ষয়িত মুসলিম পরিবারগুলো পুনরুজ্জীবিত হয় এবং এরাই বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মের পুনরুজ্জীবনকেই তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতিয়ার করে তোলে এবং নিজেদের স্বার্থোপযোগী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটায়। বলাবাহুল্য, সামন্ত-মূল্যবোধলালিত এই মুসলিম নেতৃত্বের চিন্তা-চেতনা ও রাজনৈতিক ভাবনা ছিল মানবেতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারা থেকে মুখ ফেরানো—পশ্চাদ্‌মুখী। উপন্যাসে দাদাসাহেব আলফাজউদ্দীন চৌধুরী ও তার ভাই কাদের চৌধুরী এই নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্মধ্বজাধারী রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ববাংলা অংশের গ্রাম-পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। সাবেক জমিদার পরিবারের উত্তরসূরি হিসেবে দাদাসাহেব প্রখর জাত্যভিমানী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসননীতির প্রাথমিক অভিঘাতে দাদাসাহেবের পরিবার জমিদারির সঙ্গে ক্ষমতা ও সচ্ছলতা হারায়। বৈরিতার পর্ব পেরিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী হিসেবে দাদাসাহেব ঔপনিবেশিক শাসনের অংশ হন। চাকরি ও পূর্বতন সম্পদের অবশিষ্টাংশে ভর করে পূর্ববঙ্গের এক প্রত্যন্ত এলাকার ভূমিহীন প্রজাসর্বস্ব সমাজে দাদাসাহেব নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিদেশি শাসকের প্রতি বিদ্বেষপোষণ দাদাসাহেবের পক্ষে স্বাভাবিক; তবে শাসকের বিজাতীয়তার চেয়ে বিধর্মীয়তাই তার কাছে বেশি গ্লানিকর। দাদাসাহেব ধর্মাশ্রয়েই খোঁজেন হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের পথ এবং ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী 'ইসলাম-ধর্মের গর্বিত-পতাকা' উত্তোলনের স্বপ্ন দেখেন। বিধর্মীয় শাসকের অধীনে অস্বস্তিকর চাকরিজীবন শেষ করে তিনি স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন করে গ্রামের বাড়ির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। দাদাসাহেব পূর্ণোদ্যমে শুরু করেন দশাধিক বালক-বালিকার উর্বর মনে ধর্মের বীজ রোপণের কাজ : 'তিনি পরমসত্যে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সে-সত্য কেবল আসল কিতাবেই পাওয়া যায় এবং সে-সত্য মানুষের বিগতদিনের বা বর্তমানকালের কার্যকলাপে ধ্বংস হয় না : চিরন্তন সত্যকে কখনো ধ্বংস করা যায় না। তাঁর নিগূঢ় বিশ্বাস, সে-কিতাবের আদেশ-নির্দেশ বাধা-নিষেধ অনুসরণ করে জীবন-যাপন করলেই মানুষের মুক্তি লাভ হয়।' (পৃ. ১০৮)। তাঁর কঠোর তদারকিতে ধর্মীয় রীতি-নীতি হয়ে ওঠে সকলের জন্য অবশ্য-মান্য বিষয়; কারোর অবকাশ নেই কাতার-বন্দি হয়ে নামাজ আদায়ে ন্যূনতম শৈথিল্য-প্রদর্শনের। তিনি সকলের সামনে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল দিগ্বিজয়ের কথা বলেন, কিন্তু গোপন করেন এর ইতিহাস-সিদ্ধ নৃশংসতার কথা। তার সাধের ধর্মরাষ্ট্রের 'চতুর্দিকে ঝলমলে জ্যোৎস্নালোক', কিন্তু 'চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো'-র গভীরে নিহিত ঘোর অমাবস্যা। এর 'ফুটফুটে জ্যোৎস্না'য় বসে অবৈধ ভোগের আসর আর অবলীলায় সংঘটিত হয়ে যায় নির্মম হত্যাকাণ্ড। হত্যাকারী দাদাসাহেবেরই কনিষ্ঠভ্রাতা কাদের চৌধুরী। সে 'সম্পূর্ণভাবে নিষ্কর্মা' (পৃ. ১১১); 'অদম্য খামখেয়ালীভাব, উগ্র মেজাজ আর সৃষ্টিছাড়া দুরন্তপনা' (পৃ. ১১০) তার স্বভাবনিহিত বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিকভাবেই দাদাসাহেবের প্রবল প্রতাপ ও নিয়ন্ত্রণ কাদেরের বেলায় ছিল অকার্যকর। চাপা-উদ্বেগ সত্ত্বেও কনিষ্ঠের উগ্র-অবাধ্যতাকে তিনি 'দরবেশে'র প্রলেপে ঢেকে আত্মপ্রবোধ দেন এবং এর সঙ্গে মিশে থাকে তার প্রচ্ছন্ন-গর্ব মিশ্রিত প্রশ্রয়। কাদেরের রহস্যময় নিশি-বিহারকে তিনি 'বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ' হিসেবে প্রচার করেন। চূড়ান্ত রকমের ভণ্ড, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়াসক্ত কাদের দরবেশসুলভ অনাসক্তির আবরণে অভাবিত ধূর্ততায় চালিয়ে যায় তার লাম্পট্যপনা; 'দরবেশ' পরিচয় হয়ে ওঠে তার লাম্পট্যপনার সুরক্ষা-কবচ। লাম্পট্য আড়াল করতে সে অনায়াসে হত্যা করে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সে নির্বিবেক, অনুশোচনাহীন। নারীদেহ তার কাছে নিতান্তই ভোগ্যবস্তু; নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বরাবরই প্রেম-ভালবাসারহিত; নিশি-সহচরী বা নিজের স্ত্রী দুইয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। হতভাগ্য নারীর সঙ্গে কাদেরের সম্পর্ক এবং পূর্ববাংলার সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কটি সমরূপ; কাদেরের মতোই

পাকিস্তানি শাসকেরা বাংলাকে কেবল পৈশাচিক ভোগের তলায় পিষ্টই করেছে; কোনো হার্দিক-বন্ধন রচনা করেনি।

যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে গেল তার একমাত্র সাক্ষী বড়বাড়ির আশ্রিত নগণ্য শিক্ষক আরেফ আলী, পুরো উপন্যাস জুড়ে যে 'যুবক শিক্ষক' হিসেবেই অভিধাপ্রাপ্ত। পাকিস্তানি বৈষম্যপীড়িত শাসন আর দারিদ্র্যের কঠোর অবরোধ পেরিয়ে পূর্ববাংলার ভূমিহীন কৃষকসমাজ থেকে শ্রেণি-উত্তরণ প্রয়াসী এক সংগ্রামী মানুষ আরেফ আলী। গুরুত্বের বিবেচনায় সে এতটাই উন যে তার নামটাই বাহুল্য; কিন্তু বহুল পুনরাবৃত্তিময় 'যুবক শিক্ষক' পরিচয়ে আরেফ আলী হয়ে ওঠে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণধী, সুগভীর বিবেচনাবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধে শানিত এবং একান্ত প্রান্তিক অবস্থান থেকে নিজ দায়িত্বপালনে একাগ্র ও আত্মোৎসর্গীকৃত একজন নৈতিক বুদ্ধিজীবিতার প্রতিমূর্তি : 'অস্তিত্বগত প্রান্তিক পরিস্থিতির (border line situations) তীক্ষ্ণমুখ আঘাতে আরেফ আলী যন্ত্রণাকাতর, চেতন-অবচেতনায় রক্তাক্ত, সত্যানুসন্ধানে আত্মখননকারী জটিল ও স্তরবহুল; অভিজ্ঞতায় ক্রমসঙ্কুচিত।' (সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০১০: ১১৭)। এডওয়ার্ড সাইদ উত্তর-উপনিবেশী ভঙ্গুর সমাজে এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক ভূমিকার কথা বলেছেন, যাঁরা অশুভ আধিপত্যবাদী শক্তির দমন-পীড়ন-শোষণের গোপন কলাকৌশলগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ ও উদ্ঘাটন করবেন এবং এ-বিষয়ে মানুষকে সচেতন করবেন ও অনমনীয় দৃঢ়তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। শারীরিক প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে আরেফ আলী যখন শীতরাতের কুয়াশা-ঢাকা চন্দ্রালোকিত প্রকৃতির অজাগতিক সৌন্দর্য অবগাহনে নিমগ্ন, তখন সে দ্রুতগমনশীল কাদেরকে প্রত্যক্ষ করে এবং বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলের ঝোঁকে তাকে অনুসরণ করে। দ্রুতগামী কাদের জঙ্গলে-বাঁশঝাড়ে মিলিয়ে গেলে ঘটনা-পরম্পরার একপর্যায়ে বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে আরেফ আলীর কানে ভেসে আসে একটি অকথ্য ধ্বনি, হয়তো-বা সংগীতও, এরপর কণ্ঠ চাপা দেওয়ার শব্দ এবং অবশেষে অখণ্ড নীরবতা। এরপর শব্দের উৎসস্থলে গিয়ে সে প্রত্যক্ষ করে সদ্যমৃত এক নারীর অর্ধ-উলঙ্গ দেহ। হতচকিত আরেফ আলী বুঝতে পারে না এ সত্য, না দৃষ্টি-বিভ্রম। এরপর বেশ কিছুটা এগিয়ে সে দেখে সামনে কাদের মিঞা। প্রথমে ঠাহর করতে না-পারলেও ধীরে ধীরে সে ঘটনার হোতার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। হত্যাকারীর পারিবারিক ও 'দরবেশ' পরিচয়ই এই প্রাথমিক বিভ্রমের হেতু। ঘটনা-পরম্পরায় বাধ্য হয়ে লাশ বহন করে সে এ হত্যাকাণ্ড-উত্তর পরিস্থিতির সহযোগীর ভূমিকায় জড়িয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডটি যুবক শিক্ষকের সংবেদনশীল মনে তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং একের পর এক যুক্তির জালে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদে লিপ্ত হয়। একসময় হত্যাকাণ্ডটিকে একটি প্রণয়ঘটিত দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে কাদেরকে নির্দোষ প্রমাণের একটি নৈতিক যুক্তিভূমিও সন্ধান করে সে। যুবতীর সঙ্গে কাদেরের প্রেম-ভালোবাসার কোনো যোগ নেই, ব্যাপারটি নিতান্তই দেহভোগের জান্তব উন্মাদনা এবং হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কাদেরের মানবিক অনুশোচনা নেই, আছে কেবল অপরাধ-গোপনের পশু-প্রবৃত্তি—যুবক শিক্ষক যখন সবশেষে এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়, তখনই তার মধ্যে নির্দয় হত্যাকারীকে বিচারের মুখোমুখি করার গভীর দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। কিন্তু কর্তব্যপালনের পথে প্রতিবন্ধকতা পাহাড়-সমান এবং বিপদও সুগভীর। তার মনে উদ্রিক্ত হয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ : 'সে তার বিধবা মা এবং তার মুখাপেক্ষী দুটি ভাই-বোনকেও খাওয়াতে পারছে। তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে কে তাদের দেখাশোনা করবে?' (পৃ. ১৮২)। এছাড়া তার মনে এ চিন্তাও উদ্রিক্ত হয় : 'কত অন্যায়-দুর্নীতির কথা মানুষ জানতে পায়। কিন্তু নিজের ভাত-মারা না পড়লে নিজের ক্ষতি করে কেউ সে-সব কথা প্রকাশ করে নাকি?' (পৃ. ১৮২)। এর চেয়েও বড় বিষয় হলো, সত্য প্রকাশ করে সে কারো সমর্থন পাবে না, সাক্ষীর অভাবে ন্যায়-বিচার দুরূহ হবে; উলটো হত্যার দায় তার কাঁধেই বর্তানোর আশঙ্কাই সমূহ। কিন্তু চিন্তার নানান শাখা-প্রশাখা বেয়ে যুবক শিক্ষক তার করণীয় স্থির করে এই যুক্তিবিন্দুতে এসে : 'যুবতী নারীর সঙ্গে কাদেরের সম্পর্কটি যখন নিন্দনীয় এবং হত্যাকাণ্ডটি যখন অতিশয় গুরুতর অপরাধ, তখন তা প্রকাশ না করে কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে কি?' (পৃ. ১৮৩)। সত্য প্রকাশ না-করাটা আত্মপ্রবঞ্চনা আর প্রকাশ করাটা আত্মহত্যা—এই প্রবল মানস দ্বৈরথে সে মানবিক ঔচিত্যবোধতাড়িত সামূহিক বিপদের পথটাই বেছে নেয়। মীমাংসিত আরেফ

দাদাসাহেবের কাছে হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করে। বাহ্যত দাদাসাহেবের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলেও তার শখের ধর্মরাজ্যের অন্তঃসারশূন্যতা ও হীনস্বার্থের বিভীষিকার বিষয়টি গোপন থাকে না। দাদাসাহেবের ধর্মীয় আড়ম্বর কৃত্রিমতাসর্বস্ব; তাতে ন্যায়-মানবিকতার ভান আছে, বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই; পরিবারের সম্মান-প্রতিপত্তি আর স্বজনপ্রিয়তাই প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রসন্ন বাহু তার দিকেই প্রসারিত। উল্লেখ্য, দাদাসাহেবের ধর্মীয় অনুশাসনের বিপরীতে আরেফ আলীর কর্তব্যবোধ সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। যুবক শিক্ষক তাই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে সোজা যায় থানায়; আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব জানায়। দুদিন পর পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর যুবক শিক্ষককে থানায় ধরে নিয়ে আসে। সেখানে পুলিশ তার সঙ্গে 'ধমক' ও 'হুঙ্কারে'র ভাষায় কথা বলে; জানতে চায় 'চালাকি করতে চেয়েছিলেন কিনা'; পরামর্শ দেয়, 'হয় অপরাধ স্বীকার করেন। না হয় আজগুবি কথাটা ছাড়েন।' এভাবে দাদাসাহেবের স্বপ্নের ধর্মরাষ্ট্রে সত্য হয়ে যায় আজগুবি, একজন নারীর জীবন হয়ে যায় অর্থহীন। তথাকথিত ন্যায়ের রাষ্ট্রে অন্যায়ই হয়ে ওঠে সার্বভৌম, আর হত্যাকারী পায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা; ন্যায়নিষ্ঠ, দায়িত্ববান মানুষ পরিগণিত হয় জঘন্য অপরাধী হিসেবে। এটাই হলো চাঁদের অমাবস্যা; 'স্নিগ্ধ-সুন্দর চাঁদের পৃষ্ঠদেশ'-এ 'কদর্য-নিষ্ঠুরতা'। (পৃ. ১৪৩)। *লালসালু*-তে মিথ্যা কবরের গায়ে জমিলার পদস্পর্শের সংকেতে যেমন দুমড়ে-মুচড়ে যায় মজিদের সাম্রাজ্য, তেমনি হতভাগ্য নিহত নারীর পায়ে গড়াগড়ি খায় দাদাসাহেবের আলোময় তথাকথিত ধর্মরাষ্ট্র : 'শাড়িটা অসংলগ্ন, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো।' (পৃ. ১৯৬)।

দেশ-বিভাগের প্রায় দেড় দশক পরে রচিত উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা*-য় কালগত পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটেছে। *লালসালু*-তে ইংরেজি-শিক্ষিত যুবক আক্কাস যেখানে মজিদের কাছে অপমানিত ও ধরাশায়ী হয়ে নিশ্চেষ্ট বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল, *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলী অশুভশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর লড়াইটা শেষপর্যন্ত চালিয়ে যায়; যদিও উভয়ের প্রতিপক্ষ প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ও স্বৈরাচারী। *লালসালু*-তে প্রতিনায়ক মজিদই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কত্বে অভিষিক্ত, সেখানে আক্কাসের মধ্যে নায়ক হওয়ার গুণ বিদ্যমান থাকলেও মজিদের নায়কত্ব বানচাল করার ক্ষমতা তার ছিল না। কারণ আক্কাসের নায়কত্বের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসনকাঠামোটিই ছিল চরম বৈরী; পক্ষান্তরে পাকিস্তানি রাষ্ট্রাদর্শই ছিল মজিদের অনুকূল। *চাঁদের অমাবস্যা*-য় আরেফ আলী ও তার প্রতিপক্ষের লড়াইটা হয় প্রায় সমানে-সমানেই; আনুকূল্য-প্রাপ্ত কাদের ও দাদাসাহেবের সঙ্গে থানা-পুলিশ যোগ দিলে লড়াইটা অসম হয়ে পড়ে। অন্যায়-শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সত্ত্বেও তার নায়কত্ব গড়ে ওঠে না; তবে প্রতিনায়কের একচেটিয়া দাপটকে সে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পেরেছে এবং প্রতিনায়ককে নায়কের আসন দখল করতে দেয়নি। সত্য-প্রকাশের লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত না জিতলেও যুবক শিক্ষক অশুভ পরাক্রমশালী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং লড়াইটাকে জিইয়ে রাখতে সংঘবদ্ধতার উত্থান কামনা করেছে। আরেফ আলীর আত্মবিনাশী প্রতিবাদের রূপকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে নৃশংস স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ বাঙালির রক্তক্ষয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দূরভাষ্য : 'আইয়ুবি ডিকেডের জাতি-শোষণ সশস্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন এবং ঘৃণ্যপ্রলোভন-আতঙ্কিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনা করেন *চাঁদের অমাবস্যা*...। ওয়ালীউল্লাহ্র চরিত্রগুলোকে, লক্ষ করি, অস্তিত্বের চেতন-অবচেতন গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে; শুনি তাদের নিঃশব্দ আর্তনাদ; দেখি তারা দুহাতে ভেঙে-ভেঙে চলেছে অন্ধকার; শোনা যায় তাদের কষ্টচালিত শ্বাস-প্রশ্বাস। এভাবেই ভীতিশিহরিত নিরস্তিত্বের গুহাপথ অতিক্রম করে, আত্মপ্রতারক 'কীটপতঙ্গ সদৃশ' আরেফ আলীরা হয়ে ওঠে সূর্যপ্রতিম, টান-টান প্রতিবাদী।' (সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০১০: ১২৬)।

এভাবে উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নে *চাঁদের অমাবস্যা*-য় আমরা প্রত্যক্ষ করি, ধর্মাদর্শের খোলসে ঢাকা একটি রাষ্ট্রকাঠামোতে ক্ষমতাবানদের অনৈতিক কর্মে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিপরীতে একজন ক্ষমতাহীন প্রান্তিক বুদ্ধিজীবী কর্তৃক ক্ষমতাবান অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি করার নিঃস্বার্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রয়াস। এতে প্রতীকায়িত হয়েছে নব্য-উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বাঙালি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানবতাবাদী ও আপসহীন দায়িত্বশীল নেতৃত্বে অনতিদূর ভবিষতে গড়ে ওঠা মুক্তিসংগ্রামের চিত্র।

সংশপ্তক[৬]

শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫) উপন্যাসে দেশ ও কাল––দুদিক থেকেই এপিকের বিস্তৃতি। উপন্যাসটির কাহিনি পূর্ববাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী দুটি গ্রাম বাকুলিয়া ও তালতলিতে শুরু হয়ে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা মহানগরী হয়ে নবগঠিত পূর্বপাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে সাময়িক বিচরণভূমি করে সমাপ্ত হয়েছে উৎসভূমি বাকুলিয়ায় প্রত্যাবর্তনে। আর কালের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী তুলনামূলক নিস্তরঙ্গ সময় থেকে সংকট-সংক্ষুব্ধ মহাসমরকালীন দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের পূর্বকাল পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত একযুগের সময়পটে সংঘটিত বাঙালির সংঘাত-সংক্ষুব্ধ জীবনালেখ্য কেন্দ্রীয় উপজীব্য হলেও বিধৃত কাহিনি সুদূর সেন শাসনামল পর্যন্ত পশ্চাদ্‌বর্তী হয়েছে মিঞা-সৈয়দদের আভিজাত্য-গর্বী ঠিকুজি সন্ধানসূত্রে। মিঞাবাড়ির ইতিহাস পুনরুদ্‌ঘাটনের সুবাদে উন্মোচিত হয়েছে পূর্ববাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী, বিশেষত অভিজাত মুসলিমসমাজের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাস। উপন্যাসের বিশাল পটে উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির উপজাত হিসেবে সামন্তবাদী রুদ্রশোষণে গ্রামবাংলার বিপর্যয়কর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন; সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সংরক্ত উন্মাদনা ও এর বিরুদ্ধে মানবিক শুভবোধের উজ্জীবিত প্রয়াস এবং সর্বোপরি বাঙালির জাতিরাষ্ট্র গঠনের কল্লোলিত সংগ্রামের চলচ্ছবি। তীক্ষ্ম ইতিহাস-চেতনা ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার কুশলী পরিচর্যায় চরিত্র-পাত্ররা ব্যক্তি-সত্তা ও শ্রেণি-সত্তার নিপুণ সামঞ্জস্যে উপস্থাপিত। একই উৎস থেকে জাত এবং পরস্পর-সংলগ্ন চরিত্রসমূহের বহুমাত্রিক বিকাশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সংকটদীর্ণ উপনিবেশিত বাংলার দ্বন্দ্বজটিল বিবর্তনের অনুপুঙ্খ চিত্র এবং উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে 'জাতীয় রূপক'।

'বাকুলিয়া-তালতলি', 'ফেলু মিঞা-রামদয়াল', 'সেকান্দর-রমজান', 'রাবু-আরিফা'– স্থান-কাল-চরিত্রের এমনিতর বিপরীত-যুগলের অন্তঃশীলা স্রোতের নিয়মে এগিয়েছে আখ্যানের ঘটনাক্রম। রামদয়াল-ফেলুমিঞা, রমজান-সেকান্দর––বিপরীত ঘরানার এই চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তরের দ্বন্দ্ব-জটিল ইতিবৃত্তটি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

একটি সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত, যা উত্তর-দক্ষিণের দু বাহুতে জমজ সন্তানের মতো জড়িয়ে আছে দুটো গ্রাম––বাকুলিয়া ও তালতলিকে। উপন্যাসে শস্যক্ষেত্রটি সম্পদ-সমৃদ্ধ পূর্ববাংলার প্রতিচ্ছবি : 'সোনার চেয়েও দামি পূর্ববঙ্গের মাটি। কাঁড়ি-কাঁড়ি সোনা ফলে এ মাটিতে। পুস্তক-কিতাবের কথা নয়, দক্ষিণ ক্ষেতে যারা লাঙল চালায় তারাই জানে। কত উর্বর সোনা-ফলা এ মাটি।... কখনো ধান, কখনো সরিষা, মুগ, কলাই, খেসারি, গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ আর সবুজ বুকে নিয়ে সন্তানবতী নারীর পুষ্ট বক্ষের মতো ভরে থাকে দক্ষিণের ক্ষেত।' (পৃ. ৫৫)। এই শস্যক্ষেত্রের দুই পাশের দুই গ্রামে দুই বাস্তবতা। মুসলিম অধ্যুষিত বাকুলিয়া ভয়াবহভাবে দারিদ্র্যদীর্ণ; বিপরীতে হিন্দু অধ্যুষিত তালতলি অনেক বেশি সমৃদ্ধ।[৭] সাম্প্রদায়িক বিভাজনভিত্তিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ভয়ানক ক্ষতগুলোই মূর্ত হয়ে উঠেছে এই দুই গ্রামের সার্বিক রূপায়ণের মাধ্যমে।

বাকুলিয়ার দুই প্রান্তে দুই খানদানি বাড়ি আর তার ভেতরে গভীর দারিদ্র্যে জর্জরিত হতভাগ্য প্রজাকুল। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই দক্ষিণ ক্ষেত্রের বিপুল সমৃদ্ধি, কিন্তু এই সমৃদ্ধি তাদের জীবনে অধরা, ক্ষুধা তাদের নৈমিত্তিক যন্ত্রণা। মিঞা-সৈয়দদের খানদানও ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু। একদা দক্ষিণক্ষেত্রসহ গোটা অঞ্চল ছিল বাকুলিয়ার মিঞাদের সম্পত্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফাঁদে পড়ে মিঞাদের জমিদারি ক্রয়ে নব্য-ধনী রামদয়ালের হস্তগত হয়। ব্রিটিশ শাসনে যে নতুন সামন্তব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে নগদ-পুঁজির ভূমিকাই ছিল মুখ্য। রামদয়ালের কাছে মিঞাদের জমিদারি হারানোর এই ঐতিহাসিক কারণ উন্মোচিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের নির্মোহ বিশ্লেষণে : 'তালতলি, চাটখিল, সুলতানপুর এসব গ্রাম ছিল মিঞাদেরই জমিদারির অংশ। কিন্তু কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের সময় কেমন করে যে জমিদারিটা বেহাত হয়ে যায়, সেই ইতিবৃত্ত এখনো উদ্ধার করতে পারেনি ফেলু মিঞা। শুধু শুনেছিল প্রাচীন সম্পত্তি পুনর্বার বন্দোবস্ত নেবার মতো নগদ টাকা নাকি ছিল না তাদের দুর্ভাগা পূর্বপুরুষদের হাতে। ছিল না তেজারতি কারবারে নগদ অর্থের অধিকারী কোন হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌপ্যশক্তি। তাই ত্রিপুরার মহারাজের অধীন কয়েকটি পত্তনী আর বন্দোবস্ত নিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সেই অভাগা পূর্বপুরুষদের। পরে সেই পত্তনী বন্দোবস্তগুলোও একের পর এক হাতছাড়া হয়েছে।' (পৃ. ৫৬)। এই ইতিহাস বোঝার অক্ষমতা ফেলু মিঞার ব্যক্তিগত নয়, এই অক্ষমতা বাংলার পুরো মুসলিম অভিজাতশ্রেণির। ব্রিটিশদের কাছে মোগলদের ক্ষমতা-হারানোটা কেবল সামরিক ব্যাপার ছিল না, কিংবা ব্রিটিশ শাসন মুঘল আভিজাত্যের ধারাবাহিকতাও নয়, এ শাসন ছিল সম্পূর্ণত বণিকের শাসন। নতুন ধরনের এই শাসনে মুনাফাই মুখ্য ব্যাপার আর পুঁজি হলো সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্বের নির্ধারক ক্ষমতা। আভিজাত্য-গর্বী এই মুসলিম সামন্তশ্রেণি পুঁজিকেন্দ্রিক এই আর্থ-সামাজিক বাঁকবদলের চারিত্র্য বুঝতে না-পেরে রীতিমত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ইতিহাসের গতিধারার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের দুর্ভোগের জন্য ব্রিটিশদের ক্ষমতা-দখলকেই অভিযুক্ত করেছে এবং এই বিভ্রমেই তাঁরা আটকে ছিল ঔপনিবেশিক কালের শেষাবধি। মিঞা-আভিজাত্যের শেষ প্রতিনিধি ফেলু মিঞার মগ্নচৈতন্যে 'ওৎ পাতা জন্তু'-র মতো লেপ্টে আছে তার পরিবারের পূর্বতন খানদান, ভোগমত্ততা আর স্বৈর-ক্ষমতাচর্চার দুরন্ত স্মৃতি এবং বর্তমানের রিক্ততা ও অক্ষমতাজনিত আক্রোশ ও বহ্নিযন্ত্রণা।[৮] হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের সূত্র সে সন্ধান করে পুরনো সামন্ততন্ত্রের পুনরাধিষ্ঠানের মধ্যে। তার বন্ধ্যা-আভিজাত্যবোধে ব্যবসায় ও কৃষিকাজ সম্মান-হানিকর ব্যাপার[৯]; আর চাকরি মানেই 'ইংরেজের নফরদারি' (পৃ. ৫৭)। হারানো-আভিজাত্য পুনরুদ্ধারের উন্মাদনায় খাজনা আদায়ের নামে প্রজাদেরকে বাস্তুচ্যুত করতে এবং স্ত্রীর গহনা চুরির মতো নীচতার আশ্রয় নিতেও সে বেপরোয়া। বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের তুঙ্গস্পর্শী পাকিস্তান আন্দোলনে ফেলু মিঞার সম্পৃক্ততা তার সামন্ত-আভিজাত্য পুনরুদ্ধার বাসনায় প্ররোচিত। আকবর বাদশাহর উত্তরাধিকার হিসেবে ভারতবর্ষের মালিকানা ফিরে পাওয়াটা তার কাছে অধিকার। কিন্তু অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে ইংরেজদের চেয়ে রামদয়ালের মতো দেশীয় হিন্দু অভিজাতশ্রেণিই তার প্রধান বাধা। তার কাছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান মানেই হিন্দু অভিজাতশ্রেণির প্রাধান্যপুষ্ট নতুন শাসন, যা মুসলমানদের জন্য নতুন ধরনের পরাধীনতা, বিপর্যয়কর ভবিষ্যৎ।[১০] ক্ষমতা-প্রত্যাশী ফেলু মিঞা রামদয়ালের কাছে মিঞাদের ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোকে গোটা অঞ্চলের মুসলমানদের পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত করে এবং রামদয়ালের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাকে সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত করে।[১১] কিন্তু ফেলু মিঞার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, মিঞা-আভিজাত্যের পতন সে রোধ করতে পারেনি; নিঃস্ব অবস্থায় তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। ফেলু মিঞার পতন দীর্ঘ ঔপনিবেশিক যুগ শেষে পূর্ববাংলায় সামন্ততন্ত্রের পতন ও নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পুঁজিবাদের উত্থানকে সংকেতিত করে।

ফেলু মিঞা রামদয়ালকেই তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেছে। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক মিত্রতা ও তদ্‌লব্ধ নগদ পুঁজির জোরে রামদয়াল মিঞাদের জমিদারি এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি-কর্তৃত্ব-আভিজাত্য কুক্ষিগত করেছে। মিঞাদের মতো জমিদারিই তার উপার্জনের একমাত্র উৎস নয়, বৈচিত্র্যময় ব্যবসাই তার অর্থোপার্জনের মূল খাত : 'হিসেবী লোক রামদয়াল। তালুক জোত তার কম নয়। কিন্তু মহাজনী তেজারতিটাই আসল পেশা, পূর্বপুরুষদের পেশাও বটে। তা ছাড়া দত্তের বাজারে অর্ধেক শরিক, দোকান, মহকুমা শহরে ধান-চাল-মশলার পাইকারি কারবার। ওতেই টাকা ঢালে রামদয়াল। ওতেই মুনাফা অঢেল, নগদানগদি। ইতিমধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের হিসাবটাও করে ফেলেছে রামদয়াল।' (পৃ. ৬০)। আর্থ-সামাজিক অবস্থার গতিবিধি অনুধাবনে এবং তদনুয়ায়ী পুঁজি বিনিয়োগে রামদয়াল অসামান্য কুশলী ও বিচক্ষণ বণিক। সামন্তযুগের অবশেষটুকুর আসন্ন পতন সম্পর্কে তার দূরদর্শিতা বিস্ময়কর, যুদ্ধের অর্থনীতিটাও তার নখদর্পণে। ফেলু মিঞা যখন জমি বিক্রি করে তালুক-ক্রয়ে উন্মত্ত, তখন রামদয়াল তালুক বিক্রি করতে উদ্যোগী লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে। ফেলু মিঞার তালুক-ক্রয়ের অন্ধ-নেশাকে সে কৌশলে মুনাফার ক্ষেত্র হিসেবে

ব্যবহার করে। উচ্চমূল্যে তালুক-বিক্রয়ে রামদয়াল দালাল হিসেবে নিয়োগ করে ফেলু মিঞারই ঘনিষ্ঠ অনুচর রমজানকে। যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারি করে সে উপার্জন করে কাড়িকাড়ি টাকা। জমিদার-মহাজন-বণিক হিসেবে রামদয়াল চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বার্থান্ধ ও নির্বিবেক শোষক। তার চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে কোনো দেশপ্রেম বা মানবকল্যাণের ন্যূনতম দায়বদ্ধতা নেই, আছে কেবল সীমাহীন অর্থলিপ্সা আর স্বার্থপরতা। সামন্ত-শাসকের ভূমিকায় রামদয়াল ফেলু মিঞার সমগোত্রীয় আর বণিকী ধূর্ততায় রমজানের একান্ত দোসর। প্রখর বুদ্ধিমত্তায় রামদয়াল অগাধ সম্পদের মালিক হলেও আসন্ন বিপর্যয় সে রোধ করতে পারেনি; সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়ে তাকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে।

ফেলু মিঞা ও রামদয়ালকে সরিয়ে দিয়ে গোটা অঞ্চলের নতুন অধিপতি হয়ে ওঠে রমজান। রমজানের এই উত্থান ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ম মেনেই ঘটেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে যে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল তা গোড়া থেকেই ছিল ব্রিটিশ শাসননীতির অনুসরণে সাম্প্রদায়িক বিভাজনভিত্তিক এবং তাতে ছিল ক্ষমতা-আকাঙ্ক্ষী অভিজাতগোষ্ঠীকে ব্রিটিশ ঔনিবেশিক শাসনের সঙ্গে জুড়ে নেয়ার কৌশল। এই নির্বাচনী রাজনীতিতে ঔপনিবেশিক আশীর্বাদপুষ্ট পুঁজিপতিরাই ছিল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। জনপ্রতিনিধি হওয়ার পথে সাম্প্রদায়িকতাকে তারা ব্যবহার করে নিপুণ হাতিয়ার হিসেবে। নির্বাচনী রাজনীতির হাত ধরেই ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ক্রমশ গভীর হয় এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানপর্বে তা রূপ পায় রক্তাক্ত দাঙ্গায়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রয়োজনে ব্রিটিশরা ভারতে যে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছিল, তারাই আবার শাসন প্রত্যাহার করে নেয়ার আগে ভারতকে পশ্চিমা পুঁজিবাদের সুতোয় বেঁধে রাখতে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর স্থানীয় পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছিল। যুদ্ধ-অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়নের সুযোগে রমজান প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয় এবং কূটকৌশলে পুরনো মনিব ফেলু মিঞা এবং ব্যবসায়িক দোসর রামদয়ালকে উৎখাত করে নিজের উত্থান নিশ্চিত করে। রমজানের পূর্ববঙ্গের একটি জনপদের একচ্ছত্র কর্তা হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা ও নেতৃত্বের গণবিরোধী প্রশ্রয়ের প্রকাশ ঘটেছে।

উপন্যাসে রমজান শঠতা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, দস্যুবৃত্তি ও প্রতিহিংসাপরায়ণতায় মোড়ানো আপাদমস্তক এক খলচরিত্র। প্রাথমিক পরিচয় তার নিতান্তই সাধারণ ও তুচ্ছ; ফেলু মিঞার ভাষায়- 'চাষার পূত চাষা' (পৃ. ১১৬)। গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের নামেও সম্মানসূচক একটি বংশীয় পদবি থাকে, রমজানের তা-ও ছিল না। তবে সে মনের গহিনে লালন করেছে ক্ষমতাধর ও 'তোয়াঙ্গর' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা; সে গড়ে তুলতে চেয়েছে একটি সম্মানজনক আত্মপরিচয়। কিন্তু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জনের প্রধান দুই নিয়ামক বিত্ত ও বিদ্যা কোনোটিই তার আয়ত্তে ছিল না। সহজ-স্বাভাবিক পথে ইচ্ছা-পূরণ যখন অসম্ভব, তখন সে বাঁকা পন্থাকেই অবলম্বন করেছে। ভাগ্যান্বেষণে সে রেঙ্গুন গিয়েছে, সেখানে সে ধূর্তবুদ্ধি ও দুর্বৃত্তপনার সহযোগে কুলি-সর্দার হিসেবে 'ফাও রোজগারের' একটি ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছিল। সেখানে দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রাণ বাঁচাতে প্রত্যাবর্তন করে বাকুলিয়ায়। স্তাবকতায় ও 'অন্ধ গোলামের মতো বিনয়ে' মুগ্ধ করে এবং সকল অপকর্ম ও লাম্পট্যে পরামর্শ ও সহযোগিতা জুগিয়ে সে হয়ে ওঠে ফেলু মিঞার 'দক্ষিণহস্ত'। বাকুলিয়ার নতুন অধ্যায়ে দুর্বৃত্তপনা, হিংস্রতা, লাম্পট্য, প্রতিহিংসাপরায়ণতায় সে পরিণত হয় 'ফেলু মিঞার যোগ্য সাকরেদ'-এ (পৃ. ৯০) এবং 'চাষী ও মিঞার মাঝে রমজান হলো গিয়ে এক সেতু।' (পৃ. ৭৭)। এটি ছিল তার জন্য একটি বিশেষ সামাজিক মর্যাদা। তদুপরি ফেলু মিঞার পৃষ্ঠপোষকতা ও ছত্রচ্ছায়ায় সকল প্রকার অপকর্মের শাস্তিপ্রাপ্তি থেকে সে ছিল সুরক্ষিত। ফেলু মিঞার সামন্ত-ক্ষমতায় অংশীদারত্বই ছিল তার উত্থানের প্রাথমিক ভিত্তি। রমজান ফেলু মিঞার দুষ্কর্মের সহযোগী হলেও কখনোই তার বিশ্বস্ত মিত্র ছিল না। প্রদর্শিত আনুগত্যের আড়ালে রমজান ছিল ফেলু মিঞার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ফেলু মিঞার ক্ষমতার পার্শ্বচর হিসেবে ক্ষমতার মাহাত্ম্য সে প্রত্যক্ষ করেছে, ক্ষমতাধর হওয়ার ধূর্তকৌশলগুলো রপ্ত করেছে এবং মনিবকে সরিয়ে সেখানে নিজেকে প্রতিস্থাপনের গোপন অভিসন্ধি লালন করেছে। ধুরন্ধর রমজান ফেলু মিঞার দ্বারা ব্যবহৃত হয়নি, বরং ফেলু মিঞার আভিজাত্য-গর্বী

নির্বুদ্ধিতার সুযোগে তার পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে রমজান ক্ষমতা অর্জনের পথে খুব চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে মনিবের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতেও সে দ্বিধা করেনি। ফেলু মিঞার তালুক কেনার নেশা বাস্তবায়নে বকেয়া খাজনা আদায়ের বুদ্ধি জুগিয়ে পুরস্কারস্বরূপ সে দখল করে নেয় কসিরের বাস্তুভিটা; উচ্চমূল্যে তালুক কিনিয়ে রামদয়ালের কাছ থেকে আদায় করে কমিশন। কৌশলে সে সৈয়দবাড়ির জমি দেখাশোনার দায়িত্বও হাতিয়ে নেয়। ফসল বিক্রি এবং রামদয়ালের কাছ থেকে দালালি বাবদ প্রাপ্তি মিলিয়ে বেশ কিছু নগদ অর্থের মালিক বনে যায় রমজান। নির্বাচনী রাজনীতির অর্থ-ছড়াছড়ির নৈরাজ্য থেকেও প্রচুর অর্থ কামিয়ে নেয় সে। সেই অর্থ আবার সুদি কারবারেও নিয়োজিত করে। নগদ অর্থের জোরেই সে রামদয়াল-ফেলু মিঞার দ্বিপাক্ষিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্রমান্বয়ে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। মনিব ফেলু মিঞার তুলনায় রমজান ছিল অগ্রসর চিন্তার মানুষ। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তার ধারণাটা ছিল পরিষ্কার। তাই পশ্চাদ্‌মুখী ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে নিজের বিজয়টাকে অবধারিত ধরে নিয়েই সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে।[১২] মিঞা আভিজাত্যের অনুকরণে সে একটি বৈঠকখানা গড়ে তোলে[১৩], সেখানে তার মহাজনি ব্যবসার খাতক ছাড়া গ্রামের দু-চারজন মাতবরও আসে। একপর্যায়ে সে ফেলু মিঞার বৈঠকখানায় যাতায়াত প্রায় বন্ধই করে দেয়; মনিবের ডাকে সাড়া দিতেও দেখা যায় তার গড়িমসি ভাব। ফেলু মিঞার বিশ্বস্ত পেয়াদা কালুকেও বকশিশ প্রদানে সে বশীভূত করে নেয়। কালুকে উদ্দেশ্য করে রমজানের উক্তিতে ফুটে ওঠে ফেলু মিঞার প্রতি তার তাচ্ছিল্যের মনোভাব : 'তুই যেমন পেয়াদা, তেমন তোর মুনিব, দলিল দলিল করেই শালা মরবে।' (পৃ. ১৬৫)। ক্ষমতার লড়াইয়ে ফেলু মিঞাকে ধরাশায়ী করতে রমজান সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে : 'ফেলু মিঞার পক্ষেও আছি আমরা, বিপক্ষেও আছি। এ বড় কঠিন খেইল।' (পৃ. ১৬৫)। ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে এ কঠিন খেলায় অনায়াসেই সে তুলে নেয় কাঙ্ক্ষিত বিজয়। কিন্তু রমজানের সামনে রামদয়াল ছিল প্রকৃতই এক কঠিন প্রতিপক্ষ। স্বার্থপরতায়, শঠতায়, প্রতারণায়, ধূর্তবুদ্ধিতে, অর্থলিপ্সায় দুজনেই সমকক্ষ। যুদ্ধের বাজারে কালোবাজারিতে দুজনের ভূমিকাই মানবতাবিরোধী এবং পারস্পরিক সহযোগীর।[১৪] তবে শেয়ানে-শেয়ানের এই দ্বৈরথেও রমজানই চূড়ান্ত বিজয়ী। এ পর্যায়ে ফেলু মিঞার তৈরি করা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ময়দানটিকেই রমজান চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। জমিদার ও মহাজন হিসেবে প্রজাপীড়কের ভূমিকাকে সামনে রেখে ফেলু মিঞার সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় রামদয়াল মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে মুসলিম-বিদ্বেষী গণশত্রু রূপে চিহ্নিত হয় এবং রমজানের অশুভ তৎপরতায় রামদয়াল শেষপর্যন্ত বাধ্য হয় দেশত্যাগে। সেকান্দর মাস্টারের জবানিতে আমরা পাই 'কানকাটা' রমজানের উত্থানের চিত্র : 'চশমখোর বেইমানের কি জাত আছে, না ধর্ম আছে। ফেলু মিঞার তেল নুন খেয়ে তুই মানুষ। হোক হারামের রুজি, তবু রামদয়ালের কৃপাতেই তো দুটো পয়সা করলি তুই। আর তাদের রেহাই দিলি না?' (পৃ. ৩৬৪)। রামদয়াল ও দেশত্যাগী হিন্দুদের সমুদয় সম্পদ দখল করে নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে রমজান হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চলের একচ্ছত্র অধীশ্বর; আর 'দত্তবাড়ি'-র রূপান্তর 'কাজীবাড়ি' হয়ে ওঠে নতুন ক্ষমতার স্মারক।

ফেলুমিঞা-রামদয়াল-রমজান এই তিন চরিত্রে বিম্বিত হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তান আমলে বাংলার ক্ষমতাকেন্দ্রের পালাবদল এবং এর জঘন্য চারিত্র্যের ইতিহাস। এই ক্ষুদ্রাকৃতির ক্ষমতাকেন্দ্রের বাইরে বাংলার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে ছড়িয়ে আছে ঔপনিবেশিক শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণায় স্পৃষ্ট ও নিঃসীম দারিদ্র্যে জীর্ণ বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর, ভূমিহীন, খেটে-খাওয়া চাষাভুষো মানুষ। লেকু, কসির, ফজর আলী, হুরমতি, আম্বরি ভাগ্যবিড়ম্বিত বিস্তীর্ণ মানুষদের প্রতিনিধি। এর মধ্যে লেকুই সর্বাগ্রগণ্য দৃষ্টান্ত। লেকুর 'মস্ত যোয়ান দেহ' (পৃ. ৪০), 'গোবদা গোবদা পায়ের গোছা, হাত আর মুখ আর বুকের পাটাটা কুলোর মতো চওড়া, খাটতে পারে মোষের মতো'। 'গতর খাটুনি'তে তার স্ত্রী আম্বরিও কম নয়। চৌদ্দ গণ্ডা জমি ও ক্ষুদ্র ভিটিতে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ পরিশ্রমে ফলানো ফসলে পরিবারের তিন সদস্যের মাত্র পাঁচ মাসের খোরাকির সংস্থান হয়। বাকি সাত মাসের খোরাকির জন্য লেকুকে কর্মোপলক্ষ্যে ছুটতে হয় উত্তরের পাহাড়ে, বাখরগঞ্জে বা আসামে। অক্লান্ত পরিশ্রমেও তাদের দারিদ্র্যমুক্তি ঘটে না। অলংকার বন্ধক রেখে তাকে সংস্কার করতে হয় ঝড়ে ভেঙে-পড়া ঘর। জমি বিক্রি করে

শুধতে হয় জমিদারের বকেয়া খাজনা। জমিদার-মহাজন ও প্রকৃতির বিরূপতায় তাকে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হতে হয়। বিপুল যার কর্মশক্তি, দারিদ্র্যের কাছে সে শিশুর মতো অসহায়। নিজের অসহায়ত্ব নিয়ে সে আত্মধিক্কারে ফেটে পড়ে : 'মানুষ? কে? তুই? আমি? পশুর চেয়েও অধম। অমানুষ, অমানুষ।' (পৃ. ৮৭)। কসির ফেলু মিঞার বকেয়া খাজনা এবং রামদয়ালের ঋণ ফাঁকি দিতে রাতের অন্ধকারে ভিটেমাটি ছেড়ে অজানা গন্তব্যে পাড়ি জমায়। কসিরের মতো বাস্তুচ্যুতরা আর কখনো ফেরেনি, যদিও ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়েই তারা বাস্তুত্যাগ করেছে : 'মাস্টারসাব মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার আসব।' (পৃ. ১০৮)। মিঞা-বাবুর যৌথ উৎপীড়নে নিয়তির মতো অলঙ্ঘনীয় ভাঙনে বিধ্বস্ত হয়েছে এই সম্পদ-সমৃদ্ধ জনপদ : 'বইয়ে পড়া, ছোট বেলায় কিছুটা বুঝি চোখেও দেখা সোনার বাংলা সোনার গ্রাম। ভেঙে যাচ্ছে সেই গ্রাম বাংলার গাঁথুনি। এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে মানুষগুলো। ঘুঘু চরছে শূন্য ভিটায়। কে রুখবে, কেমন করে রুখবে এ ভাঙন?' (পৃ. ১০৯)। হুরমতি মিঞাদের উন্মত্ত ভোগের ফসল, আবার ভোগের শিকার। অসহায় হুরমতিকে ফেলু মিঞা, রমজানেরা টাকার বিনিময়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করে, আবার অবৈধ সন্তান জন্মদানের অপরাধে ইচ্ছেমতো শাস্তিও প্রদান করে। ঔপনিবেশিক শাসনে প্রভাবশালীদের হাতেই পুঞ্জীভূত হয়েছে সকল ক্ষমতা, আর স্বৈরক্ষমতার বলেই তারা ভোগ করেছে সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ-দমনের অবাধ স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক আইন-আদালত-পুলিশ প্রভাবশালীদের সুরক্ষা জুগিয়েছে। দমন-পীড়ন-শোষণে বিপর্যস্ত হলেও সাধারণ মানুষের মুক্তির স্বপ্নটি ছিল অবিচল। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে পুরো ঔপনিবেশিককাল জুড়ে তারা শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে; তবে ইতিহাসের বিশেষ পর্বে এসে সরল বিশ্বাসে তারা অভিজাত ধনাঢ্যশ্রেণির হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করেছে এবং নির্মমভাবে প্রতারিত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের মধ্যপর্বে এসে 'তালুক পত্তনী'র চেয়ে শিক্ষা ও চাকরি-বাকরিই হয়ে উঠে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির পক্ষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠে। প্রথমাবধি এই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণিটি ছিল মূলত হিন্দুপ্রধান। বিশ শতকের গোড়ায় এসে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে যে ক্ষুদ্রাকৃতির শিক্ষিতশ্রেণির উদ্ভব ঘটে তাতে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতশ্রেণিরই ছিল প্রাধান্য, দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তানের সংখ্যা সেখানে নিতান্তই নগণ্য। *সংশপ্তকে* ঔপন্যাসিক মাত্র কয়েকটি বাক্যের আঁচড়ে আঁকেন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির পূর্ণাঙ্গসম্ভব চিত্র : 'বাকুলিয়ায় শিক্ষা বলতে যা বোঝায় সে তো মিঞা আর সৈয়দদেরই একচেটিয়া। ... তালতলির ঘরে ঘরে বি.এ. এম.এ পাস...। ... মিঞা এবং সৈয়দ বাড়ির বাইরে একমাত্র সেকান্দরই তো দু'দুটো পাস দিয়েছে, বি.এ. পর্যন্ত পড়েছে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে এমন একটা ছেলেও তো নেই বাকুলিয়ার কৃষকদের।' (পৃ. ৭৬)। পতনোন্মুখ আভিজাত্য রক্ষা-কল্পে বড় মিঞা তালুক বিক্রির টাকায় সন্তানদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। শিক্ষা ও চাকরিসূত্রে ভূসম্পত্তিভিত্তিক গ্রামীণ সামন্তশ্রেণি থেকে তাদের উত্তরণ ঘটে নতুন কৌলীন্যের নাগরিক মধবিত্তশ্রেণিতে। 'সাহেব' বনে-যাওয়া এই মিঞা-সৈয়দরা তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতোই জনবিচ্ছিন্ন এবং সামন্ত-আভিজাত্য সম্পর্কে উদাসীন। বড় সৈয়দ 'ইংরেজ সরকারের অনুগত কর্মচারী এবং শান্তিপ্রিয় প্রজা' (পৃ. ২৪৭) আর তার বড় ছেলে রাশেদ, যে 'মুখে পাইপ আর বগলে মেম নিয়ে ফিরে এসেছিল বিলেত থেকে' (পৃ. ২৪৬)।

সুবিধাবাদী, স্বার্থান্ধ ও দাস্য মনোবৃত্তির এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি থেকেই আবির্ভাব ঘটেছে জাহেদ-রাবুদের মতো নিঃস্বার্থ মানবতাবাদী ও যথার্থ দেশপ্রেমিক মানুষদের। বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মোট আকারের তুলনায় এদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য, তবে এরা প্রখর ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় মানবনিষ্ঠা ও মানবমুক্তির আদর্শিক সংকল্পে শানিত দায়িত্বশীল বুদ্ধিজীবী। আর সেকান্দর মাস্টার মৃত্তিকা-উৎস থেকে জাত মূললগ্ন বুদ্ধিজীবী। রমজান-সেকান্দর মাস্টার 'চাচাত-জ্যাঠাত ভাই' (পৃ. ৩০); দুজনেই বংশ-পদবিবিহীন দরিদ্র কৃষক-পরিবারের সন্তান এবং দুজনেই উত্তরণ-প্রয়াসী, তবে দুজনের প্রয়াস দু ধরনের—রমজান হতে চেয়েছে ক্ষমতাধর 'তোয়াঙ্গর' আর সেকান্দর নিষ্ঠাবান শিক্ষক, নিষ্পেষিত গণমানুষের মুক্তির দূত। এই উত্তরণ-প্রয়াসে রমজান স্বশ্রেণি-বিদ্বেষী, মনিব ফেলু মিঞার মতোই তার দৃষ্টিতে স্বশ্রেণির মানুষেরা 'কমজাত, ছোট লোকের বাচ্চা' (পৃ. ১০৬)। অপরপক্ষে সেকান্দর

শিক্ষিত হলেও আভিজাত্যগর্বী আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে শহরে পা বাড়ায়নি[১৫], গ্রামকেই আঁকড়ে থেকেছে গভীর মমতায় তাকে নতুন করে গড়বে বলে। গ্রামের মানুষের কাছে সেকান্দর 'আপন ঘরের ছেলে' (পৃ. ৭৫), একজন পরম নির্ভরতার অভিভাবক : 'মাস্টার ওদের গৌরব। ওদের অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্নেহপ্রীতি আর বোধ হয় অনেক আশা ভরসা ওকে ঘিরে।' (পৃ. ৭৬)। গ্রামবাসীর অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভক্তির মূল্য দিতেই তাদের কল্যাণে সে আত্ম-নিবেদন করেছে। 'শিক্ষকতার পবিত্র ব্রত'-ই (পৃ. ১০৫) তাকে সংকীর্ণ স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে 'সরল গাঁয়ের মানুষ'দের মুক্তির পথপ্রদর্শক হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মূক গণমানুষের অসহায়ত্ব তাকে গভীর দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত করেছে।[১৬] এমন সময়ে জাহেদের কাছ থেকে আসে রাজনীতিতে যোগদানের আহ্বান : 'গোটা ভারতের মুসলমানকে আজ এক হতে হবে, এক জমাতে এক আওয়াজে এক নিশানে। গোটা বাংলায়, সারা ভারতে শুরু হয়ে গেছে সে কাজ। এ অঞ্চলে সে কাজের দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকে।' (পৃ. ১২৯)। জাহেদের দুর্বার আন্দোলনের জালে মাকড়শার মতো জড়িয়ে পড়ে সেকান্দর। উভয়ের অভিন্ন অন্বিষ্ট 'গরীব-দুঃখী' মানুষের মুক্তি হলেও[১৭], শ্রেণিগত অবস্থানের কারণেই তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও ছিল সুস্পষ্ট। প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সেকান্দর অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী : 'কেন অমন সংকীর্ণ ঈর্ষায় ছোট করি নিজেকে? তার চেয়ে জ্ঞানে-গরিমায় সততায় ত্যাগে ওদেরকেও ছাড়িয়ে যাব, এমন একটা প্রতিজ্ঞা কি নিতে পারি না আমরা? আমি তো বলি এই সুস্থ প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতার পথটাই একমাত্র সত্য পথ, ওতে উভয়েরই মঙ্গল।' (পৃ. ১৩২)। আর শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্বের কারণেই জাহেদ ফেলু মিঞার মতোই সাম্প্রদায়িক : 'স্বাধীনতা মানে স্বরাজ নয়– ... স্বরাজ মানে তো হিন্দুরাজ। ওতে মুসলমানদের কি হবে? প্রায় দু'শো বছর তো ইংরেজের গুঁতো খেয়ে কাটল। স্বরাজ এলে পরে শুরু হবে বেনে-মুৎসুদ্দির গুঁতো।' (পৃ. ১২৮)। জাহেদের মতে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনটা ব্রিটিশ ও হিন্দু বানিয়া এই যৌথ শত্রুর বিরুদ্ধে। (পৃ. ১৫৩)। ব্রিটিশ বিতাড়ন ও মুসলমানদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠাই তার কাছে স্বাধীনতা আর সেই মহার্ঘ স্বাধীনতা আসবে ধনী-নির্ধন সকল মুসলমানের সর্বাত্মক ঐক্যে ভর করে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে সে সকল মুসলমানের ঐক্য চেয়েছে[১৮] এবং ফেলু মিঞা-রমজানদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য সেকান্দরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।[১৯] কিন্তু সেকান্দর মাস্টারের কাছে ধর্মীয় ঐক্যের নামে শোষক-শোষিতের মেলবন্ধন নীতিহীন[২০] ও পরিহাসকর। কারণ সে অভিজ্ঞতা থেকেই জানে প্রজার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং শোষণ-উৎপীড়নের নির্মমতায় রামদয়াল ও ফেলু মিঞা ধর্মনির্বিশেষে একই শ্রেণিভুক্ত।[২১] শ্রেণিচরিত্রের কারণেই ক্ষুধার্ত প্রজাসাধারণের অসহায় মৃত্যুকে জাহেদ যখন খুব ন্যায্য মনে করে[২২] তখন সেকান্দর মনে করে ক্ষুধার্ত মানুষের মৃত্যুর মিছিল জাহেদের শ্রেণিভুক্ত শোষকদের চাপিয়ে দেওয়া অপমানজনক দুর্ভোগ। এই উপলব্ধি সেকান্দরকে মৃত্যুর মিছিল থামানোর লড়াইয়ে প্রত্যয়দীপ্ত করে তোলে : 'এ মৃত্যুকে আমি রুখব। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হব। আমি মরণ-জয়ের ডঙ্কা বাজাব, সবাইকে শোনাব মৃত্যুহীনের ডাক।' (পৃ. ১৫৪)। কারণ সেকান্দরের জীবনবোধ আর রাজনৈতিক চেতনার মূলে সর্বজনীন মানবিকবোধ। সে জাহেদের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের তর্কে অকপটে ঘোষণা করে তার পরিচয় 'মানুষ' (পৃ. ১৫৬) হিসেবে; দৃঢ়তার সঙ্গে জাহেদের ত্রুটি ধরিয়ে দেয় এই বলে : 'ভুল করছ জাহেদ, ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম।' (পৃ. ১৫৬)। সেকান্দরের এই ভাবনায় জাহেদের মনে জেগে ওঠে তার শ্রেণিচেতনাজাত শঙ্কা : '...অনুভূতির এই তীব্রতা মাস্টারকে নিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও, স্বদেশীদের খপ্পরে নতুবা শ্রেণী সংগ্রামের পথে। আর দুটোকেই পরিহার করে চলে জাহেদ।' (পৃ. ১৫৪)। জাহেদের অভীপ্সা যেখানে স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা মুঠোবন্দি করায় বলয়িত, সেখানে সেকান্দরের আকাঙ্ক্ষা––'রৌদ্রে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকাল মৃত্যু যাদের কপালের লিখন––তাদের মুক্তি।' (পৃ. ১৫৫)। তবু স্বাধীনতার প্রশ্নে জাহেদের আবেগী উন্মাদনার কাছে সেকান্দর আপস করে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম লীগের পক্ষে গড়ে তোলে অভাবনীয় সমর্থন। 'সুদিন আসছে, সুদিন আসবেই'––আজন্মলালিত মুক্তির সম্ভাবনায় লেকুর বিক্ষুব্ধ মনও দুশমনের প্রতি প্রসন্ন ক্ষমায় উদ্বেলিত হয় : 'সুদিনের কথাটা যেদিন থেকে গেঁথে গেছে ওর মনে সেদিন থেকে উরুর ওই ব্যথাটাও যেন ভুলে গেছে ও। ভুলে গেছে অনেক কিছু। সেই রাগ, সেই আক্রোশ রমজানের বিরুদ্ধে, ফেলু মিঞার বিরুদ্ধে, তেমন করে যেন উন্মাদ করে না ওকে। ওর সেই 'সুদিনের' স্বপ্নের কাছে ওরা যেন কিছুই না, ওদের

গ্রাহ্য করে না লেকু।... বোজা চোখে তন্দ্রার মাঝেও বুঝতে পারে লেকু, জোর আসছে ওর বুকে, ওর মনে। তাকত আসছে ফিরে, শক্তি আসছে ধমনিতে। আবার সেই জোয়ান মরদের থলথলে শরীরটা যখন চলবে মাটি কাঁপবে, থরথর করে মাটি কাঁপবে।' (পৃ. ১৩৭)। আপাত ঐক্যের বাতাবরণে ফেলু মিঞা, রমজানের মতো দুর্বৃত্তরা গণমানুষের মুক্তিসংগ্রামে মিশে যায় এবং অবস্থান নেয় নেতৃত্বের পুরোভাগে। এভাবে রাজনীতি হয়ে উঠে 'অনেক স্বার্থ অনেক কোন্দল অনেক মনের সংঘর্ষে বিচিত্র জটিল গিঁঠ'। (পৃ. ১৭৭)। এই জটিলতায় জাহেদের 'সৎ-আবেগ' আর 'সদিচ্ছা'কে ছাপিয়ে কূটতৎরতায় রমজানের হিংস্র স্বার্থপরতারই জয়জয়কার। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথ বেয়ে জাহেদের প্রত্যাশিত 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' অর্জিত হয় বটে, কিন্তু পাকিস্তান নামের নবীন রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেন্দ্রে জেঁকে বসে জনবিচ্ছিন্ন গণশত্রুরা। নব্যশোষকদের দৌরাত্ম্যে বেহাত হয়ে যায় গণমানুষের বহুল কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বপ্ন।

স্বাধীনতার ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে গড়ে ওঠা স্বাধীনতার সংজ্ঞার্থের মধ্যে। এই সংজ্ঞার্থে বিদেশি শাসনের অবসান ও স্বদেশির শাসনই স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক মতাদর্শে শিক্ষিত অভিজাতশ্রেণি নিরূপিত এই সংজ্ঞার্থটি তৈরি হয়েছে গণদারিদ্র্য ও জনদুর্ভোগের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করে। জাহেদের মতে, 'একমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই উন্মুক্ত করতে পারে আকাঙ্ক্ষিত দ্রুত সংস্কারের পথ, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই তৈরি করে দেবে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি।' (পৃ. ১৭৪)। স্বাধীনতার এই সংজ্ঞার্থ আর উদ্দেশ্য ছিল ভয়াবহভাবে ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর; অভিজাতশ্রেণির ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের উগ্র বাসনা প্রান্তিক কৃষক-জনতার বৃহত্তর মুক্তিকে স্পর্শ করেনি। জাহেদের অসম্পূর্ণ সংজ্ঞার্থের বিপরীতে সেকান্দরের ভাবনায় ধরা পড়েছে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অবয়ব : 'স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর রয়েছে একটা অর্থ, তাৎপর্য। সেটা হলো জাগরণ এবং পুনর্গঠন—– নৈতিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক–অর্থনৈতিক—সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী, প্রস্তুতি চলবে ঘরে-ঘরে।' (পৃ. ১৭৫)। 'আজাদীর জন্য... অধিকার বোধটা হলো প্রাথমিক উপলব্ধি। সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সততা আর আত্মার সম্পদ প্রয়োজন...। ওগুলো বাদ দিয়ে আজাদী আসতে পারে না, এলেও সে আজাদী ধরে রাখতে পারবে না, আত্মিক শক্তির অভাবে আজাদীই হবে উৎপীড়ন বিশৃঙ্খলার নামান্তর।' (পৃ. ১৭৫)।

ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষত হিসেবে অর্থনৈতিক দারিদ্র্যকে মুখ্য করতে গিয়ে মানুষকে আত্মিক ও নৈতিকভাবে নিঃস্বকরণের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনে দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অশিক্ষা ও কুসংস্কার, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা, সর্বোপরি লোভের ফাঁদে ভেঙেচুরে গেছে জনগণের নৈতিক ভিত্তি এবং পারস্পরিক সহানুভূতির যৌথচেতনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঔপনিবেশিক গোলামিরই ফলাফল : 'দু'শো বছরে অনেক পাপের বীজ জমেছে আমাদের রক্তে। এ হয়তো তারই ফল।' (পৃ. ২৪৩)। ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াইয়ে প্রাধান্য লাভ করে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী স্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িকতা হয়ে উঠে রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভের মূল নিয়ামক। স্বার্থপরতার কারণেই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে হিন্দু-মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ব্যর্থ হয়েছে : 'ক্ষেতে ওরা লাঙল দেয় একসাথে, আপিসে কারখানায় কাজ করে একসাথে। ইংরেজের লাথি খায় একসাথে। সংগ্রামটা একসাথে করতে পারেনি।' (পৃ. ২৪৩)। বিদেশি শত্রুকে ভুলে লিপ্ত হয়েছে আত্মঘাতী হানাহানিতে। 'আল্লাহু আকবার আর বন্দেমাতরম্'—এই শ্রুতিমধুর ছন্দঝংকার হয়ে ওঠে 'পাশবিকতার হুংকার', 'উলঙ্গ হিংস্র এক মৃত্যুর ঘোষণা'। (পৃ. ২৩৪)। পশুত্বের বর্বরতায় মৃত্যুমুখী মানুষের আর্তচিৎকারে প্রকম্পিত হয়েছে বাংলার আকাশ-বাতাস; সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য নিষ্পাপ মানুষ। এই দাঙ্গায় 'গরিব লোকেরাই ক্ষেপেছে বেশি, অথচ এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে ওদের সবচেয়ে বেশি।' (পৃ. ২৫১)। শত্রু-মিত্র সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতাবশত সাধারণ মানুষ আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতায় প্ররোচিত হয়ে স্বসম্প্রদায়ের ক্ষমতালোভী ও নৈতিকতাবর্জিত লোকদের ক্ষমতারোহণে সহায়তা করে। ঔপনিবেশিক শাসকদের অভিসন্ধি অনুসারে নবীন রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসকদের দোসর ও মতাদর্শপুষ্ট স্থানীয় ধনতন্ত্রীগোষ্ঠী। *সংশপ্তক*-এ সদ্যস্বাধীন পাকিস্তানের

একটি অঞ্চলে প্রায় নাম-পরিচয়হীন, হিংস্র-স্বার্থপর রমজানের হাতে কুক্ষিগত হয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব : 'যুদ্ধের পর এলো পাকিস্তান। পাকিস্তানের মওকাও ছাড়েনি রমজান। আজ বুঝি আরও উঁচু স্তরের মানুষ শেখ রমজান। আজ তার কোন পদবি, তালতলির কোন কাজিবাড়িতে তার নতুন মসনদ! ... ওলট পালট, লয় পরিবর্তন, এটাই নাকি পৃথিবীর নিয়ম। সে নিয়মেরও ধর্ম আছে, ধারা আছে। সে পরিবর্তনের ধর্ম, তার গতি, সময় ও কালের ফলকচিহ্নে দৃষ্টিগ্রাহ্য। কিন্তু রমজান? ও যেন ভোজবাজি, ছুমন্তর। পির সাহেবের ফুঁক ফাঁক তুক তাক, কুদরতের ভেল্কিবাজি। লোকে বলে সেই ভেল্কিবাজিতে একখানা নোট দশখানা হয়, দেখতে এক টাকার নোটখানা হয়ে যায় একশো টাকার। ম্যাজিকের ওই ভেল্কিবাজিকেও যেন হার মানিয়েছে রমজান। ছাড়িয়ে গেল সময়ের গতিকেও। উল্টিয়ে দিয়েছে নিয়মের চাকা।' (পৃ. ৩৬২)। মালুর বীক্ষণবিন্দুতে উপস্থাপিত রমজানের এই ভোজবাজির মতো উত্থান কেবল একজন ব্যক্তির উত্থানই নয়, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির একটি বিশ্বস্ত চিত্রও। নৈতিকতাশূন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুষ্কর্মের সহযোগী হিসেবে পূর্ণপ্রতাপে বহাল হয় ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী আমলাতন্ত্র। *সংশপ্তক*-এ মালুকে উদ্দেশ্য করে রমজানের উক্তিতে প্রতিফলিত হয় এ বাস্তবতা : 'আজ ইউনিয়ন বোর্ড, কাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পরশু রিলিফ কমিটি, মিটিং করে করেই জানটা গেল রে মালু।... দিনভর মিটিং চলবে। রাত্রে একটা পার্টি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে। কন্ট্রোলার সাহেব চলেছেন, এস.ডি.ও. সাহেব আসছেন বিকেলে। মানী মর্যাদার মেহমান সব।' (পৃ. ৩৬২)। জনবিচ্ছিন্ন শিক্ষিতশ্রেণি নির্বিবেক আত্মপরতায় মগ্ন হয় এবং মেতে ওঠে দুর্নীতি ও লুঠপাটে। সৈয়দসাহেবের কাছে পাকিস্তান মানেই ব্যক্তিগত পদোন্নতি ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি[২৩], এই উদ্দেশ্যে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ ও তাকে পুলিশে সোপর্দ করতেও তিনি দ্বিধাহীন।[২৪] আরিফার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী দুর্নীতির টাকায় নতুন রাজধানী ঢাকার বুকে গড়ে তুলছে একের পর এক বাড়ি; বাড়ির নকশা তৈরির জন্য উড়িয়ে এনেছে বিদেশি আর্কিটেক্ট। এই অঢেল সম্পদ অর্জনের পথে পাকিস্তানি অভিজাত শাসকশ্রেণির প্রতি তাদের ছিল নিঃশর্ত আনুগত্য ও সহযোগিতা। নিজেদের শ্রেণিস্বার্থবিরোধী মার্কসবাদী রাজনীতির প্রতি তাদের ভীতি ও বিদ্বেষ প্রবল। এজন্য মেজোভাই জাহেদ, এমনকি আবাল্য সহচরী রাবুর সঙ্গেও আরিফা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দুর্নীতি ও লুঠপাটের টাকায় রাজধানীতে গড়ে ওঠেছে একটি ভোগবাদী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-মমতার মতো মানবিক সম্পর্কগুলো অর্থের প্রাচুর্যের কাছে তুচ্ছমূল্য। রিহানা ও তার আত্মীয়বর্গের কর্মকাণ্ডে ভোগবাদের এই নগ্নরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির বিশ্বাসঘাতকতা ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া শোষণ-নৈরাজ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেনি; উপন্যাস এগিয়ে চলে ব্যর্থ-স্বাধীনতার পটে গণমানুষের মুক্তির অনিঃশেষ সংগ্রামের পথ ধরে। আদর্শিকভাবে রূপান্তরিত জাহেদ সদ্য স্বাধীন দেশে নব্যশোষকদের বিরুদ্ধে গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনটি শুরু করে নতুনভাবে; যদিও তার এই রূপান্তরের নিগূঢ় অথচ কঠিন আত্মদ্বৈরথের ইতিবৃত্ত ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার উপন্যাসের পটে উপস্থাপন করেননি। এবার সৈয়দ-আভিজাত্যের বৃত্ত ভেঙে জাহেদ নেমে আসে সাধারণ্যের কাতারে, নাগরিক জৌলুস আর ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করে উৎসভূমে—বাকুলিয়ায়। এই সংগ্রামে তার সাথি রাবু, সেকান্দরের মতো কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল শিক্ষক, মালুদের মতো উদারমনস্ক মানবতাবাদী সংস্কৃতিকর্মী আর শোষণ-শাসন থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর লেকু, ফজর আলী, হুরমতির মতো নিরন্ন, সর্বহারা মানুষেরা। এক্ষেত্রে রাবুর সংগ্রাম আবার রাজনীতির সীমা পেরিয়ে ধর্মশাসিত পুরুষতন্ত্রের গোঁড়ামি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রসারিত। নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন সকলের জন্য শোষণবিহীন সাম্যবাদী সমাজপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে রাবু গ্রামে ফিরে আসে এবং মানুষকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহা ও আত্মজাগরণের মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে মালু তার শিল্পীসত্তাকে উৎসর্গ করে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে ভর করে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে জাহেদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শোষণহীন সাম্যবাদী জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী গল্প : 'তখন সমাজে শ্রেণিবিভাগ আসেনি। দলবদ্ধভাবে শিকার করতো, যা পেত একসাথে ভাগ করে খেত আদিম মানুষ। দলপতি ছিল একান্তভাবেই আজকের নির্বাচিত প্রতিনিধির মতো...। এল গোষ্ঠীপ্রথা.....।' (পৃ. ৩৯৫)। এই অন্তহীন গল্প সুদূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত : 'এক ধারায় নয় বহু ধারায় প্রবাহিত মানুষের জীবন। যদি শুকিয়ে

যায়, যদি রুদ্ধ হয় একটি ধারা আর এক ধারায় জীবন বয়ে চলে সার্থকতার পানে। এটাই জীবনের ধর্ম। সহস্র ধারায় জীবনের বিকাশ, অজস্র পথে তার পূর্ণতা।' (পৃ. ৩৯৮)। ক্ষমতাদর্পীদের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা ভেঙে বহুমাত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই জাহেদ-সেকান্দরদের স্বপ্ন, যেখানে প্রতিটি মানুষের বৈচিত্র্যময় স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা শতপুষ্পে বিকশিত হবে।

আলোচিত *সংশপ্তক* উপন্যাসের উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নে পরিলক্ষিত হয়েছে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রক্তাক্ত পরিণতিতে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ঔপনিবেশিক মূল্যবোধপুষ্ট নেতৃত্বের স্বার্থান্ধ হঠকারিতায় সাধারণ জনগণের তা স্বপ্নভঙ্গের কথকতা। নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বিশেষত পূর্ববাংলার জনগণ নিজেকে নতুন করে উপনিবেশিত বোধ করে নিজেদের; আর্থ-সামাজিক মুক্তির সংগ্রামটি আবার নতুন করে শুরু করে তারা। বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করেছেন যে, শুধু বিদেশি শাসকদের বিদায়ে স্বাধীনতা আসে না, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের রেখে যাওয়া মূল্যবোধ ও শাসনপ্রণালিকেও পুরোপুরি বর্জন করতে হয়। জাহেদ-সেকান্দর-রাবুর নেতৃত্বে আমরা সূচিত হতে দেখি সেই পূর্ণাঙ্গসম্ভব মুক্তির সংগ্রামের ইশারা।

কাঁদো নদী কাঁদো[১৫]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) অবিরাম চেতনা-প্রবাহরীতির এক অনন্য কথামালা। তবারক ভূঁইয়ার অবিরাম কথা বলা ও তারই পরিপূরক হিসেবে উত্তম পুরুষের চিন্তাস্রোত আমাদের সামনে তুলে ধরে একটি নদী ও তার অববাহিকার করুণ চিত্র। ছোট শহর কুমুরডাঙ্গার ঘাটে আর স্টিমার আসে না; কারণ নদীতে চড়া পড়েছে। সেই থেকে নদীর কান্নার শুরু; প্রথম শুনতে পায় মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে স্কুল-শিক্ষিকা সকিনা খাতুন, তারপর আরো দুয়েকজন, তারও পরে আরো অনেকেই। এরই সমান্তরালে চাঁদবরণঘাট গ্রামের ভালো-মানুষ খেদমতুল্লাহ ধীরে ধীরে হিংস্র প্রকৃতির হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে খুন হয়। তারই ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফা বাড়ি ছেড়ে গিয়ে লেখাপড়া করে এবং হাকিম হয়ে কুমুরডাঙ্গায় আসে। উপযুক্ত পাত্র হয়ে উঠলে তার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় প্রভাবশালী ব্যক্তি আশরাফ হোসেন চৌধুরীর কন্যার সঙ্গে। এভাবে তার সামনে উন্মোচিত হয় বহুল কাঙ্ক্ষিত শ্রেণি-উত্তরণের অপার দিগন্ত। কিন্তু বাধ সাধে তার সঙ্গে সম্পর্কিত বোন খাদিজার বিয়ের পিতৃ-প্রতিশ্রুতি। মুস্তফার অন্যত্র বিয়ের সংবাদ প্রচারের অব্যবহিত পরেই শ্যাওলা-আবৃত পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয় বাগদত্তা খোদেজার। ঘটনা-পরম্পরায় দুর্ঘটনাটিকে মুস্তফার কাছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গজনিত আত্মহত্যা বলে প্রতিভাত হয় এবং অনুশোচনাদগ্ধ মুস্তফা আত্মহননে মুক্তি খোঁজে। দুই সমান্তরাল কাহিনী একই বিন্দুতে মিলিত হয় উপন্যাসের অন্তিম কয়টি বাক্যে: 'স্টীমার ধীরে-ধীরে ঘাটের পাশাপাশি হয়, তার চতুর্পাশে উচ্ছৃঙ্খল পানি শত শত হিংস্র সরীসৃপের মত গর্জন করে। তবে সহসা আমার মনে হয় নদী যেন নিষ্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কণ্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যেই। মনে মনে বলি: কাঁদো নদী কাঁদো।' (পৃ. ৩৫৬)।

কাঁদো নদী কাঁদো-য় অনুপস্থিত জমিদারের জনবিরোধী কর্মকাণ্ড ও দৌরাত্ম্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বস্তুগত ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের সচকিত করে। উপন্যাসে জমিদার সম্পর্কিত বর্ণনার উদ্ধৃত খণ্ডাংশ এরূপ : 'জমিদারবাবুর বাসস্থান ছিল শহর থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ থেকে দূরে। তাছাড়া জমিদার কদাচিৎ তার বাসস্থানে থাকত; শস্যসংগ্রহকাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে দেশের বাড়িতে ডাক না পড়লে অধিকাংশ সময়ে সৌখিন কলকাতার নেশায় মৌজ হয়ে সে-বৃহৎ শহরেই দিন কাটাতো।' (পৃ. ২১৩) জনবিচ্ছিন্ন হলেও সমগ্র অঞ্চলে নিরঙ্কুশ প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার বিষয়ে তার ছিল নিশ্ছিদ্র সতর্কতা। স্টিমার কোম্পানির কর্তৃপক্ষের চা-পানের দাওয়াতে স্থানীয় গণ্যমান্যদের তালিকায় হিন্দু জমিদারবাবু অন্তর্ভুক্ত হননি। ঘটনাটি বঙ্গভঙ্গের উত্তাল রাজনীতির বিক্ষুব্ধ সময়ের, যখন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিনের মিত্র হিন্দু অভিজাতশ্রেণির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কটিকে শিথিল করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ও বিশেষ

সুবিধাদানের নীতি গ্রহণ করে। কুমুরডাঙ্গার সঙ্গে জাহাজ যোগাযোগ গড়ে তোলা ইংরেজদের এই নয়া-নীতিরই অংশ। তাই জমিদারবাবুর কাছে দাওয়াত না-পাওয়া যতটা না অপমানের, তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হারানোজনিত উদ্বেগের। বিক্ষুব্ধ জমিদার প্রতিশোধও নেন তার চিরাচরিত কৌশলে; উদ্বোধনের প্রাক্-মুহূর্তে 'নির্ভেজাল খাঁটি দুধ-ঘি'-এ প্রতিপালিত তাগড়া-তাগড়া চেহারার লাঠিয়াল লেলিয়ে জাহাজ ভাঙচুর করার মাধ্যমে। জমিদারদের এধরনের জনবিমুখ কর্মকাণ্ড ও অত্যাচার-উৎপীড়নে বিক্ষুব্ধ ছিল পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রজা। সাধারণ মুসলমানদের এই জমিদার-বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় ক্রমে হিন্দু-বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়, যা ভারত-বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত আগে বা পরে এই অনুপস্থিত স্থানীয় জমিদার ও প্রভাবশালী হিন্দু ব্যক্তিবর্গ স্থায়ীভাবে কলকাতা বা ভারতে চলে গেলে নেতৃত্ব পর্যায়ে যে শূন্যতা তৈরি হয়, সেটা পূরণ করে উঠতি ধর্মভিত্তিক মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই পালাবদলের চমৎকার দৃষ্টান্ত নবীন উকিল কফিলউদ্দিন কর্তৃক শহরের নামকরা হিন্দু উকিলের বাড়ির মালিকানা অর্জন। প্রাসাদের মতো বাড়িটির প্রতি কফিলউদ্দিনের ছিল গভীর মুগ্ধতা ও তার মালিকানা অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বাড়িটি ক্রয়ের মধ্য দিয়ে কফিলউদ্দিন হয়ে ওঠে খ্যাতনামা হিন্দু উকিলের আভিজাত্য ও ওকালতি বুদ্ধির যথার্থ উত্তরাধিকার। ধর্মভিত্তিক পরিচয় আলাদা হলেও তাদের বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও স্বভাব অভিন্ন ধরনের। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের এক উদীয়মান অভিজাত সে, কুমুরডাঙ্গার স্বকল্পিত নতুন 'বাদশাহ'। এই নব্য অভিজাতশ্রেণি 'বাইরে ধার্মিক; কিন্তু সে-ধার্মিকতা একটি মুখোস মাত্র'। (পৃ. ২১৫)। এই মুখোস আবার সময়ে সময়ে বদলায়, যেমনটি কফিলউদ্দিনের : 'তখন সে নবীন উকিল, মুখে দাড়ি নাই, কিন্তু মস্ত বড় ঝুঁলে-পড়া কাস্তের মতো বাঁকা গোঁফ, পরে কয়েক বছরের জন্য যার বিপরীতটাই ঘটে; তার গোঁফ অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু মস্ত বড় একটি দাড়ি দেখা যায় বুক জুড়ে। বর্তমানে তার মুখ দাড়িগোঁফ শূন্য।' (পৃ. ২২৯)। কফিলউদ্দিন আত্মরূপ অঙ্কন করে এভাবে : 'মানুষের দুই মুখ—একটি বাইরের, অন্যটি ভেতরের। বাইরেরটি সমাজ-ধর্মের নির্দেশ মাফিক সাজানো-গোছানো, ভেতরটি নির্ভেজাল স্বার্থে তৈরি, সর্বমহৎ উদ্দেশ্যবিবর্জিত। প্রথমটি নকল, দ্বিতীয়টি খাঁটি; একটি সুন্দর, অন্যটি কদাকার।' (পৃ. ২৪১)। বলাবাহুল্য, মানুষের খাঁটি, কদাকার ভেতরের দিক নিয়েই কফিলউদ্দিনের কাজ-কারবার। এহেন কফিলউদ্দিন জাহাজ চলাচল বন্ধের খবরে বিচলিত হয়ে ওঠে; কারণ তার প্রভাব-প্রতিপত্তি-সৌভাগ্য পাকিস্তানের সঙ্গে জোড়বাঁধা। দরিদ্র কুমুরডাঙ্গাই তার যাবতীয় সম্পন্নতা-জোগানো আশ্রয়স্থল; কিন্তু শেকড়ের টান সে অনুভব করে মূল-ভূখণ্ডের সঙ্গে। সে তার বাড়ির প্রথম মালিকের অনুকরণে এক বিশ্বাসী আত্মীয়কে পাহারাদার নিয়োগ করে পা বাড়ায় মূল ভূখণ্ডের দিকে। কুমুরডাঙ্গা ত্যাগের বেপরোয়া প্রয়াস ছিল তার জন্য অস্তিত্ব-বিনাশী : 'সংক্ষিপ্তভাবে বিদায় নিয়ে খোদার নাম উচ্চারণ করে উকিল কফিলউদ্দিন বজরায় উঠতে যাবে এমন সময়ে সর্পদষ্ট মানুষের মতো পা তুলে নেয় সে। কিছুক্ষণ সে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-ওদিক তাকায় যেন কোথাও কিছু সন্ধান করে, তারপর কেমন স্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ে। এবার ঘাটের সমবেত লোকের মনে হয়, নদীর দিকে তাকিয়ে সে যেন কি শুনছে। ক্রমশ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, তারপর সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। অদৃশ্য কোনো হিংস্র জন্তুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই যেন আবার ক্ষিপ্রগতিতে বজরায় ওঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু এক পা মাত্র উঠিয়ে সহসা বেসামাল হয়ে ধরাশায়ী হয়—দেহের অর্ধেক পানিতে, অর্ধেক জমিতে। কেউ যখন তাকে তুলবার চেষ্টা করে তখন উকিল কফিলউদ্দিনের ধড়ে আর প্রাণ নাই।' (পৃ. ৩২৯)। নদীর ভেতর থেকে উদ্গত কান্নায় উকিল কফিলউদ্দিন পূর্ববঙ্গের জনতার আসন্ন গণআন্দোলন ও পাকিস্তানের ভাঙনের ধ্বনিই যেন শুনতে পায় এবং এরই সঙ্গে অনুভব করে নিজের অস্তিত্ব-সংকট। কফিলউদ্দিন প্রকৃতপক্ষে সেই বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধি, যাঁরা নিজেদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে ছিলেন বিভ্রান্ত এবং মানসিকভাবে ছিলেন উন্মূলিত; এ মানুষগুলো উদ্বাস্তু, চরমভাবে নিরাশ্রয়। বাড়ির দুই মালিকই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় রাজনীতির বিভ্রান্ত শিকার; দুজনের পরিণতি একই—স্বভূম থেকে নির্বাসন। তবে প্রথমজন থেকে দ্বিতীয়জনের পরিণতি অধিকতর মর্মান্তিক।

কফিলউদ্দিনের বিপরীতে খতিব মিঞা প্রৌঢ় বয়সে নিজেকে আবিষ্কার করে কুমুরডাঙ্গার একজন হিসেবে: 'সে আর কোম্পানির লোক নয়, বিদেশিও নয়। তাদেরই একজন।' (পৃ.৩৪৯)। অবসরজনিত নতুন পরিস্থিতিতে

স্বভূমে প্রত্যাবর্তনের যৌক্তিকতা বা আবেগ কোনোটিই সে অনুভব করে না; কুমুরডাঙ্গাতেই সে প্রোথিত করে তার অস্তিত্বের শেকড়। এ যেন আত্মজিজ্ঞাসাবিদ্ধ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়-আবিষ্কার। তবে এই আত্মপরিচয় নির্মাণ বাঙালি মুসলমানের জন্য খুব সহজ ছিল না। সমাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে অপমান-অবজ্ঞা-লাঞ্ছনায় দিশেহারা দারিদ্র্য-জর্জরিত মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজের আত্মপরিচয় নিয়ে ছিল বরাবরই দ্বিধাগ্রস্ত। এই পরিচয়-সংকট কাটাতে প্রতিষ্ঠাকামী বাঙালি মুসলমানেরা সচেষ্ট হয় পাকিস্তানি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আত্মপরিচয় নির্মাণে, যা পরিলক্ষিত হয় মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে। নতুন রাষ্ট্রের উঠতি মধ্যবিত্ত হওয়ার উচ্চাশাতাড়িত কিশোর নবম শ্রেণিতে উঠেই পিতৃদত্ত নামের সঙ্গে আভিজাত্যগর্বী শব্দবন্ধ জুড়ে দিয়ে নিজের নাম লিখে ফেলে 'চৌধুরী আবু তালেব মুহাম্মদ মুস্তফা'। এই ঝোঁক তার অবচেতনে লুক্কায়িত হীনম্মন্যতা উৎসারিত, বহিরাগত অভিজাতদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মধ্যেই সে সন্ধান করেছে আত্মগরিমা। অজপাড়াগাঁয়ের পিতৃহীন এক প্রান্তিক কিশোর চাঁদবরণঘাট গ্রামের গ্লানিময় গণ্ডি অতিক্রম করে পাকিস্তানি অভিজাতশ্রেণিতে স্থান করে নেয় শেষপর্যন্ত; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ মাড়িয়ে ঢুকে পড়ে পাকিস্তানের ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্রে। তার অদম্য নিষ্ঠার কাছে পরাভূত হয়েছে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুরতা ও সমাজের বিছানো বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা। তার ঝলমলে সাফল্যের পালকে যুক্ত হয় পাকিস্তানের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন চৌধুরীর কন্যার সঙ্গে বিয়ের বন্দোবস্ত। উল্লিখিত আশরাফ হোসেন চৌধুরীর 'প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট, নানা উঁচু দরবারে তাঁর অবারিত দ্বার, যাতায়াতও কম নয়' আর 'শীঘ্র তিনি মন্ত্রীসভার দিকে যাবেন'। আর হবু স্ত্রীটিও আবার রূপে-গুণে অনন্যা : 'এমন মেয়ে সত্যি দুটি হয় না- শিক্ষায় বল, দেখতে-শুনতে বল, লেহাজ-নম্রতায় বল'। (পৃ. ২২৪)। রহস্যময় উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত মুস্তফা দেশের বাড়ির ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে এক অলঙ্ঘনীয় দূরত্বে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে চাচা-চাচী, চাচাত ভাই, ফুফু, বাগদত্তা খোদেজা, এমনকি তার মা আমেনা খাতুনও তার কাছে দূরবর্তী প্রান্তের মানুষ। বাস্তবের উগ্র আলোয় খোদেজাকে বিয়ে করার পিতৃ-প্রতিশ্রুতি তার কাছে সারশূন্য উক্তিতে পর্যবসিত হয়; তবে শেষপর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতিই হয়ে ওঠে মহাসত্য। (পৃ. ২৩৩)। শৈশবের অশুভ জীবনচক্রকে স্থানিক পটভূমিতে আটকে রেখে মুস্তফার আত্মবিকাশের প্রাণান্ত চেষ্টায় দুঃস্বপ্নের মতো হানা দেয় ভয়ংকর অতীত। খোদেজার সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত ছিল অতীতলগ্ন মূল থেকে তার স্থায়ী বিচ্ছেদের প্রয়াস। খোদেজার মৃত্যু তার শানিত বিবেকে জাগ্রত করে এক গভীর অপরাধবোধ; আর এই অপরাধবোধ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুশোচনা থেকে জাত। কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে 'মুহাম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গা থেকে ঢাকা যায়নি, তার সুহৃদ বন্ধু তসলিম বা আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করেনি, সোজা দেশের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল...। বেশভূষায় নতুন হাকিমের কোন চিহ্ন ছিল না...।' (পৃ. ৩৫৩)। এরপর 'যে তে'তুলগাছের তলে বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিল সে-গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে-চোখ শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে কী যেন সন্ধান করছে।' (পৃ. ৩৫৫)। এ যেন অনুশোচনাদগ্ধ মুস্তফার মূলের দিকে চিরকালীন প্রত্যাবর্তন; তার আত্মহনন শেষপর্যন্ত আত্মবিসর্জন নয়, আত্মমুক্তি। কুমুরডাঙ্গার সঙ্গে দূরপনেয় বিচ্ছিন্নতা ও নিরবলম্ব পরিবেশ মুস্তফাকে ঠেলে দিয়েছে আত্মধ্বংসের দিকে; সেখানে তার কোনো উদ্ধারকর্তা ছিল না।

উল্লেখ্য, উনিশ শতকের গোড়ায় যে বাঙালি মুসলমান সমাজ ছিল কৃষিসর্বস্ব ও মধ্যবিত্তহীন, পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোয় সেই গ্রামীণ কৃষিসমাজ থেকেই বিকশিত হয় একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। *লালসালু*-র আক্কাসে সেই মধ্যবিত্তশ্রেণির অঙ্কুরোদ্‌গম; অশিক্ষিত, ব্যক্তিচেতনাহীন, অসংবদ্ধ মানুষের ভিড়ে সে এক নিঃসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় সত্তা। *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলী দারিদ্র্যের বৃত্ত ভেঙে কিছুদূর এগিয়েছে, তবে সে পরাশ্রিত; পাকিস্তানি অভিজাতদের অনুগ্রহপুষ্ট ও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপন্যাসের পরিণতিতে তার মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তসুলভ ব্যক্তিচেতনার বিকাশ পরিলক্ষিত হলেও কঠিন দুঃশাসনের কারণেই তার চারপাশের 'জনসাধারণ' চরিত্রটি তখনো দানা বেঁধে ওঠেনি। *কাঁদো নদী কাঁদো*-র মুহাম্মদ মুস্তফা অনেকদূর অগ্রসর-চেতন; সে কেবল শিক্ষিত নয়, উচ্চশিক্ষিতও; তার প্রশ্নশীল ব্যক্তিচেতনা অর্থবোধক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উত্তীর্ণ; আর চারপাশের

'জনগণ' চরিত্র দানা বেঁধে উঠলেও সুসংগঠিত নয়। সংকটাপন্ন নদীর অন্তরোত্থিত কান্নার ধ্বনি কুমুরডাঙ্গার পুরো জনগোষ্ঠীকেই সচকিত করে তোলে এবং নদীর সংকটে তারা নিজের অস্তিত্বসংকটকেই অনুভব করে। মূল-ভূখণ্ড থেকে সংযোগ-হারানো মফস্বল শহর কুমুরডাঙ্গা আসলে পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচারকবলিত পূর্ববঙ্গ, যেখানকার দমবন্ধ পরিবেশে এক উদ্ধারহীন মানবমণ্ডলী বিকাশ-সম্ভাবনার সমস্ত সূত্র হারিয়ে মুস্তফার মতই গভীর বিপর্যয়ে নিপতিত। সমালোচক সনৎকুমার সাহা যথার্থই বলেন : 'বইটির প্রকাশকাল ... ১৯৬৮। তখন চলছে দোর্দণ্ড প্রতাপ সেনানায়ক আইয়ুব খানের শাসন। উন্নয়ন-দশকের ঢাক বাজিয়ে বাজারে নেমেছে ভাড়াটে স্তাবকের দল। বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নামে চালিয়াতি আর চালাকিতে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা স্বৈরশাসকের অবৈধ রাজ-কাজ। নদীর বুকে চড়া- এ যেন এ সুরেরই প্রতীক। নদীর কান্না—কান্না এ ভূখণ্ডেরই। প্রতিশ্রুতির আশা স্বপ্নে মেলায়। মানুষ তার কথা রাখে না। স্বার্থপর-হিংস্র জন্তুজানোয়ারের মতো হয়ে ওঠে সব। মুক্তি বুঝি মেলে আত্মবিনাশেই। নদীর অববাহিকার চিত্র এই-রকমই। অন্তত ওই সময়ে। রূপকের আড়ালে ও চেতনাপ্রবাহে অবিরাম চিত্রমালায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেন, তারই স্বপ্নভঙ্গ ও বিষাদের কথা শোনাতে চেয়েছেন।' (নান্দীপাঠ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪: ২৩)।

কান্না শুধু অশুভ-পরাজয়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে নতি-স্বীকারের শরীরী মুদ্রা নয়, অবস্থাবিশেষে তা প্রতিবাদেরও আহ্বান। বাঙালি কেবল বিষাদ-কান্নায় মূহ্যমান থাকে না; উনসত্তরে ঘটে গণআন্দোলনের বিস্ফোরণ; একাত্তরে উচ্চারিত হয় অমোঘ বাণী : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের; আসে রূপকথার মতো সব-পাওয়ার স্বাধীনতা। কিন্তু দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে অচিরেই, সংঘটিত হয় পঁচাত্তরের নারকীয় হত্যাকাণ্ড; ফিরে আসে ঔপনিবেশিক-কাঠামোর সামরিকশাসন। নদীর কান্নার মতোই বাঙালির কান্নারও শেষ নেই। ঔপনিবেশিক মতাদর্শপুষ্ট শাসনে স্পৃষ্ট বাঙালি জনগোষ্ঠীর চিরকালীন কান্না সমীকৃত হয়ে গেছে নদীর কান্নায়, উপন্যাসের সমাপ্তিতে তারই সম্ভাব্য অনুরণন : 'স্টীমার ধীরে ধীরে ঘাটের পাশাপাশি হয়, তার চতুর্পাশে উচ্ছৃঙ্খল পানি শত শত হিংস্র সরীসৃপের মত গর্জন করে। তবে সহসা আমার মনে হয় নদী যেন নিষ্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কণ্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যেই। মনে মনে বলি : কাঁদো নদী কাঁদো।' (পৃ. ৩৫৬)।

লক্ষণীয় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র তিনটি উপন্যাসের পরিণতি নির্ধারিত হয়েছে অপঘাতের মৃত্যুতে; তিনটি মৃত্যুই প্রান্তিক নারীর; প্রবল পুরুষ-কর্তৃত্বে নারী বরাবরই প্রান্তজন। চরম জুলুম-নির্যাতনে জেরবার দুর্বল প্রান্তবর্তী নারীরাই হলো শতাব্দী-পরম্পরার উপনিবেশিত বাংলাদেশ (*লালসালু*-র রহীমা, আমেনা; *চাঁদের অমাবস্যা*-র করিম মাঝির অনামা স্ত্রী); কখনো সে মুক্তির অন্বেষায় আত্মবিনাশী সংগ্রামে লিপ্ত (*লালসালু*-র জমিলা), আবার কখনো সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্নে বিভোর নারী প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দংশনে নীল (*কাঁদো নদী কাঁদো*-র খোদেজা)। পুরুষের দৌরাত্ম্যে নারীর হতাশা, দুর্ভোগ, কান্নার শেষ নেই; স্বার্থান্ধ ক্ষমতাধর অভিজাতদের পদতলে দলিতমথিত হয়েছে সাধারণ মানুষের সুখসমৃদ্ধির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা; তদ্রূপ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বা ঔপনিবেশিক মতাদর্শের পাকিস্তানি ও পরবর্তীতে বাংলাদেশি উর্দি বা উর্দি-আশ্রয়ী শাসনে অর্থাৎ পরাধীন বা স্বাধীন যে কোনো কাঠামোতেই সাধারণ বাঙালির জীবনে হতাশা-দুর্ভোগ-কান্না নিত্য ঘটনা; তার রূপ অভিন্ন, রূপান্তর নেই। সবকালের সকল শাসনের অভিন্ন ও একমাত্র সুফলভোগী ঔপনিবেশিক মতাদর্শপুষ্ট অভিজাত শাসকশ্রেণি এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহচর আমলা, ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিশ্রেণি।

সর্বতোমুখী শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণির সংগ্রামটাও চলমান; কিন্তু বাস্তবতা হলো সেই সংগ্রাম চূড়ান্ত সাফল্য পায় না; গণআন্দোলনের মুখে শাসকগোষ্ঠী সাময়িক পিছু হটে, উত্তেজনা কমে এলেই তারা স্বরূপে আবির্ভূত হয়। শোষণের শাসনের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যর্থতা নিহিত সাধারণ জনগণের অশিক্ষা-অসচেতনতা এবং শাসকশ্রেণির ধূর্তকৌশলগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবিলার অক্ষমতায়। অধিকারচেতনা ও রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতাই গণমানুষের সংগ্রামকে সাফল্যের তীর্থে পৌঁছে দিতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষাই হলো মানুষের চেতনার উদ্বোধন ও আত্মজাগরণের মূল

অনুঘটক এবং শিক্ষক হলেন হতভাগ্য জনগোষ্ঠীর পথদ্রষ্টা। *লালসালু*-তে মজিদের দুর্বৃত্তায়নের অবসানে আক্কাস শিক্ষাকে অপরিহার্য বিবেচনা করেছে; *চাঁদের অমাবস্যা*-র দরিদ্র শিক্ষক আরেফ আলী প্রবলের অন্যায় ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে এক বিবেকী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে; আর *কাঁদো নদী কাঁদো*-র স্কুল-শিক্ষিকা সকিনা বেগম একটি জনপদের আসন্ন গভীর সংকটকে প্রথম অনুধাবন করে এবং সাধারণ মানুষকে সেই সংকট সম্পর্কে সচেতন ও সংকট-উত্তরণের লক্ষ্যে গণজাগরণ ও গণআন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা করে। উত্তর-উপনিবেশবাদ জ্ঞানকে হাতিয়ার করে সৎ বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণমানুষের সচেতন সংগ্রামকেই উপনিবেশবাদী শাসনব্যবস্থা বিলুপ্তির উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। এ নিরিখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ র উপন্যাসসমূহ হয়ে উঠেছে উপনিবেশবাদের সঙ্গে উত্তর-উপনিবেশবাদের ঐতিহাসিক দ্বৈরথের সাহিত্যিক অভিসন্দর্ভ।

বিদ্রোহী কৈবর্ত[২৬]

সত্যেন সেনের *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৯৬৯) উপন্যাসের আখ্যানটি একাদশ শতকের ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে রচিত। রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর রাজক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তীব্র গৃহবিবাদ শুরু হয়। এই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ও বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রে পুরো ক্ষমতাকাঠামো নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খল প্রেক্ষাপটে কৈবর্ত জনগোষ্ঠী দিব্বোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পালরাজত্বের অবসান ঘটিয়ে গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করে। ইতিহাসের এই সূত্রটুকু বিশ্বাসযোগ্যভাবে অন্বিত করে উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মিত হয়েছে। এই আখ্যানে সুদূরকালের রাজ-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার প্রশ্নে হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাত, উচ্চবর্গের ভেতরকার ষড়যন্ত্র প্রভৃতিকে ছাপিয়ে উপন্যাসের নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের জীবন সংগ্রাম এবং দিব্বোকের তীক্ষ্ম রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ও সুশাসনের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসের এই কাঠামোর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে আধুনিককালে ঔপনিবেশিক শাসনবিস্তারের কলাকৌশল, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রত্যয়দীপ্ত সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি; সর্বোপরি উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর স্বাধীন আত্মবিকাশের পথনির্দেশিকা।

রাজা শশাঙ্কের রাজত্বের পতনের পর বাংলা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটে। স্থানে স্থানে গোষ্ঠীপতি নেতৃত্বের উত্থান ঘটে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে পুরো সমাজে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতি ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়ের শাসন' হিসেবে অভিহিত। কয়েক দশকের এই নৈরাজ্যের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রত্যয় থেকেই পালরাজত্বের পত্তন ঘটে। প্রথম পালরাজ গোপালের রাজ্যাভিষেক ঘটেছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়; 'প্রকৃতি' (জনসাধারণ), মতান্তরে সামন্ত গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে। রাজা গোপালের দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে (রাজত্বকাল ৭৫০-৭৭৭) গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বাংলায় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তী চারশ বছরের শাসনকালে উৎসস্থল বাংলা ভূখণ্ড থেকে বৃহত্তর পূর্ব-ভারতবর্ষ, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল পর্যন্ত পালরাজত্বের প্রসার ঘটে। শুধু রাজ্যবিস্তার নয়, পালরাজত্বের গৌরবময় দিক হলো দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ। পালশাসকদের অবারিত পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে সোমপুর, নালন্দা, বিক্রমশিলার মতো বহু বৃহদায়তন মন্দির ও মঠ এবং এগুলো প্রাচীন ভারতের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পালসাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও; তিব্বতি বৌদ্ধধর্মে পাল উত্তরাধিকার আজও বহমান। পাল সম্রাটেরা বৌদ্ধধর্মের মহাযান ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিলেন; কিন্তু তাঁদের শাসনব্যবস্থা ছিলো অসাম্প্রদায়িকচেতনার। পাল প্রশাসন ছিল রাজতান্ত্রিক এবং রাজা ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু; কিন্তু প্রধান অমাত্য হিসেবে নিয়োগ পেতেন ব্রাহ্মণেরা। চেদী বা রাষ্ট্রকূটের মতো হিন্দু রাজ্য থেকে আগত কূটনীতিকরা অনায়াসেই রাজসভায় প্রধান অমাত্যসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পালরাজেরা অসংকোচে হিন্দুরাজ্যের রাজকন্যাদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেন। পাল আমলের মহাবিহারগুলি হিন্দু রামায়ণ ও মহাভারত

মহাকাব্যের দৃশ্যাবলি দ্বারা সজ্জিত ছিল। এভাবে পালশাসনের অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে গোটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এই ঐক্যে ভর করেই গৌড় জনপদ একটি সুসংহত রাষ্ট্রশক্তি হয়ে ওঠে। জনকল্যাণ ও শান্তিরক্ষার প্রত্যয়ই ছিল পালশাসনের ভিত এবং এই প্রত্যয়ই পালশাসনের স্বর্ণযুগ রচনা করেছিল। কিন্তু দুই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্যেই পারস্পরিক আধিপত্য বিস্তারের লড়াইটাও সক্রিয় ছিল। বৈবাহিক আত্মীয়তা ও শাসনকার্যে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে পালরাজারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। স্থানীয় কৌম জনগোষ্ঠী হতে জাত ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে বাঙালি এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হলেও ক্রিয়াকর্ম ও ধ্যানধারণায় পালরাজারা আর্যশ্রেষ্ঠত্বে বশীভূত এবং নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ অমাত্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। রাজার আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠে একটি সামন্তসমাজ এবং এই সামন্তরাই হয়ে ওঠে পালশাসনের মূল ভিত্তি। বর্ণবাদী আর্যশ্রেষ্ঠত্বে বৌদ্ধধর্মীয় সামাজিক সাম্যের ধারণাটি প্রহত হয়। ব্রাহ্মণ অমাত্য ও সামন্তদের নিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ড ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পালশাসন পূর্ববর্তী নৈরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সূচিত হয় পালরাজত্বের অবক্ষয় ও পতনের যুগ। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পালরাজত্ব ক্ষমতাকেন্দ্রিক গৃহবিবাদে জর্জরিত; সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতকেন্দ্রিক বিভাজন ও বিভেদে ভঙ্গুর; এর শাসনকাঠামো জনকল্যাণের পরিবর্তে জনশোষণমুখী। এই পরিস্থিতিতে শাসকের নিশ্ছিদ্র পাহারা এড়িয়ে দানা বেঁধে ওঠে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ এবং বহির্দেশীয় ষড়যন্ত্র এই পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলে। ভিতর ও বাইরের চাপে নড়বড়ে হয়ে পড়ে পালশাসকদের ক্ষমতার ভিত এবং কৈবর্তদের হাতে পতন ঘটে পালসাম্রাজ্যের। পালসাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পটভূমিই *বিদ্রোহী কৈবর্ত* উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসে পালশাসনের উত্থান ও সমৃদ্ধিপর্বের উল্লেখ না থাকলেও পতনের কার্যকারণ হিসেবে উত্থানপর্বের জনকল্যাণকামী প্রত্যয়ের ব্যত্যয়কেই দূরাভাষে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যু-উত্তর ঘটনাপ্রবাহ উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কিন্তু প্রতিটি ঘটনার বিষবীজ রোপিত হয়েছিল অদুরদর্শী ও ভোগলিপ্সু রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের হাতে। তাঁর রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদ পরিণত হয়েছিল 'কদর্য কামনার অন্ধকূপে'। রাজরানি শঙ্খদেবীর ভাষ্যে বিম্বিত হয়েছে ভোগতপ্ত রাজপ্রাসাদের ভেতরের পরিচয় : 'তার কানায় কানায় বিলাস, ব্যভিচার আর বিকৃত কামনার দুর্গন্ধ পংক। ... দেখতাম, ভোগের বলি হিসেবে নিত্য নতুন মেয়ে আসে, কিছুদিন বাদেই রাজ-উচ্ছিষ্ট হয়ে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।' (পৃ. ১৫৬)। বৃদ্ধ বিগ্রহপালের কামনার শিকার হয়েই শঙ্খদেবীর রাজরানি হয়ে রাজপ্রাসাদে অনুপ্রবেশ। তার আত্মরক্ষার সমগ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতো রাজার উদগ্র কামনার কাছে। এমনকি রাজা শঙ্খদেবীর শরীর ভোগের জন্য মদ খাইয়ে মাতাল করার মতো নিকৃষ্ট পন্থাও অবলম্বন করতেন। অনন্যোপায় রানি শেষপর্যন্ত রাজার কদর্য ভোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং রাজাকে শরীরী কামনায় আচ্ছন্ন করে রাজকর্তৃত্ব নিজের হস্তগত করে নেয়। প্রজাকল্যাণ নয়, ভোগাসক্তিতেই রাজা আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন। ফলত দেশে এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ ক্ষমতাকাঠামোর দূরবর্তী অংশ; ক্ষমতা বিষয়ে তাদের ন্যূনতম মাথাব্যথাও নেই। নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রত্যাশা থেকে তারা রাজার কর্তৃত্বকে মেনে নেয় এবং এই ক্ষমতাকাঠামোকে পরিপুষ্ট করতে করের নামে পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের একাংশ অকপটে তুলে দেয় রাজকোষাগারে। কিন্তু রাজা যখন প্রজার প্রতি দায়িত্বপালনে উদাসীন হয়, তখন সংক্ষুব্ধ প্রজার কাছে রাজার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়, রাজকর্তৃত্বের প্রতি প্রকাশ করে তীব্র অনাস্থা। পালরাজ বিগ্রহপালের প্রতি সক্ষোভ অনাস্থা কার্যকারণসমেত ধ্বনিত হতে শুনি এক প্রান্তিক নারীর কণ্ঠে : 'রাজা আমাদের কোন কাজে লাগে শুনি? দেশে অনাবৃষ্টি-অজন্মা লেগেই আছে, চোর ডাকাতের উপদ্রবে মানুষ অস্থির, অসুখ-বিসুখ ঘর থেকে নামতে চায় না, অভাবে-অনটনে মরে গেল মানুষ, কিন্তু রাজা কোনদিন দেখতে এসেছে? ... রাজা জানে শুধু তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিতে। জমির কর দাও, হাটের কর দাও, ব্যবসা বাণিজ্যের কর দাও—শুধু দাও, দাও শব্দ। এমন রাজা থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।' (পৃ. ১৫৯)। প্রজার কাছে ভোগাসক্ত রাজার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু ভোগের সরবরাহ অবারিত রাখার জন্য রাজার প্রজাকে প্রয়োজন। প্রজার সম্মতি ও আনুগত্যের ওপর নির্ভর করে রাজার রাজত্বের স্থিতি এবং সংক্ষুব্ধ প্রজার

আনুগত্য নিশ্চিত করতে ক্ষমতামত্ত রাজার সামনে দমনপীড়নই হয় অবিকল্প পন্থা। রাজা যখন শক্তির ভাষায় কথা বলে, তখন নিষ্ঠুরতা ও নিষ্পেষণই হয়ে ওঠে রাজকর্মকাণ্ডের সারকথা। দমনপীড়নের তাণ্ডবে প্রজাসাধারণের মধ্যে নেমে আসে এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, আর এই স্তব্ধতার অন্তরালে পুঞ্জীভূত হতে থাকে বিদ্রোহের দাবানল। জনবিচ্ছিন্ন রাজা বিগ্রহপালের ক্ষমতামত্ততা ও ভোগতপ্ততাকে ঘিরে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বহুপাক্ষিক স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে এবং তাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় রাজপ্রাসাদ পরিণত হয় ষড়যন্ত্রের অন্ধকূপে। রাজার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার বিষয়ে রাজার তিন পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব চরম রূপ নেয়। এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃত্রয় হলেও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন–– প্রধান অমাত্য বরাহস্বামী ও রাজরানি শঙ্খদেবী। বেনামে ক্ষমতাকেন্দ্র দখল করাই ছিল অন্তরালের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিপ্রায়। দুজনের ক্ষমতাদ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছিল বিগ্রহপালের রাজত্বকালে। রাজা তৃতীয় বিগ্রহপাল প্রথমে চেদী রাজ্যের যৌবনশ্রীদেবীকে বিয়ে করেন এবং তার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে আগমন ঘটে সেখানকার অমাত্য বরাহস্বামীর। পরবর্তীতে তিনি গৌড় রাজ্যের প্রধান আমাত্যতে পরিণত হন। তৃতীয় বিগ্রহপাল রাষ্ট্রকূট বংশের কন্যা শঙ্খদেবীকে বিবাহ করলে নতুন রাজরানি দুর্বলচিত্ত অযোগ্য রাজাকে বশীভূত করে শাসনক্ষমতায় নিজের এককাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। বরাহস্বামী প্রধান অমাত্য হলেও রানি শঙ্খদেবীর কাছে প্রভাব হারিয়ে ক্ষমতাকাঠামোতে একান্ত প্রান্তিক হয়ে পড়েন। রানির ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে তাঁকে বহুবার নাজেহাল হতে হয়েছে। তবে রাজার ওপর শঙ্খদেবীর অপরিসীম প্রভাব সত্ত্বেও উত্তরাধিকার নির্বাচনে রাজা প্রথাকেই অনুসরণ করেছেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপালের রাজ্যাভিষেক ছিল শঙ্খদেবীর বিরুদ্ধে বরাহস্বামীর এক ঐতিহাসিক বিজয়। এই নতুন রাজ্যপটে রাজাকে ক্রীড়নকে পরিণত করে বরাহস্বামীই হয়ে ওঠেন ক্ষমতার ভরকেন্দ্র, শাসনক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই হয়ে ওঠে নির্ধারক। রাজা হয়েও শাসনব্যবস্থায় বরাহস্বামীর এই আধিপত্যকে মহীপাল মেনে নিয়েছেন অথবা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যত দুই কারণে–– এক, রাজত্বপ্রাপ্তিতে বরাহস্বামীর ভূমিকার প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা; এবং দুই, নড়বড়ে সিংহাসন টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পরীক্ষিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাঁর ওপর অপরিসীম নির্ভরতা। রাজা হিসেবে অভিষেকের পর মহীপালকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে রাজত্বরক্ষার কঠিন লড়াইয়ে। এই লড়াইয়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্র রামপাল রাজা মহীপালের চেয়ে বেশি জনপ্রিয়; সামন্তদের বেশিরভাগের সমর্থনও রামপালের পক্ষে। সহোদর শূরপালও রামপালের সহযোগী। রামপালের সবচেয়ে বড় শক্তি তাঁর মাতা শঙ্খদেবী, যার রয়েছে অপরাজেয় মানসিকতা, ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা এবং বিরূপ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সুনিপুণ দক্ষতা। বরাহস্বামীর কাছে সাময়িক পরাজয়ে তিনি হাল ছাড়ার পাত্রী নন। তাঁর প্রধান সহায় নিকটাত্মীয় মথনদেব, যিনি হিন্দু জনগণের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়। মথনদেবের নেতৃত্বেই বরাহস্বামী ও দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধশক্তি ক্রমে দানা বাঁধছিল। রাজা যখন নিজেকে অজনপ্রিয় ও জনবিচ্ছিন্ন অনুভব করেন, তখন ক্ষমতার শেকড় হিসেবে আমলাতন্ত্রকেই বেছে নেন। আর আমলাতন্ত্রে রাজার চেয়ে প্রধান অমাত্যের প্রভাব বেশি থাকলে রাজার অসহায়ত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। এই কারণেই রাজা হয়েও প্রধান অমাত্য বরাহস্বামীর বিরোধিতা করার সাহস ও ক্ষমতা মহীপালের নেই : 'বরাহস্বামীর মুখের উপর কোন কঠিন কথা বলবার মতো সাহস তাঁর নাই। এটা তিনি ভালো করেই বোঝেন যে তিনি তাঁর প্রথম অমাত্যের কাছে নানা দিক দিয়েই বাঁধা। আর এ বাঁধন দিনের পর দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। রাজকর্মচারীরা এবং সৈন্য বিভাগ তাঁর প্রতি অনুগত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাদের মূল আনুগত্য প্রথম অমাত্যের সঙ্গে। প্রথম অমাত্য রাজার পক্ষ থেকে ভুক্তির শাসনকর্তা, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি ও বীথিপতিদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেন। তাছাড়া মহাসান্ধিবিগ্রহিকের মাধ্যমে তিনি সামন্তরাজদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ফলে বলতে গেলে সমস্ত শক্তি একটি লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। কোন কারণে প্রথম অমাত্যের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে রাজার পায়ের তলায় দাঁড়াবার মত মাটি থাকবে না।' (পৃ. ১৫)। রাজাকে অসহায়ত্বের ফাঁদে ফেলে বরাহস্বামী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন জারি করেন। নিজস্ব ক্ষমতা সুসংহত করা এবং প্রতিপক্ষদমনই ছিল তাঁর শাসনকাজের মূলনীতি। তাঁর দমননীতির অংশ হিসেবেই রামপাল ও শূরপালকে কারাবন্দি করা হয় এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শঙ্খদেবীকে করা হয় নজরবন্দি। তাঁর হিংস্রতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে রামপাল ও শূরপালকে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে রাজাকে প্ররোচিত করার প্রস্তাবে। অর্থাৎ ক্ষমতার পথে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচিয়ে রাখা, নিদেনপক্ষে মুক্ত বাতাসে বিচরণ করতে দেওয়ায় তিনি নারাজ ছিলেন। শনাক্ত ও অশনাক্ত সকল শত্রুর ওপর নজরদারির জন্য দেশজুড়ে জারি করা হয় সতর্ক প্রহরা। পালরাজারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও শাসনক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতিকে অনুসরণ করতেন। ফলত, পালরাজত্বে অসাম্প্রদায়িকচেতনার এক অনন্য ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। বরাহস্বামীর প্ররোচনা ও কর্মকাণ্ডে সেই ঐতিহ্য ভেঙে পড়ে। নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে তিনি গোষ্ঠীতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রণোদনা দেন। বরাহস্বামীর প্রভাবে হিন্দু উৎসব- অনুষ্ঠানাদি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়। রাজা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ বিহারগুলোর বরাদ্দ ক্রমশ হ্রাস পায়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ বৌদ্ধ রাজ-কর্মচারীদের ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকে। হিন্দুদের ক্ষমতাবৃদ্ধি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করে। তাই নিশ্ছিদ্র সতর্কতা সত্ত্বেও একদল হিন্দু ও বিক্ষুব্ধ বৌদ্ধ শ্রেণির মধ্যে একটি জোট গড়ে ওঠে এবং রাজা এবং বরাহস্বামীর প্রতিপক্ষ হিসেবে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে। ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের এই লড়াই কেন্দ্রীভূত ছিল উচ্চবর্গের মধ্যে এবং শাসকগোষ্ঠীর সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল এই বিদ্রোহ দমনে। গৌড়ীয় রাজনীতির এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই রাজধানী থেকে বহুদূরবর্তী এক প্রান্তিক জনপদ বরেন্দ্রভূমিতে বেড়ে ওঠে আরেক শক্তি। কেন্দ্রের শাসকেরা, এমনকি ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহীরাও, কৈবর্তদেরকে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেনি; বরং তাদেরকে 'মূর্খ' 'বর্বর' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। শাসকদের দৃষ্টিতে কৈবর্তদের বিদ্রোহ ছিল বর্বদের সৃষ্ট এক সাময়িক 'গোলমাল', যা শক্তিপ্রয়োগে সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তাই প্রধান অমাত্য বরাহস্বামী নিঃশঙ্কচিত্তে রাজাকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে, 'না না, সে ভয় করবেন না, ... সে শক্তি ওদের নাই। ওখানকার অবস্থা আমাদের আয়ত্তেই আছে। ওদের অনেক লোক প্রকাশ্যে ও গোপনে আমাদের পক্ষ হয়ে কাজ করে চলেছে। সেইখানেই ওদের দুর্বলতা। ... সামন্ত দিব্বোকের প্রভাব সমস্ত কৈবর্তদের উপর পরিব্যাপ্ত। ... যতক্ষণ তিনি আমাদের পক্ষে আছেন, ততক্ষণ কৈবর্তদের বিদ্রোহ অসম্ভব।' (পৃ. ৩৪)। কৈবর্ত বিদ্রোহকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন অভ্যন্তরীণ শত্রুদমনে। আর গৃহবিবাদের ঘোরালো পরিবেশে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কৈবর্তদের উচ্ছৃংখলতাকে নিজেদের জন্য একটি বাড়তি সুবিধা ভেবে খুশি হয়েছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর আর্যগরিমাপুষ্ট আত্মবিশ্বাসের অন্তরালে রাজক্ষমতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয় কৈবর্তরা এবং পালরাজকে পরাস্ত করে দখল করে নেয় গৌড়ের শাসনক্ষমতা। শাসনক্ষমতায় কৈবর্তদের উত্থান শুধু যুদ্ধের নিয়মে বিজয়ীর ক্ষমতাদখল নয়, এটি একটি বিপ্লব––উচ্চবর্গের চাপিয়ে দেওয়া অপমান আর স্বৈরাচারী শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মহিমান্বিত ক্ষমতায়ন। উত্তর-উপনিবেশবাদী বীক্ষণে প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন অতীব সাধারণ ঘটনা, কিন্তু কৈবর্তদের ক্ষমতারোহণ অসংখ্য স্বাভাবিকের ভিড়ে বিশেষ তাৎপর্যে বিভূষিত।

কৌম জনগোষ্ঠী হিসেবে কৈবর্তরা স্বাধীনতাপ্রিয় এবং নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে সচেতন। জীবনযাপনে তারা অত্যন্ত সহজসরল ও নিরীহপ্রকৃতির এবং জীবনবোধে সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও সমতাবাদী। তাদের সরলতা ও বিশ্বস্ততা এতই সুগভীর যে, কোনো বিষয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতিই তাদের কাছে চূড়ান্ত মান্য, লিখিত চুক্তিকে তারা প্রয়োজনীয় মনে করে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তারা যেমন একনিষ্ঠ, প্রতারণার বিরুদ্ধেও তারা প্রবলভাবে সোচ্চার। সর্বোপরি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে তারা মরণপণ যোদ্ধা। কৈবর্তরা নিজেদের বরেন্দ্রীর ভূমিপুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে; 'সূর্য ও কট্টলির সন্তান' হিসেবে কৈবর্তরা মানবসমাজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। (উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত ভলকু বুড়োর গল্পে তাদের এই বিশ্বাস প্রতিফলিত।) তাদের চৈতন্যে বরেন্দ্রের লাল 'মাটি আর মেয়ে এই দুইয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এই দুয়ে মিলে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।' (পৃ. ৪১)। তাই বহিঃশত্রুর হাত থেকে মা-মাটির স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যেতে তারা কখনো পিছপা হয় না। বরেন্দ্রীর স্বাধীনতার জন্য পালরাজাদের সঙ্গে তারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়েছে। অস্ত্রের দিক থেকে কিছুটা দুর্বল হলেও তাদের সঙ্ঘশক্তি মারাত্মক। গহন অরণ্য তাদেরকে দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে সুরক্ষা দিয়েছে। গৌড়ের হস্তিবাহিনীর কাছে বারবার পরাজিত হয়েও কৈবতরা

কখনও ভেঙে পড়েনি, 'কোন পরাজয়কেই ওরা চূড়ান্ত পরাজয় বলে মেনে নেয়নি।' (পৃ. ২৯)। সামরিকশক্তিতে পরাস্ত করতে না পেরে শেষপর্যন্ত রাজা প্রথম বিগ্রহপাল কৈবর্তদের পালরাজত্বে অন্তর্ভুক্ত করতে এক কৌশলী সন্ধির আশ্রয় নেয়, 'সেই সন্ধিতে এই শর্ত ছিল, ওদের ভূমির উপর রাজা হাত দেবে না। তবে বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটলে ওরা সৈন্য যোগাতে বাধ্য থাকবে। এ ছাড়া লেন-দেন এর ব্যাপারে রাজার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না ওদের।' (পৃ. ২২)। কিন্তু পালরাজত্বের অধীনে আপাত এই স্বাধীনতার অন্তরালে সক্রিয় ছিল ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার জালে 'ভীষণ দুর্ধর্ষ জাতি' কৈবর্তদের বন্দি করার দুরভিসন্ধি। করপ্রদান থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তিকেই অশিক্ষিত, সরলমতি কৈবর্তরা 'স্বাধীনতা' ভেবেছে এবং এর বিনিময়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে পালরাজত্বের অদৃশ্য আনুগত্যে জড়িয়ে পড়েছে। শান্তির এই পর্বে পালরাজারা অশিক্ষিত, ধর্মাধর্মজ্ঞানবর্জিত কৈবর্তদের সভ্যকরণের নামে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রভৃতি জাতির লোকদেরকে বরেন্দ্রীতে সংস্থাপন করতে থাকে। তারা কৈবর্ত সামন্তপ্রভুদের সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা প্রদানের বিনিময়ে আনুগত্যের শেকলে বন্দি করেছে। এই সামন্তদের অনেকেই গৌড়ের সভ্যতার সংস্পর্শে গর্বিত এবং গৌড়ের রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নিজ জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহদমনের দায়িত্বে নিয়োজিত। কৈবর্তদের যুদ্ধকৌশলের সুরক্ষিত দুর্গ 'অরণ্য' ধ্বংসের লক্ষ্যে শাসকেরা পরিকল্পিতভাবে দলে দলে কোচদের নিয়োগ করে এবং তাদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে। পালরাজারা সুকৌশলে এই দুই কৌম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং শত্রুতার সম্পর্কটি স্থায়ীকরণে বিশেষ যত্নবান হয়। এক্ষেত্রে আর্যেতর জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের কৌটিল্যীয় নীতিকে তারা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করে। অন্তঃ ও আন্তঃ গোষ্ঠী বিবাদে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে সৈন্যসমেত হাজির হয় রাজপুরুষেরা এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে তারা কৈবর্তদের ওপর পরিচালনা করে বেপরোয়া দমনপীড়ন এবং এই দমনপীড়নকে বৈধতা জোগায় অসভ্য বর্বরকে শান্তিপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ করার যুক্তি। রাজা গৃহবিবাদে ক্ষয়িষ্ণুশক্তির কৈবর্তদের ওপর উৎপাদিত শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ ভূমিকর চাপিয়ে দেয়। কৈবর্তরা এই অন্যায় দাবিপূরণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের ওপর নেমে আসে কঠিন শারীরিক নির্যাতন। তার ওপরে যুক্ত হয় বণিকদের দৌরাত্ম্য। বণিকরা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে নিষ্ঠুর শোষণে ভেঙে দেয় কৈবর্তদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। বানোয়াট চুক্তির শর্তানুসারে কৈবর্ত কৃষকেরা বহিরাগত ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হয়ে যায়, বাধ্য হয় নিজের সমুদয় ফসল স্বল্পমূল্যে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে। কৈবর্তদের নিঃস্বকরণের চিত্রটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে মহাসান্ধিগ্রহিক পদ্মনাভের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনায় : 'বছর তিনেক আগে ... একবার একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পাঁচ বছর আগেও যার দশ কুল্যবাপ পরিমাণ জমি ছিল। কিন্তু তখন তার এক কনাও বাকী নাই। বহিরাগত এক বৈশ্য পরিবার কলে-কৌশলে তার সমস্ত জমি গ্রাস করে নিয়েছে। আর সেই অভাগা এখন সেই বৈশ্যের কাছেই দাস্যবৃত্তি করছে। সে, তার বৌ, আর তার ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের ক্ষেতেই কাজ করছে, আর ফসল উঠছে সেই বৈশ্যের ঘরে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, শুধু সে-ই নয়, তার মত আরও অনেকে এইভাবে জমি হারিয়ে নিঃস্ব হতে চলেছে।' (পৃ. ২৪)। এক্ষেত্রে অভিযোগ করে কৈবর্তরা রাজপুরুষদের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার পায়নি; বরং তারা ছলেবলে বণিকদের স্বার্থের সুরক্ষা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন মানেই শোষণের জন্য শাসন; অনিবার্যত শোষণ-দমনই তাদের শাসননীতি। প্রতিকার না পেয়ে প্রতিরোধের পথে এগোলে রাজপুরুষেরা তাদের ওপর নির্বিচার নিপীড়ন ও গণহত্যা চালায়, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তারা নির্মম দণ্ডপ্রয়োগে অশান্ত কৈবর্তদের শান্ত করে এবং তাদের প্রতিরোধক্ষমতাকে চিরতরে স্তব্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। অমানবিক দমনপীড়নে কৈবর্তরা শান্ত হয় ঠিকই, কিন্তু অসন্তোষ চাপা পড়া আগুনের মতো তাদের হৃদয়ে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। আর্য-অহমিকায় শাসকেরা কৈবর্তদেরকে অর্ধ-মানুষ, বর্বর বলে অবমূল্যায়ন করলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের জাতিসত্তাগত পরিচয়, ঐতিহ্য ও অধিকার বিষয়ে তারা ছিল সচেতন। তাদের লিখিত ইতিহাস না থাকলেও তাদের অতীতের গৌরবময় বীরত্বের কাহিনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয় লোককাহিনির মধ্য দিয়ে। জাতিগতভাবে চৌর্যবৃত্তি, দস্যুতা ও প্রতারণার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় না থাকলেও আর্যসভ্যতার আলোর সংস্পর্শে তারা এ বিষয়ে সচেতন হয় এবং আর্যশাসকদের বাতলানো পথেই তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কৈবর্তদের অবিসংবাদিত নেতা দিব্বোকের বুদ্ধিদীপ্ত ও

সুকৌশলী নেতৃত্বে কৈবর্তদের স্বাধীনতা আন্দোলন সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। দিব্বোক বুঝতে পারেন বিচ্ছিন্ন সহিংসতার মাধ্যমে পালরাজদের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়, বরং তাতে শাসকগোষ্ঠীর মাত্রাতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগে কৈবর্তদের অস্তিত্বসংকট আরও গভীরতর হবে। তিনি পক্ষ-প্রতিপক্ষের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলোকে খুব সূক্ষ্মভাবে শনাক্ত করেন এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে শাসকপক্ষের সঙ্গে মিত্রত্ব স্থাপন করেন এবং সেই আপাত মিত্রতাকে সুকৌশলে সন্দেহের ঊর্ধ্বে নিয়ে যান। কৈবর্ত বিদ্রোহদমনে বরাহস্বামী দিব্বোকের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা প্রকাশ করেন: '... যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাদের পক্ষে আছেন, বরেন্দ্রী সম্পর্কে আমাদের ভয় করবার মত কিছু নাই।' (পৃ. ৮০)। দিব্বোকের গতিবিধি ও কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রেরিত রাজপুরুষদের বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে বরাহস্বামী দিব্বোককে একান্ত আপনজন হিসেবেই আস্থায় নেন। দিব্বোকের প্রতি প্রধান অমাত্যের অকুণ্ঠ আস্থার প্রধানতম কারণ ছিলো দিব্বোকের জাতিসত্তাগত পরিচিতি : '[তিনি] বুদ্ধিমান হলেও সরল প্রকৃতির লোক। ওটা ওদের জাতের ধর্ম। ওদের বুদ্ধির একটা স্বভাবজাত সীমাবদ্ধতা আছে।' (পৃ. ৮০)। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি বুদ্ধির চাতুর্যে সুচতুর ও বিজ্ঞ অমাত্য বরাহস্বামীকেও বোকা বানিয়েছেন। শেষপর্যন্ত পালরাজত্বের পতন পতন ঘটেছে কৈবর্তদের হাতে; এবং এই বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে দিব্বোকের নেতৃত্বে। পালরাজার আস্থাভাজন হতে গিয়ে তিনি কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর আস্থা হারিয়েছেন। পরভুর দল যখন গৌড়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত, তখন দিব্বোককে লড়াইদমনের নিখুঁত অভিনয় করতে হয়েছে। এরজন্য কৈবর্তরা তাঁর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছে 'গৌড়ের পাত চাটা কুকুর, কৈবর্ত জাতের কলঙ্ক' (পৃ. ৮৮) বলে। শাসকপক্ষ ও স্বজাতি উভয়ের পক্ষ থেকে আসা অবজ্ঞা ও ঘৃণা তিনি নীরবে হজম করেছেন, অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যে। তিনি একটি সফল বিপ্লবের জন্য সুযোগের অপেক্ষা করেছেন এবং একটি নিখুঁত প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর আত্মভাবনায় ধরা পড়ে সেই প্রস্তুতির কথা : 'যতই দিন যাচ্ছে, সুযোগ আর সম্ভাবনার মাত্রা বেড়ে চলেছে। গৌড় থেকে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, ওদের নিজেদের ভিতরকার দলাদলিটা বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু অবস্থাটা আরও একটু পেকে উঠুক—তারপর। কৈবর্তরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সন্দেহ নাই। কিন্তু ওদের অশ্বরোহী সৈন্যের বিরুদ্ধে পায়ে হাঁটা সৈন্য কি কখনও যুঝতে পারে? এ প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ্য যুদ্ধে নামতে গেলে জয়ের আশা কম্‌ই আছে।' (পৃ. ৯০)। যে গৃহবিবাদ আর অশ্বারোহী বাহিনীকে পুঁজি করে গৌড়ের শাসকেরা কৈবর্তদের অধস্তন করেছে, দিব্বোক সেই কৌশলেই গৌড় অধিকারের ছক কষেন। কিন্তু দিব্বোকের কৌশলগত নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই বরেন্দ্রীর এখানে ওখানে দানা বেঁধে উঠতে থাকে বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে পরভু। ডানপিটে স্বভাবের এই কৈবর্ত তরুণ বল্লুকী নামের এক সুন্দরী তরুণীর প্রেমে পড়ে। বল্লুকী বন-গাড়ুলি পূজার জন্য বনে শালের মঞ্জরি আনতে গিয়ে অপহৃত হয়। রাজপুরুষ বা বণিকদের দ্বারা কৈবর্ত তরুণীদের অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিরোধে অক্ষম কৈবর্তরা শাসকচক্রের এই ধরনের অপরাধ নীরবে হজম করে যায়। কিন্তু পরভু প্রতিশোধের নেশায় মেতে ওঠে। সে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং গড়ে তোলে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত দল। এখানে ওখানে ডাকাতি হতে থাকে দিনরাতের বাছবিচার ছাড়াই। ডাকাতদের লুব্ধ দৃষ্টি বহিরাগতদের জমিজমা, ঘরবাড়ি আর গৌড়ীয় বণিকদের ধানের গোলার দিকে। ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে গুপ্ত দস্যুদল ও দলপতির পরিচয়। রাজকীয় সম্মান আর গৌড়ের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে এই দস্যুদল দমনের লক্ষ্যে বরেন্দ্রীতে প্রেরিত হয় রাজকীয় সৈন্যদল। সৈন্যদলের দমনপীড়ন যত বাড়তে থাকে, ডাকাতদলের উৎপাতও বাড়তে থাকে সমানতালে। একপর্যায়ে বণিকদলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈন্যদলের ওপর আক্রমণ চালায় ডাকাতরা এবং প্রকাশ্য দিবালোকে রাজকীয় সৈন্যদের হত্যা করে লুট করে নেয় বণিকদের ধানের গাড়ি। ডাকাতদলের কর্মকাণ্ডে গর্বে গৌরবে স্ফীত হয় কৈবর্তদের বুক। এমতাবস্থায় সৈন্যদল হানা দেয় পরভুর বাড়িতে এবং পরভুর বয়োবৃদ্ধ পিতা চাপাই মোড়ল এবং দুই ভাইকে কুকুরের মতো বেঁধে মারতে মারতে রওনা দেয় রাজধানী অভিমুখে। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে কৈবর্ত চাষারা। মলুই দেবতার ঢিবির কাছে আসতেই সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকাতদল। সৈন্যদের ওপর ডাকাতদলের ঝাঁপিয়ে পড়ার সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৈবর্তজনতা বিদ্যুচ্চমকের মতো রণোন্মত্ত হয়ে ওঠে

এবং যার যার হাতিয়ার নিয়ে গগনবিদারী চিৎকারে চারপাশের গ্রাম থেকে বাঁধভাঙা স্রোতের ন্যায় ছুটে চলে ঘটনাস্থলের দিকে। তিনটি মৃতদেহ পেছনে রেখে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যায় রাজকীয় সৈন্যদল। পুরো জনপদ অগ্নিগর্ভ হয়েই ছিলো, বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা ছিলো একটি স্ফুলিঙ্গের। এই খণ্ডযুদ্ধে ডাকাতদলের এক অচেনা যুবকের আত্মত্যাগ পুরো কৈবর্ত জনগোষ্ঠীকে প্রতিরোধচেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে : কৈবর্ত যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এক সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। বিচক্ষণ দিব্বোক কৌশলে এই বিপ্লবী শক্তিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেন। পরভু নিজে এই মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য দিব্বোকের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। দিব্বোক কৈবর্তজাতির এই মহাজাগরণের অপেক্ষায় ছিলেন। কৈবর্তজাতির এই জাতীয় জাগরণ, আধুনিক রাজনীতির পরিভাষায় 'জাতীয়তাবাদী' জাগরণকে কাজে লাগিয়ে শুধু বরেন্দ্রীর স্বাধীনতা নয়, গৌড়ের রাজধানী দখলের মাধ্যমে কৈবর্তদের অনুকূলে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য। আর এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য, যুদ্ধের প্রকৃতি ও যুদ্ধজয়ের কৌশল সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্যকভাবে সচেতন : 'যে যুদ্ধ আমাদের সামনে তা এতদিনকার এই বনজঙ্গলের যুদ্ধ নয়। রাজধানী দখলের এই যুদ্ধের ধরন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যুদ্ধ হবে মুক্ত রণক্ষেত্রে, আর নগরের রাজপথে। এ যুদ্ধ ওরা চিরকাল করে এসেছে, তাই এ ব্যাপারে ওরা দক্ষ। কিন্তু কৈবর্তেরা যুদ্ধ করে আসুক না কেন এ ধরনের যুদ্ধ তাদের কখনোই করতে হয়নি। ... আমরা যুদ্ধ করতে চলছি শুধু প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলা খেলতে নয়, আমরা জয়লাভ করতে চাই।' (পৃ. ১০৪)। সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের জন্য কৈবর্তদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও সনাতন অস্ত্র যথেষ্ট নয়, লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁকে আরও অনেকগুলো বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির সমর্থন ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা। স্থানীয় দুই প্রধান জাতিগোষ্ঠী কোচ ও কৈবর্তদের মধ্যে ঐতিহাসিক বিরোধ সৃষ্টি এবং এই বিরোধকে জারি রেখেই পালরাজারা বরেন্দ্রীর ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুভাবাপন্ন কোচদের সঙ্গে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা, নিদেনপক্ষে যুদ্ধকালে নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করতে আলোচনাকে প্রাধান্য দেন। যুদ্ধসময়ে কোচদের নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারা ছিল যুদ্ধজয়ে দিব্বোকের এক দূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপ। কূটনৈতিক প্রজ্ঞাবলে তিনি পীঠিরাজ দেবরক্ষিতের আস্থা অর্জন করেন এবং যুদ্ধের মিত্র হিসেবে অশ্বারোহী সৈন্যযোগে সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করেন। অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধির জন্য গোপনে পরভুর বাহিনী দিয়ে গৌড়ীয় বাহিনীর অস্ত্র লুট করান। প্রতিটি কাজই তিনি সুপরিকল্পিত পন্থায়, সন্দেহাতিরিক্ত সতর্কতায় এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। শাসকবর্গের সকল হিসাবনিকাশ ও আর্যগরিমাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে দিব্বোকের নিখুঁত নেতৃত্ব আর রণনৈপুণ্যে ভর করে গৌড়ের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় নিম্নবর্গের কৈবর্তরা। দিব্বোক ক্ষমতাদখলের বিস্ময়কর সাফল্যে তৃপ্ত থাকেননি; অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর শোষণসর্বস্ব ক্ষমতাকাঠামোকে ভেঙে দিয়ে একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রনির্মাণে আত্মনিবেদন করেন। দিব্বোকের রাষ্ট্রনির্মাণের প্রয়াসই এই উপন্যাসের প্রাণরস এবং উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের প্রত্যয়ও তাই।

কৈবর্তদের গৌড়জয়ের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করেছে তাদের জাতিসত্তাগত ঐক্যের প্রেরণা। একটি জাতির জাতীয়তাবোধের শেকড়ে প্রোথিত থাকে তার গর্বমিশ্রিত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রত্নস্মৃতি; এই স্মৃতিসূত্রেই তারা একটি জনগোষ্ঠী অভিন্নসত্তা ও আত্মিক বন্ধনে গ্রথিত হয়। এই বন্ধন যখন ক্ষমতামুখী রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করে তখন তা জাতীয়তাবোধে পরিণত হয়। জাতীয়তাবোধের উন্মেষকালে একটি ইতিবাচক প্রত্যয় থাকে; একটি জাতিকে সমষ্টিচেতনায় এবং যৌথকল্যাণে প্রাণিত করার আবেগ থাকে। বিশেষত, পরাধীন জাতিগোষ্ঠীর শোষণ-জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য জাতীয়তাবোধ একটি মোক্ষম মন্ত্র। কিন্তু জাতীয়তাবোধ যখন আধিপত্য বিস্তারের নিয়ামক হয়, তখন এর মধ্যে আর কোনো কল্যাণবোধ থাকে না, তা হয়ে ওঠে মানবদমনের মারণাস্ত্র। আধিপত্যকামী জাতীয়তাবোধ জাতিতে জাতিতে বিভেদ, ঘৃণা ও হিংসা উৎপাদন করে এবং নিজের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় ভিন্ন জাতিকে অধস্তন ও জুলুম করার যুক্তি তৈরি করে। বাংলার প্রাচীন যুগের এক বিশেষ পর্বে কৈবর্তদের মধ্যে জেগে ওঠা জাতীয়তাবোধে ঔপন্যাসিক আধুনিক

যুগের জাতীয়তাবাদকে সঞ্চারিত করেছেন, যে জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় ইউরোপ বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে অবশিষ্ট বিশ্বকে বন্দি করার যুক্তি তৈরি করেছে। অসভ্য, বর্বর জনগোষ্ঠীকে সভ্যকরণের স্বপ্রণোদিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তারা দখলকৃত দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন এবং কঠোর প্রকৃতির প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে। এব প্রত্যক্ষ ফল হলো অশ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর ওপর যথেচ্ছ শোষণ-নির্যাতন চালানোর বৈধতা; সুদূরপ্রসারী ফল হলো উপনিবেশিত জনগণের মননে-বিশ্বাসে হীনম্মন্যতাকে গেঁথে দেওয়া। ঔপনিবেশিক শাসনের দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই উপনিবেশিতের মনে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে উপনিবেশবাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা গোষ্ঠীতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের বদৌলতে। শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতার কারণেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভেতর থেকে জন্ম নেয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ভাষিক জাতীয়তাবাদ। পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষত পাঞ্জাবি জাতীয়তাবাদের আধিপত্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী নতুন নিষ্পেষণের শিকার হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ-জুলুম-বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটি নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অভিঘাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতর থেকে ভেঙে যাওয়া এবং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনার উত্তাল সময়ে *বিদ্রোহী কৈবর্ত* উপন্যাসের প্রকাশ। এই উপন্যাসে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার কার্যকারণ যেমন চিহ্নিত হয়েছে, তেমনি একটি প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রের নবনির্মাণের রূপরেখাও অঙ্কিত হয়েছে। কৈবর্তনেতা দিব্বোক ঔপন্যাসিক-কল্পিত সেই ফলপ্রসূ স্বাধীনতার রূপকার। দিব্বোক কৈবর্তদের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে গৌড়ের ক্ষমতা দখল করেছে, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সেই জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় রাশ টানার উদ্যোগ নেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রনির্মাণের পথে উগ্র জাতীয়তাবাদ এক প্রবল প্রতিবন্ধক। তিনি ছিলেন অনার্যসভ্যতার চিরাচরিত মানবিক মূল্যবোধের ধারক-বাহক; আর্যসভ্যতার হিংসাত্মক বিভাজনের নীতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পরও তিনি তাঁর বিশ্বাস ও মূল্যবোধে অনড় থেকেছেন। যুদ্ধের সময়ও তিনি অযথা প্রাণহানি ও নিরীহ নিরপরাধ মানুষের প্রতি আক্রমণকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। তাঁর নিষেধ অমান্য করে পূর্ববর্তী শাসকদের মতোই প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত কৈবর্তেরা পরাজিত শাসকপক্ষের লোকদের ওপর নৃশংস ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডে, বিশেষত মহাসান্ধিগ্রহিক পদ্মনাভের হত্যাকাণ্ডে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছেন। পদ্মনাভের বিচক্ষণতা, একনিষ্ঠ কর্মোদ্যোগ ও সর্বোপরি উদার মানবিকতায় তিনি মুগ্ধতা পোষণ করতেন এবং তাঁর শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তাঁকে বিবেচনায় রেখেছিলেন। পদ্মনাভের মৃত্যুকে তিনি অপূরণীয় ক্ষতি বলে আক্ষেপে ফেটে পড়েছেন।

গৌড় বিজয়ের পর কৈবর্তদের মধ্যে লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। গৌড়ের সভ্যজাতির এই রোগ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে কৈবর্তদের মধ্যে। কৈবর্তদের এই লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি রাজা দিব্বোক কঠোর হস্তে দমন করেন এবং লুণ্ঠনলব্ধ সম্পদ রাজকোষাগারে জমা দেওয়ার কঠোর নির্দেশ জারি করেন। লুণ্ঠিত সম্পদকে রাজা সাধারণের সম্পদ হিসেবে সাধারণের কল্যাণার্থে ব্যয় করার আদেশ জারি করেন। শাসক হিসেবে কৈবর্ত-আধিপত্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি তাঁর রাজত্বে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করেন। রাজা দিব্বোকের শাসনে হাটের কর রহিত হয়, শস্যের ওপর রাজকর ছয় ভাগের এক ভাগের বদলে আট ভাগের এক ভাগে নেমে আসে। কর আদায়ে জুলুম অত্যাচারের নীতি পরিত্যাজ্য হয়। কর হিসেবে 'যে শস্য রাজভাণ্ডারে জমা হয়, তার সবটাই প্রজাদের ভালোর জন্য খরচ করা হয়ে থাকে। রাজা দিব্বোক তার একটা কণাও ছুঁয়ে দেখেন না।' (পৃ. ১৬৯)। দিব্বোক প্রজাদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেন এবং এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা জারি করেন। এই নীতিমালায় বরেন্দ্রীর ধান ব্যবহারে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আর কেবল উদ্বৃত্তটুকুই বাইরে চালানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাঁর সুশাসনে

আকৃষ্ট হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কোচেরা পরম নির্ভরতায় তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। 'শুধু কোচরাই নয়, ছোট ছোট উপজাতি যারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে ছিল, তারাও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল।' (পৃ. ১৯৬)। রাজ্যের পরিসীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিব্বোকের রাজদায়িত্বও বেড়ে চলে। এই রাজদায়িত্ব পালনে দিব্বোক এক নিঃসঙ্গ পথিক। কৈবর্তরা বীরের জাতি নিঃসন্দেহে, কিন্তু তারা গণ্ডমূর্খ এবং রাজ্যপরিচালনার সূক্ষ্ম কৌশলে শিশুর মতো অনভিজ্ঞ। তাই তিনি রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই উদ্যোগে তাঁর স্বজাতীয়রাই প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কৈবর্তজনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবেই শিক্ষাবিমুখ, আর এই বিমুখতা তীব্রতর হয়েছে অন্ধ আর্যবিদ্বেষের কারণে। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হলো, 'দরকার নাই বাপু বেশী লেখাপড়া শিখে। এমনিতেই ভাল আছি। লেখাপড়া শিখলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। ওই পুঁথিগুলির পাতায় পাতায় যত রাজ্যের রাজ্যের দুষ্ট আর বজ্জাতির বীজ রয়েছে। গৌড়ের মানুষগুলো এত কুবুদ্ধি কোথা থেকে যোগাড় করত? ওদের ওই পুঁথিগুলো থেকেই তো? তুমি কি আমাদের ছেলেগুলোকে ওদের মত করে তুলতে চাও নাকি?' (পৃ. ১৭৫)। নিরক্ষরতা থেকে দানা বেঁধে ওঠে ধর্মীয় কুসংস্কার। ওলান ঠাকুরের পুজাতে নরবলির মতো বর্বরতাকে তারা অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় আচার হিসেবে বিশ্বাস করে। নরবলির মতো বর্বর প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে পড়েন। সাধারণ কৈবর্তদের মতো তিনি গৌড়ের আর্য-অভিজাতদের প্রতি অন্ধ বিরাগ পোষণ করেননি, তাদের কর্মকাণ্ডের যতটুকু সদর্থক সেটুকুর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন এবং প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেছেন। নিজের জাতিগোষ্ঠীর মূর্খতায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং একটি জ্ঞাননির্ভর ও মানবিক রাষ্ট্রনির্মাণযজ্ঞে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পদ্মনাভের অভাব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর অবর্তমানে গৌড়ের ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞদের মোকাবিলা করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার মতো প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব তাঁকে বিচলিত করেছে। ইতোমধ্যেই তিনি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি। তাই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে রুদোকের হাতে গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করে তিনি বরেন্দ্রীতে প্রত্যাবর্তন করেন। বরেন্দ্রীকে কৈবর্তদের একটি শক্ত ঘাঁটি হিসেবে নির্মাণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। পাল রাজপুরুষেরা রাজ্য পুনরুদ্ধারের সর্বাত্মক চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ইতোমধ্যে তারা দুবার আক্রমণ চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাদের চেষ্টা থেমে ছিল না। তাই দিব্বোক রাজ্যের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা উন্নত ও নিখুঁতকরণে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। পীঠিরাজের অশ্বারোহীবাহিনীর সহযোগিতায় কৈবর্তরা গৌড় জয় করেছে। কিন্তু বিচক্ষণ দিব্বোক ভালো করেই জানেন, ক্ষমতার রাজনীতিতে চিরস্থায়ী মিত্র বলে কিছু নেই; স্বার্থ ও কৌশলই এখানে মূলকথা। তাই প্রতিরক্ষায় পরনির্ভরতা কাটাতে তিনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সামরিকবাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ক্ষমতার উত্তরসূরি ভীম যখন শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রের চারদিকে প্রশস্ত ও উঁচু জাংগাল গড়ে তোলার প্রস্তাব করে, তখন তিনি ভীমের উদ্দেশে বলেন, 'ভবিষ্যতে এরকম জাংগাল তোলা যদি সম্ভব হয় আর সেটা সত্যসত্যই কাজে আসে, তবে তা করবে না কেন? কিন্তু ভীম, এই জাংগালের চেয়েও শক্তিশালী মানুষের জাংগাল...। সবচেয়ে নজর রাখতে হবে তার দিকে। ... মনের সঙ্গে মন গেঁথে এই মানুষের জাংগাল গড়ে তুলতে হয়। আমরা কৈবর্ত, কোচ এবং আরও অন্যান্য জাতের মানুষদের মন গেঁথে গেঁথে এই জাংগাল গড়ে তুলতে পেরেছিলাম বলেই ওরা এই জাংগাল ভেদ করে ঢুকে পড়তে পারেনি। কিন্তু আরও অনেক দৃঢ়, অনেক সুগঠিত করে তুলতে হবে একে। মাটি-পাথরে গড়া জাংগালের চেয়েও মানুষের জাংগালের শক্তি অনেক বেশী। যতদিন এই জাংগাল ঠিক থাকবে, ততদিন আমাদের ভয় নাই।' (পৃ. ২০৪)। স্পষ্টতই তিনি রাজার ক্ষমতা ও দেশের প্রতিরক্ষাস্তম্ভ হিসেবে সাধারণ মানুষের অভিন্নহৃদয়ে গ্রথিত ঐক্যকেই বুঝিয়েছেন। আর এই ঐক্য গড়ে তুলতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বঞ্চনাহীন অনুভূতিই মানুষকে শাসকের প্রতি আস্থাশীল করে এবং দেশরক্ষায় আত্মত্যাগে প্রাণিত করে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায়, কিন্তু স্বাধীনতাকে অর্থবহ ও সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রতিটি নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়ন ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা, প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন সত্তায় গেঁথে দেওয়া এবং এক্ষেত্রে গ্রন্থির দায়িত্ব পালন করবেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব––এটাই উত্তর-উপনিবেশবাদের মূল প্রত্যয়। উপন্যাসে দিব্বোক উত্তর-উপনিবেশবাদ নির্দেশিত আদর্শ নেতা। ১৯৬৯ সালে

বাংলাদেশের জন্ম-সম্ভাবনার পটে রচিত এই উপন্যাসে একটি সর্বজনীন কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ রূপরেখাই যেন উপস্থাপিত হয়েছে দিব্বোকের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে।

বিদ্রোহী কৈবর্ত উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীর ক্ষমতায়ন; আর এই প্রসঙ্গটির আলোকপাত হয়েছে শঙ্খদেবীর চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী বিবেচিত হয়েছে অবৌদ্ধিক নিম্নবর্গের সত্তা হিসেবে। এই চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে নারীর আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতাকে ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষমতাকাঠামো থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে পরিণত করা হয়েছে পুরুষের ভোগের জৈবযন্ত্রে। পালরাজত্বের অবক্ষয়পর্বে বিকৃত কামনার বশে নারীকে অপহরণ করা হতো; অথবা, ভোগের বলি হিসেবে সাজিয়ে-গুজিয়ে পৌঁছে দেওয়া হতো পুরুষের শয্যাগৃহে। যথেচ্ছ ভোগের পর সেই নারীদের কেউ চিরতরে হারিয়ে গেছে, আবার কাউকে বরণ করতে হয়েছে পরাশ্রয়ী উচ্ছিষ্টের জীবন। কেবল নিম্নবর্গের নারীরা নয়, এই সীমাহীন অপমান ও নিগ্রহে স্পৃষ্ট হয়েছে রাজপ্রাসাদের অভিজাত নারীরাও। রাজপ্রাসাদে শঙ্খদেবীর আগমন ঘটে রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের অমিত ভোগের উপচার হিসেবে। রাজবংশের কন্যা হলেও শঙ্খদেবী পুরুষতান্ত্রিক অবরোধে সাধারণ মেয়ের মতোই বেড়ে উঠেছেন। রাজা বা রাজপুত্র নয়, তাঁর তরুণীমন জীবনসঙ্গী হিসেবে এমন এক পুরুষকে কামনা করেছে যাকে একান্ত আপন করে পাওয়া যাবে। ক্ষমতার বাইরে একটি মানবীয় প্রেমের শুচিস্নিগ্ধ সম্পর্কের মধ্যেই তিনি জীবনের সার্থকতা সন্ধান করেছেন। ঘটনাচক্রে বৃদ্ধ রাজা বিগ্রহপালের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে শঙ্খদেবীর ওপর। বিয়ে বিষয়ে বংশীয় ঐতিহ্য অনুসারে শঙ্খদেবীর মতামতের মূল্য ছিল না। প্রবল আপত্তি এবং বাধা সৃষ্টি করেও শঙ্খদেবী এ বিয়ে প্রতিহত করতে পারেননি। পিতৃবংশের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। কারণ এই বিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার এবং গৌড়ের রাজকীয় ক্ষমতায় নিজেদের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সম্ভাবনা। রাজার কদর্য-কামনা আর নিজ জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পঙ্কের কাছে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। জবরদস্তির এই বিয়েকে তিনি পুরাকালের রাক্ষস বিয়ে বলে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছেন এবং অন্তঃকরণ থেকে কখনোই স্বীকৃতি দেননি। এই কারণেই তিনি অন্য নারীদের মতো পুরুষের ভোগের পঙ্কে হারিয়ে যাননি, পঙ্কজ হয়ে ফুটেছেন আপন মহিমায়। 'বিগ্রহপালের স্থূল অশুচি হস্তাবলেপে লাঞ্ছিত, ক্ষতবিক্ষত ও মূর্ছিত' হতে হতে প্রবল ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি রুখে দাঁড়ান পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে; মেতে ওঠেন ক্ষমতার নির্মম হানাহানির খেলায়, যে খেলায় নীতি আর বিবেকের স্থান নেই। রাজাকে রিপুর রজ্জুতে বেঁধে পুরো রাজকীয় ক্ষমতাকাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠা করেন নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। এই নারী আর অবলা নয়; তীক্ষ্ম প্রতিভা, কূটবুদ্ধি আর সুচতুর কর্ম-কৌশলে পারঙ্গম পুরুষ-আধিপত্যের প্রবল প্রতিস্পর্ধী। বুদ্ধির খেলায় তিনি প্রতিপক্ষকে যেমন বিধ্বস্ত করেছেন, তেমনি আদায় করে নিয়েছেন পক্ষ-প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে সকলের সম্মান-শ্রদ্ধা-সমীহ। তাঁর রাজনীতির কূটচালে বরাহস্বামীর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিককেও বহুবার নাজেহাল হতে হয়েছে। বরাহস্বামীর নির্মোহ মূল্যায়নে বিধৃত হয়েছে শঙ্খদেবীর অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব : 'স্ত্রীলোক বলে একে সামান্য মনে করো না। স্বর্গীয় মহারাজের শেষ জীবনে ইনিই ছিলেন গৌড়ের সর্বাধিনায়িকা। সেদিন পদে পদে তাঁর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা হয়েছে আমাদের। অনেক ক্ষেত্রে হঠতেও হয়েছে আমাকে, একথা অস্বীকার করতে পারব না।' (পৃ. ১৯)। সুষ্ঠু পরিকল্পনায় তাঁর রাজকীয় কর্মকাণ্ডসমূহ এমন নিখুঁত ছিল যে, প্রধান অমাত্যের তাতে ন্যূনতম হস্তক্ষেপের অবকাশ ছিল না। তাই মহীপালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বরাহস্বামীর মূল উদ্বেগ কেন্দ্রীভূত ছিল গৃহবন্দি ও বয়োবৃদ্ধা শঙ্খদেবীকে ঘিরেই: 'শঙ্খদেবী আর রামপালদেবের উচ্চাশার মূল এখনও উৎপাটিত হয়নি, দৃষ্টির আড়ালে তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। ক্ষমতাচ্যুত রাজকূটবংশীয়েরা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও নিশ্চেষ্ট নয়। শঙ্খদেবীকে আমার মতো আর কেউ চেনে না। এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় যে, তিনি যেখানেই থাকুন বা যেভাবেই থাকুন না কেন, তার প্রতিভা কখনও নিষ্ক্রিয় হতে পারে না।' (পৃ. ২০)। বরাহস্বামীর দৃঢ়বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করে শঙ্খদেবীই শেষপর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের মূল কারিগর। তাঁর সুতীক্ষ্ম পরিকল্পনায় রাজা মহীপালের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে ওঠে এক শক্তিশালী আন্দোলন। শঙ্খদেবীর রাজনৈতিক কৌশলে ভর করেই রাজ্যে রাজ্যে রামপালের

পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হয়; অধিকাংশ সামন্তরাজার সমর্থন ও আনুগত্য পুঞ্জীভূত হয় রামপালের পক্ষে; মথনদেবের দূতিয়ালিতে বরাহস্বামীর প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ক্ষোভ পরিণত হয় রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। এভাবে শঙ্খদেবীর বিচক্ষণ নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক জনসমর্থনপুষ্ট এক অভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরি হয়। অল্পের জন্য এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও শঙ্খদেবীর নিপুণ পরিকল্পনার কারণেই ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ ধরা পড়েনি, এমনকি কাউকে শনাক্তও করা সম্ভব হয়নি। কৈবর্তদের কাছে রাজা মহীপালের পতনের মধ্য দিয়ে শঙ্খদেবীর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ইতি ঘটে। ক্ষমতার ময়দান ছেড়ে রাজবৈদ্য হরিগুপ্তের হাত ধরে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর ছদ্মবেশে তিনি সাধারণ্যে মিশে যান। জীবনের এই রূপান্তরে তাঁর কোনো হতাশাবোধ নেই, আছে মুক্তির অপার আনন্দ। ক্ষমতার কূটরাজনীতির চক্রাবর্তে তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার অপমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছিল, রাজপ্রাসাদের বাইরে দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতি আর হরিগুপ্তের প্রেমময় সান্নিধ্যে শঙ্খদেবীর মৃতপ্রায় প্রাণে জীবনের সঞ্জীবনীসুধা সঞ্চারিত হয়, যা ছিল তাঁর আজীবন আরাধ্য। শঙ্খদেবী শৈশব থেকেই স্বাধীনচেতা, মুক্তমনা ও যুক্তিশীল। কোনো আরোপিত সত্যে তাঁর আস্থা নেই; ধর্ম ও প্রথার নামে চলে আসা সত্যকেও তিনি প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেননি। যুক্তি ও বুদ্ধির আলোয় জগৎ ও জীবনকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গি তিনি অর্জন করেছেন শৈশবে এক পিতৃব্যের কাছ থেকে। সহজাত ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা ও রাজকীয় কাজের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছেন, ধর্মের নামে বিভাজন ও হানাহানি ক্ষমতার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষমতা অন্যের ওপর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ চায় এবং ধর্ম ক্ষমতার পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণের যুক্তি ও বৈধতা তৈরি করে। আর্য-অনার্যের বিভাজনকাঠামোটি ধর্মাশ্রয়ী; আর্যশ্রেষ্ঠত্বে অনার্য জনগোষ্ঠীকে নিষ্পেষণ করার যুক্তি হিসেবে এই হিংসাত্মক বিভাজন তৈরি করা হয়েছে। গৌড়ের শাসকগোষ্ঠী আর্যশ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিতেই অসভ্য, নির্বোধ ও বর্বর অভিধা দিয়ে কৈবর্তদের দমন-পীড়ন করার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। আবার ধর্মের যুক্তিতেই নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অস্বীকার করে তার দেহমনের মালিকানা পুরুষের হাতে তুলে দিয়েছে ধর্ম। ধর্ম পাতিব্রত্যকে নারীর জন্য বাধ্যতামূলক পবিত্রকর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, বিয়ের নামে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অপছন্দের পুরুষকেও দেবতাজ্ঞানে আজীবন ভক্তি ও সেবা করে যেতে হবে। ধর্মে এর অন্যথা জঘন্য পাপ এবং অন্যথাকারী নারী পাপিষ্ঠা ও দুশ্চরিত্রা হিসেবে চরমভাবে ঘৃণিত। ধর্মের সাফল্য এই যে, নারীর জন্য চরম অপমানজনক এই দাসত্বকে নারী মনস্তত্ত্বে গেঁথে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে শঙ্খদেবী এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী নারী; তিনি নিবর্তনকারী ধর্মের বৈধতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া বিয়েকে মনেপ্রাণে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং লম্পট স্বামীর প্রতি প্রবল ঘৃণায় ফেটে পড়েছেন। প্রবলের প্রতি দুর্বলের ঘৃণায় আটকে থাকেননি, ঘৃণাকে তিনি প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। রাজনীতির চতুর খেলায় ক্ষমতাধর স্বামীকে পুতুল বানিয়ে তিনি রাজকীয় ক্ষমতার সর্বেশ্বর হয়ে ওঠেন। ধর্মসমর্থিত প্রবল ক্ষমতাধর পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই সেই কাঠামোকে ভেঙেচুরে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীর বাহুলগ্ন থেকেই তিনি পরপুরুষকে কামনা করেছেন। গৌড়ের রাজনৈতিক বিপর্যয় তাঁর অবরুদ্ধ কামনা পূরণের সুযোগ করে দেয়। স্বপ্নপুরুষ হরিগুপ্তের হাত ধরে তিনি বেরিয়ে আসেন রাজকীয় দাম্পত্যের কারাগার থেকে, সংসার পাতেন উন্মুক্ত আকাশের তলে। বিবাহবহির্ভূত এই দাম্পত্যসম্পর্ককে ধর্ম 'পাপ' বললেও শঙ্খদেবীর বিদ্রোহীমন একে পাপ বলে স্বীকার করেনি; তাঁর কাছে এই নতুন জীবন অগ্নিদগ্ধ মনের 'বিমল প্রশান্তি'। এ প্রসঙ্গে তাঁর অকপট উচ্চারণ : 'এমন সুখ আমি আমার জীবনে আর কখনও পাইনি। ধন্য হয়েছি আমি। তুমি কি বলতে চাও এসবই আমাদের পাপের ফল? পাপের ফল যদি এই ভাবেই ফলে, তবে পাপই আমার ভাল, পাপই আমার মাথার মণি।' (পৃ. ১৫৪)। যে পাপের রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি, সেখানে আর প্রত্যাবর্তন করতে চান না। পুত্র রামপালদেবের সূত্রে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের যে ক্ষীণ সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিল, তারও চূড়ান্ত অবসান ঘটে গয়ায় তাঁর পিণ্ডিদানের সংবাদে। এ সংবাদে তাঁর গভীর প্রশান্তিভরা উক্তি : 'মুক্ত, এবার মুক্ত আমি ... রামপাল এবার আমায় মুক্তি দিয়েছে। রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যেটুকু বন্ধন অবশিষ্ট ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে গেল। আজ আমার নবজন্ম।' (পৃ. ১৮৬)। যে ক্ষমতা হিংস্র উন্মত্ততায় মানুষকে শোষণ করে, লেলিহান লোভের তাড়নায় মানুষের মানবিক মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে

সেই ক্ষমতাকে তিনি ঘৃণাভরে চিরতরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে তিনি নেমে আসেন সাধারণ মানুষের সমতলে। যে নারী সারাজীবন ধরে পরের সেবা পেয়ে এসেছেন, সে নারী মহামারি আক্রান্ত মানুষের সেবায় আত্মনিবেদিত। প্রকৃতির অপার সৃজনশীলতা ও গ্রামের মানুষের নিষ্পাপ সরলতা তাঁকে দিয়েছে প্রকৃত জীবনার্থের সন্ধান, প্রাণপ্রাচুর্যে আর নির্মল আনন্দে বাঁচার প্রেরণা। নবলব্ধ জীবনোলব্ধিতে শঙ্খদেবী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী নারীমাত্র নয়, একজন নারীর মহিমান্বিত মানুষে উত্তরণের সংগ্রামী প্রতীক।

পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য এই, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে যে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ওই রাষ্ট্রের অভিজাতশ্রেণির ক্ষমতাকেন্দ্রিক নেতৃত্বের স্বার্থান্ধ আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিভূ হয়ে ওঠে। প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষত-বিক্ষত পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে এই রাষ্ট্র শুধু ব্যর্থ হয়নি, বরং পূর্বতন দুর্ভোগগুলোকে আরও গভীরতর করেছে। নতুন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে প্রবল দমন-পীড়নের যাঁতাকলে পড়ে। জনগণের আন্দোলনের স্পৃহা ও সক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটানো হয়। ফলত নব্য-ঔপনিবেশিক শাসনের ঘেরাটোপে বন্দি হয় সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির স্বপ্ন। তদুপরি বাঙালিকে আত্মপরিচয়হীন করার লক্ষ্যে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। চরম অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালি নতুন করে প্রাণ বাজি-রাখা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই পর্বের উপন্যাসসমূহ বাঙালি জাতির সে-সংকটময় সময়ের সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত এবং উপন্যাসের স্বভাবধর্ম অনুসারেই এই উপন্যাসসমূহে বাঙালির সমকালীন অস্তিত্ব-সংকট এবং তাদের প্রতিরোধ-সংগ্রাম ইতিহাস-পরিস্রুত চেতনায় রূপকে-প্রতীকে প্রতিফলিত হয়েছে। একেবারেই সমকাল সংলগ্ন ঘটনা-প্রবাহকে ধারণ করতে গিয়ে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের রোষানল এড়াতে কোনো কোনো উপন্যাস হয়েছে প্রতীক ও রূপকাশ্রয়ী; আর সমকাল থেকে কয়েক দশক পশ্চাদ্‌বর্তী ঘটনা অবলম্বনে রচিত বলে কোনো উপন্যাস সরাসরি আখ্যান-আশ্রয়ী বর্ণনায় উপস্থাপিত। তবে প্রকরণগত বৈসাদৃশ্যসত্ত্বেও উদ্দেশ্যগত বিচারে উপন্যাসগুলো প্রায় সমধর্মী। সম্ভাব্য উদ্দেশ্যটি হলো নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচন এবং বাঙালির সর্বাত্মক মুক্তি অর্জনের মুক্তি-প্রয়াসকে বেগবান করা। উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের অভীষ্টও এটাই।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : *লালসালু* (১৯৪৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস, সৈয়দ আকরম হোসেন ১- সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, ***নান্দীপাঠ ৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যা : ১***, ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : ৮৩।

৩. প্রাগুক্ত : ৮৮।

৪. শওকত ওসমান : *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৩), শওকত ওসমান উপন্যাসসমগ্র-১, ৪র্থ মুদ্রণ ২০১০, ঢাকা, সময় প্রকাশন।

৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : *লালসালু* (১৯৪৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস, সৈয়দ আকরম হোসেন ১- সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

৬. শহীদুল্লা কায়সার : ***সংশপ্তক*** ২০১৭, চারুলিপি, ঢাকা।

7. 'বড় বড় দলিান তালতলিতে। বাকুলিয়ায় তো দালানই মোটে দুটো—সৈয়দদের আর মিঞাদের। কিন্তু তালতলির দালানের তুলনায় ওগুলো যেন কবুতরের খোপ। দালানগুলোর চেয়েও তালতলির ইয়া বড় বড় টিনের চৌচালাগুলো যেন আরো ভালো লাগে মালুর। ভালো লাগে তকতকে ঝকঝকে মাটির ভিটি। বাকুলিয়াটা বড় নোংরা, তালতলিতে এলেই একথাটা মনে পড়ে ওর।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৬৭)।

৮. 'স্কুলের স্বল্প শেখা ইাতহাস জ্ঞান থেকে বারবার ভেসে উঠে দুটো নাম—আকবর বাদশা আর নবাব আলিবর্দী। এই নাম দুটোর সাথেই জড়িত যত গৌরব। তারপর সিরাজুদ্দৌলা, বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণ। এই

কলঙ্কের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মিঞা আভিজাত্যের বিলুপ্ত অধ্যায়। তার ওপর শালা কর্নওয়ালিশ, শেষের শূলটা তো ওই শূয়োরখোরটাই মেরে গেছে। তাইতো আজ 'বাইন্যা' রামদয়ালের কাছারিতে যেতে আসতে হয় ফেলু মিঞাকে, ফিরে যেতে হয় ব্যর্থ মনোরথে। জ্বালা। জ্বালা। এ এক অসম্ভব জ্বালা। ভেতরের শিরাগুলো কেমন টাটিয়ে ওঠে আর ফেলু মিঞার মনে হয় শরীরের সমস্ত চামড়া যেন ঝলসে গেল। এমনিই হয় মিঞাদের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎটা যখন চিন্তা করে ফেলু মিঞা তখন এমনি এক জ্বালায় দাউদাউ করে বুকটা, কোত্থেকে কোন হারানো দিগন্তের বহ্নি শিখারা এসে ছেঁকে ধরে ওকে। সেই শিখারা মাথায় চড়ে, লুণ্ঠিত মর্যাদা, লুপ্ত অতীত, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর এখনো অপূর্ণ সেই সংকল্পটি ধেইধেই করে কি এক আগুনের নাচন জুড়ে দেয় ফেলু মিঞাকে ঘিরে।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৬৩)।

৯. 'প্রজা মানে সম্ভ্রম। আসতে যেতে সালামটা, কারণে-অকারণে একটু হাঁকডাক। এসব বাদ দিয়ে, প্রজাকে নাকচ করে বড় মানষীর কথা, আভিজাত্যের কথা কি ভাবা যায়? দ্রোণে দ্রোণে জমির মালিক হাজার জন মজুর খাঁটিয়ে চাষ, সে বলদ দিয়েই হোক আর কলের লাঙলেই হোক, টাকা লাখই আসুক আর কোটিই আসুক হাতে, তবু তো চাষ করা? লোকে চাষা-ই বলবে; বলবে না মিঞার ব্যাটা মিঞা। টাকার পাহাড়ের ওপর বসে থাক, হাজার জন মজুরের ওপর সর্দারি কর, সে এক জিনিস। আর মিঞাগিরি? সে এক গৌরব। সে এক বড়মানষী।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৬৬)।

১০. 'সেকান্দর মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে বলা উক্তিতে ফেলু মিঞার সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকটিত: "শোন মাস্টার। এই ফেলু মিঞা একটা কথা বলে রাখছে—ওই হিন্দুরা একটা একটা করে সব মুসলমান খতম করবে এ দেশ থেকে। এখন তো রায়ট হচ্ছে কালেভদ্রে! কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখছে, এমন দিন আসছে প্রতি মাস প্রতি দিনই রায়ট হবে।... ইংরেজ থাকতেই এ অবস্থা? ইংরেজ চলে গেলে, হিন্দুদের হাতে স্বরাজ এলে কি অবস্থাটা হবে ভেবে দেখ তো? একটা মুসলমানেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না এ দেশে। একটাও না। সব মুসলমান, ধনী নির্ধন, আমীর ফকির সবাই যদি আজ একটা না হতে পারি আমরা তবে এই, এই আমাদের ভবিষ্যৎ।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৯৫)।

১১. 'মিঞা বাড়ির ইজ্জত, মিঞা বাড়ির নাম নিশানা মুছে ফেলতে চায় তালতলির ঐ মালাউনের গোষ্ঠীটা। টাকা যে আমার চাই, যেমন করে হোক। নইলে শুধু আমার হার নয়, বাকুলিয়ার, ওই সুলতানপুরের, গোটা পরগণার মুসলমানের হার। কোনদিন, কোনদিন ওরা মাথা উচিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। পারবে না।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৯৬)।

১২. 'রমজানের এগিয়ে চলার পথরেখা বিম্বিত হয় তার মনোকথনে: "লোকে আজকাল তালুক বেচে জমি কিনছে। কেননা জমিতেই এখন টাকা, ফসল বিক্রির নগদ মুনাফা। একটু বুদ্ধি খরচ করলেই তো ব্যাপারটা বুঝতে পারে ফেলু মিঞা। কিন্তু ফেলু মিঞা বুঝবে না। ফেলু মিঞা জমি বেচে তালুক কিনবে। কেমন একটা ধূর্ত হাসি ঝিলিক তুলে যায় রমজানের ঠোঁটের কোলে।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৯২)।

১৩. 'নিজের বৈঠকখানা হবে, সেখানে আড্ডা জমবে; পান-তামাক চলবে, এটা অনেক দিনের শখ রমজানের।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৬৩)।

১৪. 'শুনেছে মালু, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বানিয়েছে রমজান। যুদ্ধের হাটে বিচিত্র পণ্যের কারবার তার। রামদয়াল তার দোসর। ঘরে-ঘরে বুভুক্ষু কৃষক-বধূরা, নিরাশ্রয়া কিষাণী কুমারী রমজানের পুঁজির কড়ি।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ২০০)।

১৫. 'এইটুকু লেখাপড়া নিয়েই বিদেশ গিয়ে নিজের ভাগ্যটা পরখ করে দেখতে পারতো সেকান্দর। কিন্তু ওর মনটা গ্রাম ছাড়তে সায় দেয়নি। কি যেন আছে বাকুলিয়া গ্রামে আর তালতলির স্কুলে যা ওকে বন্দি করে রেখেছে এই কয়েক মাইল পরিধির জগতে।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৮১)।

১৬. 'নির্ঝঞ্ঝাট সরল জীবনটা ওর কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। স্থির বাসনা-স্কুল-ক্ষেত-বাড়ি। নির্ধারিত বৃত্তের মাঝে সীমিত জীবন। হঠাৎ সেই বৃত্তের আড়ালটা যেন অপসারিত হয়ে গেছে। ওর অজানতেই কখন বিস্তৃত হয়ে গেছে জীবন আর চিন্তার পরিধিটা। গৎ ধরে চলা আর বাঁধাধরা ভাবনা, সবকিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাকুলিয়ার সকলের সাথে সব কিছুর সাথে কখন সে জড়িয়ে পড়েছে। কারো বিশ্বাস, কারো অবিশ্বাস, কারো বা ঘৃণা—সব কিছু মিলিয়ে এ জীবনটা কেমন? ইচ্ছে করলেও যেন এর মায়া কাটানো যায় না।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১১০)।

১৭. এ প্রসঙ্গে ফেলু মিঞার প্রতি জাহেদের উক্তি : 'শুনুন ফেলু মামা। দুশো বছরের ইংরেজ শোষণের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য লড়ছি আমরা। সে মুক্তির রূপ অতি স্পষ্ট : দেশের মাটি আমার, দেশের সম্পদ আমার, আমার মুক্তি কোটি কোটি মজলুমের পেটে দেবে অন্ন, গায়ে দেবে বস্ত্র আর মুখে ফোটাবে হাসির ছটা। আমাদের লড়াইয়ের ঘোড়ায় চড়ে আপনার মতো জমিদার তস্য জমিদাররা তখ্‌তে জেঁতে বসবেন সেটি হচ্ছে না কিন্তু।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৩১)।

১৮. 'জমাত তো করতেই হবে। সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দিলে চলবে না।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৩২)।

১৯. 'থাক। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তুমি ভুলে যাও সব; রমজানকেও মাফ করে দাও। সেকান্দরের দিকে চেয়ে বলল ফেলু মিঞা। হাত কচলিয়ে এগিয়ে আসে রমজান। সেও আপস চায়। হ্যাঁ হ্যাঁ সেকান্দর। মিটিয়ে ফেল, এসব ঝগড়া বিবাদ এখন ভুলে যেতে হবে, ওদের কথায় সায় দেয় জাহেদ।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৩৫)।

২০. 'জমাত তো একটা নীতিহীন সুবিধাবাদীদের জোট নয়। তার থাকবে সুস্পষ্ট নীতি। সে নীতি হলো স্বাধীন দেশে আমাদের স্বাধীন বিকাশ আর উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান, তার জন্য সংগ্রাম।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৩২-৩৩)।

২১. 'তুমি আমাকে বোঝাতে চাও, সৈয়দপুত্র তুমি, মাতুল ফেলু মিঞা আর লেকু, ফজর আলী তোমরা সবাই এক সারিতে, এক শ্রেণীতে, বঞ্চিতের দলে, হা হা হা।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৫৫)।

২২. 'খিচিয়ে উঠল জাহেদ : গত বছর মরেছে, তার আগের বছর, তারও আগের বছর, সব সময়ই এরা মরছে। এ বছরও মরবে, সামনের বছরও মরবে। দ্যাট ইজ হোয়াট দে ডিসার্ভ, ইট ডিসার্ভ। নির্বিবাদে মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোন কাজটা করতে পারো তোমরা।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ১৫৪)।

২৩. 'পাকিস্তানের বদৌলতে সৈয়দ সাহেব ধাঁই ধাঁই করে উপরে উঠছেন, আড়াই বছরে তিনটি পদোন্নতি পেয়েছেন। চতুর্থ-পঞ্চম বা তার পরেও যদি উপরে উঠবার জায়গা থাকে সেখানে পৌঁছুবার সুযোগ হয়তো পাবেন একটু ধৈর্য ধরলেই। তবু কেন এত অতৃপ্তি, এত অধৈর্য সৈয়দ সাহেবের?' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৩১৪)।

২৪. 'মাস দুই আগের কথা। হঠাৎ রাতের বেলায় এসেছিল জাহেদ।... রাত বাড়তেই চলে গেছিল। তারপর কিছু লোক ওর খোঁজখবর করে গেছে। সৈয়দগিন্নীর সন্দেহ সরকারের যে দফতরের অন্যতম মাথা সৈয়দ সাহেব স্বয়ং, লোকগুলো সেই স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই। অর্থাৎ সাদা পোশাক পুলিশ। ছেলের কোনো খোঁজ পান না সৈয়দগিন্নী।' (শহীদুল্লা কায়সার, ২০১৭ : ৩১৩-৩১৪)।

২৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : *লালসালু* (১৯৪৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

২৬. সত্যেন সেন : *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৯৬৯), ২০১৭, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস : উত্তর-উপনিবেশবাদী অবলোকন

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালি জাতির জন্য এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিপুল আত্মত্যাগের মহাকাব্য রচনা করেই বাঙালি লাভ করেছে স্বদেশে আত্মকর্তৃত্বের অধিকার। শতাব্দী-পরিব্যাপ্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র ও সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফাঁদে পড়ে ১৯৪৭-এ বাঙালি লাভ করে বিভক্তির স্বাধীনতা; পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্ভুক্ত হয় হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে আর পূর্ববঙ্গ যুক্ত হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র পাকিস্তানে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কেবল শাসক বদল হয়েছে পূর্বতন কলোনিয়াল ব্যবস্থাটিকে অবিকল বহাল রেখে। পুরনো ঔপনিবেশিকতা আরও তীব্রতর হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ নির্ধারিত হওয়ায়। কারণ এই জাতীয়তাবাদেই সংগুপ্ত ছিল পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীকে নিম্নবর্গে পরিণত করার ষড়যন্ত্র। উল্লেখ্য, অবিভক্ত ভারতে অভিজাত হিন্দু-মানসে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী শনাক্ত হয়েছে 'মুসলমান' হিসেবে; এই কল্পিত 'মুসলমানত্বে' বাঙালিত্ব ছিল না। অপরদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির কাছে ঐ জনগোষ্ঠীই শনাক্ত হয় বাঙালি হিসেবে। উভয়ক্ষেত্রেই এই চিহ্নায়নের কেন্দ্রে ছিল পরিচয়-সংকটের ফাঁদে ফেলে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শোষণোপযোগী অধস্তন করে রাখার অভিপ্রায়। দুবারই তারা অভিজাতশ্রেণি-নিরূপিত শনাক্তিকে জোরালো করে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ-সন্ধান করেছে; প্রথমবার মুসলমান পরিচয়ে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে, দ্বিতীয়বার বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অনুকরণে শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণ শুরু করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করে; অজুহাত একটাই––হিন্দুয়ানিপুষ্ট বাংলাভাষা পাকিস্তানের ইসলামি আদর্শের সঙ্গে বেমানান। পূর্ববাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী পরিশোধনযোগ্য––রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তাদেরকে 'অপর' হিসেবে চিহ্নায়নের অকাট্য যুক্তি দাঁড় করানো হয়; আর এ যুক্তিতে অমুসলিম জনগোষ্ঠী 'গভীরতর অপর' হিসেবে পরিগণিত হয়। চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে বৈষম্য চাপিয়ে দেওয়ার এই অপপ্রয়াসের বিপরীতে অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পূর্ববাংলার জনগণ তার হাজার বছর পরিস্রুত ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ে উজ্জীবিত হয়, যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলন। এরপর বৈষম্যসৃষ্টির ক্রমধারায় বাঙালির ওপর শোষণ-দমন-নিপীড়ন যত বেড়েছে ততই শানিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্ববাংলার জনগণের সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষা পরিণতি পায় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সংবিধানে বাংলাদেশের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু অচিরেই মূলনীতিগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং নানান অভিধাকরণ ও কাটাছেঁড়ায় পরিবর্তিতও হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের আধিপত্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটে পড়ে আর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুপ্তচৈতন্যে রক্ষিত 'মুসলমানত্বে'। বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের সংকট কেটেছে বলে ভাবা হলেও অনিঃশেষ বিতর্কের আবর্তে আজও তা অনির্দিষ্ট। কারণ পূর্ববাংলার মুসলমানদের পাকিস্তানি অভিজাতশ্রেণির সীমাহীন তাচ্ছিল্যের প্রতিক্রিয়ায় যে বাঙালি স্বাতন্ত্র্যচেতনার উন্মেষ ঘটেছে তাতে আন্তরিকতাপূর্ণ প্রীতির চেয়ে স্বার্থবোধই ছিল প্রধান। স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থবোধই তাকে মুসলমানত্বে পুনঃপ্ররোচিত করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখেছে যে, রাজনীতি মানে ক্ষমতারোহণের সিঁড়ি; আর ক্ষমতা মানেই সমাজে কর্তৃত্ব করার অবারিত অধিকার, আভিজাত্য ও বিত্তলাভের প্রশস্ত সুযোগ। ঔপনিবেশিক রাজনীতির ঐতিহ্য মেনেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ক্ষমতান্ধ ও স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির ধারক। নিখাঁদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদ

সংখ্যানুপাতে নিতান্তই নগণ্য। এই বৃহদংশ স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থকরণের সুযোগ হিসেবেই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণিত হয়েছে। এর বিপরীতে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকচক্রের শোষণ-পেষণ থেকে মুক্তি অর্জন। গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে দিয়েছিল রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশাপূরণের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। গণমানুষের অপরিসীম সমর্থন ও অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ একটি গণযুদ্ধে পরিণত হয় এবং বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ক্ষমতাসীন হয়েই রাজনীতিবিদেরা গণ-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে সম্পদ-লুণ্ঠন এবং নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার কোন্দলে মেতে ওঠে। ক্ষমতা-সংহতকরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বৈরাচারী মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। সাবেক ঔপনিবেশিক শাসকচক্র পরোক্ষে এই ক্ষমতার ষড়যন্ত্রে শরিক হয়। দেশি-বিদেশি কূটচালে দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের দেশ-গঠনের প্রয়াস বাধাগ্রস্ত হয়, অশুভচক্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে অনেকে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হন, অনেকে সাজানো হত্যাকাণ্ড ও গুপ্তহত্যার শিকার হন। রাজনৈতিক ব্যর্থতার পটে ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের চক্রান্তে শরিক হয় সামরিক বাহিনীও। এক্ষেত্রে তাদের অনুপ্রেরণা ছিল পাকিস্তান আমলের দীর্ঘ সামরিক শাসনের ঐতিহ্য। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর উত্তরাধিকার হিসেবে তারা ছিল পশ্চিমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পশ্চিমা মূল্যবোধলালিত। মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম-সমর্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করলেও মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে তারা পশ্চিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজায় রেখেছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচিয়েছে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের একাংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের সরিয়ে উচ্চপদে নিজেদের প্রতিস্থাপনের আকাঙ্ক্ষায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক না-থাকায় এবং মূল্যবোধগত নৈকট্যের কারণে সাবেক সহকর্মীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে বাধা ছিল না। শোষণ-দমন-পীড়নের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা যে আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিল, পাকিস্তানি শাসন পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো প্রকার পরিমার্জন-পরিশোধন ছাড়াই তা বহাল হয়েছে। প্রভুত্ববাদ ও গোষ্ঠীস্বার্থের বাইরে তাদের ভূমিকা খুবই সীমাবদ্ধ। অভিন্ন স্বার্থবন্ধনে আবদ্ধ দুর্বৃত্ত রাজনীতিবিদ, প্রভুত্ববাদী সামরিক ও বেসামরিক আমলা এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মর্মান্তিক প্রকাশ ঘটে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে এবং এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বরে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্তর্কোন্দলের ভয়াবহতা বোঝা যায় মুশতাকের সরকারে পূর্ববর্তী সরকারের অধিকাংশ সদস্যের যোগদানে। স্বল্পস্থায়ী মুশতাক সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ঘটে সাবেকি মডেলের সামরিক শাসনের। এরপর একযুগের বেশি ব্যাপ্ত সামরিক শাসনের অবসানে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত দুটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন থাকলেও সরকার পরিচালনায় সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে গণমানুষের জন্য একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে। কর্তৃত্ববাদী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রকে আইনের প্রাধান্যবিশিষ্ট একটি জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল অভিপ্রেত। প্রয়োজন ছিল আধুনিক রাষ্ট্রের প্রধান তিন স্তম্ভ––আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে পরস্পরের কাছে দায়বদ্ধ করে তোলা, রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানকে আইনিকাঠামোর ভিত্তিতে সাজিয়ে দায়িত্ব পালনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হয়নি; রাজনীতিবিদদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জুঁতসই হওয়ার কারণেই ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোটি বহাল রয়ে গেছে। অধিকন্তু কতিপয় সংস্কারের মাধ্যমে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের কাছে নিঃশর্ত আনুগত্যে বন্দি করা হয়েছে; রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা প্রধান নির্বাহীর হাতে অর্পিত হয়েছে। নীতিপ্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে শীর্ষনির্বাহীর মুখাপেক্ষী। অথচ স্বাধীন দেশের সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য উল্টোটি হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি হতে হতো গবেষণাভিত্তিক এবং জনমানুষের সম্পৃক্ততায়; আর নিম্নতল থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজটি হতো নির্বাহী বিভাগের সুচারু তত্ত্বাবধানে।

সকল ক্ষমতা এক হাতে মুঠোবন্দি হওয়ায় ব্যক্তিই হয়ে ওঠে সর্বময়, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয় ব্যক্তির ক্রীড়নকে। নির্বাচনী গণতন্ত্রের আধারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দেওয়া রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বকে রাজনীতিবিদেরা অনূদিত করেছে ক্ষমতা হিসেবে এবং সেই ক্ষমতা দ্বারা জনগণকেই পিষ্ট করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এমন এক পাঠ তৈরি করা হয়েছে যেখানে কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃত্বই সকল কৃতিত্বের দাবিদার। জনগণের অপরিমেয় আত্মত্যাগ অস্বীকৃত হয়েছে এই ইতিহাসে, সেই সঙ্গে বিসর্জিত হয়েছে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উপেক্ষিত হয়েছে দেশগঠনে জনগণের সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা। এমন কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি, যা দেশের সুষম উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে। নবীন রাষ্ট্রের অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষিখাত উপেক্ষিত হয়েছে, পুনর্গঠন কর্মসূচির অভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও বিধ্বস্ত হয়েছে। দেশের অর্থনীতি পরিকল্পিত হয়েছে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর স্বার্থ-সংরক্ষণের উপযোগী করে। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবে শিল্পোদ্যোগ বাদ দিয়ে পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে বিদেশি পণ্যের বাজারজাতকরণে। স্থানীয় শিল্পের সীমিত বিকাশ ঘটেছে সস্তা শ্রমনির্ভর পণ্য পশ্চিমে জোগানের প্রয়োজনে। গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রকল্পভিত্তিক এবং রাজধানীকেন্দ্রিক। বিদেশি ঋণে পরিচালিত এসব প্রকল্পের মাধ্যমে রাজধানীর বুকে নির্মাণ করা হয়েছে বিভিন্ন অবকাঠামো এবং এসব প্রকল্প ছিল অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের এক উর্বর ক্ষেত্র। সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির অভাবে দেশে বেকারত্ব বেড়েছে, দারিদ্র্য তীব্রতর হয়েছে; বঞ্চনার গভীরে নিপতিত হয়েছে দেশের অধিকাংশ মানুষ। দেশে কোনো সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন শিক্ষানীতি গড়ে তোলা হয়নি, যার মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। বাংলাদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তা অধিকাংশক্ষেত্রেই পশ্চিমের প্রণোদনায় ও প্রয়োজনে পরিকল্পিত; এর পাঠ্যসূচির অনেকাংশই সৃজনবিমুখ, পরিপ্রেক্ষিত-বর্জিত, জনমূল-বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পশ্চাদ্‌পদ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির আধিপত্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকযুগের চেয়েও দৃঢ় হয়েছে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার প্রকৃত মর্যাদা হয়েছে একান্তই প্রান্তিক। এ যেন ম্যাকলে-র সেই ঐতিহাসিক প্রকল্প—ইংরেজি-জানা ভদ্রলোকগোছের একদল চাকরিজীবী তৈরি, যারা মনেপ্রাণে পশ্চিমের প্রতি মুগ্ধতা পোষণ করবে, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক হবে অনপেয় দূরত্বের, সাধারণ মানুষের প্রতি আচরণ হবে প্রভুত্বব্যঞ্জক ও পীড়নমূলক। জনস্বার্থের চেয়ে স্বার্থপরতাই এই শিক্ষিতশ্রেণির অধিকাংশের কর্মকাণ্ডে প্রাধান্য পেয়েছে। ফলত শোষণ, দুর্বৃত্তায়ন, বৈষম্যে বিস্তীর্ণ সাধারণ মানুষ গহিন প্রান্তিকতায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যা মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসে, বিশেষত রাজনৈতিক উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় উপজীব্য। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, প্রেরণা, যুদ্ধ-সময়ের বীভৎসতা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব, নারী ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ও সক্রিয়তা, যুদ্ধজয়ের আনন্দ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, যুদ্ধ-পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনের প্রয়াস ও ব্যর্থতা, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তির উত্থান ও এর প্রতিক্রিয়া, প্রান্তিক মানুষদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও জীবনসংগ্রাম, স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিকতার পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে এ সময়ের উপন্যাসে। এছাড়া ব্রিটিশ কলোনিশাসিত বাংলা, দেশভাগ ও পাকিস্তান-শাসিত পূর্ববাংলাকে পটভূমি করে এ-সময় উপন্যাস রচিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব ঘটনাপ্রবাহ এই ধরনের উপন্যাসের উপজীব্য হলেও মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে মানুষের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি-ব্যর্থতার অনুরণন হয়েছে কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বর্ণনায়, কখনো রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে। এ নিরিখে এ-পর্বের বাংলাদেশের উপন্যাস হয়েছে উত্তর-উপনিবেশবাদী বীক্ষণের এক প্রশস্ত ময়দান। মুক্তিযুদ্ধোত্তর তিন দশকের পরিসীমায় রচিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১৯৭১-২০০০ সালের মধ্যে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসের উত্তর-উপনিবেশবাদী পর্যালোচনা

জীবন আমার বোন[১]

মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* (১৯৭৬) উপন্যাসের পটভূমি রক্তস্বাক্ষরখচিত মুক্তিযুদ্ধ; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিজয়-গৌরব চিত্রিত হওয়ার বদলে উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে পুঞ্জীভূত অগ্নিবলয়ের এক উৎকেন্দ্রিক তরুণের ব্যক্তিগত বিপন্নতাবোধের কথকতা। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালীন ঢাকা শহরকেন্দ্রিক অসহযোগ আন্দোলন এবং আর্মি ক্র্যাকডাউনের অব্যবহিত পরের ঘটনা পর্যন্ত উত্তাল মার্চের সাতাশ দিনের ঘটনাপ্রবাহ মুখ্যত এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলডুবিতে দুই বোনের মৃত্যুর চৈতন্যশায়িত স্মৃতি আর বৃহৎ বাড়িতে চাকর-বাকর পরিবেষ্টিত ভাই ও তৃতীয় বোনের সংসারযাপনের হার্দ্য-প্রীতিপূর্ণ খণ্ডচিত্র। অসহযোগ আন্দোলনের উন্মাদনায় যখন পুরো ঢাকা শহর উত্তাল, তখন বাইশ বছর বয়সের টগবগে তরুণ খোকা আশ্চর্যজনকভাবে বিবিক্ত, ক্ষেত্রবিশেষে বিরক্ত ও বিরোধিতায় উত্তেজিত। এদিক থেকে 'মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় জাগরণের প্রবল স্বপক্ষের একটি প্রতিপক্ষ' হিসেবে খোকা চিহ্নায়নযোগ্য হলেও উত্তরস্বাধীন বাংলাদেশে অর্ধশতাব্দীবাহিত 'লক্ষ শহিদের রক্তঋণের প্রতি কর্তব্যসাধনে ব্যর্থতার' (ভীষ্মদেব, ২০১৩: ১৭) কার্যকারণ সংকেতিত হয়েছে খোকার স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত রাজনৈতিকচেতনার অভিব্যক্তিতে।

জাহেদুল কবীর ওরফে খোকাকে সঠিক তাৎপর্যে মূল্যায়নের জন্য তার পারিবারিক ও সামাজিক পটভূমি জানাটা গুরুত্বপূর্ণ, যার কিছুটা ছিন্নসূত্রের মতো উপন্যাসের নানা জায়গায় ফুটে উঠেছে, আর কিছুটা সংগুপ্ত রয়েছে উপন্যাসে অনুল্লেখিত পূর্ববাংলায় মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠার ইতিহাসে এবং সেই শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনস্তত্ত্বে। বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের কৃষকসমাজের ভেতর থেকে জন্মলাভ করে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণি, যা বঙ্গভঙ্গ-রদের পরে, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) পর ক্রমস্ফীত হয়ে চল্লিশের দশক নাগাদ একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এই উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবলয়ে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির শতাব্দী-পরিব্যাপ্ত আধিপত্যে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়; আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও চাকরি-বাকরিতে সমান সুযোগ লাভের দাবি উত্থাপন করে। দুই সম্প্রদায়ের উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যকার এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব সময়-পরিক্রমায় গণস্তরের সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়, যা রক্তাক্ত দাঙ্গার পথ পেরিয়ে ১৯৪৭-এ এসে দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তোলে। বাঙালির প্রতি বৈষম্য সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাকরণ অনুসারে এই উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণির একটি ক্ষুদ্রাংশকে নিজেদের ক্ষমতাবলয়ের অংশীদার করে নেয়। তাদেরকে পাকিস্তানের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দিয়ে এবং ব্যবসায়িক সহযোগী হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা হয়। ভোগ্যপণ্যের সহজ যোগানের নিশ্চায়ক প্রতিষ্ঠান নিউ মার্কেটকে মাঝখানে রেখে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার আজিমপুর ও ধানমণ্ডিতে গড়ে তোলা হয় এই স্বল্পায়তন বাঙালি এলিটশ্রেণির সরকারি ও বেসরকারি আবাসন ব্যবস্থা। উপন্যাসের তথ্যানুসারে খোকা ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম প্রায় অভিন্ন সময়ে। এই তথ্য-সূত্রে ভর করে অনুমান করা কষ্টকল্পিত নয় যে, খোকার আমলা-পিতা চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের এক যুবক, যার মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও পাকিস্তান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী বা পরোক্ষ সমর্থক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। উপন্যাসোক্ত তথ্যমতে খোকার পিতা পাকিস্তান সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা; খোকার প্রয়াত মা ছিলেন রেডিয়োর খ্যাতিমান শিল্পী, যা মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতার পরিমণ্ডলে প্রাগ্রসরতা ও পারিবারিক আভিজাত্যের স্মারক। সরকারি কর্মসূত্রে বৈধ-অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে খোকার পিতা ধানমণ্ডির অভিজাত এলাকায় গড়ে তুলেছেন প্রকাণ্ড বাড়ি, সন্তানদের জন্য তৈরি করেছেন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে কর্মরত ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। তবে এ-তথ্যে মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ বিষয়ে তার

অবস্থান সুস্পষ্ট নয়। পাকিস্তানি শাসনামলের বাঙালি উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে পিতার সঞ্চিত অর্থে খোকার নাগরিক জীবন সচ্ছলতাপূর্ণ ও নিরাপদ; তার আড্ডা-সঙ্গীদের মতো তাকে কর্মসন্ধান বা জীবিকার জীবনক্ষয়ী মানসিকচাপ ভোগ করতে হয়নি। হেঁয়ালিপনা, বোহেমীয়তা তাকেই মানায়; বিদ্রূপে, অপমানসূচক বাক্যবাণে অন্যকে ক্ষতবিক্ষত করা তার স্বভাবের অংশ, এমনকি বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও প্রচ্ছন্ন নিম্নবর্গের ছকে বাঁধা। বন্ধু মুরাদের প্রতি ব্যক্তিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষটাও বুনো-হিংস্রতায় ঠাঁসা, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় মুরাদের ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং তার পরিবারের সদস্যদের লক্ষ করে খোকার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে। আর রঞ্জুর প্রতি মুরাদের ভালোবাসার অভিপ্রকাশকে খোকা তার পারিবারিক আভিজাত্যে আঘাতের ঔদ্ধত্য হিসেবেই বিবেচনা করে : 'গাছের একটি ভিজে পাতায় চন্দ্রালোক দ্যাখে মুরাদ, আমি দেখি উদ্যত ফণা, ফলে আছাড় খেয়ে পড়ি দুঃস্বপ্নে।' (পৃ. ১১৩)। বন্ধু মুরাদকে 'চাষা' বলে অপমান কৃষকের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তার অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য সীমাহীন; তাদের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়েও তার আপত্তি তীব্র রকমের : 'ট্যানারি শ্রমিকরা রাজনীতির বোঝেটা কি, গিনিপিগ এক একটা।' (পৃ. ১৭)। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে খোকার সম্পর্কটা যেমন বেশ দূরত্বের এবং উন্নাসিকতায় মোড়ানো, তেমনি স্বশ্রেণির মানুষজন ও স্বজন থেকেও সে বিচ্ছিন্ন; বিচ্ছিন্ন দেশকাল ও রাজনীতি থেকেও। একাত্তরের মার্চে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধিকারের দাবিতে 'মিছিলে-শ্লোগানে আর গানে-গর্জনে মুখরিত', তখন খোকা আশ্চর্যজনকভাবে নির্লিপ্ত; তার মনে হয়, 'এইসব ভজকট ব্যাপারে নিরর্থক অপচয়িত না হয়ে বরং শিথিল আলসেমির ভিতর ডুবে থাকা ঢের ভালো, অন্তত নিরাপদ তো বটেই।' (পৃ. ১৭)। প্রচণ্ড রাজনীতি-বিমুখতার কারণে 'একজন শিক্ষিত নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে তার পুরাপুরি ধারণা থাকলেও ভোটার লিস্টে সে তার নাম তোলে নি।' (পৃ. ১৪)। তার রাজনীতি ও গণআন্দোলন বিমুখতার কারণ হিসেবে অনেক সমালোচক অতলতলাশ্রয়ী চৈতন্যে প্রোথিত জলডুবিতে দুই সহোদরা অঞ্জু-মঞ্জুর বেদনাবহ মৃত্যুর স্মৃতি-অনুষঙ্গ প্রভাবিত মনোবৈকল্যকে চিহ্নিত করেছেন। এই তাৎপর্যবাহী চিহ্নায়নের পাশাপাশি আরেকটি কারণ হতে পারে পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর সবচেয়ে সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের অংশ হিসেবে শাসকশ্রেণির প্রতি তার সুবিধাভোগের কৃতজ্ঞতা এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার দায়বদ্ধতা। হয়তো মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বভাবসুলভ দোদুল্যমানতা ও বিভ্রান্তি তার নিষ্ক্রিয়তার হেতু হতে পারে। তবে সমকালীন রাজনীতি ও দেশকাল সম্পর্কে তার অন্তর্গত ভাবনা ও চিন্তাসূত্রসমূহকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্‌কালে গণআন্দোলনে খোকার নিষ্ক্রিয়তাকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও পাকিস্তানপ্রীতি হিসেবে শনাক্ত করা কঠিন। উপন্যাসে খোকা তার 'জনান্তিক' (ভীষ্মদেব, ২০১৩: ১৯) অবস্থান থেকেই অনুভব করেছে বাঙালি জাতির রণোন্মত্ত জাগরণের উন্মাদনা, তার সুষুপ্ত চেতনাতলেও লেগেছে অগ্নিবলয়ের আঁচ : 'প্রতিটি রাজপথই এখন ভয়ানকভাবে পদপিষ্ট। মুহুর্মুহু বজ্র-নির্ঘোষে উপর্যুপরি কেঁপে উঠছে সবকিছু, কাছেপিঠে কোথাও কোনো এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি শতবর্ষ পর রুদ্ররোষে উদ্‌গিরিত হচ্ছে, ভস্মাচ্ছাদনে মুড়ে দিয়েছে চিৎপাত শহরকে; সংহারপিপাসু উত্তুঙ্গ অগ্নিময় লাভাস্রোতে ধীর অথচ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসরমান।' (পৃ. ৪৩)। আপাতনিরীহ গণমানুষ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যচেতনায় উজ্জীবিত হলে কত শক্তিধর ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে তাও খোকা উপলব্ধি করেছে গভীরভাবে : 'এতোদিন তার চোখে যা ছিলো সামান্য মানুষ, এখন তা সংগঠিত অবিচ্ছিন্ন মিছিলে। খোকা শিউরে উঠলো, এতোদিন তার কাছে যা ছিলো দয়িতা যামিনী মদিরার মতো তিন অক্ষরের হালকা পালকে মোড়া পাখির মতো নিছক একটি রোগা শব্দ, এখন তা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়েছে শহরময়, জনতা!' (পৃ. ৪৪)। গণমানুষের অদম্য শক্তি ও স্বাধীনতার যৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা তার মর্মমূলে ঝড় তুলেছে; পাকিস্তানি শাসকচক্রকে সে স্বৈরতান্ত্রিক শোষক ও আগ্রাসী শক্তি হিসেবেই বিবেচনা করেছে এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করার বিধ্বংসী আয়োজনকে সে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তার মন্তব্যে : 'জাহাজ বোঝাই সৈন্য চট্টগ্রামের দিকে ছুটে আসছে, বেলুচিস্তানে ঈদের জামাতের ওপর বোমা দাগানো কসাই টিক্কা খান আসছে নতুন লাট-বাহাদুর হয়ে...।' (পৃ. ১৪)। বাঙালির ওপর শোষণ-দমন-পীড়ন চালানোর ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকরা যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের যথার্থ উত্তরসূরি-– খোকার এ-উপলব্ধি অনুরণিত হয়েছে বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসনের তেইশ

বছরকে দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনামলে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে : 'যে দেশ রক্ত দাও রক্ত দাও বলে বলে দুশো বছর ধরে চিৎকার করে চলেছে আমাদের কেউ নয় সে, দেশমাতৃকা তুই নস!' (পৃ. ৭৮)। যে ধর্মীয় রজ্জুতে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানে বেঁধে রাখার লক্ষ্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রাংশ মুক্তিযুদ্ধবিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, উপন্যাসের কোথাও খোকার সেই মতাদর্শের প্রতি মুগ্ধতা ও পক্ষপাতের চিহ্নমাত্র নেই। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নায়ক আসাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এবং তার আত্মত্যাগের প্রতি সহমর্মিতা খোকার রাজনৈতিক সচেতনতা ও মতাদর্শের পক্ষে ইঙ্গিতবহ। তাহলে রাজনীতি ও দেশ বিষয়ে তার অপার নির্লিপ্ততা এবং ক্ষণে ক্ষণে বিরোধিতার উৎসে সক্রিয় অন্য কোনো কারণ। উপন্যাসের বর্ণিত নানা টুকরো থেকে আমরা অবগত হই, খোকার বিচরণ বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে এবং বিভিন্ন আড্ডায় তার ভূমিকা দেশকাল, রাজনীতি বিষয়ে বৌদ্ধিক বিতার্কিকের। তার পঠনপাঠন ব্যাপক, দেশকালের ভূগোল পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রসারিত। সুবিস্তৃত পঠনপাঠন ও পর্যবেক্ষণে সূক্ষ্মদর্শিতার কারণেই তার রাজনীতিচিন্তা ও দেশভাবনা প্রচল ছকের বাইরে ইতিহাসের তলশায়ী বস্তুনিষ্ঠতায় পরিস্রুত এবং ভবিষ্যৎদর্শী। বলাবাহুল্য, উপন্যাসটির রচনাকাল বিবেচনায় খোকার রাজনৈতিকচিন্তাকে ভবিষ্যৎদর্শী বলার অবকাশ নেই; কারণ মুক্তিযুদ্ধ ইতোমধ্যেই বিগত এবং স্বাধীন বাংলাদেশে গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। ঔপন্যাসিক স্বপ্নভঙ্গের বেদনার পটে দাঁড়িয়ে অদূর-অতীতে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে খোকাকে সৃষ্টি করেছেন; হয়তো বা খোকার বীক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজস্বভাবনার একটি যৌক্তিক ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ১৯৭১-এর উত্তাল মার্চের বাংলাদেশে সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যের ভেতরে খোকার সত্যান্বেষী দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে অসংখ্য স্বার্থের ভয়ংকর বিনাশী শক্তির দাপট। দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের পর সিকি শতাব্দীর পাকিস্তানি শাসনে জনগণের অবশিষ্ট প্রাণশক্তিটুকুও নিঃশেষিত। এ অবস্থায় অনাহার-অশিক্ষা-দারিদ্র্যে জীর্ণশীর্ণ জনগণের কাছে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল অস্তিত্বরক্ষার দায়। বিপরীতে পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি-সমৃদ্ধির প্রবাহকে নিশ্চিত করতে পূর্ববাংলার সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব বজায় রাখাটা ছিল অপরিহার্য। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণের উর্বরক্ষেত্র পূর্ববাংলায় দখলদারিত্ব বজায় রাখতে বাঙালিকে রক্তসাগরে ভাসিয়ে দিতেও ছিল বেপরোয়া। আর স্বাধিকার অর্জনের জন্য রক্তখচিত সংগ্রামই বাঙালির সামনে ছিলো অবিকল্প পথ। কিন্তু রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে খোকা একদিকে বীতস্পৃহ, অন্যদিকে গণমানুষের মুক্তির প্রশ্নে ছিল সংশয়ী। তার এ সংশয় দানা বাঁধে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর জটাজূটজাল হিসাবনিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে। জাতীয় জাগরণের তুঙ্গমুহূর্তে নিম্নবর্গের অশিক্ষিত মানুষেরা স্বাধীনতার স্বপ্নে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নিঃস্বার্থভাবে সক্রিয় হলেও এ-সংগ্রামের মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা ছিলো অসচেতন, স্বাধীনতার মর্মার্থ অনুধাবনে অক্ষম অথবা বিভ্রান্ত। স্বাধীনতা বিষয়ে নিম্নবর্গের মানুষের সারল্যপ্রণোদিত নির্বুদ্ধিতা খোকার পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গৃহপরিচারিকা ময়নার বাবার কথাসূত্রে : 'আল্লাহ করুক, জয়বাংলা যদি হয়েই যায় তাহলে আর মেয়েটাকে ঝিগিরি করায় কে।' (পৃ. ৪৬)। স্বাধীনতাকে ঘিরে সাধারণ জনগণের এই ধরনের কর্তব্যরহিত স্বয়ংক্রিয় দারিদ্র্যমুক্তির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা বিষয়ে খোকাকে সংশয়িত করে। অন্যদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষাও গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যেই বলয়িত। তাদের কাছে স্বাধীনতার মানে হলো আত্মপ্রতিষ্ঠার অপার সম্ভাবনা, নানান নৈতিক-অনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অবারিত সুযোগ। জনগণের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার ভিতেই গড়ে উঠেছে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাঁরা মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণির জন্ম ও বিকাশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রযোজনায় এবং প্রয়োজনে। ঐতিহ্যগতভাবেই তাঁরা জনমূলবিচ্ছিন্ন এবং স্বার্থবোধতাড়িত; তাদের চিন্তা-ভাবনা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীস্বার্থে আচ্ছন্ন। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসনের অধীনে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হলে এই মধ্যবিত্তশ্রেণিই রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হয়। গণমানুষের মুক্তির প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে রাজনীতি করলেও সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের বলয়ের বাইরে তাঁরা যেতে পারেননি। গোষ্ঠীস্বার্থের প্রণোদনায়ই রাজনৈতিক নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বন্দি হয়েছেন। চিন্তার কূপমণ্ডুকতা ও সৃজনশীলতার অভাবে থিসিস-এন্টিথিসিসের বৃত্ত ভেঙে সিনথেসিসের

সর্বজনীনতায় খুব কম সংখ্যক রাজনীতিবিদ উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছেন। ফলত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমপর্বে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও রক্তাক্ত দাঙ্গা হয়ে ওঠে রাজনীতির মূল নিয়ামক। এই অপরাজনীতির পরম্পরায় মুসলমান রাজনীতিবিদেরা শোষণমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়ে শোষণজর্জর, দারিদ্র্যপীড়িত মুসলমান জনগোষ্ঠীকে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্ররোচিত করে। এই ক্লেদাক্ত রাজনীতির রক্তাক্ত পথেই ভারতবর্ষ অর্জন করেছে দ্বিধাবিভক্ত স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে আবেগপীড়িত জনগণ বেহিসাবি রক্ত দিয়েছে, কিন্তু রক্তখচিত পথে তাদের জীবনে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। ঔপনিবেশিক মূল্যবোধপুষ্ট রাজনীতিবিদদের স্বার্থান্ধ দুর্বৃত্তপনায় অঙ্কুরেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে গণমানুষের শোষণ-লাঞ্ছনামুক্ত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা; বিশেষত পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোতে পূর্ববাংলার গণমানুষের জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে পূর্বতন ঔপনিবেশিক পরাধীনতা। এ যেন খোকার কাছে জলডুবিতে স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই দুই বোনের অপমৃত্যুর মতোই চৈতন্য চূর্ণ-করা ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্বপ্নভঙ্গের বেদনার পটে দাঁড়িয়ে পূর্ববাংলার মানুষকে আবারও শুরু করতে হয় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ভাঙার সংগ্রাম। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিপরীতে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯); এবারেও রাজনৈতিক নেতৃত্বে মধ্যবিত্তশ্রেণি। লক্ষণীয়, উপন্যাসে পরিবেশিত তথ্যানুসারে নবগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী মুসলিম লীগ ও খোকার জন্ম অভিন্ন দেশকাল-সময়পটে; দুয়েরই একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতিসত্তা ও সাধারণ বাঙালির অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধস জয়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে এই জয় ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৫৫ সালের দলীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বাঙালির সর্বজনীন দল হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু করে, কিন্তু ১৯৫৭ সালের কাগমারি সম্মেলনে এ-যাত্রা হোঁচট খায়। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মতাদর্শিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বামপন্থি নেতাদের নিয়ে গড়ে তোলেন নতুন রাজনৈতিক দল ন্যাপ। এই বিভক্তি বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছিল এক প্রবল ধাক্কা। এই ঘটনার অনতিকাল পরেই হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন ঘটে এবং আইয়ুবি স্বৈরতন্ত্র বাঙালির ওপর চেপে বসে। খোকা-রঞ্জুর মধ্যবর্তী দুই বোন অঞ্জু-মঞ্জুর জন্ম হয় এই সময়ে এবং উপন্যাসোক্ত সূত্র মতে ঘটনাকাল বিবেচনায় আইয়ুবি স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার সময়েই জলডুবিতে অঞ্জু-মঞ্জুর করুণ মৃত্যু ঘটে। হয়তো অবচেতনভাবেই ঔপন্যাসিক অঞ্জু-মঞ্জুর ট্র্যাজিক পরিণতির সঙ্গে বাঙালির জাতীয় বিপর্যয়কে গেঁথে দিয়েছেন। খোকার অনুধ্যানী দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বার্থপরতা ও কদর্য আশা-আকাঙ্ক্ষার মহামারি সূক্ষ্মরূপে ধরা পড়ে। খোকা নিজেও মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলের মানুষ, তবে মধ্যবিত্তীয় স্বার্থচিন্তা থেকে উত্তরণের একটি প্রয়াস তার রয়েছে। এর প্রমাণ মেলে নীলাভাবীর সঙ্গে দেহজ সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার অনুশোচনাবোধ ও সেই প্রলোভন থেকে তার মুক্তি অর্জনের প্রয়াসে। একাত্তরের মার্চের প্রমত্ত গণআন্দোলনের পটে খোকা বিস্ময়করভাবে নিষ্ক্রিয় থাকলেও তার ভেতর-সত্তায় প্রবল ভাংচুর ঘটে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তার আত্মভাবনায় : 'একটা শোরগোল ক্রমশ জোরালো হয়ে অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে বাতাসে। খোকা কান পাতলো, দ্রুত ফুঁসে উঠছে হৈহল্লা, একটা মিছিল রায়ের বাজারের দিক থেকে ক্রুদ্ধ অজগরের মতো এঁকেবেঁকে সদর রাস্তায় উঠে ই.পি.আর-এর দিকে এগিয়ে চলেছে; কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে ঢাকা শহর, কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষ, কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে লোহার রড, কালো পতাকা, বর্শা, তরোয়াল, বৈঠা, কোদাল, শাবল, কাঁধে নিয়েছে যে যা পেরেছে। কি দ্রুত বদলে যাচ্ছে যাবতীয় দৃশ্যপট, বদলে যাচ্ছে মানুষের মুখের আদল, দ্রুত, দ্রুত, দ্রুত এবং ধাবমান, গ্লেসিয়ারের মতো ধাবমান; দুর্মদ মৃত্যুর মতো দরগলমান গ্লেসিয়ার। মানুষ! মানুষ! মানুষ আর মানুষ! ... বাঁধভাঙা বন্যার তুমুল জলস্রোতের মতো অবিরাম অবিশ্রান্ত মানুষ; শস্যক্ষেত খামার উইঢিবি বাঁশঝাড় সাঁকো শহর-বন্দর-গণিকালয় সবকিছু সেই অপ্রতিরোধ্য জলরাশির বিমর্দিত তোড়ের মুখে অকাতরে ভেসে চলেছে। এ কোন্ নূহের প্লাবন, ভিতরে ভিতরে খোকা টাল খায়, তার মাথা দপদপ করে।' (পৃ. ১৬)। স্পষ্টতই

দেখা যায়, খোকা তার শ্রেণি-মানসিকতার সঙ্গে দ্বৈরথে লিপ্ত; কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ দোদুল্যমানতা ত্যাগ করে সে শেষপর্যন্ত জনারণ্যে ভিড় করেনি। খোকার বীক্ষণবিন্দুতে পাকিস্তানের 'ধর্ম আর রাজনীতি ব্যবসার রাঘব-বোয়ালরা ভেজাল ওষুধের কারবারি কিংবা পচা মাছ বিক্রেতার চেয়েও জাতে নিকৃষ্ট।' (পৃ. ১৭)। প্রায় সিকি শতাব্দীর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক নেতৃত্বেও খোকা প্রত্যক্ষ করে বিচিত্র স্বার্থের জটাজূটজাল। রাজনীতিবিদদের কুহকবিস্তারী বক্তৃতামালায় যে প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা তৈরি হয়, খোকার পর্যবেক্ষণে তা ফাঁপা-বুলিসর্বস্ব, বৈদগ্ধ্যশূন্য ও উদ্দেশ্যরহিত; অর্থাৎ অশুভ স্বার্থপরতায় মোড়ানো। এমনকি যাঁরা গণতন্ত্র, শ্রেণিসংগ্রাম, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অথবা প্রগতিশীলতার ধ্বজা ওড়ান তাদের মধ্যেও খোকা প্রত্যক্ষ করে অসদুদ্দেশ্য ও সুবিধাবাদ : 'প্রগতিশীল অথবা বামপন্থী গণমান্যদের অনেকেই এখন ইন্টারকনের লোলুপ নিভৃতে বসে কাটিশার্কব্যালেন্টাইনের মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে দূর থেকে নমস্কার করে স্কটল্যান্ডকে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পুঁজি, মুনাফা শ্রেণিসংগ্রাম, রিয়েলিটি, গণতন্ত্রের গ্যাঁড়াকল, নিও হ-য, আলট্রা ব-র-ল, এসবও যথারীতি মোচড় মেরে স্থান পায়, এবং পিঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো অতি সহজে সিল্‌ক খুলে ফেলে মেয়েদের—রাত যখন গভীর হয় কিংবা দিন যখন রাত্রিকালের গভীরতম প্রদেশ বলে ভ্রম হয়; অর্থাৎ বামাপন্থী হওয়াই সব কথার শেষ কথা।' (পৃ. ১৮)। এ-অবস্থায় উন্মত্ত জনতার অপরিমেয় রক্তের বিনিময়ে উপনিবেশ-মুক্তি ঘটতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের চাপে এবং স্থির আদর্শের অভাবের কারণে খোকার শানিতবোধে তা আরেকটি অধরা-স্বপ্নের সংকীর্ণ রন্ধ্রপথে প্রবেশ : 'কাচের একটি বিশাল স্বচ্ছ গোলাকার চিমনির ভিতর মাছির মতো বারবার পিনপিন ক'রে ঘুরতে থাকে এইসব স্বপ্ন।' (পৃ. ৯৪)। বন্ধু মুরাদ যখন গণআন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত, তখন খোকা এই আশাবাদের আসন্ন বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় বিক্ষুব্ধ : 'দেশ দেশ করে চাষার মতো অমন চিৎকার জুড়েছিস কেন? দেশ বলতে কি বুঝিস তুই? একটা আধপাতা বয়সের ছোকরা, কতটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে তোর? ... নিজের বেকারত্ব নিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে এখন হঠাৎ দেশ দেশ করে পাগল হয়ে উঠেছিস, আমাদের ময়নার বাপ যেমনভাবে বলে জয়বাংলা কায়েম হলেই আর কাজ করতে হবে না তার মেয়েকে! এটা আর কিছু নয়, ক্লাস পাবার জন্য হেডস্যারদের ঝাঁকামুটে সাজা যেমন, বিজ্ঞাপনের টাকা মারার জন্যে সঙ্কলন বের করা যেমন, ঠিক তেমনি একটা কিছু! দেশের তুই কি বুঝিস?' (পৃ. ৫৪)। মুরাদ একাত্তরের রক্তপটে দেশের 'পরিবর্তন' প্রত্যাশা করে, মুরাদের সঙ্গে বিতর্কসূত্রে আমরা দেখি, খোকার আকাঙ্ক্ষা অনেক দূরপ্রসারী—'রূপান্তরের' (দ্র. পৃ. ৯৫-৯৯); অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এমন বাংলাদেশ তার প্রার্থিত, যা জনজীবনকে ভেতর থেকে বদলে দেবে, গণমানুষের মুক্তি ও মনুষ্যত্বকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে খোকা অনুভব করেছে আত্মসুখসর্বস্ব ও সংকীর্ণচেতা রাজনৈতিক নেতৃত্বে তার কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাই স্বাধীনতার জন্য 'রাজনীতির খোকা'র রক্তত্যাগী আহ্বানে সাড়া দেয়নি উপন্যাসের খোকা; বরং উত্তাল মার্চের রক্তপটে রক্ত না-দেওয়ার বিরুদ্ধ-প্রতিজ্ঞায় উপনীত : 'দেব না! ... যে দেশ রক্ত দাও রক্ত দাও বলে বলে দুশো বছর ধরে চিৎকার করে চলেছে আমাদের কেউ নয় সে, দেশমাতৃকা তুই নস! যে দেশ কেবল জন্মান্ধ রাক্ষস প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রকে তোড়ের মুখে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ভূরিভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করে হাঙরকে, তোকে বিশ্বাস নেই, দেশমাতৃকা তুই নস!' (পৃ. ৭৮)। উল্লেখ্য, ঔপন্যাসিক রক্তপাতের কালিমালিপ্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে উন্মূলিত হয়েছেন শৈশবের স্মৃতিময় বাস্তুভূমি বারাসত থেকে; তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসনের ব্যক্তিগত সংরক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন রাজনৈতিক রক্তারক্তির নিরর্থকতা। লেখক তাঁর মানসপুত্র খোকার মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত করেছেন তাঁর রক্তজর্জর রাজনীতির হানাহানি-বিরোধী অভীপ্সা। খোকা রক্ত দিতে না চাইলেও পাকিস্তানি শাসকচক্রের সঙ্গে অনিবার্য যুদ্ধে পূর্ববাংলায় ইতিহাসের ভয়াবহতম রক্তপাত ঘটে; আর সমুদ্রতুল্য রক্তের বিনিময়ে বাঙালি অর্জন করে নেয় আরাধ্য স্বাধীনতা। কিন্তু খোকার আশঙ্কাকে সমূলক করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশ প্রবেশ করে দুর্বৃত্তায়ন ও লুণ্ঠনতন্ত্রের নতুন যুগে। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা অভ্যন্তরীণ লুটেরাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী শত্রু। ক্ষমতাবলয়ে লুকিয়ে-থাকা শোষকচক্রকে বঙ্গবন্ধু নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি; বরং নিজেকেই সরে যেতে হয় সপরিবার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থান্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় বাংলাদেশের জমিনে।

বাংলাদেশ পুনরায় প্রবেশ করে সাবেকি সমরতন্ত্রে, বাংলাদেশ পরিণত হয় দেশীয় স্বার্থান্ধগোষ্ঠীর অবাধ শোষণক্ষেত্রে। মুক্তিযুদ্ধ মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলো, কোনো সমাজ-বিপ্লব তো ঘটাতেই পারলো না, এমনকি ক্ষমতাও ধরে রাখতে পারলো না। নিজেদের স্বার্থান্ধ অন্তর্কলহে অচিরেই নেমে এলো সেনা-শাসন, ধর্মনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো বাংলাদেশ। এটা তো পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি পাকিস্তানে আইয়ুবি সেনাশাসন প্রতিষ্ঠার পুনর্মঞ্চায়ন; বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি। ভাষা আন্দোলনের বিজয় দেখতে না দেখতেই নেতাদের মধ্যে শুরু হয় অন্তর্কলহ; আর এই আত্মঘাতী কলহের সুযোগ কাজে লাগিয়ে চেপে বসে সামরিক স্বৈরশাসন। এ ঘটনা ভাষা আন্দোলনে গড়ে ওঠা শক্তি দুর্গ রক্ষায় বাঙালি মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়া নেতৃত্বের ভয়াবহ ব্যর্থতা। অঞ্জু-মঞ্জুর মৃত্যু খোকার অন্তর্চৈতন্যে জন্ম দিয়েছিলো বেদনাবিহ্বল বিপন্নতাবোধ; আর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিকতায় তাড়া খাওয়া 'একলক্ষ চল্লিশ হাজার পায়ের তলায় পড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে' রঞ্জুর মৃত্যু খোকার বেঁচে থাকাকেই নিরবলম্ব করেছে। তারপরেও খোকা বেঁচে থাকে, তাকে বেঁচে থাকতে হয়, মুক্তিযুদ্ধে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে কোটি জনতা যেমন বেঁচে থাকে। এই ট্র্যাজিক পটেই খোকা তৈরি করে নেয় দেশের সংজ্ঞার্থ : 'দেশ তাহলে একটা পুকুর। অঞ্জু মঞ্জুর মতো এর নিস্তরঙ্গ নিথর তলদেশে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে রঞ্জু।' (পৃ. ১৫৮)। এই দেশ খোকার কাঙ্ক্ষিত নয়, কাঙ্ক্ষিত নয় খোকার স্রষ্টা ঔপন্যাসিকেরও। কারণ এই ঔপন্যাসিক সেই প্রজন্মের মানুষ, যাঁরা পেয়েছিলেন দু-দুটি স্বাধীনতার স্বাদ—সাতচল্লিশ ও একাত্তর; এবং যাঁকে প্রথমবারের স্বাধীনতার স্বাদ নিতে হতে হয়েছে দেশান্তরিত; কিন্তু কোনো স্বাধীনতাকেই তিনি মুক্তি ভাবতে পারেননি। ক্রান্তদর্শী মাহমুদুল হক খোকাকে দিয়ে উন্মোচিত করেন গণমানুষের অমিত সাহসিকতা ও তুলনাহীন আত্মত্যাগে অর্জিত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে আশাভঙ্গের শেকড়ের খবর। খোকার ভাবালুতা-বর্জিত নির্মোহ আত্মসমীক্ষায় উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধের মহাযজ্ঞে নিজের জড়ত্ব, বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীস্বার্থের বৃত্তের বাইরে সর্বজনীন কল্যাণবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যর্থতা এবং তার পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের গভীরে নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনার অপমৃত্যুর বৃত্তান্ত। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে খোকা গড়ে তোলে স্বতন্ত্র বয়ান; মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে করতেই তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে ফলময় করার গূঢ় মন্ত্র। আর তা হলো—বুর্জোয়া-মধ্যবিত্তই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাণস্পন্দন; তাঁদের কর্মকাণ্ডেই নির্ধারিত হবে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের গতিধারা। অপেক্ষা শুধু কূপমণ্ডুকতা ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থের সীমা পেরিয়ে জনগণের সর্বজনীন কল্যাণে তাঁদের সৃজনশীল, নীতিনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনে আত্মনিবেদনের। এ উপন্যাসে খোকার ভূমিকা উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তকের, যার চিন্তায় উন্মোচিত হয়েছে উত্তর-উপনিবেশী রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ও ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বন্দি থাকার অন্তর্গূঢ় কারণ।

অরণ্যানী[২]

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ছিল মূলত সম্পদ-মোক্ষণের শাসন। ভাবাদর্শিক কারণেই উপনিবেশকেরা অরণ্য-সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয় এবং এই লক্ষ্যে প্রবর্তন করে 'অরণ্য আইন' (১৮৭৮)। এ আইনে অরণ্যকে 'সংরক্ষিত' ও 'সুরক্ষিত'—এই দুই বর্গে ভাগ করা হয়। সংরক্ষিত অরণ্যের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় অধিকার একচ্ছত্র হয়। আর সুরক্ষিত অরণ্যে বিশেষ বিশেষ গাছ কাটা নিষিদ্ধ হলেও অরণ্যবাসী মানুষদের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পশু চরানোর অধিকার এবং অন্যান্য সম্পদ আহরণের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। এভাবে শতাব্দী পরম্পরায় চলে-আসা অরণ্যের ওপর অরণ্যচারী মানুষদের অধিকার হয় রহিত অথবা রাষ্ট্রীয় আদেশনামার নিয়ন্ত্রণাধীন। অরণ্য-সম্পদে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপক সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয় 'অরণ্য বিভাগ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। অরণ্য বিভাগের দায়িত্ব ছিল টেকসই উপায়ে অরণ্যসম্পদ নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুরক্ষিত অরণ্যকে সংরক্ষিত অরণ্যে রূপান্তর করার ক্ষমতা এ সংস্থার হাতে পুঞ্জীভূত ছিল এবং তার অহরহ প্রয়োগ হতো। অরণ্যে আবাদি কৃষির সম্প্রসারণই ছিল

তাদের মূল লক্ষ্য। 'অনাবাদি কিন্তু আবাদযোগ্য' জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসাকে তারা সংজ্ঞায়িত করেছে 'সভ্যতার অগ্রগতি' হিসেবে; অরণ্য-বিনাশের মাধ্যমে কৃষির সম্প্রসারণকে প্রচার করেছে 'প্রগতির আখ্যান' বলে। ঔপনিবেশিক সরকারি মহল অরণ্যচারী যাযাবর-প্রকৃতির জনগোষ্ঠীকে স্থিতিশীল ঘরোয়া রূপদানে ও কৃষকায়নের প্রয়াস চালায়। সুস্থিত কৃষিবসতিকে প্রসারিত করার লক্ষ্য ছিল ভূমি-রাজস্ব এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়িয়ে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত বজায় রাখা, যার গুরুত্ব ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের মৌলিক কাঠামোগুলোর পক্ষে ছিল অপরিসীম। স্থিতিশীল ঘরোয়া রূপটাকে আরও এক কারণে মূল্য দেওয়া হতো যে, ওই জীবন বেশি শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং তাকে সামলানো অনেক সহজ। অরণ্য-আইনে স্বাধীনচেতা, স্বাতন্ত্র্যচেতন অরণ্য-মানবগোষ্ঠীকে বংশানুক্রমিকভাবে বর্বর, স্বভাব-অপরাধী উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের কঠোর ব্যবস্থা হিসেবে জারি করেছে 'অপরাধী উপজাতি আইন' (১৮৭১)। যদিও এ আইন তৈরি হয়েছিলো ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৪-৫৫) অনেক পরে প্রাকৃতজনের স্বার্থ ধামাচাপা দেওয়ার অপকৌশল হিসেবে, তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আইনটি ছিল চরম নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং আইনের গঠনটাই ছিল এমন যে, দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনভঙ্গের জন্য আরণ্যক মানুষদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসন একেবারে নির্লজ্জভাবে অত্যাচারী ছিল। তবে অভিনব বাক্-চাতুর্যে আইনগুলোর নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার দিকসমূহ আড়াল করেছে এবং 'আধুনিকতা' ও 'উন্নয়ন' নামক প্রলোভনের অভেদ্য ফাঁদে ফেলে আরণ্যক প্রাকৃতজনদের বশীভূত করেছে।

বনমহালের জন্য জায়গা অধিগ্রহণের সময় উপনিবেশকেরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামনে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অরণ্য-উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবনকে নিরাপদ ও উন্নত করার স্বপ্ন ঝুলিয়েছে। শ্রমিক হওয়ার নিশ্চয়তায় অল্পে-তুষ্ট, সরল-চিত্ত অরণ্য-জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় ও প্রফুল্লচিত্তে নিজের বাস্তু-ভিটার অধিকার ত্যাগ করেছে। এভাবে মনোরম প্রতারণার মাধ্যমে উপনিবেশকদের কয়েকটি উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে––এক. সহযোজনের মাধ্যমে অরণ্যে রাষ্ট্রীয় তথা বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণকে অপ্রতিহত করে তোলা; দুই. অরণ্য-বাগিচার জন্য বশংবদ একটি শ্রমিক-ভাণ্ডার গড়ে তোলা; এবং তিন. আরণ্যক জনগোষ্ঠীর বিপুল সস্তাশ্রমকে নিজেদের মুনাফায় নিয়োগ করা। অল্প কিছু নিষ্কর ভূমির বিনিময়ে তাদের নিয়োগ করা হতো বেগার শ্রমিক হিসেবে। এই বেগার শ্রমিকদেরকে আবার বাধ্য করা হতো অরণ্যবিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের গৃহ-দাসত্বে। অরণ্যনীতির অধীনে অরণ্য-বাগিচাগুলো হয়ে উঠত সাহেবদের মৃগয়াক্ষেত্র। এই আরণ্যক-শ্রমিকদেরই ব্যবহার করা হতো শিকারের 'বিট' আর সাহেবদের ফূর্তির বন্দোবস্ত করার জন্য। এক্ষেত্রে উপনিবেশক শাসন করতো উপনিবেশের অভ্যন্তরীণ সহায়তা আর প্রভুত্ব-কাঠামোর ওপর নির্ভর করে। একবার বনমহালের খোঁয়াড়ে ঢুকানো সম্ভব হলে 'আদিম', 'পশ্চাদ্‌পদ', 'পুরুষানুক্রমিক অপরাধী' এই সব ছাপ্পা লাগিয়ে অরণ্য-জনতাকে বশে রাখার নিষ্ঠুর আইনগুলো ঘুমন্ত দৈত্যের মতো জেগে উঠতো। এভাবে আরণ্যক সরলতার পরিবেশে বেড়ে-উঠা তথাকথিত সভ্য-জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন শিকার-খাদ্যসংগ্রহজীবী প্রান্তিক নৃ-গোষ্ঠীর ওপর অরণ্য আইনের উৎপীড়ক চেহারাটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অরণ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশের বিপরীতে গোষ্ঠীসমাজের অধিকারকে ঘিরে অরণ্যবাসীদের অসংখ্য আন্দোলনের উদয় হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসে বনকর্তন করে বনভূমিকে আবাদ ও বসতিযোগ্য ভূমিতে রূপান্তরের কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে, আমাদের আলোচ্য অজয় ভট্টাচার্যের *অরণ্যানী* (১৯৮৩) উপন্যাসটিও ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতির অভিঘাতে অরণ্যবাসী ত্রিপুর নৃগোষ্ঠীর জীবনে ঘনীভূত অস্তিত্ব-সংকট এবং তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত। উল্লেখ্য, ঔপন্যাসিক 'অজয় ভট্টাচার্য (১৯১৪-৯৯) বৃহত্তর সিলেট জেলায় সংঘটিত ঐতিহাসিক নানকার-বিদ্রোহের (১৯৪৭-৪৮) যুগপৎ সংগঠক, নেতা ও ঐতিহাসিক। ... সর্বত্যাগী এই কমিউনিস্ট নেতার জীবনযাপনা ও আদর্শ তাঁর অনুসারীদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয়। ত্যাগী ও নির্যাতিত জীবনের নানা ঘটনা জীবদ্দশাতেই তাঁকে এক কিংবদন্তির নায়কে পরিণত করেছিল।' (ভীষ্মদেব, ২০২১: ২৪১)। তাঁর রাজনৈতিক জীবনাদর্শ ও অভীপ্সার প্রতিফলন এই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় উপজীব্য।

লুসাই পাহাড়ের পাদদেশের অগম্য বনাঞ্চলের গভীরে ছোট ছোট কুটিরে শতাব্দী পরম্পরায় বসবাস করে আসছে ত্রিপুর-কৌমের জনতা। বুনো জন্তু-জানোয়ার আর প্রকৃতির বৈরিতার সঙ্গে লড়াই করেই তাদের জীবন-যাপন। জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই তারা সাহসী ও কর্মঠ; তবে এই প্রাকৃত মানুষেরা স্বভাবে প্রকৃতির মতোই কোমল। এরা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রমত্ত বীর : 'বিপদে ত্রিপুরেরা ধৈর্য ধরে, অসীম সাহসে বুক বেঁধে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।' (পৃ. ১২)। পাথুরে পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে তারা কর্ষণযোগ্য করে তোলে কঠোর নিষ্ঠায়; প্রমত্ত পশুকে বাগে আনে বীরত্বব্যঞ্জক শিকার-চাতুর্যে। এরা দক্ষ-শিকারি এবং শিকারের উপকরণগুলোও তাদের হস্তনির্মিত। কারণে-অকারণে তারা পূর্ব-বসতি ত্যাগ করে অন্য কোনো অগম্য বনাঞ্চলে রচনা করে নতুন নীড়। অরণ্যের যে-কোনো প্রান্তেই থাকুক, তারা পরস্পরের আত্মার আত্মীয় : 'এমন মহারণ্যে যারা বংশানুক্রমিক বাস করে, দূরে হোক, কাছে হোক, তারা কেউ কারো অনাত্মীয় নয়।' (পৃ. ৩৩)। অরণ্যচারী এই কৌম জনগোষ্ঠী প্রকৃতির মতোই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীনচেতা। লোলজিহ্ব ঔপনিবেশিক শক্তির আসুরিক হাত বিস্তৃত হয়েছে এই দুর্গম আরণ্যক জনপদ পর্যন্ত; তছনছ করে দিয়েছে তারা ত্রিপুর-কৌমের শান্ত নির্বিবাদ জীবনকে।

ত্রিপুর কৌমের বৈশিষ্ট্যানুসারেই *অরণ্যানী*-র কেন্দ্রীয় চরিত্র লক্ষ্মণ তার স্ত্রী সাবিত্রীসমেত পূর্ব-বাস্তু ত্যাগ করে গহিন অরণ্যে আবাস গাড়ে। 'গাছ উপড়িয়ে, পাথর টেনে অমানুষিক শ্রমের বিনিময়ে' (পৃ. ১০) তারা গড়ে তোলে কৃষি-খামার। জন্তু-জানোয়ার, বিশেষত বন্য শুকর আর মত্ত হাতির তাণ্ডবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসীম ধৈর্যে তারা এ গভীর অরণ্যে নিজেদের শেকড় গাড়ে, রচনা করে স্বপ্নরঙিন সুখের নীড়। কিন্তু মত্ত হাতির হিংসাত্মক আক্রমণে প্রাণরক্ষার্থে তারা দুই বছরের অনিঃশেষ শ্রমে গড়ে তোলা নতুন আবাস ছেড়ে ছুটে চলে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। পরিণতিতে সেই অনির্দিষ্ট গন্তব্যটাই নির্দিষ্টতা পায় 'বেগার পল্লী'তে। পথ-চিহ্নহীন বনপথ পেরিয়ে তারা প্রথমে পৌঁছোয় এক ত্রিপুর পল্লিতে। এখানে এসে তারা এই অরণ্যের এক প্রান্তে সরকারি আওতায় এক নতুন পল্লি গড়ে ওঠার সংবাদ জানতে পায় : 'সরকারী বন-মহালকে আরো ভালো করার উদ্দেশ্যে মহালের অগম্য অংশে সরকার এক নতুন পল্লী গড়ে তুলবে। গভীর বনের প্রান্তে পাহাড়ী নদীর ভাটিতে এ পল্লীর স্থান নাকি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। সরকার প্রচার করছে, যারা কর্মহীন, অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়হীন এই পল্লীতে তারা ঠাঁই নিতে পারবে।... সরকারী পরিভাষায় এ পল্লীকে 'বেগার পল্লী' বলা হয়।' (পৃ. ৩৪)। এই ধরনের পল্লিতে সরকারি আইনটা খুব কড়া এবং বেগার খাটা বাধ্যতামূলক, তবুও ক্ষ্যাপা হাতি আর জন্তু-জানোয়ারের উৎপাত না-থাকায় তারা সানন্দে রাজি হয় সেখানে বসতি স্থাপনে : 'বেগারী হোক, রোজগারী হোক, খাটুনি ত খাটুনিই। লক্ষ্মণ কবে খাটুনি থেকে রেহাই পেতে চাইলো? তার সবল পেশী যদ্দিন সবল থাকবে তদ্দিন সে খাটুনিকে ভয় করবে না। কেবল ঘরের শান্তিটা বজায় থাকলেই হল, হাসিমুখে সারাদিন একটানা খেটে যেতে পারবে, মুখে টুঁ শব্দটা করবে না।' (পৃ. ৩৫)। আসলে ঔপনিবেশিক শাসন এবং এর অরণ্য-আইন সম্পর্কে শাসন-কেন্দ্র থেকে বহুদূরবর্তী 'আজন্ম বনবাসী' মানুষদের ন্যূনতম ধারণা ছিল না এবং তা জানার প্রয়োজনও তারা কখনো মনে করেনি : 'তারা আজন্ম বনবাসী। বন ছাড়া তাদের আর কোনো জগত নেই। জীবনে মরণে জীবন ধারণে বনই তাদের সর্বস্ব। বনের আইন ভিন্ন, কানুন ভিন্ন, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাও এখানে ভিন্ন। সরকারী আইনের নির্ধারিত নির্দিষ্ট পথে তা কখনো গা বাঁচিয়ে চলে না। এখানকার জীবনের সাথে ঐ আইন-কানুনের কোনো সঙ্গতি নেই, কোনো সামঞ্জস্য নেই—ভিন্নতা এখানে সর্বত্রই। ... কোথায় কে রাজা হল, কে রাজত্ব নিল, এখানে কেউ তা কোন দিন শোনে না। কোথায় কোন্ আইন হল, কোন্ আইন পাল্টাল, তাও কেউ জানে না। তাই এমন কোন কথার ফাঁকে ভাবনা তাদের ঘুরে মরতে শিখেনি। তারা জানে জগৎটা আগে যেমন ছিল আজো ঠিক তেমনই আছে। আর চিরদিন এমনই থাকবে। রাজা, রাজ্য, রাজ্যের বিধি-বিধান, কিছু কোনদিন বদলাবে বলে তারা মনে করে না। ত্রিপুর জাতির উৎপত্তি থেকে রাজা তাদের ত্রিপুরার মহারাজা, এই তাদের জানা কথা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারটা যুগই তাদের ত্রিপুরার মহারাজার রাজত্বে কেটেছে, তারা বলে। ... ত্রিপুরেরা যেখানেই থাক, রাজ্য সেটা যাই হোক, ত্রিপুরার মহারাজার নামোচ্চারণে যুক্ত কর ললাটে ঠেকিয়ে এ সত্য প্রকাশ করতে তারা কুণ্ঠা বোধ করে না।' (পৃ. ৩৯)।

'অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না'—একসময় ঔপনিবেশিক প্রলয় তাদের জীবনেও নেমে আসে ভয়ংকররূপে। এই বনবাসী মানুষদের সরলতা ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে নিশ্চেতনার সুযোগেই ঔপনিবেশিক ধূর্ত শাসকেরা ঢুকে পড়ে তাদের অরণ্যে ঘেরা শান্ত নিরিবিলি জীবনে; কায়েম করে এমন এক শাসনব্যবস্থা, যার সম্পদ-লিপ্সু আগ্রাসী স্বরূপ বোঝার ক্ষমতা নির্লোভ অরণ্যবাসী কৌমজনতার ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসকদের অনুপ্রবেশটা ঘটে বেশ মোলায়েম রূপে; নিরাপদ আশ্রয়দাতার ভূমিকায়। *অরণ্যানী*-তে অরণ্য আইনের প্রতারক-চিত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠতায় :

> 'সরকারী বনমহালের জন্যে সরকার একেবারেই সোজা করেই আইন তৈরি করেছে।... এ আইনে লেখাজোখার কোন প্রয়োজন নেই প্রজা পত্তনে। পত্তনী জমির হিসাব-নিকাশও নিষ্প্রয়োজন। বনমহালের প্রয়োজন বাঁচিয়ে বেগারদের জন্যে যে জমিটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, বেগারদের ভোগদখল কেবল তার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকলেই যথেষ্ট। তারপর কে কোথায় চাষ করল, বাস করল, বনমহালের তাতে কী? সরকারী আইনে লেখা জোখা, হিসাব-নিকাশ তাই একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে আরো অনেক কিছু। জমির জন্য কর, খাজনা, সেলামী, সুদ, আবওয়াব, ভেট, উপঢৌকন, সবই বাদ পড়েছে এ আইনে। বনমহালে চাষবাসের জন্য এমন কোন উশুল তহশিলের ব্যবস্থা নেই সরকারের। এখানে অন্য ব্যবস্থা। এই অন্য ব্যবস্থায়, জমি-জমা ভোগ-দখলের জন্য যাদের কোন কর দিতে হয় না তারা কায়িক শ্রমের জন্যও কোন পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে না। জমির মালিক সরকার, অর্থাৎ বনমহালের প্রয়োজনে তাদের মজুরী ছাড়াই মজুর খেটে যেতে হবে। এই ব্যবস্থা অস্বীকার করলে কাউকে জমি দখল করে থাকতে দেওয়া হবে না। মুখের কথায় যারা বসেছে মুখের কথায়ই তাদের উঠে যেতে হবে। সোজা আইন, একেবারেই সোজা। সোজা মানুষের জন্য সরকার বনমহালে এমন সোজা আইনটা তৈরি করে রেখেছে। বনমহালের আইনে আরো আছে, এমন আইন ছাড়া বনের সমৃদ্ধি নাকি অক্ষুণ্ন থাকে না। বনের মাটিতে মানুষ বেড়ে উঠলে বন বুঝি আর বন থাকে না। তাই মানুষ নয়, বনকেই এখানে বাড়তে দিতে হবে। আইনে আছে, বনের প্রয়োজন হলে মানুষকে জমি ছেড়ে দিতে হবে। বনের কাজ শেষ হয়ে গেলে, যারা প্রাণপাত পরিশ্রমে বনকে গড়ে তুলেছে তাদের বাস্তু ছেড়ে সরে যেতে হবে। বন এসে সেই বাস্তু-জমি গ্রাস করবে। এ জমিতে একমাত্র বন ছাড়া আর কেউ স্বত্ব-স্বামিত্ব দাবি করতে পারবে না। বনের আইনে মানুষের দাবি অগ্রাহ্য, বন্যতাই কেবল গ্রাহ্য।' (পৃ. ৪০-৪২)।

আপাত নিরীহ এই ভয়ানক আইনের মারপ্যাঁচে অরণ্য-মানবেরা 'বনের উদ্বৃত্তে' পরিণত হয় এবং বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'বনে বনে, গভীর থেকে গভীর বনে ঘুরে ঘুরে' উদ্বাস্তু জীবনযাপনে বাধ্য হয়। ঔপনিবেশিক শাসকের অনুগ্রহে এই ভাসমান মানুষেরা আত্মপ্রতিষ্ঠার গভীর আকাঙ্ক্ষায় বনমহালে বাস্তু গাড়ে ক্রীতদাস হিসেবে। নীড়সন্ধানী লক্ষ্মণ ও সাবিত্রীও ঔপনিবেশিক আইনের পাতা ফাঁদ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে একটুকরো জমির খোঁজে ছুটে যায় বনমহালে এবং সানন্দে বরণ করে বেগারত্ব। একটুকরো 'অনূঢ়া কুমারী' জমিতে চলে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার উন্মাদ খাটুনি। তাদের অক্লান্ত শ্রমে একসময় জমিতে পাকা ধান হেসে ওঠে, সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ্মণ-সাবিত্রীদের শ্রম-ক্লান্ত মুখে। কিন্তু আপাত আনন্দের পেছনেই ওত-পাতা জন্তুর মতো অপেক্ষা করছিল ভয়াবহ বিপর্যয়। লক্ষ্মণের ডাক পড়ে বনমহালে; দুজনের কর্মক্ষেত্র পৃথক হয়ে যায়। জমিতে যৌথ-খাটুনিটা একপর্যায়ে সাবিত্রীর একক কাঁধে বর্তায়। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহ নিয়ে ঘরে ফিরে তারা অকাতরে ঘুমায়, কখনো বা লক্ষ্মণের ঘরেই ফেরা হয় না। সময়ের প্রবহমানতায় তাদের ছন্দবদ্ধ জীবনে ঘটে ছন্দপতন; তাদের হার্দিক দাম্পত্য-সম্পর্কটা পরিণত হয় সম্পর্কহীন সম্পর্কে। লক্ষ্মণদের হাড়ভাঙা শ্রমে একসময় বুনো বন হয়ে ওঠে পরিপাটি বাগিচা; পড়ো বন হয়ে ওঠে 'পয়সার মাল'। এ বনে বেগাররা 'বিনে পয়সার কারবারী'; তবু নিজের শ্রম-সার্থকতায় লক্ষ্মণের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। কিন্তু এই সার্থকতার পথ বেয়ে তাদের জীবনে নেমে আসে মহাবিপর্যয়; বেগার বন-শ্রমিক থেকে তাদের অবনমন ঘটে গৃহদাসে। মর্যাদার এই অবনমনের রেখাটি ঔপন্যাসিক এঁকেছেন নিপুণ বস্তুনিষ্ঠতায় : 'অগম্য বন আজ দ্বার খুলে দিয়েছে। যার খুশি সে ই আসে, আসে সবাই। আসে বড় সাহেব, আসে মেজো সাহেব, আসে সেজো সাহেব, ছোট সাহেবরা। ... যেখান থেকে যেই আসুক, বেগারদের তাদের পেছনে ছুটে যেতে হয়।... বছর দুই একটানা কাজের পর বনের বিন্যাস যখন কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে তখন বেগারদের এমন ছুটে বেড়াবার কাজটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সাহেবদের মুখে কথাটা বেরুবার সাথে সাথে তাদের ছুটে যেতে হয়, তার জন্য আগে থেকে তৈরি থাকতে হয়। অথচ কখন কী হুকুম হবে এক মুহূর্ত আগেও তা বুঝবার উপায় নেই। জগতে যে এমন ধারার কাজ আছে বনমহালের বেগার পল্লীতে বসতি নেবার আগে

বেগারদের অনুমান করার সাধ্য ছিল না।' (পৃ. ৪৬-৪৭)। বেগার-শ্রমে বনকর্তাদের মনোরঞ্জন করতে করতে লক্ষ্মণ হাঁপিয়ে ওঠে; অতীত মুক্ত-জীবনের স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়া তাকে হাতছানি দেয়। লক্ষ্মণের মনে যখন মুক্ত বিহঙ্গ-সত্তা দানা বাঁধছিল, তখনই তার ডাক আসে বনকর্তাদের গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার। সাহেবদের বাসায় কাজ করা––অলিখিত হলেও অতিপুরনো এবং বেগারদের জন্য অবশ্যমান্য আইন। এটা ছিল বেগার-দাসত্বের চরম পর্যায়। বনমহালের দপ্তরে এসে আজন্ম বনবাসী লক্ষ্মণ প্রথম মুখোমুখি হয় আধুনিক সভ্যজগতের এবং সেখানেই তার কাছে প্রতারক সভ্যজগতের বীভৎস রূপটি উন্মোচিত হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনপ্রকল্পে অরণ্যবাসী মানুষদেরকে বিবেচনা করা হয়েছে 'দূর প্রান্তবর্তী জংলি উপজাতি' ভাবকল্পে। ইউরোপীয় সাদা সাহেবদের অনুকরণে স্থানীয় সাহেব-মেমসাহেবরাও প্রান্তিক আরণ্যক মানুষদেরকে 'বুনো জানোয়ার', 'বন-ভূত' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করে। এভাবে পশুবর্গে ফেলে মানসিকভাবে ভেঙেচুরে দিয়ে তাদের মনের গহিনে হীনম্মন্যতা চাড়িয়ে দেওয়া হয়। মানুষ হিসেবে তার আত্মবিশ্বাসে ধস নামে এবং সভ্যজগতের স্বেচ্ছা-দাসত্বে বন্দি হয়। আর কেউ যদি অবাধ্যতা করে, তাহলে তার ওপর পশুসুলভ নির্যাতন চালানোটা এই চিহ্নায়নে বৈধ হয়ে যায়। গৃহকর্মী চয়নে বড়কর্তা রমেশের ছিল অগ্রাধিকার এবং তার সন্ধানী দৃষ্টি পড়ে শক্ত-সমর্থ লক্ষ্মণের ওপর। কিন্তু প্রথম দর্শনেই লক্ষ্মণের প্রতি মেমসাহেব শশীতারার অভিব্যক্তি ছিল, 'দেখতে ত একেবারে মোষের মত'। অরণ্যবীর লক্ষ্মণের কাছে এ ছিল নতুন অভিজ্ঞতা; এই সম্বোধনে সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। ক্রমাগত অপমান-অবহেলায় সে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং তার স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা লোপ পায়। অরণ্য আর আরণ্যক মানুষদের ওপর তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ শশীতারা উগড়ে দিতে থাকে লক্ষ্মণের ওপর এবং একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাকে বিতাড়নে। এ অবস্থায় লক্ষ্মণকে বড়কর্তার শহর-যাত্রার সঙ্গী হতে হয়। আলো ঝলমলে শহরকে তার মনে হয় 'অসংখ্য সাহেবের অরণ্য'। (পৃ. ৭৭)। এই অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে মনিবকে খুঁজতে খুঁজতে যখন সে দিশেহারা, তখন সে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। অরণ্য আইনে তো প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীকে স্বভাব-অপরাধী হিসেবে আগেই মার্কা দিয়ে রেখেছে। তাই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে পুলিশ তৎপর হয় লক্ষ্মণের চৌদ্দ পুরুষের খবর বের করায়। কিন্তু আকস্মিকতায় বিমূঢ় পুলিশের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না লক্ষ্মণ। ফলত তাকে পুলিশের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বনমহালে ও শহরে––সভ্যজগতের হাতে নির্যাতনের নির্মম অভিজ্ঞতা তাকে প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের চেতনায় উজ্জীবিত করে। বনমহালের সভ্যজগৎ ছেড়ে লক্ষ্মণ প্রত্যাবর্তন করে সাবিত্রীর কাছে, বনমহালের নিভৃত কুটিরে। লক্ষ্মণের এই গৃহ-প্রত্যাবর্তন ছিল বনমহালের এক অভূতপূর্ব ঘটনা এবং ভয়াবহ শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ। শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে পাইক-বরকন্দাজ ছোটে লক্ষ্মণকে বন্দি করতে। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রবল বিক্রম প্রত্যাঘাতে তাদেরকে রক্তাক্ত হয়ে ফিরতে হয়। উদ্ধত বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করা বনমহালের কর্তাদের অবশ্য-করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় থানা-পুলিশ এগিয়ে আসে শান্তি-প্রতিষ্ঠার কাজে। ভয়ংকর অপরাধীকে ধরার সাজ-সাজ আয়োজন চলে। আত্মরক্ষার্থে সে সাবিত্রীকে নিয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায়। আগেরবার সে বাস্তু ত্যাগ করেছিল মত্ত হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে; তার এই দ্বিতীয় বাস্তুত্যাগ তথাকথিত সভ্য মানুষের হিংস্রতা থেকে আত্মরক্ষার্থে। বনমহালের বেগার পল্লি থেকে কেবল লক্ষ্মণ-সাবিত্রীই পলায়ন করেনি, পলায়ন করেছে গোটা বেগার পল্লির সকল বেগার। কিন্তু এই সম্মিলিত পলায়ন গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, প্রবল পরাক্রমশালী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য। এ-পর্যায়ে নবজাগ্রত ত্রিপুর কৌমের যৌথস্বপ্নে খেলা করে প্রতারক ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে হারানো অরণ্যাধিকার পুনরুদ্ধারের অভীপ্সা; স্বভূমে মহিমান্বিত আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। 'উৎসে-ফেরা বেগারপল্লির আরণ্যক জনতা নিজেদের স্বরাজ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে 'কোমর বেঁধে ফিরে দাঁড়ানোর' প্রস্তুতিতে তৎপর হয়ে উঠেছে' (ভীষ্মদেব, ২০২১: ২৫৮):

> 'সাবিত্রী বলে, 'বর্শা কিন্তু আমি বানাতে পারি।'
> লক্ষ্মণ অস্ফুট উচ্চারণ করে, 'তীর, ধনুক, দাও, বর্শা।'
> সাবিত্রী বলে, 'বাঁ হাতে দাও রেখে ডান হাতে বর্শা আমি চালাতে পারি।'

'পারবি, পারবি। পারবি নে কেন? সবই পারবি। তীর, ধনুক, শূল, বর্শা বানাতে আর চালাতে না পারলে বাঁচবি কেমন করে?'

গিরি-গুহায় বসে ধনুকে ছিলে বাঁধে রাম। দময়ন্তি পাথর শানায়।

দশরথ ঝোঁপে ঝোঁপে বর্শাদণ্ড খোঁজে।

রাবণ যুধিষ্ঠির পাথর কুঁড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে পাথরের শক্তি পরীক্ষা করে।

সীতা, নলিনী, যামিনী, কামিনী কেউ আর বসে নেই। তারা কাজ করে। কাজ করে পাথরের স্তূপে স্তূপে। পাথরে তারা পাথর ঘষে। পাথরে পাথর ঘষে আগুনের হল্কা ছড়ায়।...'

সাবিত্রী বলে, 'তারপর।'

'তারপর আমরা বাঁচব।' লক্ষ্মণ বুক ঠুকে জবাব দেয়।

'বাঁচব, বাঁচব, বাঁচব।' যুধিষ্ঠির, দশরথ, রাবণ গলা ছেড়ে চেঁচায়।

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনি ওঠে—বাঁচব। বাঁচব। বাঁচব। চেঁচায় সীতা, দময়ন্তী, নলিনী, যামিনী, কামিনী—'বাঁচতে আমরা তৈরি।'

'আর যদি মরি?' —মনে মনে এ প্রশ্নও যে কেউ তোলে না তা নয়।

'মরব?' নিজে নিজেই আবার তারা জবাব দেয়—'তবে মরেও আমরা বাঁচব। না মরে কারো বাঁচবার এখানে পথ নেই।' এক সাথে জীবন মরণের প্রস্তুতি চলে এ অরণ্যে।' (পৃ. ১২২-২৩)।

আরণ্যক ত্রিপুর কৌম জনগোষ্ঠীর উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হয় পুরাণ খুঁড়ে জেগে ওঠা সংগ্রামী চরিত্র-পাত্ররা। স্থান-কালের সময়মীমা পেরিয়ে এই সংগ্রাম পরিণত হয় শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বিশ্বজনীন মুক্তিসংগ্রামে। ঔপনিবেশিক শাসনবলয়ে বন্দি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষদের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রাম *অরণ্যানী* উপন্যাসে সমমূল্যে অভিব্যঞ্জিত।

দক্ষিণায়ণের দিন–কুলায় কালস্রোত-পূর্বরাত্রি-পূর্বদিন[৩]

শওকত আলীর ট্রিলজি ***দক্ষিণায়ণের দিন–কুলায় কালস্রোত-পূর্বরাত্রি-পূর্বদিন*** (১৯৮৫-৮৬) ১৯৬২-৬৯ সময়পর্বের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর বিচিত্র অসংগতির নৈরাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত-নির্যাতনে বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘনীভূত সংকট এবং তার বিপরীতে বাঙালির স্বাধীন সত্তার উন্মেষ ও মুক্তি-অন্বেষী রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের ইতিহাস নিয়ে রচিত। এই ট্রিলজির কাহিনি-কেন্দ্রে ইতিহাসের শিক্ষার্থী রোকেয়া আহমদ রাখী; আর এই কাহিনিপ্রবাহের টুকরো টুকরো তরঙ্গ-বিক্ষেপ রাশেদ আহমদ, বুলু, মনি, সেজান, হাসান, জামান, মাজহার, পারভীন প্রমুখ। ঔপনিবেশিক শাসন ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গহ্বর থেকে রাখীর নারীসত্তার অন্তঃশীল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যলালিত শোষণ-শাসন এবং এর বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একটি সমগ্রতাস্পর্শী ইতিহাসের পাঠোদ্ধার সম্ভাবিত করেছে। ইতিহাস-অধ্যয়নের প্রথম বর্ষেই রাখীর অন্তর্চৈতন্যে উত্থিত হয়েছিল বাংলার ইতিহাসবিষয়ক মৌলিক প্রশ্ন : 'প্রাচীন বাংলায় নাকি গণতন্ত্র ছিল—মাৎস্যন্যায় বলে যে যুগটাকে চিহ্নিত করা হয়, সেটা নাকি আসলে গণতন্ত্রেরই যুগ?' (পৃ. ২৩)। এই প্রশ্নে 'মাৎস্যন্যায়' ও 'গণতন্ত্র' শব্দ দুটির অভিন্নার্থতায় ষাটের দশকে গণতন্ত্রের শোভন মোড়কে আইয়ুবশাহীর স্বৈরশাসনকবলিত পাকিস্তানের গোজামিলসর্বস্ব নৈরাজ্যের রূপকেই প্রকটিত করে তোলে। পাকিস্তান আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল শোষণ-বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন; কিন্তু জন্মমাত্রই পাকিস্তান পরিণত হয় সামন্ত ও বণিগ্‌বৃত্তিক পুঁজির অবাধ শোষণক্ষেত্রে। পাকিস্তানের ক্ষমতাকাঠামোয় জেঁকে বসে ঔপনিবেশিক শাসকদের ঘনিষ্ঠ মিত্র স্থানীয় সামন্ত অভিজাত ও পুঁজিপতিশ্রেণি। নতুন রাষ্ট্রে সচল থাকে শাসকশ্রেণির স্বার্থসংরক্ষণকাররী ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো; পুরনো প্রতাপে বহাল থাকে ঔপনিবেশিক আমলের বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশেষ সখ্য গড়ে তোলে এবং নিশ্চিত করে মুনাফামত্ত পুঁজিবাদের ধারাবাহিকতা। শোষণ ও ক্ষমতাকে পোক্ত করতে এবং জনরোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে জনবিচ্ছিন্ন শাসকসম্প্রদায় দমন-পীড়ন-নিষ্পেষণের পথ বেছে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী মদদে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভূলুণ্ঠিত হয় এবং স্বৈরতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা

ঘটে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে পাকিস্তান পরিণত হয় কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে অন্তহীন অসংগতির এক হতাশার ভূগোলে। এই আখ্যানে জনগণের অধরা স্বপ্নের প্রতিভূ রাশেদ আহমদ। তিনি জীবনে শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দেখেছেন; এই স্বপ্নের পেছনে বিত্তের প্রাচুর্য বা প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, ছিল গ্লানিহীন, অপমানহীন, পরিচ্ছন্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তিনি চেয়েছেন সন্তানদের উচ্চনৈতিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যও অপরিসীম, তবে এই সাফল্যেই নিহিত ছিল তাঁর সর্বস্ব হারানোর বীজ। নৈতিক-মানবিক উৎকর্ষের কারণেই তাঁর সন্তানেরা আদর্শহীন, নৈতিকতারিক্ত ও বিকারগ্রস্ত স্বার্থান্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে এবং বরণে বাধ্য হয়েছে নিঃস্বপ্ন, নিঃসঙ্গ ও নিঃশেকড় অবস্থায় করুণ পরিণতি। 'জীবন ও রাজনীতি'র মধ্যে সংগতি সাধনে ব্যর্থ হয়ে একমাত্র পুত্র মনির মৃত্যু, স্বামীর বিত্তলোভের কাছে স্বীয় চিত্তবৃত্তির পরাভবে বড় মেয়ে বুলুর উন্মাদ অবস্থায় করুণ মৃত্যু এবং জামানের নীতিবর্জিত স্থূলরুচির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে রাখীর দাম্পত্যসম্পর্ক বিনষ্টির তিনি অসহায় দর্শক। সবকিছুই 'তাঁর আয়ত্তের বাইরে', জীবনের প্রতি সংশয় আর অবিশ্বাস নিয়ে ঘনীভূত ভয়ংকর বিপর্যয়ের জন্য শুধুই নিশ্চেষ্ট অপেক্ষা : 'হ্যাঁ শুধুই অপেক্ষা, বিপর্যয় এসে কখন তাঁকে আঘাত করবে, তারই জন্য অপেক্ষা। হ্যাঁ শুধুই অপেক্ষা, ১৯৬৬ সালে এসেও শুধুই অপেক্ষা।' (পৃ. ১১৫)। পুঁজির দখলদারিত্ব ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সার্বত্রিক আগ্রাসনে বিচূর্ণ হয়েছে রাশেদ সাহেবের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা : 'এই যুগটাই তো টাকার যুগ। যেমন ক'রে হোক, যে ক'রে হোক টাকা চাই মানুষের। মানুষ টাকা চায় শুধু টাকার জন্য, কোনো কিছু বিল্ডআপ করার জন্য নয়। প্রফেসন হিসেবে ব্যবসাকে কেউ নিতে চায় না। কোনোরকম ক্রিয়েটিভ এফোর্ড দেখি না কোথাও – সর্বত্র গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা।... আসলে একটি ঠিকাদারি সোসাইটি গড়ে উঠেছে এ দেশে। ব্যবসা, ইন্ডাস্ট্রি, চাকরি – সর্বত্রই ঐ ঠিকেদারি মনোভাব দেখা যাচ্ছে। শর্টকাট পথে বড় হবার পাগলামিতে পেয়ে বসেছে সবাইকে।' (পৃ. ৩৪)। স্বার্থান্ধ রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ববাংলার সর্বত্র গড়ে উঠেছে শোষণ-লুঠপাটের সংস্কৃতি এবং সর্বত্র পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের আধিপত্য। উপনিবেশায়নের পুরনো কৌশলে পূর্ববাংলার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশকে জুড়ে নেয় পাকিস্তানি মুৎসুদ্দি পুঁজির সক্রিয় কর্মকাণ্ডে। স্বৈর বন্দি-মুহূর্তের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পটে আত্মোন্নতিকামী মধ্যবিত্ত তার সকল প্রকার ন্যায়বোধ ও শ্রেয়োচিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিবেকহীন লোভ ও আত্মসর্বস্বতায় মগ্ন হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণির মূল্যবোধহীন উচ্চাভিলাষ ও স্বার্থপরতা এবং ঠিকাদারি পুঁজির বিকারগ্রস্ত স্ফীতির দৃষ্টান্ত হাসান। বিত্তবৈভব ও জৌলুস অর্জনের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে স্ত্রীকে ব্যবসায়িক পার্টনারের শয্যাসঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করে এবং অবশেষে বিবেকহীনভাবে পরিত্যাগ করে। প্রতারণা ও চক্রান্তের পঙ্কিল পথে হেঁটে সে 'অনেক দূর আর অনেক ওপরে চলে এসেছে'। (পৃ. ২১৪)। ছয়-দফার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশ নাম দিয়ে শেখ মুজিবের নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের প্রচারে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিরা ব্যবসা গুটিয়ে নিতে চাইলে বহিরাগত আধিপত্যের বাইরে আরও বিস্তৃত সাফল্যের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসানের 'ছয়-দফার প্রস্তাবটা ভালই লেগে' যায় (পৃ. ২১৫) এবং রাজনীতিতে যোগ দিয়ে অচিরেই বনে যায় 'আওয়ামী লীগের ওপর দিককার নেতা'। (পৃ. ২৯৯)।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে মানুষের মুক্ত বিকাশের পথ ছিল অবরুদ্ধ; স্বাধীন চিন্তা ও পেশাচয়নের স্বাধীনতা ছিল সুদূর-পরাহত। পূর্ববাংলাকে বন্দি করা হয়েছিল কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থার ঘেরাটোপে। এই শিক্ষা ছিল উদ্দেশ্যরহিত ও হতাশা উদ্রেককারী। উপন্যাসে রাখী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভ্রান্ত। পেশা হিসেবে সে বেছে নেয় অধীত বিষয় 'ইতিহাসে'র সঙ্গে সম্পর্কহীন 'ওভারসীজ এজেন্সী'র হিসাব বিভাগে। রাশেদ সাহেবের মন্তব্যে বিম্বিত হয়েছে এই শিক্ষার ব্যর্থতা : 'লেখাপড়া শিখলে, ইতিহাস জানলে, কিন্তু তোমার সেই লেখাপড়াটা কোনো কাজে লাগাতে পারলে না।' (পৃ. ৬১)। এখানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতায় নিয়ন্ত্রিত ও নিরুৎসাহিত। এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এমন এক শিক্ষিতশ্রেণি জন্ম নিয়েছে যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বহীন, দ্বিচারী ও অবিকশিত চিন্তার খণ্ডিত মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক জামানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ক্লীবত্ব ও বন্ধ্যাত্বের

দিক। 'বাজে রকমের ঈর্ষা, প্রচণ্ড লোভ, গোপন লাম্পট্য আর মনের বিশ্রী নীচতা'-র (পৃ. ২৭৪) সমন্বয়ে জামান এক সুবিধা-শিকারী, পরাশ্রয়ী ও অনুকম্পাকামী কাপুরুষ। জামান ক্যারিয়ার-সর্বস্ব মানুষ; আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তার ভূমিকা নির্লজ্জ দালালি ও বিশ্বাসঘাতকতার। তার কাছে স্ত্রী মানে শরীরী ভোগের বস্তু আর সন্তান মানে বাজে খরচ ও ক্যারিয়ারের পথে 'ফ্যাসাদ'।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল্যবোধলালিত এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণিই ছিল বাঙালির উপনিবেশমুক্তি ও অধিকার আদায়ের রাজনীতির কেন্দ্রভাগে। কিন্তু তাদের চিন্তা ছিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের সংকীর্ণ বলয়ে আবর্তিত; ভোগবাদ, সুবিধাবাদ, ক্ষমতালিপ্সা, আধিপত্য ও প্রাচুর্যের প্রতি মোহ-আকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল উপজীব্য। ক্ষুদ্রস্বার্থের বৃত্ত অতিক্রম করে সমগ্র মানুষের কল্যাণ করার ঔদার্য ও মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে তারা ছিল ব্যর্থ। এই নেতৃত্বকামী শিক্ষিতগোষ্ঠীই ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত; ষাটের দশকের বাঙালির জাতীয়তাবাদী, বামপন্থি বা পাকিস্তানপন্থি রাজনীতির এরাই হর্তাকর্তা। জনগণের শোষণমুক্তি নয়, শোষণ-দণ্ডটা নিজের মুঠোয় নেয়াটাই ছিল রাজনীতিকদের মূল অভিপ্রায়। রাখীর স্বগতচৈতন্যের ভাবনারাশিতে বিম্বিত হয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্বাধীন রাজনীতির নৈরাজ্যের চিত্র : 'সময়টা ১৯৬৭ সাল হলেও উত্তরবঙ্গের সুদূর উত্তরে এই মহকুমা শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে পানি নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই। মেয়েদের স্কুলটা পুরনো। কিন্তু মেয়েদের কলেজের বয়স মাত্র বছর পাঁচেক। বড় জোতদাররাই হর্তাকর্তা। ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকেদারী, ডাক্তারী ওকালতি– এসব তাদেরই ব্যাপার। রাজনীতিতে তারাই সর্বত্র। ড্রামাটিক ক্লাব আছে, স্পোর্টস ক্লাব আছে, লাইব্রেরি আছে–সর্বত্রই ঐ একই মাতব্বরি। নিজেদের এলাকার মান রাখবার জন্য কলেজ করা হয়েছে। সেই একই উদ্দেশ্যে মেয়েদের এই কলেজটারও সম্ভবত আরম্ভ। ভাবখানা এইরকম যে নতুন কিছু হোক, শহর হোক, আধুনিকও হোক– কিন্তু সবই থাকবে আমাদের হাতে। সেজন্য মিলাদ মাহফিলে আমরাই টুপি মাথায় ওয়াজে সামিল হবো, আবার নাটকেও সাজ-পোশাক পরে রঙ মেখে আমরাই অভিনয় করবো। মুসলিম লীগ আমরা হবো, আমরাই আওয়ামী লীগ করবো আবার আমরাই জামাতে ইসলামীও করবো।' (পৃ. ২৩৪)।

এই সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতেই প্রায় মুঠোবন্দি ছিল পূর্ববাংলার বামপন্থি রাজনীতিও। বাঙালি মার্কসবাদী নেতারা ছিলেন ঐতিহ্যগত ক্ষমতা-কাঠামোরই মানুষ। বিশ্বগণমুক্তির চেতনা নিয়ে তারা সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকচেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ভারতের স্বাধীনতা বা উপনিবেশমুক্তির আন্দোলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতো কমিউনিস্ট পার্টিও যেমন আবদ্ধ ছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠীস্বার্থের প্রচ্ছন্ন মোড়কে, ষাটের দশকে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও একইভাবে সামন্তবাদ ও সাম্প্রদায়িক-মনস্কতায় বন্দি। ফলত, জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল দলগুলোর পাকিস্তানি স্বৈরশাসনবিরোধী রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচিও ছিল অভিন্ন ধাঁচের। উপন্যাসে এর প্রতিফলন ঘটেছে কমরেড সফিউদ্দিনের উক্তিতে : 'আপনাদের রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা বোধগম্য নয়। আসলে আপনারা মানুষের সঙ্গে সেই ভাবেই কমুনিকেট করতে চান, যেভাবে অন্য পার্টির লোকেরা করে। এলেন দু চারজন চেনা জানা বড় গেরস্থের বাড়ি অতিথি হলেন, মাতবর ব্যক্তিদের ডাকলেন-বোঝালেন––ব্যস পার্টি হয়ে গেল আপনাদের, আপনারা চলেও গেলেন। সাধারণ মানুষের কথা অবিশ্যি আপনারা বলেন, কিন্তু ঐ রকম সমস্যার কথা তো অন্য পার্টির লোকেরাও আজকাল বলে। আপনারা কৃষকের কথা বলেন কিন্তু কৃষিজীবন সম্পর্কে কি আপনারা ভালভাবে জানেন? গরু চুরি হয়ে যাওয়া যে ছেলেমেয়ে চুরি হয়ে যাওয়ার চাইতেও ভয়াবহ ব্যাপার সেটা বোঝেন আপনারা?' (পৃ. ২৬২)। মনের গহিন চৈতন্যে সক্রিয় স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণেই মার্কসবাদী তত্ত্বকে গভীর বিশ্বাসে আত্মস্থ এবং এতে সমর্পিত হতে পারেনি শহুরে নেতারা; 'মধ্যবিত্তের আঙিনা ছেড়ে' (পৃ. ২৬১) মনেপ্রাণে হতে পারেনি শ্রেণিহীন বা সর্বহারা, গণমানুষের সঙ্গে স্থাপন করতে পারেনি আন্তরিক যোগাযোগ। দলের আঞ্চলিক নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল ক্ষমতা-কেন্দ্রে যাওয়ার সারথি জোতদার-মহাজনদের হাতে। তৃণমূল মানুষের সঙ্গে শহুরে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এই আঞ্চলিক নেতাদের কাছে ছিল অনভিপ্রেত। প্রগতিশীল রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে বাধা এবং শোষণবিরোধী গণবিপ্লব নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিহতকরণের দুরভিসন্ধিই ছিল জোতদার-মহাজনদের বামপন্থি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার মূল কারণ। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের মতো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটিকে

টিকিয়ে রাখাটাই ছিল মধ্যবর্তী রাজনীতিকদের অভিপ্রায়; ঔপনিবেশিক-কাঠামোর যেকোনো ধরনের পরিবর্তন ছিল তাদের স্বার্থবিরোধী। প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শকে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতার, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় শিবনাথ রায়ের উক্তিতে : 'আমার মতো একজন জোতদার আপনাদের পার্টির মেম্বার। আমি আমার প্রজাদের নিয়ে সমর্থন জানালাম আপনাদের। আপনারা খুব ভালো মানুষ, ভালো ভালো আইনও বানালেন। কিন্তু সেই আইন খাটাবে কারা? আমরাই তো? নাকি আমার প্রজা আসবে আমার ওপর আইন খাটাতে? বলুন, তাই কি হয় কখনো? ধরলাম, থানা পুলিশ সরকারি কর্মচারীদের ঐ আইন চালু করতে বলা হলো। করবে ওরা, বলুন? ওরা সব আমারই খায় আমারই পরে–– ওরা কেন উল্টা-পাল্টা কাজ করে নিজেদের জন্যে অসুবিধা সৃষ্টি করবে? আমরা যেমন, ওরাও তেমনই চাইবে যেমন যেমন নিয়ম-কানুন আছে, তেমনই থাকুক। ওসব ঘাঁটাঘাঁটি করে ঝামেলা বাড়াতে গেলে মেলা ঝামেলা। সুতরাং পার্টি যতই চেষ্টা করুক––আইন-কানুন পুরনোই থেকে যাবে।' (পৃ. ২৬১)। প্রগতিশীল দলগুলোর রাজধানীকেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন বৃহত্তর গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো ছিল তত্ত্বসর্বস্ব, পরিপ্রেক্ষিতবর্জিত ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, কপটতা ও মিথ্যাচারিতাদুষ্ট। নেতাদের প্রতারণাপূর্ণ বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত ও বিদীর্ণ হচ্ছিল মনির মতো একনিষ্ঠ কর্মীরা : ' '৫৭ সালের দিকে সন্দেহটা প্রথম জাগে।... ধারণা দেওয়া হয়েছিল, অসাধারণ পার্টির ক্ষমতা––গ্রামে গ্রামে সেল তৈরি হয়ে আছে––কর্মীরা সব তৈরি, শুধু ডাক দেবার অপেক্ষা, একবার ডাক দিলেই বিপ্লব আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেলো '৫৮ সালের আয়ুবী হামলাতেই পার্টির কর্মীরা আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। '৫৭ সালে যে-দল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, সেই দলের সঙ্গে নাকি সহযোগিতা করে যেতে হবে। প্রশ্ন করা হলো, কেন? তো তার কোনো জবাব নেই। বলা হলো, ওপরের নির্দেশ––নেতৃত্বে বিশ্বাস করো––নেতারা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন––আপাতত সহযোগিতাই করা দরকার প্রথমে। ... '৬২-তে সে ছাত্রফ্রন্টের সঙ্গে ছিল, আন্দোলন যখন তুঙ্গে আপোষকামীরা সরকারের সঙ্গে আপোষের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো। জানানো হলো, আপাতত আপোষই হোক, ঐ আপোষকামীদের দলের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে হবে। ... মনি প্রশ্ন তুলেছিল, যারা আপোষ করবে, তাদের সঙ্গে মিলে আন্দোলনে যাওয়া কেন? সেবারও ঐ একই জবাব শোনা গিয়েছিল––নেতৃত্বে আস্থা রাখো– নেতারা অনেক বেশি জানেন। আগে ভালো কর্মী হও– তারপর প্রশ্ন করো।' (পৃ. ২৭৬)। নেতৃত্বের অগভীর রাজনৈতিক আদর্শ, ভণ্ডামি ও স্বার্থান্ধ হঠকারিতার অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বে পথভ্রষ্ট হয় বাম রাজনীতি : 'গোঁজামিলের ফাঁকে ফাঁকে সন্দেহ আর সংশয় শিকড় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সেই ১৯৬২ সাল থেকেই, ১৯৬৬ সাল থেকে ধসে ধসে পড়তে লাগল স্তম্ভ আর দেয়াল। যারা ঐক্যের ডাক দিয়ে রাজনীতিতে নেমেছিল, এক সময় দেখা গেল তারা মত পাল্টাচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। পার্লামেন্টারী রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই, ক্ষমতায় না গেলে কিছুই করা যাবে না––এই সব তত্ত্ব তারা সামনে আনলো। যারা বিপ্লবের জন্য রাজনীতিতে এসেছিল– তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নামতে চাইলো। তাদের মধ্যে আবার নানা দৃষ্টিভঙ্গি। প্রশ্ন উঠলো শত্রু কে, কারা শাসন করছে দেশ? সামন্তবাদী না উপনিবেশবাদী শক্তি? নাকি দুই শক্তি একসঙ্গে? এই মুহূর্তেই সশস্ত্র সংগ্রাম, নাকি তার জন্যে প্রস্তুতি প্রয়োজন––এই সব তত্ত্ব সামনে আসতে থাকলো। ... ওদিকে চীন ভারত যুদ্ধ হয়ে গেছে, এদিকে পাকিস্তান ভারতের যুদ্ধের ঘটনাও ঘটে গেছে ১৯৬৫তে। সামরিক শাসনের গণতন্ত্র উঠতি দালাল বুর্জোয়াদের ফুলে ফেঁপে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। যারা ছিল পাকিস্তান আর মার্কিনিদের বন্ধু, যারা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়ে গেছে বলতো, বলতো সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা যাবে না তাদের মুখে স্বায়ত্তশাসনের দাবি শোনা গেল। আর তাদের দিকেই ঘেঁষতে লাগলো অনেক মানুষ।' (পৃ. ১১৫)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বাংলায় যে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে তাতে মধ্যবিত্তেরই ছিল ঐতিহ্যগত একাধিপত্য। পাকিস্তানি শাসনামলে ৫২, ৬২, ৬৬ ও ৬৭-র সমগ্র আন্দোলন ছিল মধ্যবিত্তের এবং মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের; এখানে কৃষক-শ্রমিক নেই, থাকলেও তারা একান্ত গৌণ, মধ্যবিত্ত নেতা বা জোতদারদের একান্ত আজ্ঞাবহ। বহু বছরের বাংলার ক্ষমতাকাঠামোর ঐতিহ্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যে, তার ফলশ্রুতিতে এখানে গণমানুষের রাজ হবে, শ্রমিকশ্রেণির দল হবে, শাসন হবে। এক্ষেত্রে সেজানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উদ্ধরণযোগ্য : 'কিষাণের জমি চাই– এ দাবির কথা বললে তাদের চোখে মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফোটে। যদি বলে, লাঙল যার, জমি তার, তাহলে তারা জিজ্ঞাসা করে, যাদের লাঙল নেই তাদের কী হবে? যদি বলা হয়,

জোতদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হবে– তাহলে তাদের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখা যায়। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, জোতদারদের যদি জমি না থাকে তাহলে আমরা কাজ পাবো কোথায়?' (পৃ. ২৬৩)। বাংলার সমাজকাঠামোর এই ঐতিহ্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বাংলায় গণমানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আদর্শিক নিষ্ঠা, উদারতা ও বিপ্লবে আত্মোৎসর্গ করার চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা দরকার ছিল তা মধ্যবিত্ত-মূলীভূত মার্কসবাদী নেতাদের ছিল না। মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদে প্ররোচিত প্রগতিশীল রাজনীতিকরা ক্ষমতার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের দৌরাত্ম্যে দেবতোষ-সেজানদের মতো সৎ কমিউনিস্ট কর্মীরা কোণঠাসা। তারা সুবিধাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে গণমুক্তির বিপ্লবী আদর্শকে আঁকড়ে ধরে; বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গণমানুষের শাসন প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু দুটো প্রশ্নকে সামনে রেখে তারাও আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে–– উদ্দেশ্য জনগণকে নিয়ে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, অথবা জনগণকে সাংগঠনিক কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করা। দেবতোষ সময়ক্ষেপণের পথ পরিহার করে শোষকদের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে ধূমায়িত করে গণমানুষকে সরাসরি বিপ্লবের কেন্দ্রে টেনে আনার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে দেবতোষের যুক্তি হলো : 'শ্রেণী সংগ্রাম না হলে শ্রেণী চেতনা জাগে না। কিষাণদেরই আন্দোলন করতে হবে–– কনফ্রন্টেশনে যেতে হবে–– আবার আঘাত এলে সে আঘাত তাদেরই রুখতে হবে। তাদের লড়াই অন্যে এসে করে দিয়ে যাবে না। ... সংগঠন হাওয়ার ওপর দাঁড়ায় না। আন্দোলন দরকার। আন্দোলন না হলে সংগঠন হওয়া সম্ভব নয়। আমরা বিপ্লব শেখাতে আসিনি, আমরা চাই কিষাণদের সমস্যা কিষাণরাই সমাধান করুক এবং শ্রেণিগতভাবে করুক।' (পৃ. ২৯০)। সেজান প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের সুবিধাবাদী আপোশকামিতা ও বিপ্লবী চরমপন্থা দুয়ের বিপজ্জনক পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিল। ১৯৬৭ সালের বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতার যথার্থ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় সুমিতাকে লক্ষ করে বলা সেজানের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যে : 'আমার ধারণা, সামনে একটা খুব বড় আন্দোলন আসছে––এমন আন্দোলন এদেশে আর কখনো হয়নি। এই আন্দোলনে বামপন্থীদের নেতৃত্ব দিতে হবে–– কেননা এর পরই ––বাঙালির স্বাধীনতার প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠবে। আন্দোলন হবেই– কেউ ঠেকাতে পারবে না। অথচ মুশকিল কি জানেন, আন্দোলনের নেতৃত্ব ভুল পথে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে পুরো মাত্রায়– তার মানে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, যদি প্রগ্রেসিভ ফোর্স নিজেদের সংগঠিত করতে না পারে।' (পৃ. ৩০৬)। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার প্রশ্নে বামপন্থিরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিল, ১৯৬৭ সালে পূর্ববাংলায় তারই পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় সেজান আতঙ্কিত। কারণ সেজানের বিশ্বাস '... য়্যুনিটি সুবিধাবাদে শেষ হয়, সরকার গঠন যে য়্যুনিটির লক্ষ্য।' (পৃ. ৯১)। অপরপক্ষে দেবতোষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও তার কাছে 'উদ্দেশ্যহীন, অসংগঠিত, নিষ্ফল প্রতিরোধ' (পৃ. ২৬৬) এবং তা প্রগতিশীল রাজনীতির জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক : 'পায়ের তলায় যেটুকু মাটি পাওয়া গেছে, সেটুকুও থাকবে না।' (পৃ. ২৬৫)। সেজান বাংলার সমাজকাঠামোর ঐতিহাসিক গঠনকে আমলে নিয়েই সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সংশোধনবাদী পন্থা অনুসন্ধান করে। এক্ষেত্রে সেজানের যুক্তি হলো : '... থিয়োরিটিক্যাল কথাবার্তা যারা তোমাদের শোনাচ্ছে তাদের ফিল্ড-এ কাজ করতে বলো আগে। বইপড়া তত্ত্ব দিয়ে রাজনীতি হলে অধ্যাপকরা বড় রাজনীতিবিদ হতেন, তোমাদের কাছে এখন ব্রডবেস্ড য়ুনিটির কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া পার্টিগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করার জন্য–– তাতেই নাকি বিপ্লব হবে। এসব কথা ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। ... বিপ্লবের বিকাশ বুর্জোয়াদের শান্তির মধ্য দিয়ে হয় না; বিপ্লবের বিকাশ বিপ্লবী কাজকর্মের মধ্য দিয়েই ঘটে। এ ব্যাপারে আমার শেষ কথা এদেশে সত্যিকার অর্থে প্রলেতারিয়েত যদি কেউ থাকে তো সে হলো এদেশের কৃষাণ- ওদের সংগঠিত যদি করা না যায় তাহলে কোনো বিপ্লবী আন্দোলনই সফল হবে না।' (পৃ. ৯০-৯১)। প্রভুর আসনে বসে গণমানুষের শাসন কায়েম করা যাবে না, নেমে আসতে হবে জনগণের কাতারে, তাদের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে সহমর্মিতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে নির্মাণ করতে হবে দলের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি––এই উপলব্ধি থেকেই সেজান শহর ছেড়ে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির কামরায় চড়ে চলে যায় উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে এবং সংগঠন গড়ে তোলার প্রাণান্ত চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিধাবাদী নেতৃত্বের নেটওয়ার্কের প্রবল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় সেজান; বিরুদ্ধতা আর বিদ্রূপে জর্জরিত করে

সেজানের আত্মোৎসর্গীকৃত সদিচ্ছাকে। সেজানকে বরণ করতে হয়েছে হতাশা, ব্যর্থতা ও পরাজয় : 'গ্রামাঞ্চলের কথা বললে কেউ আমাকে ঠাট্টা করেছে, স্বাধীনতার কথা বললে কেউ আমাকে রি-এ্যাকশনারি বলেছে, টেবিলের তাত্ত্বিক তর্ক ছেড়ে কাজে নামার কথা বললে আমাকে পাগল বলেছে। আজ আমাকে বলা হলো, আমি নাকি আগাগোড়া হঠকারী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, দেশের এক নাম্বার শত্রু। ঐ রকম কথা সবাই বললো একে একে।' (পৃ. ৩০৭)।

সেজানের পরাভব মানে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী মতাদর্শপুষ্ট জাতীয়তাবাদীদের একচ্ছত্র অধিষ্ঠান। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও পুঁজিবাদী শক্তির উত্থান এবং বামপন্থি রাজনীতির দ্বিধা-সংকট ও ব্যর্থতার পটে সাধারণ মানুষের মুক্তির বিস্ফোরণোন্মুখ আকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংহত হয়। ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত নেতৃত্ব চলে যায় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের হাতে। পাকিস্তানি শাসকদের প্রসাদপুষ্ট বাঙালি মুৎসুদ্দি-পুঁজিপতিরাও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে জায়গা করে নেয়। গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেই সংঘটিত হয় ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ; এর পরিণতি হলো আরেকটি ভৌগোলিক বিভাজন, অর্থনৈতিক ভূগোলের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, ১৯৭৫-এ ভয়াবহ ট্রাজিক ঘটনা সংঘটন এবং '৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিশ্রেণিই ভিন্ন রূপে ও পোশাকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শাসনব্যবস্থায় এই শ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমর্থনে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ঘটে পাকিস্তানি ঘরানার ঔপনিবেশিক শাসন। পাকিস্তানি রাষ্ট্রাদর্শের পুনরুজ্জীবন, রাষ্ট্র ও গণমানুষের মধ্যে মেরুদূর ব্যবধান, রাজনীতিতে জনকল্যাণের বদলে গোষ্ঠীস্বার্থের প্রাধান্য, সদর্থক রাজনীতিচর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বাংলাদেশের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি রূপায়ণে শওকত আলী এই সংকটের শেকড়কেই উপজীব্য করেছেন; আর এই শেকড় প্রোথিত রয়েছে ষাটের দশকের আইয়ুবশাহীর দুর্বৃত্তায়িত স্বৈরশাসনপর্বে বাঙালির পুঁজিবাদী আকাঙ্ক্ষা এবং মুক্তি-আন্দোলনের সংকট ও সীমাবদ্ধতার ইতিহাসে। এই উপন্যাসে আমরা প্রত্যক্ষ করি বাঙালির স্বার্থপরতার রাজনীতির ফলাফল হলো হাসানের প্রবল প্রতিষ্ঠা আর সৎ রাজনৈতিক কর্মী মনি ও সেজানের গ্লানিজর্জর পরাভব ও আত্মবিসর্জন।

আগ্রাসী স্বার্থপরতার কাছে বারবার মার খেয়েছে বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন, তারা অজ্ঞতাবশত নেতৃত্ব ও শাসনদণ্ড তুলে দিয়েছে স্বার্থান্বেষী শত্রুর হাতে, বেহাত হয়েছে তাদের মুক্তির সম্ভাবনা, কিন্তু বাঙালির মুক্তির স্বপ্ন কখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আর মানবমঙ্গলে ঐকান্তিক একজন শুভকামী মানুষের সংগ্রামী প্রয়াস অশুভশক্তি দ্বারা প্রহত হতে পারে, কিন্তু তার আত্মত্যাগে শোষণ-মুক্তির চিরায়ত আন্দোলন স্তব্ধ হতে পারে না বা নির্দিষ্ট কালখণ্ডে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। বাঙালির মুক্তির অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষা আর মানবমঙ্গলে আত্মনিবেদনের সীমাহীন প্রেরণা রোপিত রাখীর গর্ভে সেজানের সন্তানের মধ্যে। সন্তানসম্ভবা রাখী অনাগত 'সেজান'-কে নিয়ে হয় জনসংলগ্ন এবং সোনালি ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রত্যাশায় নেমে পড়ে উনসত্তরের উত্তাল আন্দোলনে : 'একেক দিন মিছিল দেখে রাস্তায় নেমে পড়ে। কোনোদিন য়ুনিভার্সিটি গেটের কাছে, কোনোদিন গুলিস্তানের মোড়ে, কোনোদিন প্রেসক্লাবের সামনে। আর হাঁটে রাখী। শীতের বাতাস টাল খেয়ে যায় দালানে দালানে ধাক্কা লেগে। রাখী তখন মনে মনে ছেলেকে ডাকে। বলে, দেখ এখানে আমি হেঁটেছিলাম—তুইও হাঁটিস এখান দিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে আমি মিছিল দেখেছিলাম—তুইও দেখিস এইখানে দাঁড়িয়ে, সেজানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এখানে, এই গাছতলায়—এখানে তুইও দাঁড়াস, আর এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তায় সেজান মিছিল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল—তুইও এই রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাস, হ্যাঁ রে পারবি তো?' (পৃ. ৩২০)। অথচ উপন্যাসের শুরুতে রাখী একান্তই রাজনীতি-নিরাসক্ত, ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতি-বিদ্বেষী; বড়ভাই মনি-র রাজনৈতিক সহকর্মী সেজানকে 'ভণ্ড, ধড়িবাজ', 'শত্রু' রূপেই দেখেছে সে। রাখী পুরুষনির্মিত সমাজব্যবস্থার এক নারী, যেখানে অধস্তন করার মানসে নারীকে চিহ্নিত করা হয় নিষ্ক্রিয়, অসহিষ্ণু, অস্থিরচিত্ত ও যুক্তিহীন হিসেবে। পুরুষের লৈঙ্গিক আধিপত্যে প্রান্তিকায়িত হয়েছে নারী, তার অস্তিত্ব হয়েছে বিভ্রান্ত, দিশেহারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পরও রাখী নিজের ভবিষ্যৎ

নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, করণীয় নির্ধারণে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আবর্তিত এবং অবশেষে পুরুষের সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। ভগ্নিপতির ইচ্ছানুসারে সে যোগ দেয় ট্রাভেল এজেন্সির চাকরিতে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করলেও রাখী পুরুষ-ভোগ্য মাংসস্তূপের মিথ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। মাজহারের শরীরী তৃষ্ণা শ্বাপদ চেহারায় আবির্ভূত হয়। রাখী আত্মরক্ষার্থে বিশ্বস্ত আশ্রয় হিসেবে নির্বাচন করে আরেকজন পুরুষকেই, আবদ্ধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জামানের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে। রাখীর প্রত্যাশা ছিল প্রেমময় দাম্পত্যসম্পর্ক, যা রাখীর রুচিশীল সংযমী চৈতন্যে ব্যক্তিত্বের দুর্দমনীয় অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু এ বন্ধন রাখীর কাছে প্রতিভাত হয় পুরুষের ইচ্ছার কাছে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার বিসর্জন, পুরুষের ওপর নারীর নির্ভরতার এক অন্তর্লীন ব্যবস্থা হিসেবে। জামানের শরীরসর্বস্ব প্রবৃত্তিতে পিষ্ট হতে হতে রাখীর নিজেকে মনে হয় সমাজ-আরোপিত বৈধতার আড়ালে শরীরী-খেলায় লুঠের সামগ্রী হিসেবে। জামানের কামার্ত স্বার্থপরতায় চরম অপমানিত হয় রাখীর উদ্বেলিত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। তার প্রতারিত নারী-সত্তার মর্মমূল থেকে উদ্গীরিত হয় অতল ঘৃণা, যার ফলশ্রুতি জামানের সঙ্গে বন্ধনবিচ্ছিন্নতা এবং তা চূড়ান্ত হয় গর্ভস্থ সন্তানের অপঘাত মৃত্যুতে।

চিলেকোঠার সেপাই[৬]

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসের পটভূমি। ঔপন্যাসিক শহর-গ্রাম মিলিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ-প্রতিপক্ষ সমেত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল বাংলাদেশকে পূর্ণাবয়বে ধারণ করেছেন আলোচ্য পাঠকৃতিতে। খিজির, ওসমান, চেংটু, খয়বার গাজী, রহমতউল্লাহ্, আলাউদ্দিন, আনোয়ার, নাদু পরামানিক, করমালি, জুম্মনের মা, জালাল মাস্টার, বজলু প্রমুখ অসংখ্য চরিত্র নিজ নিজ সামাজিক শ্রেণি অবস্থান, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে গণআন্দোলনের সামূহিক অবয়বের একেকটি একক হিসেবে অসাধারণ স্বচ্ছতায় উপস্থিত। এমনকি ভিক্টোরিয়া পার্ক, বটগাছ, গলি-উপগলি, যমুনার চর, রহমতউল্লাহ্‌র বাড়ি ও চিলেকোঠা সবকিছুই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উনসত্তরের গণআন্দোলনের চারিত্র্য ও বিশালত্বকেই রূপময় করে।

যে আইয়ুবি স্বৈরশাসন জগদ্দল পাথরের মতো বাঙালি জাতিকে রুদ্ধশ্বাস করেছিল, উনসত্তরের গণআন্দোলন ছিল সেই অপশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চূড়ান্ত অধ্যায়। এই গণ-অভ্যুত্থানের সাফল্যের প্রেরণাই মাত্র দুই বছরের মধ্যে সম্ভাবিত করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বিস্ময়কর অভ্যুদয়। তবে ঔপন্যাসিক *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে উনসত্তরের গণআন্দোলনকে ধরতে চেয়েছেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাঠামোর বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। তাই আলোচ্য পাঠকৃতিতে এই অগ্নিগর্ভ আন্দোলন কেবল রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে প্রতিফলিত হয় না, এই আন্দোলনের অন্তঃসার হিসেবে উঠে আসে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে সক্রিয় শোষণ-বৈষম্যের গোপন এলাকাগুলো। এই সময়ের বিশিষ্ট কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অথবা যাঁদের মৃত্যু এই অভ্যুত্থানের গতিধারার নির্ধারক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে, এমন কেউ এই উপন্যাসের নায়কত্বে অভিষিক্ত হননি। শেখ মুজিবের নাম ঘটনাপ্রসঙ্গে কয়েকবার মাত্র উল্লেখিত হয়েছে, মাওলানা ভাসানীর কথা একবার মাত্র উল্লেখে সীমাবদ্ধ। শীর্ষ নেতৃত্বের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে তৃণমূলে সংগঠকের ভূমিকা পালনকারী মধ্যম পর্যায়ের অখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃত্বের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে কেন্দ্রীয় রাজনীতির চালচিত্র এই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। শহিদ আসাদ (২০ জানুয়ারি), সার্জেন্ট জহুরুল হক (১৫ ফেব্রুয়ারি) এবং শহিদ ড. শামসুজ্জোহা (১৮ ফেব্রুয়ারি) এই তিনজনের মৃত্যু উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে বিশেষ প্রভাবসঞ্চারক ঘটনা। ঐতিহাসিক কালক্রম বজায় রেখে তাঁদের মৃত্যুর কথা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, তবে এই বর্ণনা একান্তই নৈর্ব্যক্তিক। নামত ইতিহাসে অখ্যাত, তবে নিজেদের প্রবল সক্রিয়তায় আন্দোলন পরিণতিমুখী হয়ে উঠেছে এমন শহিদরাই উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। খিজির-চেংটুদের মতো অখ্যাত প্রান্তিক মানুষেরা এই উপন্যাসে নায়কসুলভ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস যেখানে এই আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্য ও সীমাহীন সম্ভাবনার

কথা বলে, ইলিয়াস এই বিপুল সম্ভাবনার চিত্র আঁকতে আঁকতেই সন্ধান করেন এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ। এক্ষেত্রে ইলিয়াসের শ্রেণি-রাজনীতির প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট, তবে এই গণঅভ্যুত্থানের প্রাণস্পন্দন অনুধাবন ও এর উপন্যাসায়নে তিনি বিস্ময়করভাবে বস্তুনিষ্ঠ। ইতিহাসের মূল কাঠামো বা প্রতিষ্ঠিত তথ্যে কোনো প্রকার ব্যত্যয় না ঘটিয়ে আন্দোলনের নানা পক্ষ, সকল দল ও শ্রেণি, ক্ষমতা-কাঠামোর প্রধান শরিকদের যথাযথ ভূমিকাসমেত গণঅভ্যুত্থানের চিত্র ও চারিত্র্যকে উপস্থাপন করেছেন তিনি। *চিলেকোঠার সেপাই*-এ 'গণমানুষের মুক্তির রাজনীতির কিছু তত্ত্বীয়-প্রায়োগিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে', আছে 'পার্টি-রাজনীতির তত্ত্বায়নচেষ্টা'। (দ্র. আজম; দীপন, সেপ্টেম্বর ২০২৩ : ৩৭৪-৭৫)। এভাবে ঔপন্যাসিক সমকালীন সমাজ বাস্তবতার সীমা পেরিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক সীমা প্রসারিত করেছেন বহুদূর।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল 'অপরায়ণে' ক্ষতবিক্ষত পূর্ব-বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী কর্তৃক পরাক্রমশালী ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে দুমড়েমুচড়ে দেওয়ার এক স্পর্ধিত অভিযান। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত 'ছয় দফা' (১৯৬৬) ছিল এই আন্দোলনের প্রেরণাবীজ। এই ছয় দফায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠী শুনতে পায় নিজেদের পতন, পাকিস্তানের ভাঙনের হুংকার আর বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পদধ্বনি। স্বৈরশাসকগোষ্ঠী 'ছয় দফা'-র আন্দোলনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে প্রচার করে এবং এর প্রস্তাবক শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। দেশ জুড়ে ত্রাসসৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালনা করে গণগ্রেফতার কার্যক্রম। শেখ মুজিব এবং বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে স্তব্ধ করতে সাজানো হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯৬৮)। সকল স্তরের বাঙালি অনুভব করে, ছয় দফার ব্যর্থতা মানে তাদের সামনে শোষণ-নির্যাতন-পরাধীনতার এক ঘোর অমানিশা; আর সাফল্য মানে শোষণ-বঞ্চনামুক্ত স্বাধীনভাবে বাঁচার অফুরন্ত সম্ভাবনা। তাই এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলগুলো মতাদর্শগত পার্থক্য ভুলে ছয় দফার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। ছাত্রসমাজও ১১ দফা দাবি (১৯৬৯) নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনের ময়দানে। নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন সত্ত্বেও বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে বাঙালি জাতির প্রতিরোধ আন্দোলন। এই প্রমত্ত গণ-আন্দোলনের আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে শেখ মুজিবের কারামুক্তির মাধ্যমে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের এই সকল ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে। বামপন্থি রাজনীতির সমর্থক শওকতের মন্তব্য পাওয়া যায় গণঅভ্যুত্থানে শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের স্বীকৃতি : 'শেখ সাহেব সবচেয়ে পপুলার নেতা, দেয়ার ইজ নো ডাউট এ্যাবাউট ইট।' (পৃ. ২২৫)। উপন্যাসে আমরা দেখি শেখ মুজিবের মুক্তির মধ্য দিয়ে এই অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলনের আপাত পরিসমাপ্তি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার আর শেখ মুজিবের কারামুক্তিকেই সংগ্রামী বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের বিজয় হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং এই বিজয় উদ্‌যাপন উপন্যাসে নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইলিয়াস স্পষ্টতই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের পুরোভাগে আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে রেখে ইতিহাসনিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলেও এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত কেবল আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্বের কর্মসূচির তোয়াক্কা না করে উন্মত্ত জনতার সংগ্রাম উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলে। রক্তদানের নেশায় পেয়ে বসে মুক্তিকামী মানুষকে; একজনের মৃত্যু অজস্রকে প্রাণিত করে মৃত্যুর মিছিলে। হরতালের পর হরতাল চলে; হরতাল আহ্বানের জন্য কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দরকার হয় না; পিকেটিংয়ের জন্য প্রয়োজন হয় না কোনো সংগঠনের। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোই বরং সংগ্রামশীল জনতার দাবিকে তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে বাধ্য হয় : 'একেকটা ঘটনা ঘটে যায় আর লিডাররা সবই তাদের প্রোগ্রামে ইনক্লুড করে নেয়'। গণ-আন্দোলনের তুঙ্গমুহূর্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা দাঁড়ায় 'এডিটিং'-এর : 'কোন কাজটা তারা করেনি আর কোন কাজটা তাদের নেতৃত্বে হলো তাই ডিসাইড করা। এ্যাকশন উইথ রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট।' (পৃ. ৪১)। শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ছাপিয়ে খেটে-খাওয়া প্রান্তিক মানুষেরাই হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের

চালিকাশক্তি। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা বিধৃত হয়েছে ওসমানের বীক্ষণবিন্দু-ধৃত মিছিলের চিত্রে :

> 'ওসমান প্রথমে তাকায় উত্তরে। কালো কালো হাজার হাজার মাথা এগিয়ে আসছে অখণ্ড স্রোতোধারার মতো। এই বিপুল স্রোতের মধ্যে ঘাইমারা রুইকাতলার ঝাঁক নিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে কোটি ঢেউয়ের ঢল। দক্ষিণে তাকালেও দেখা যায় এই স্রোতোধারা কেবল এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ক্যালেন্ডারে যা-ই থাক, ঢাকায় আজ আষাঢ় মাস। উত্তর থেকে আসে বরফ-গলা শহরের স্রোত, উপচে উঠে মানুষ গড়িয়ে পড়ছে পাশের গলিতে উপগলিতে। গলি-উপগলি ভরা কেবল মানুষ, দুই পাশের বাড়িগুলোর ছাদ পর্যন্ত মানুষ। গলি-উপগলি থেকে স্রোত এসে মেশে মূলধারার সঙ্গে, মানুষ বাড়ে, নবাবাপুর সামলাতে পারে না, মানুষের প্রবাহ ফের গড়িয়ে পড়ে পাশের ফাঁকা গলিতে। পাঁকা গলি কি আর আছে? সব জায়গা কানায় কানায় ভরা। ঢাকায় কি এতো লোক বাস করে? মনে হয় ঢাকা শহর তার ৩৫০/৪০০ বছরের বুড়ো হাবড়া রোগা-পটকা লোনা-ধরা গতর ঝেড়ে উঠে ছুটতে শুরু করেছে সামনের দিকে। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা। ... এই এতদিনকার শহর কি আজ তার সব মানুষ, সব রাস্তা গলি উপগলি, বাড়িঘর, সব অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়িয়ে পড়বে বুড়িগঙ্গার অতল নিচে। না। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা তার শীতের শীর্ণ তনু একেবারে নিচে ফেলে উঠে এসেছে বিপুল স্ফীত হয়ে, বুড়িগঙ্গার অজস্র তরঙ্গরাশির সক্রিয় অংশগ্রহণ না হলে কি এরকম জলদমন্দ্র ধ্বনি উঠতে পারে, 'আসাদের রক্ত'- 'বৃথা যেতে দেবো না!' .... নদীর জাহাজ নয়, নদীই আজ ছুটতে শুরু করেছে দস্তিদারের লাল লণ্ঠনের পেছেনে। এই পাগলপারা জলোস্রোতকে আজ সামলায় কে? ... এই এতো মানুষের সবাই কি তার মতো শ্বাসপ্রশ্বাস-নেয়া মাছ-ভাত খাওয়া সাধারণ মানুষ? এই যে জনপ্রবাহ, এর অনেকের কাপড় চোপড়, চেহারা তার কাছে অপরিচিত ঠেকছে? এরা কারা? তার মানে, অনেক কাল আগেকার মানুষও কি মিছিলে যোগ দিয়েছে? ঐ তো, মিছিলের মাঝখানে ইসলাম খাঁর আমলের খাটো-ধুতি-পরা ঢাকাবাসী! এমনকি তারো আগে চালের বস্তা বোঝাই নৌকা বেয়ে যারা সোনারগাঁও যাতায়াত করতো তারাও এসেছে। বাঙলা বাজার তাঁতীবাজারের মানুষ লুপ্ত-খালের হিম হৃদ্‌পিণ্ড থেকে নেমে এসেছে? ঐ তো ইব্রাহিম খাঁর আমলে শাহজাদা খসরুর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত পাগড়ি-পরা সেপাইরা। শায়েস্তা খাঁর ঠাকায়-আট-মণ-চালের আমলে না-খেয়ে-মরা মানুষ দেখে ওসমান আঁতকে ওঠে। ৩০০ বছর ধরে তাদের খাওয়া নাই,—কালো চুলের তরঙ্গ উড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে। মোগলের হাতে মার-খাওয়া, মগের হাতে মার-খাওয়া, কোম্পানী বেনেদের হাতে মার-খাওয়া—সব মানুষ না এলে এই মিছিল কি এতো বড় হয়? রেসকোর্সের কালীবাড়ির ইটের শুকনা পরত খুলে খাঁড়া হাতে নেমে এসেছে মারাঠা পুরোহিত, মজনু শাহের ফকিরেরা এসেছে, ঐ তো বুড়ো আঙুল-কাটা মুষ্ঠির ঘাই ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে মসলিন তাঁতী, তাদের কালো কালো খালি গা রোদে ঝলসায়। ৪০০০ টাকা দামের জামদানী-বানানো তাঁতীদের না-খাওয়া হাড্‌ডিসার উদোম শরীর আজ সোজা হেঁটে চলছে। সায়েবদের হাতে গুলিবিদ্ধ বাবুবাজার মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন মুসল্লিরা চলেছে, বিড়বিড় করে আয়াত পড়ার বদলে তারা আজ হুঙ্কার দিচ্ছে, 'বৃথা যেতে দেবো না!' লালমুখো সায়েবদের লেলিয়ে-দেওয়া নবাব আবদুল গনি-রূপলাল-মোহিনীমোহনের শ্বাদন্তের কামড়ে-ক্ষতবিক্ষত লালবাগ কেল্লার সেপাইরা আসে, ভিক্টোরিয়া পার্কের পামগাছ থেকে গলার দড়ি ছিঁড়ে নেমে আসে মীরাটের সেপাই, বেরিলির সেপাই, সন্দ্বীপ-সিরাজগঞ্জ-গোয়ালন্দের সেপাই। না হে, তাতেও কুলায় না। যুগান্তর অনুশীলনের বেনিয়ান ও ধুতি-পরা মাতৃভক্ত যুবকেরা আসে, তাদের মাঝখানে কলতাবাজারে নিহত ছেলে ২টিকে আলাদা করে চেনা যায়। নারিন্দার পুলের তলা তেকে দোলাই খালের রক্তাক্ত ঢেউ মাথায় নিয়ে চলে আসে সোমেন চন্দ। ঐ তো বরকত! এাথার খুলি উড়ে গেছে, দেখে ভয় পেলেও ওসমান সামলে ওঠে। এতো মানুষ! নতুন পানির উজান স্রোতে ঢাকার অতীত বর্তমান সব উথলে উঠেছে আজ, ঢাকা আজ সকাল-দুপুর-বিকাল-রাত্রি বিস্মৃত, আজ আর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নাই, সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সকল ভেদ চিহ্ন আজ লুপ্ত। সীমাহীন কাল সীমাহীন স্থান অধিকারের জন্য ঢাকা শহর আজ একাগ্রচিত্ত।' (পৃ. ১৪৯)।

এই মিছিলে শুধু জীবিতরা নয়, ইতিহাসের অতল-গভীরতা থেকে উঠে আসে পাঠান, মোগল ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মত্যাগী শহিদেরাও। ওসমানের হ্যালুসিয়েশনের বরাতে আমরা মিছিলে দেখি বাঙালির 'শত সহস্র বছরের জমানো ক্ষোভ আর প্রতিবাদের প্রবাহ' (পৃ. ২৬)। এর মধ্য দিয়ে ইলিয়াস উনসত্তরের গণ-আন্দোলনকে আবিষ্কার করেন দুভাবে—১. বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত-নিষ্পেষিত বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-বিদ্রোহের ইতিহাস বহুশতাব্দীর, কিন্তু প্রতিটি আন্দোলনেরই সমাপ্তি ঘটেছে শহিদদের ব্যর্থ রক্তদানে; দীর্ঘ ব্যর্থতার পটে উনসত্তরের গণআন্দোলনই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার পরিণতি ঘটেছে লক্ষ্যসিদ্ধির মধ্য দিয়ে; ২. এই আন্দোলন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সমুদয় শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ-সংগ্রামের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।—এভাবে ইলিয়াস প্রচলিত জাতীয়তাবাদী

বয়ানের বাইরে গিয়ে এই গণআন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেন বাঙালির সকল প্রকার নিষ্পেষক ক্ষমতাকাঠামো থেকে চূড়ান্ত মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে।

এই উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। শহুরে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে প্রান্তবর্তী খেটে-খাওয়া মানুষ––কেউ বাদ যায়নি। এরা প্রত্যেকেই আপন আপন স্বর, চিন্তাভাবনা, কামনা-বাসনা, দ্রোহ-সমর্পণ, সক্রিয়তা নিয়ে উপন্যাসের আখ্যানে জীবন্ত। কারোর প্রতি ঔপন্যাসিকের কোনো পক্ষপাত নেই, আরোপণ নেই। আন্দোলনে এসব চরিত্রের সক্রিয়তার ধরন তাদের শ্রেণিচরিত্র ও আকাঙ্ক্ষার সমানুপাতে বিন্যস্ত হয়েছে। ফলত, উপন্যাসে আন্দোলনের পক্ষ-বিপক্ষের দ্বৈরথটা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি আন্দোলনের পক্ষশক্তির ভেতরকার বিবিধ শ্রেণিগোষ্ঠীর টানাপোড়েন এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বটাও উন্মোচিত হয়েছে।

উনসত্তরের গণআন্দোলনে সক্রিয় বহুপক্ষের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় অংশ তৃণমূল জনগোষ্ঠী : 'সব লেবার আর স্ট্রিট আর্চিনস'। (পৃ. ৪১)। আন্দোলন-সংগ্রামে এই মুর্খ ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠীই ছিল বেপরোয়া; মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিতুলনায় আত্মত্যাগে তারা বেহিসাবি : 'ভদ্রলোক ও ছাত্রদের বেশির ভাগই, বলতে গেলে প্রায় সবাই একটা আধটা লাঠির বাড়ি খেয়ে কিংবা মার এড়িয়ে কেটে পড়েছে। এখন বাকি রইলো ২। ১. নোঙরা কাপড় পরা লোকজন এবং ২. অগুণতি পিচ্চি। পুলিশের মার এখন চমৎকার জমে উঠেছে।' (পৃ. ৩৬)। বেপরোয়া লাঠিচার্জ সত্ত্বেও যখন প্রান্তিক মানুষেরা সংগ্রামে অটল, তখন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি ওসমানের আচরণ কৌশলী আত্মরক্ষামূলক : 'বুদ্ধি করে ওসমান পায়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্টেডিয়ামের উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে সে এমনভাবে হাঁটে যে, মনে হয় এই সব গোলমালের কিছুই তার জানা নাই।' (পৃ. ৩৬)। ওসমানের বন্ধু কামালের সমালোচনায় ধরা পড়ে আন্দোলনে প্রান্তিক মানুষদের সক্রিয়তার তীব্রতা : 'স্পেশালি স্লাম এরিয়া। ব্যাটাদের কাজ কাম–– নেই তো, রোজ প্রসেশন বার করে। পুলিশের গাড়ি দেখলেই ঢিল ছোড়ে। ঢিল দিয়ে অটোমেটিক উইপন্স ঠেকাবে? স্টুপিড।' 'স্লাম এরিয়ার' 'স্টুপিড' 'বেওয়ারিশ পিচ্চিরা'ই অসামান্য উদ্দীপনায় হরতালকে ফলপ্রসূ করে। হোটেলের টেবিলে গোল হয়ে যখন ছাত্রকর্মীরা কথার লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন রাস্তার ছিন্নমূল পিচ্চিরা ঢিল ছোড়ে আইয়ুব খানের ছবি লক্ষ্য করে। ছবি ভাঙার উন্মাদনা ও সাফল্যে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে : 'দুটো এ্যাশট্রে এবং ইটের টুকরো ছুঁড়ে-মারা ১০/১১ বছরের পিচ্চির লুঙির কোঁচড়ে এখনো কয়েকটা পাথর ও ইটের টুকরা। কনুই দিয়ে তার নাকের গোড়া থেকে ঝুলন্ত সিকনি মুছতে মুছতে সে এগিয়ে আসে। আইয়ুব খানকে প্রথমবার ইট লাগাতে পারেনি বলে তার যে গ্লানি হয়েছিল পরবর্তী সাফল্যে তা একেবারে মুছে গেছে। এই সাফল্য তার চেহারা ও গলায় পরিণত ও অভিজ্ঞ মানুষের ভার অর্পণ করে, 'দিছি! খানকির বাচ্চারে এক্কেরে নামাইয়া দিছি!' রাস্তার ধুলামাটি ও কফথুথু মাখা পায়ে চিৎপটাং রাষ্ট্রপতির কপালে ও মাথায় সে কয়েকটা লাথি মারে।' (পৃ. ৪০-৪১)। আমরা দেখি, ভাঙা কাচে ছেলেটির পা কেটে গেছে, কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে প্রতিশোধ নেয়ার প্রশান্তি।

গণআন্দোলনে খিজিরের ভূমিকাটি উপন্যাসের চুম্বকাংশ। মিছিলে সে নিজে অংশ নেয়, আলাউদ্দিনের মিছিল-সভায় লোক জোগানোর দায়িত্ব পালন করে এবং এ দায়িত্ব পালনে সে নিষ্ঠাবান। মিছিল-মিটিংয়ে সে ভয়ডরহীন, 'বহুত চার্জড্ হয়ে ইটা মারে' (পৃ. ৪৪)। মিছিলে উত্তেজিত খিজিরকে দেখে ওসমানের মনে হয় 'তার ভাঙা গালের উঁচু হাড়গুলো আগুনের আভায় লাল'। খিজিরের কানে যেন স্লোগানের পিপাসা; মিছিলের উত্তেজনায় মহাজনের বেবি-ট্যাকসি অন্য ড্রাইভারের হাতে তুলে দিতেও সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। কারফ্যু ভাঙার জন্য যেদিন বস্তির বালক-যুবকেরা একের পর গুলি খেয়েও সেনাবাহিনীকে তাড়া করেছিল, সেদিন অসংখ্য উন্মত্ত-উত্তেজিত মানুষের ভিড়ে খিজিরকে দেখা যায় অসামান্য হয়ে ওঠার ভূমিকায় : '... কালচে হলুদ আলোর নিচে মানুষের সারি ক্রমে দীর্ঘ হয়, খিজিরের গা একেকবার ছমছম করে ওঠে ... গলি উপগলি শাখাগলি থেকে এই যে ছলকে ছলকে মানুষ আসছে এর ফলে সামনে পেছনে মিছিল কেবল বেড়েই চলে। ... সামনে যাওয়া দরকার। ... কারফ্যু ভেঙে শালার টুকরা টুকরা করে ফেলো কালো আকাশ।... হাজার হাজার মানুষ কারফ্যু ভেঙে ছুটে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে। ক্যান্টনমেন্টের চারদিকের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হবে আজ রাতে, বিশাল সমাবেশের সমবেত আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে মিলিটারির গুদাম গুদাম হাতিয়ার। কিংবা হাতিয়ার সব চলে আসবে মানুষের হাতে। ... চুতমারানি

মিলিটারিকে আজ ভাসিয়ে দেবে পেচ্ছাবের ফেনার মতো। ... কালচে হলদে আলোয় মিলিটারিদের মুখ দেখা যায় না, ঘন জলপাইরংয়ের হেলমেট তাদের মাথার ওপরকার অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছে। মিছিল তখন শতগুণ জোরে ভরা গলায় প্রতিবাদ জানায়, মানি না! এানি না! এই আওয়াজ অন্ধকার ছিঁড়ে টুকরা করতে না করতে ট্রাক থেকে ছটে টর টর টর টর টঙা টং টং টং। ... গুলিবর্ষণ, মিছিলের শেষ প্রান্তের মানি না! মানি না! স্লোগান ও এইসব আর্তনাদের সমবেত কোরাসে পিচের রাস্তা কংক্রিটের ফুটপাত এবং এই দুইয়ের মাঝখানে নালা এক সঙ্গে কাঁপতে শুরু করে। পায়ের নিচে সব কাঁপে। খিজির জানে, এই সময় স্পিড কমাতে নেই। ... কিন্তু আরও একঝাক টক টক টক টক ধ্বনির সঙ্গে চোখের সামনেকার কালচে হলুদ আলোর হলুদ ভাগ মিলিয়ে যায়, অন্ধকার গাঢ়তর হয়। কোন শালা খানকির বাচ্চা ট্রাক এসে ধাক্কা দিলো তার বুকে? বুকের বা'দিকে ও পেটের ঠিক ওপর ভাগে ... আউজকা গাড়ি জমা দিমু ক্যালায়?—আউজকা ক্যান্টনমেন্ট যাইতে হ্ইবো, জমা টমা! নাইক্কা।' (পৃ. ২৭৫-৭৮)।

উনসত্তরের গণআন্দোলনের শৃঙ্খল-মুক্তির নেশায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জনপদও। গ্রামপর্বের আন্দোলনেও খেটে-খাওয়া প্রান্তিক মানুষেরাই বেশি সক্রিয়। তবে মিছিল-মিটিংয়ের চাঞ্চল্য গ্রামে খুব বেশি ছিল না; গণআন্দোলনের রূপটি এখানে শোষক-শোষিতের বিরোধে রূপ নিয়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামের আন্দোলনের প্রকৃতিটাও ভিন্ন ঘরানার; এখানকার সংগ্রামটা যতটা না পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র-বিরোধী, তার চেয়ে অনেক বেশি জোতদার-বর্গাদার-মহাজনবিরোধী। দরিদ্র কৃষকসমাজের এই আন্দোলনের পুরোভাগে আছে চেংটু নামের ভূমিহীন দিনমজুর। উদ্ধত-বেয়াদব হিসেবে সে গ্রামের প্রভাবশালীদের কাছে ঘৃণা ও ভয়ের পাত্র। চেংটুর লড়াইটা মুখ্যত খয়বার গাজী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত। খয়বার গাজী এলাকার জোতদার; পেশিশক্তি ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভূমি-দখল, বর্গাচাষীকে অসহায়ত্বের ফাঁদে ফেলে নানান কলাকৌশলে যুগ-যুগান্তর ধরে চালিয়ে আসছে শোষণ। শোষণের সর্বশেষ উপচার হিসেবে যোগ হয়েছে তার তত্ত্বাবধানে গরু-চুরি। হোসেনকে দিয়ে সে গড়ে তোলে খোঁয়াড়; সেখানে জমা হয় চুরি-হওয়া গরু। সেই গরু বিক্রি হয় যমুনার অপর পারে। আর সেই খোঁয়াড়ে চুরি-হওয়া গরুর খোঁজ পেলে ফিরিয়ে আনতে কৃষককে দিতে হয় জরিমানা। আর এ তথ্য ফাঁস হলে কৃষকের মৃত্যু অবধারিত। গরু চুরির ঘটনা ক্রমে ভয়াবহ রূপ লাভ করে। প্রান্তিক কৃষকদের গরুর গুরুত্ব অপরিসীম; তাদের অস্তিত্বের মেরুদণ্ড। খয়বার গাজীর এই অপকর্ম ছিল চরম অসহায়ত্বে ফেলে ভূমিহীন কৃষকদের চূড়ান্ত শোষণের পদক্ষেপ। তাই গরুচুরিকে কেন্দ্র করেই মানুষ ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী আলীবক্সের নেতৃত্বে হাজার মানুষ সংগঠিত হতে থাকে। অবস্থা তুঙ্গ-পর্যায়ে পৌঁছে পচার বাপের চুরি-হওয়া গরু উদ্ধারের পটভূমিতে। পচার বাপ জরিমানা দেয়; কিন্তু গরু উদ্ধারের বদলে তাকেই নিহত হতে হয়। এই ঘটনার অভিঘাতে বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় হোসেন আলীর আস্তানা। গণআদালত বসে খয়বার গাজীর বিরুদ্ধে; বৈরাগীর ভিটায় বটগাছের নিচে সমবেত হয় গোটা জনপদের মানুষ : 'ভিড় দেখে মনে হয় এদিককার গোর্টিয়া, তালপোতা, পদুমশহর, চথুরিয়া, উত্তরের চন্দনদহ, কর্ণিবাড়ি, পশ্চিমের কড়িতলা, কামালপুর, গোলাবাড়ি কোনো গ্রামে পুরুষ মানুষ আজ ঘরে নাই। দূরের চর এলাকার লোকও এসেছে।' (পৃ. ২৬১)।

> শহর-গ্রাম দুই পর্বেই উনসত্তরের গণআন্দোলনে অশিক্ষিত, শ্রমজীবী মানুষের তুলনায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি অনেক বেশি নিষ্প্রভ, ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ক্রিয়; এবং বলাবাহুল্য, বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণআন্দোলন-বিরোধী ক্ষুদ্রাংশ গোষ্ঠীটি এই মধ্যবিত্তশ্রেণিরই অংশ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণআন্দোলন-বিরোধী ভূমিকায় আদৌ কেউ ছিল না; যদিও উপন্যাসে বজলুদের দেখা যায় মহাজনের ভাড়াটিয়া গুণ্ডার ভূমিকায়, কিন্তু এই ভূমিকা ছিলো শ্রেণি-আকাঙ্ক্ষার বিবেচনায় স্ববিরোধী এবং অল্পকাল পরেই বজলুকে দেখা যায় সংশোধিত ভূমিকায়। গণআন্দোলনে মোটদাগে মধ্যবিত্তের তিন ধরনের ভূমিকার কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক—১. রাজনৈতিক নেতৃত্বের, ২. গণ-আন্দোলন-বিরোধিতার ও ৩. আন্দোলনে নিম-সক্রিয়তা ও দোদুল্যমানতার। তিন ধরনের ভূমিকাতেই মধ্যবিত্তকে অসম্পূর্ণ, অন্তঃসারশূন্য, কপট ও স্বার্থান্ধ হিসেবে ঔপন্যাসিক সমালোচনায় বিদ্ধ

করেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ব্যাকরণে গড়ে ওঠা এই মধ্যবিত্তশ্রেণির অধিকাংশই ঐতিহ্যগতভাবে পাশ্চাত্যমুগ্ধ, জীবনযাপনে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যলুব্ধ, মন-মননে সৃজনবিমুখ ও অন্ধভাবে পরানুকারী এবং চূড়ান্তভাবে স্বার্থপর। উনসত্তরের গণআন্দোলনে মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিক্রিয়া ও সক্রিয়তাও ছিল তাদের শ্রেণিচরিত্র মেনে। উপন্যাসে শহরে আলাউদ্দিন ও গ্রামে আনোয়ারের মামা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিনিধি। রহমতউল্লাহ্ ও খয়বার গাজীও পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের সমর্থনকারী রাজনৈতিক বলয়ের মানুষ। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিয়েই গড়ে উঠেছে পাকিস্তানি শাসকদের তৃণমূলের ভিত্তি। এরা সংখ্যায় স্বল্প, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। ক্ষমতাবলয়ের প্রান্তিক অংশীদার হিসেবে তারা ভোগ করে সমাজশোষণের অপ্রতিহত অধিকার। প্রশাসন, পুলিশ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ তাদেরকে জোগায় শক্তি, সমর্থন ও সুরক্ষা। পাকিস্তানি শাসকচক্রের এই স্থানীয় ক্ষমতাবলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয় এই ক্ষমতাবলয়েরই ঘনিষ্ঠ একটি অংশ। তাঁরা পুরনো ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে নিজেদের অনুকূলে একটি নতুন ক্ষমতাকাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর। এই শ্রেণিটিই মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নেতৃত্বে আসীন। ক্ষমতাকাঠামো দখলের দ্বন্দ্বে এঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনস্তত্ত্বে সগোত্রীয়। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতার গোলকধাঁধায় জড়ানো। এই জটিল সম্পর্কটিকে ঔপন্যাসিক উন্মোচন করেছেন রহমতউল্লাহ্ ও আলাউদ্দিনের মধ্য দিয়ে। রহমতউল্লাহ্ মৌলিক গণতন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং গণআন্দোলন প্রতিহত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত। বিপরীতে ভাগিনা আলাউদ্দিন মামা রহমতউল্লাহ্র প্রভাববলয় ভেঙে স্থানীয় রাজনীতিতে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। এর প্রতীকী প্রতিফলন লক্ষ করা যায় রহমতউল্লাহ্র 'ছোট উপনিবেশ' (পৃ. ১৭৩) গিঞ্জি বাড়িটি আলাউদ্দিনের দখলে নেয়ার কৌশলের মধ্যে। শেষপর্যন্ত বাড়িটি তাঁর দখলে আসে এবং বাড়ির দখল নিয়েই ভাড়া দেড়গুণ বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে শোষক হিসেবে ও অর্থলিপ্সায় আলাউদ্দিন রহমতউল্লাহ্কেও ছাড়িয়ে যায়। দুপুর দুইটার মিছিলে লোক জড়ো করতে খিজির রিকশাওয়ালাদের রিকশা দিতে আপত্তি জানালেও আলাউদ্দিন রিকশাওয়ালাদের রিকশা নিয়ে বের হতে দেয় এবং খিজিরকে অবাক করে দিয়ে আলাউদ্দিন রিকশার ভাড়াটাও যথারীতি আদায় করে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আলাউদ্দিন রহমতউল্লাহ্র বিরুদ্ধে রিকশাওয়ালাদের ব্যবহার করে, আবার রহমতউল্লাহ্র গ্যারেজ রক্ষায় সে রিকশাওয়ালাদের ঠেকানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যে খিজির মিছিলে-সভায় লোক জোগানোর প্রধান সহায়ক, সেই খিজিরকেই সে কারফ্যুর মধ্যে রাস্তায় ঠেলে দিতে চায় রহমতউল্লাহ্র জীবনরক্ষার প্রয়োজনে। তার কাছে দরিদ্র খিজিরের জীবনের চেয়ে স্বগোত্রীয় ও আত্মীয় রহমতউল্লাহ্র জীবনের মূল্য অনেক বেশি। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের কর্তৃত্ব নিশ্চিত হওয়ার শর্তে আলাউদ্দিনের কাছে প্রতিপক্ষবলয়ের রহমতউল্লাহ্রাই তার ঘনিষ্ঠ মিত্র; প্রতিপক্ষবলয়ের লতিফ সর্দারদের নিজের রাজনৈতিকবলয়ে অঙ্গীভূত করে নিয়ে পোক্ত করে নিজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। আর খিজিরের মতো খেটে-খাওয়া প্রান্তিক মানুষদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আত্মত্যাগী সংগ্রামে করায়ত্ত ক্ষমতা আলাউদ্দিনের মতো রাজনীতিবিদেরা প্রয়োগ করে খিজিরদেরই দমন-শোষণে। খিজিরদের সমর্থন-সক্রিয়তা তার রাজনীতির ভিত্তি হলেও শ্রেণিস্বার্থ বিবেচনায় খিজিররাই তার প্রকৃত প্রতিপক্ষ। এভাবে শ্রেণিসাম্য ও শ্রেণিবিরোধের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে ঔপন্যাসিক উন্মোচন করেন আওয়ামী লীগের ঢাকা নগর কমিটির সম্ভাব্য সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদকের চরিত্রটিকে; একইসঙ্গে উন্মোচন করেন মধ্যবিত্ত মূলোদ্ভূত বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের মুখ ও মুখোশ।

গ্রামপর্বেও আমরা দেখি মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভণ্ডামি, শঠতা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতালিপ্সু রূপ। আনোয়ারের মামা আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতা। সে পাকিস্তানি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রশ্নে তার রাজনৈতিক দোসর হয়ে ওঠে লম্পট, ভূমিদস্যু ও পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের দোসর আফসার গাজী। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আক্রোশ হতে আত্মরক্ষার জন্য সে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। সভা-মিছিলের খরচ জুগিয়ে এবং আপ্যায়নের মাধ্যমে সে আনোয়ারের মামার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠে। আনোয়ারের মামার আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় সে হয়ে ওঠে থানা পর্যায়ের উদীয়মান বড় নেতা। তার এই উত্থানের মধ্যে জড়িয়ে থাকে চাচা খয়বার গাজীর সঙ্গে আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক স্বার্থ-সুরক্ষা বিষয়ে গোপন সমঝোতা। করমালির ভাষ্যে ধরা পড়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রকোষ্ঠে জমে থাকা এই নোংরামির চিত্র : 'আফসার গাজী থানা পর্যায়ে বড় নেতা হতে চলেছে। মিটিঙে মিটিঙে তার চাচা খয়বার গাজীর নামে যা-তা বলে বেড়ায়। ওর চাচা হলো আইয়ুব খানের দালাল, বাঙালির শত্রু। দালাল চাচার আধপোড়া বাড়ি ঘর দখল করার জন্য আফসার হন্যে হয়ে উঠেছে। এদিকে এইসব কথা বলে, আবার বৈরাগীর ভিটায় গণ-আদালত বসিয়ে যারা এদের বিচার দাবি করেছিলো নানাভাবে তাদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে সদাসর্বদা এক দঙ্গল কলেজের ছাত্র,...।' (পৃ. ৩০৪)। চাচা-ভাতিজার এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সমঝোতার মধ্যে সংগুপ্ত আছে গণআন্দোলনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে পুরনো ক্ষমতাবানদের অবস্থান পোক্ত করার কৌশল : 'সরকার পাল্টিও তারা, আবার অন্য পাল্টিও তারাই।' (পৃ. ৩১১)। খয়বার গাজী-আফসার গাজী এবং রহমতউল্লাহ্-আলাউদ্দিনের সম্পর্কটি অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত এবং এর মধ্য দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক দর্শনের অভিন্নতাকেই ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেন। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদগুলোতে আলাউদ্দিনকে আমরা রহমতউল্লাহ্র বিকল্প প্রতিমূর্তি হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি; এমনকি তার বাচনভঙ্গিও রহমতউল্লাহ্র মতো হয়ে ওঠে। উনসত্তরের গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে আর এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ভোগ করতে হয়েছে সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন––এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তবে এই মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ছিলো চালু ক্ষমতাকাঠামোর মধ্যে নিজেদের 'অপরতা' ঘুচিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হটিয়ে একটি বিকল্প ক্ষমতাবলয় গড়ে তোলা।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনকে ঘিরে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক-রহিত বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির চাকরিজীবী অংশটির চিন্তাভাবনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সক্রিয়তার বিষয়টির একটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসনের অধীনে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও অভিসন্ধির ভেতর দিয়ে নির্মাণ-পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, সেই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাকরণেই ইলিয়াস তাঁদের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করেছেন এবং অনিবার্যভাবেই সেই মূল্যায়ন তির্যক বিদ্রূপে ঠাঁসা। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দূরবর্তী কেন্দ্রে বসে উপনিবেশ শাসন করে আমলাদের মধ্যস্থতায়। তাই নামমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক শাসন ছিল কার্যত আমলাতান্ত্রিক। উপনিবেশ শাসনে গড়ে তোলা হয় শোষণ-নিপীড়ন সহায়ক কঠোর ও নির্মম প্রকৃতির আইনিকাঠামো এবং আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জনগণের ওপর সেই আইনের অবাধ প্রয়োগের বিপুল ক্ষমতা। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রে নিযুক্ত বাঙালি তথা ভারতীয় আমলাদেরও নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের যথার্থ মানব-উপকরণ হিসেবে। গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার কারণেই তারা পাশ্চাত্যমুগ্ধ, স্বজাতি-বিচ্ছিন্ন এবং প্রভুত্ববাদী। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর এই মেধাবী অংশটি অনিবার্যভাবেই পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, চালচলন ও জীবনাচরণে ব্রিটিশদের ভারতীয় সংস্করণ। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও পাকিস্তান রাষ্ট্র উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র। ঔপনিবেশিক শাসনে অভিজ্ঞ এই আমলাদের বদৌলতে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক কাঠামোর শাসনব্যবস্থা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, মেধা-মনন-প্রজ্ঞায় ও রাষ্ট্র পরিচলনার দক্ষতায় আমলাদের তুলনায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল

পশ্চাদ্‌পদ। ফলত রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল অতিমাত্রায় আমলানির্ভর। রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলিয়াত্বের সুযোগে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা ছিল আমলাদের মুঠোবন্দি। তবে এটা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের আড়ালে আমলাদের পরোক্ষ-শাসন; অপেক্ষা ছিল তাদের প্রত্যক্ষ-শাসন জারির; এবং তা জারি হয়ে যায় স্বাধীনতার মাত্র একদশকের মধ্যে। সামরিক আমলারা দখল করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বেসামরিক আমলারা তাতে জোগায় পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা। মনস্তাত্ত্বিক গড়নের কারণেই আমলারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন, জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা শাসক-শাসিতের, প্রভু-ভৃত্যের। পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোতেও এই ভেদরেখার ঘেরাটোপেই তারা ছিল বন্দি। তাই তাদের পক্ষে জনবান্ধব হওয়া সম্ভব হয়নি; বরং প্রান্তিক মানুষদের ওপর শোষণ-দমন-নিপীড়নের ঔপনিবেশিক ভূমিকাটিই পালন করেছে। বাঙালি আমলারাও ছিল স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের প্রতি অনুগত এবং পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থায় আমলা-আধিপত্যে সন্তুষ্ট। বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সর্বাত্মক বৈষম্যনীতির শিকার তাদেরকেও হতে হয়েছে; তবে তাদের গোপন যন্ত্রণা প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হয়নি। কারণ, পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে তারা ছিল গভীরভাবে সন্দিগ্ধ ও আত্মবিশ্বাসহীন; বাঙালির আন্দোলনে লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন হতে পারে এটা তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি। স্বভাবগত আত্মবিশ্বাসহীনতার সঙ্গে তাদের মনস্তত্ত্বে ভর করেছিল বিদ্যমান সুবিধা হাতছাড়া হওয়ার ভীতি। পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যনীতির অভিঘাতে তাদের সুপ্ত-সত্তায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে উঠলেও গণআন্দোলনের পিছল পথে পা বাড়ায়নি। সন্তুষ্টি-ক্ষোভের মিশ্র-অনুভূতি নিয়ে তারা গণআন্দোলন থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে; এমনকি বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং গণআন্দোলনে গণমানুষের সক্রিয়তাকে এই মেধাগর্বী আমলারা স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে। ওসমানের বসের মধ্য দিয়ে উনসত্তরের গণআন্দোলনে বাঙালি আমলাদের জড় ও দোদুল্যমান ভূমিকাকে ইলিয়াস খোলাসা করেছেন এভাবে :

> 'বসের বস লোকটি ল', অর্ডার ও ডিসিপ্লিনের ১ জন নিষ্ঠাবান উপাসক। ওদিকে কারো সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হলেই ফিসফিস করে, 'পাঞ্জাবিরা একেবারে শেষ করে ফেললো। বাসটার্ড রেস, কারো জন্যে মিনিমাম কনসিডারেশন নেই।' কিন্তু বিশৃঙ্খলা সহ্য করার লোক তিনি নন, 'পলিটিশিয়ানদের কথায় নেচে লাভ কী? এরা পাওয়ারে ছিলো না? বাঙালি মিনিস্টারের কোটা কোনোদিন খালি ছিলো? নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, সোহরাওয়ার্দী, এরা প্রাইম মিনিস্টার হয়নি?—রেজাল্ট?—এভরিবডি নোজ।' এরপর সিগ্রেটে গোটা দুয়েক টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে গভীর দীর্ঘশ্বাস এবং সমস্যার সমাধান ছাড়ে, 'উই নিড প্রপার প্রেস ইন দ্য পলিসি মেকিং। অফিসাররা ছাড়া এসব করবে কে? ঐসব ডেমাগগ পলিটিশিয়ান্স?' ... ওসমানের বসটি এমনিতে খুব বাঙালিঅন্ত প্রাণ। মেয়েকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ালেও ছায়ানটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখায়। আবার বাঙালি পলিটিশিয়ানদের ওপর লোকটি অতোটা চটা নয়, বরং তাদের সঙ্গে তার অনেক আগেকার পরিচয় প্রসঙ্গ সুযোগ পেলেই জানায়।' (পৃ. ২৮-২৯)।

—দো-আঁশলা গোছের সুবিধাবাদী এই আমলা চরিত্রটি ইলিয়াস নির্দয়ভাবে এঁকেছেন কোনো আরোপণ বা বাস্তবাতিরেক কোনো রঙের ব্যবহার না ঘটিয়েই; এবং এক্ষেত্রে লেখক নিখুঁত বাস্তবতার সুদক্ষ রূপকার। আমলাদের প্রতি ইলিয়াসের এই নির্দয়তার হেতু ঐতিহাসিক কার্যকারণেই নিহিত। ইতিহাসের নিবিড় পাঠক ইলিয়াস জানেন, ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের সর্বাপেক্ষা উপনিবেশিত মানুষ এই আমলারা। মুখে ইংরেজি বুলি আর গায়ে স্যুট-টাই পরিয়ে অসভ্য ভারতীয়দের কিয়দংশকে 'আধুনিক' অভিধা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অবশিষ্ট অসভ্য ভারতীয়দের শাসনে। এই আমলারা পশ্চিমা প্রভুদের মতোই ভারতবর্ষীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দেখেছে অর্ধনগ্ন, বর্বর হিসেবে। কলোনিয়াল শাসকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুবিধার বিনিময়ে তাঁরা এদেশের মানুষকে সীমাহীন দুর্ভোগ আর অপমান উপহার দিয়েছে। জনবিরোধী এই আমলারা পাকিস্তানি শাসনামলেও অভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যার প্রতিফলন দেখি শওকতের ভাষ্যে : 'সিভিল সার্ভিসের লোকজন সবসময় ডিক্টেটরদের ডোমেস্টিক সার্ভেন্টের সার্ভিস দেয়। খোঁজ নিয়ে দেখেন আইয়ুব খান হাগলে ছুচে দেয় কারা? আবার তাদের নিজেদের হোগাও সব সময় ক্লিন করে রাখতে হয়—। ... দে হ্যাভ টু রিমেইন অলওয়েজ প্রিপেয়ার্ড টু গেট ফাক্‌ড বাই দেয়ার মাস্টার এ্যান্ড দ্য মাস্টার মে রিফিউজ এ ডার্টি এ্যানাস! ... যেসব

বাঙালি ব্যুরোক্র্যাটরাও ... কিন্তু একসেপশন নয়।' (পৃ. ২২৪-২৫)। ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে জনমনস্তত্ত্বে আমলাদের সম্পর্কে একটি ধারণা মিথের মর্যাদা পেয়েছে, তা হলো– এরা 'ব্রিলিয়ান্ট প্রডাক্টস অব ইউনিভার্সিটি। এরা কাউরে পরোয়া করে?' (পৃ. ১৬২)। কিন্তু বাস্তবতা হলো এরাই সবচেয়ে আপসকামী এবং সুবিধাবাদী। আমলা তথা ভদ্রলোকশ্রেণির এই সুবিধাবাদিতার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা আঁকেন হোম মিনিস্ট্রির সেকশন অফিসারের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এনএসএফের গুণ্ডারা তার স্ত্রীকে ধর্ষণের জন্য অপহরণের উদ্যোগ নিলে তার আচরণ ছিল হাস্যকর রকমের অনুনয়-বিনয়ের। স্ত্রীর অপহরণের দৃশ্যটি সে অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করে এবং স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসে। এমতাবস্থায় খিজির থানা বা পার্শ্ববর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাহায্য নিতে বললে সে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এই বলে, 'না। তা হয় না। আরো বিপদ হবে। ওরা এক ঘণ্টা ওয়েট করতে বললো না? এসে আমাকে না পেলে ফায়ার হয়ে যাবে। চাকরি বাকরির কথা সব বলে ফেললাম, শুওরের বাচ্চারা আমার ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেবে।' (পৃ. ৭২)। ক্যারিয়ার রক্ষার জন্য সে কোনোপ্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই স্ত্রীকে ধর্ষিত হতে দেয় এবং গুণ্ডাদের নির্দেশ মতো স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য অপেক্ষাও করে। এই স্বার্থান্ধ ও মেরুদণ্ডহীন আমলারা শাসকগোষ্ঠীর অনুগত দাস হিসেবেই কাজ করেছে, গণআন্দোলনে শরিক হওয়ার সাহস বা তাগিদ কোনোটিই তাদের ছিল না। তাই গণআন্দোলনে বাঙালি রাজনীতিবিদ এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয়তাকে তারা হয় সমালোচনায় বিদ্ধ করেছে, অথবা খুব সতর্কতার সঙ্গে নিষ্ক্রিয় সমর্থন জানিয়েছে। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ডিসিপ্লিন খোঁজা এই বড়সাহেবদের কেউ কেউ রাজপথের মিছিলে নেমে আসে, যেমন- ডিআইটির চেয়ারম্যান; আর যারা মিছিলে আসেনি, তাদের পক্ষে যুক্তি হলো– 'সরকারের মধ্যে থাইকাও সরকারের বারোটা বাজান যায়'। (পৃ. ১৬২)।

উপন্যাসের আখ্যানে অফিসের মাঝারি, নিম্ন-মাঝারি কর্মচারিদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও শ্রেণি-চরিত্র অনুসারেই বিম্বিত হয়েছে। তারা বসের দুর্দশায় উল্লসিত, হরতালে খুশি, কিন্তু আন্দোলনে নিম্নবর্গীয় মানুষদের অতি সক্রিয়তায় বিরক্ত। নানা সংলাপে ধরা পড়ে তাদের চিন্তাধারা : 'খালি পিওনদের বলছেন কেন? রিকশাওয়ালা, বাস কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, কুলি এদের তেজটা দেখছেন? আরে আইযুব খান গেলে তোদের লাভটা কী? তোরা মিনিস্টার হবি? নাকি অফিসে এসে চেয়ারে বসবি?' (পৃ. ৩০)। আন্দোলনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবস্থান পুরোভাগেই, কিন্তু তাদের ভূমিকা সম্ভাব্য মধ্যবিত্তশ্রেণির সমানুপাতিক। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, বাঙালি নেতৃত্বের ক্ষমতাকাঠামোতে সেই বৈষম্যের অবসান হতে পারে, এই সম্ভাবনা তাদেরকে গণআন্দোলনে প্রণোদিত করেছে। ইলিয়াস আমাদের সামনে স্পষ্ট করেন, গণআন্দোলনে বাঙালি মধ্যবিত্তের সম্পৃক্ততা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীস্বার্থে বলয়িত; সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সর্বাত্মক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে স্পর্শ করেনি।

মিছিল-মিটিংয়ে প্রান্তিক মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বেপরোয়া আত্মবিসর্জনের বিষয়টিকেই ঔপন্যাসিক উনসত্তরের গণআন্দোলনের সারবস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তারা চেয়েছে তাদের জীবনে চেপে বসা শোষণ-পীড়নের অবসান, স্বস্তিদায়ক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা। তাই তাদের আন্দোলন কেবল পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে ছিল না, এই আন্দোলনের সীমা প্রসারিত হয়েছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। খিজিরের বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দৃশ্যত পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে হলেও তার ক্রোধের উৎস মহাজন রহমতউল্লাহ্। এই মহাজনই তার প্রধানতম শত্রু––তার আত্মপরিচয়হীন জীবনের যাবতীয় সংকটের উৎস। আপাত আশ্রয়দাতার ভূমিকায় এই মহাজনই তার জীবনটাকে স্বপ্নহীন করে দিয়েছে। অসহায়ত্বের ফাঁদে ফেলে সে তার মা ও স্ত্রীর শরীরের দখল নিয়েছে, তাকে সংসারচ্যুত করেছে, এমনকি তার ঔরসজাত সন্তান হত্যার উদ্যোগ নিয়েছে। খিজির জানে, তার শত্রু মহাজনের ক্ষমতার উৎস পাকিস্তানি শাসনযন্ত্র; ক্ষমতাকেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দিতে পারলেই মহাজনের হাত থেকে তার মুক্তি মিলবে। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শিক প্রেরণা বা ক্ষমতাকেন্দ্রে নিজেকে জড়ানোর তাগিদ নয়, কেবলি মহাজনের মতো স্থানীয় শোষকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যই খিজির উন্মত্তের মতো আন্দোলনে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খিজিরের আত্মভাষ্যে মেলে তার সাক্ষ্য : 'মিছিলে যাই কি আলাউদ্দিন মিয়ার লাইগা? তামাম ঢাকার মানুষ মিটিং করে না? মানুষ চেতছে, তর মহাজনের বাপের বাপ, দাদার দাদা, ––আইয়ুব খানের দিন বলে খতম হইয়া আইতাছে, তার হোগার মইদ্যে আড়াই ইঞ্চি পাইপ ঢোকে, তার ফাল পাড়া দেখে ক্যাঠায়?' (পৃ. ১৭৪)। তার কাছে আইয়ুব খানের পতন মানে মহাজনের ক্ষমতাচ্যুতি। মিছিলে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে সে মহাজনের বিরুদ্ধে ধুয়া ধরে। সমবেত জনতাকে মহাজনের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। শুধু মহাজনের পতন নয়, স্থানীয় প্রভাবশালীদের ক্ষমতাবলয় ভাঙাও তার আকাঙ্ক্ষা, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় হোটেলে আগুন-লাগানোর পক্ষে তার যুক্তিতে : 'মিছিলে যায় আর হোটেলের মালিক হালায় উপর থাইক্যা দুইটা পানিভরা ঠিলা ফালাইয়া দেয়! এতোগুলি মানুষরে বেইজ্জত করে, হালাগো হিম্মতটা দেখছেন? বুঝলেন না? সইবার পারে না। গরীব মানুষ সিনা ফুলাইয়া রাস্তার মইদ্যে নাড়া লাগায়া হাঁটে, হালাগো কইলজা এক্কেরে ফালা ফালা হইয়া যায়! এতোগুলা মাইনষেরে তরা বেইজ্জত করস, পাবলিকে উংলি চুষবো?' (পৃ. ১৬৬)। প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষদের কাছে উনসত্তরের গণআন্দোলন ছিল আর্থ-সামাজিকক্ষেত্রে নিজেদের অপরায়ণ ঘোচানোর এক অপার হাতছানি। গণআন্দোলনের প্রভাবে সমাজের উচ্চশ্রেণির প্রতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহমতউল্লাহ্-আলাউদ্দিনের প্রতি রিকশাচালকদের দুর্বিনীত আচরণে। মিছিলে গাড়ি দিতে নারাজ আইয়ুব খানের বশংবদ রহমতউল্লাহ্। রিকশাচালকদের ঠেকানোর জন্য সে ভাড়া করে বজলুসহ কিছু প্রান্তিক লোককে। রহমতউল্লাহ্র লোকদের মারপিট করে গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বের হয়ে পড়ে রিকশাওয়ালারা। রহমতউল্লাহ্র দাপটের কাছে যারা ছিল নিতান্ত অসহায়, তারাই রহমতউল্লাহ্কে উল্টো অসহায় করে দিয়ে একে একে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে গ্যারেজ খালি হওয়া দেখা ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। রহমতউল্লাহ্র সাহায্যে এগিয়ে আসে আলাউদ্দিন, তার সঙ্গে যোগ দেয় ইউনিয়ন লিডার ও কিছু ছাত্র নেতাও; কিন্তু তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রতিরোধ কোনোটিই কাজে আসেনি। প্রথমে খালি হয় রহমতউল্লাহর গ্যারেজ, পরে একে একে শূন্য হতে থাকে মহল্লার অন্য গ্যারেজও। শেষপর্যন্ত জয় হয় অনিয়ন্ত্রিত রিকশাওয়ালাদেরই; অসহায় রোষ প্রকাশ ছাড়া আলাউদ্দিনের কিছুই করার থাকে না। যে-সময়টিতে শহরে মহাজনদের ক্ষমতাকাঠামোটিকে কার্যত অচল করে দেয় রিকশাচালকেরা, একই সময়ে গ্রামপর্বেও চলে খয়বার গাজীর ক্ষমতাকেন্দ্র ভাঙার উন্মত্ত আয়োজন। আলি বক্স-চেংটুরা 'এলাকার মাথা' বলে সম্মানিত ব্যক্তি খয়বার গাজীর বিরুদ্ধে গণআদালত বসায়, বিচারে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ক্ষিপ্ত জনতা প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে : 'বার হ শালা, গরুচোরের সর্দার বার হয়া আয়! তোর গোয়ার মদ্যে আছেলা বাঁশ সান্দায়া দেওয়া হবে, বারা!' (পৃ. ১৮৭)।

গ্রাম-পর্বের চেংটুদের লড়াইও মুখ্যত স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে পরিচালিত। স্থানীয় বিত্তশালীদের হাতে যুগপরম্পরায় শোষিত-নিষ্পেষিত হওয়ার যন্ত্রণা তারা জীবনযাপনের প্রাত্যহিকতার মধ্য দিয়ে ভোগ করেছে, রাষ্ট্রীয় শোষণ-বৈষম্য তাদের কাছে দূরাগত ব্যাপার। তবে শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার সূত্রে চেংটুর মতো প্রান্তিক মানুষেরা কেন্দ্র-স্থানীয়ের যৌগপত্যে গড়ে ওঠা শত্রুর ক্ষমতা-জালটি শনাক্ত করতে পেরেছে। প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকচক্রের ক্ষমতার ভিত গড়ে উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সমর্থন ও সক্রিয়তায়; আর স্থানীয় প্রভাবশালীদের ক্ষমতার উৎস কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্টপোষকতা এবং রাষ্ট্রকাঠামোর সহযোগিতা। স্থানীয় শোষকদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীকে হটাতে হবে এবং কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীর হটানোর জন্য স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামো ভাঙা প্রয়োজন। তাই চেংটুদের আন্দোলন কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে খয়বার গাজীর ক্ষমতাবলয় ভাঙায় কেন্দ্রীভূত। শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই চলে চেংটুদের সংগ্রাম। চেংটু তার প্রলেতারিয়েত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন এবং সংগ্রামে তার অবস্থান ও লক্ষ্যটাও পরিষ্কার : 'সোগলির বিপদ হবো কিসক? হামাগোরে আবার বিপদ কি? হামাগোরে জমি নাই, জিরাত নাই, ঘর নাই, ভিটা নাই, ধান নাই, মরিচ নাই,––বিপদ বিসম্বাদ হলে হামাগোরে নোকশান কি?' (পৃ. ১২৫)। গ্রামীণ সম্পদশালী শোষকদের পতন মানেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে শোষণমুক্তির

সম্ভাবনা। উনসত্তরের গণআন্দোলনের মধ্যে নিঃস্ব, দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ করেছিল সেই সম্ভাবনার সংকেত, যা তাদের প্রাণিত করেছিল জীবন বাজি-রাখা সংগ্রামে। তাই চেংটুদের কাছে উনসত্তরের গণআন্দোলন শুধু রাজনৈতিক কেন্দ্র দখলের বিষয় ছিল না, সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কটিকে ভেঙে ফেলাই ছিল এই আন্দোলনের অন্তঃসার। চেংটুর বাবা নাদু প্রামাণিক যেখানে সামন্ত-প্রভুর পদাঘাতের ব্যথাকে সযত্নে ব্যবহার করে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটিকে জিয়ল রাখে, চেংটু সেখানে এ-সম্পর্কটিকে চিহ্নিত করে প্রভুর প্রতি চিরস্থায়ী অধীনতা হিসেবে এবং সীমাহীন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই সামন্ত-ক্ষমতাকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে : 'পিঠ তো ভাঙছে একজন, এখন বাকি আছে বুকখান। তুমি গাজীগেরে ঘরত যাও, খয়বার মিয়ার পাও আছে দুইখান, বুকখানা প্যাতা দিও। খাম কর্‌্যা দিবো ... নাথিগুড়ি যা খাবার চাও তাড়াতাড়ি খায়া আসো। কুনদিন যায়। শুনবা গাজীর ব্যাটার দুইটো ঠ্যাংই ভ্যাঙা দিছে, তখন নাথি দিবো কি দিয়া?' (পৃ. ১১৬)। গাজীর সঙ্গে আপসরফার প্রস্তাবে চেংটুর সাফ জবাব : 'ঐ খুনীর সর্দারের কাছে যায় কোন শালা? হামি ওর ভাত খাই, না উই হামাক জর্ম দিছে? তার কাছে হামার কিসের ঠেকা?' (পৃ. ১১৪)। স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোটিকে ভেঙে দিয়ে নিম্নশ্রেণির ক্ষমতায়নই ছিলো চেংটুদের আন্দোলনের প্রেরণা। উনসত্তরের গণআন্দোলনের এই অন্তর্নিহিত প্রেরণার প্রকাশ ঘটে একটি প্রতীকী চিত্রে : 'কথা বলতে বলতে চেংটু কখন যেন উঠে পড়েছে দালানের ভাঙা স্তূপে। আনোয়ার এবার ভালো করে তার দিকে দেখলো। আনোয়ারের দাদাজী মারা যাওয়ার ৩ বছর আগে এই বৈঠকখানা দালানে চিড় ধরে, নতুন করে তৈরি করার জন্য গোটা দালান ভেঙে ফেলা হয়। সেই বছর তার মৃত্যু হলো। এরপর আর কিছু করা হয়নি। চেংটু সেই স্তূপের উঁচু চূড়ায় দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার মুখ অস্পষ্ট।' (পৃ. ১১৭)। পুরনো দালানের ভাঙন আর তার অবশেষের ওপর চেংটুর চড়ে বসা ক্ষমতা-সম্পর্কের নতুন বিন্যাসকেই ইঙ্গিত করে। স্পষ্টতই এই আন্দোলন নিম্নবর্গের মানুষের কাছে শুধু অটোনমির ব্যাপার ছিল না, এর গভীরে ছিল জীবন্মুক্তির স্বপ্ন।

শহর-গ্রাম নির্বিশেষে নিম্নশ্রেণির মানুষ চেয়েছিল গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকাঠামোটিকে নিজেদের অনুকূলে পুনর্বিন্যস্ত করতে; বিপরীতে উচ্চশ্রেণিভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব চেয়েছিল কেন্দ্র-প্রান্তে বিন্যস্ত ক্ষমতাকাঠামোটিকে বহাল রেখে ক্ষমতাকেন্দ্রে নিজেদের নতুনভাবে সংস্থাপিত করতে। গণআন্দোলনের অন্তঃস্রোতে গরিবের ক্ষমতায়নের যে সম্ভাবনা ছিল, সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন পার্টি-রাজনীতি সেই সম্ভাবনাকে অনুমোদন দেয়নি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্দোলনে নিম্নশ্রেণির মানুষের ব্যাপক সমাগম চেয়েছে আন্দোলনকে বেগবান ও ফলপ্রসূ করার তাগিদে, তবে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে নিজেদের মুঠোয়। আলাউদ্দিনের আত্মভাবনায় ধরা পড়ে এই আকাঙ্ক্ষার কথা : 'এদের ছাড়া আন্দোলন হয় না, কিন্তু এদের হাতে আন্দোলন চলে গেলে মুশকিল।' (পৃ. ১৮৪)। গণমানুষের অতি-সক্রিয়তায় তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হতে থাকে পার্টি-রাজনীতি ও বিপ্লবী রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত ছকের বাইরে। ফলত রাজনৈতিক 'সংগঠনের ক্যারেক্টার আর এই মুভমেন্টের ক্যারেক্টার আলাদা' (পৃ. ২২৫) হয়ে যায়। এই আন্দোলনে কেন্দ্রীয় সরকারের ভিত যেমন কেঁপে ওঠে, তেমনি নড়বড়ে হয়ে যায় স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোও। গণআন্দোলনের এই বিপ্লবী চেহারায় আলাউদ্দিনরা ঘাবড়ে যায়। শ্রেণি-সংগ্রামের উপাদানযুক্ত এই আন্দোলনকে তারা শান্তি ও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে অস্বীকার করতে থাকে; অভ্যন্তরীণ শ্রেণিশোষণের প্রসঙ্গটি ধামাচাপা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের তত্ত্বটিকেই মোক্ষম করে তোলে। 'আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ দূর' (পৃ. ১৮০) করার সর্বজনীন সংগ্রাম হিসেবে প্রচার চালায়। নিজেদের পক্ষে অনুকূল শ্রেণিসংগ্রামের লক্ষণযুক্ত এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বামপন্থি দলগুলোর ছিল না। নিজেদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় কাবু হয়ে পড়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন। বামপন্থি রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই খিজিরকে আন্দোলন করতে হয় আলাউদ্দিনের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। এ-যুক্তিতেই আলতাফের আত্মবিশ্বাসী উক্তি : 'শোষিত বাঙালি মাত্রই আমাদের সঙ্গে থাকবে।' (পৃ. ২২৫)।

গণমানুষের সমর্থন ও আস্থা সমর্পিত ও সংহত হয় মধ্যবিত্ত-নিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে। বলাবাহুল্য, শোষিত বাঙালির অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আপসহীন ও আত্মত্যাগী নেতৃত্বগুণে শেখ মুজিব পরিণত হন গণমানুষের আস্থার প্রতীকে। গণমানুষের ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ প্রভাবই জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের মনে জুগিয়েছিল আন্দোলনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভরসা। এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় আলাউদ্দিনের জবানিতে : 'দ্যাখো না! শেখ সায়েবে বারাইয়া আহুক। শেখ সায়েব আইলে এইগুলির হাউকাউ থামে!' (পৃ. ২৭৯)। তবে শেখ মুজিবের মুক্তির অব্যবহিতপূর্বের টলটলায়মান অবস্থায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যুক্তিগুলোকে তারা ক্রমাগত সামনে আনতে থাকে। সমাজের উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনতার সংগ্রামকে জাতীয় ঐক্যবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করতে থাকে আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের নেতারা। এমনকি মাওলানা ভাসানীর পার্টি সমর্থক শওকতের মুখেও শোনা যায় অভিন্ন ভাষ্য : 'বাঙালি জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠার সময় এটা, এখন পাঞ্জাবিদের কোণঠাসা করো। এখন শ্রেণিশত্রু মারার নামে এ্যানার্কি তৈরি করলে বাঙালি মিডল ক্লাস সেট্‌ল্ড হতে পারবে?' (পৃ. ২৫৪)। আন্দোলনের তুঙ্গমুহূর্তে শেখ মুজিবের মুক্তিই হয়ে ওঠে আন্দোলনের শলামুখ। আন্দোলন দমনে সরকারের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী নির্বিচার গুলি চালায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে রাষ্ট্র নিজেই পরিণত হয় আইনভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানে। বেপরোয়া দমন-পীড়ন সত্ত্বেও পূর্ব-বাংলার ওপর শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়তে থাকে—রাজপথ চলে যায় উন্মত্ত জনতার দখলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অফিস-আদালত থেকে বের হয়ে আসে অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, শহর-গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতেও ধস নামে, আইয়ুব খানের পাঁড় দালাল মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভিড় জমায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পতাকাতলে, অথবা নিষ্ক্রিয় অবস্থান নেয়। অর্থাৎ উত্তাল জনতাই তখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়, সরকারের ভূমিকা তখন নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের; ওসমানের ভাষায় : 'মানুষ ঠিক রি-এক্ট করছে না। মানুষ এবার এ্যাকশনে নেমেছে, রি-এ্যাক্ট করছে বরং গভমেন্ট, রাদার কাওয়ার্ডলি।' (পৃ. ৩০)। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে। শেখ মুজিবের মুক্তিই চিহ্নিত হয় গণআন্দোলনের সাফল্য হিসেবে। কারণ বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে ষড়যন্ত্র খাড়া করেছিল, তা ধসে পড়ে শেখ মুজিবের মুক্তির মধ্য দিয়ে। একই সঙ্গে বিধ্বস্ত হয় আইয়ুব খানের 'লৌহ মানব' ইমেজ এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার নৈতিক বৈধতা। অচিরেই পতন ঘটে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের, উনসত্তরের গণআন্দোলনকে তাই অভিহিত করা হয় গণঅভ্যুত্থান বলে। এখানেই ঔপন্যাসিক ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি দেখান যে, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষের ক্ষমতায়নের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এবং বিপ্লবী চারিত্র্য ধারণ করেছিল তা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায় শেখ মুজিবের কারামুক্তির পরে এবং তারই মধ্যস্থতায়। এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে তাঁর ভূমিকা তখন সরকারের সহযোগীর। রেসকোর্সের বিশাল জনসমাবেশে—যে সমাবেশে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়— শেখ মুজিব উন্মত্ত জনতার প্রতি শান্তির আহ্বান জানান, তাঁর আহ্বান অনবরত প্রচার হতে থাকে সরকারি বেতারকেন্দ্র থেকে : '... শহিদদের রক্তে রঞ্জিত আন্দোলন যেন উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। সব রকম প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে তাঁর প্রাণপ্রিয় দেশবাসী যেন আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করেন।' (পৃ. ২৮৪)। কারামুক্ত শেখ মুজিবের আহ্বানেই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ নিভে যায়। তারপরও গণমানুষের ঢল বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, তার নমুনা রেসকোর্স-ফেরত জনতার অভিজাতশ্রেণির আস্তানা ঢাকা ক্লাবে আক্রমণ। উচ্ছৃঙ্খল জনতার এই আক্রমণে বিরক্ত এক আওয়ামী লীগ কর্মী বক্তৃতা ঝাড়ে : 'ভাইসব, আপনারা এই জায়গা ছেড়ে দয়া করে চলে যান। আমাদের আন্দোলন এখন চূড়ান্ত সাফল্যের পথে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করে এনেছি। এই ক্লাব, এইসব দালানকোঠা, —সব এখন আমাদের সম্পত্তি। বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এসবের মালিক। এসবের ক্ষতিসাধন করা মানে নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগানো। গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে এরকম উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করবে।' (পৃ. ২৮৩)। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের স্ট্রাইকে চরম বিরক্ত আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন : 'কিসব দাবি দাবি নিয়ে স্ট্রাইক করেছে, ১০ ঘণ্টা হয়ে গেলো কারেন্ট নাই। ... এইভাবে ধর্মঘট করলে কষ্ট পায় কারা? তারা কি বাঙালি

নয়? হাসপাতালে বাঙালি রোগীদের কতো কষ্ট!' (পৃ. ২৮৩)। বাঙালি জাতির ঐক্যের কথা বলে গ্রামপর্যায়েও চলে শ্রেণিসংগ্রাম অবসানের কৌশলী খেলা। আনোয়ারের মামা গণশত্রুদের পাশে নিয়ে বৈরাগীর ভিটায় বিজয় সভা করে এবং প্রদান করে শ্রেণিসংগ্রামবিরোধী অনলবর্ষী বক্তৃতা : 'ভাইসব অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে আমাদের আন্দোলন আজ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। বাঙলার জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙলার মানুষ আজ পশ্চিমাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে। এই বিজয় সম্ভব হলো কেন? ––এই বিজয়ের একমাত্র কারণ হলো বাঙালির জাতীয় ঐক্য। কিন্তু ভাইসব, ঐক্যের প্রয়োজন কি শেষ?––না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র আজো চলছে। এই মুহূর্তে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে হানাহানি করি, বাঙালি হয়ে বাঙালির বাড়ি জ্বালাই, একে হত্যা করে ওর ফসল কেটে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি তার সুযোগ নেবে কারা? ... যারা বারোশো মাইল দূর থেকে আমাদের সম্পদ শোষণের কর্মে লিপ্ত, যারা আমাদের সোনার বাঙলাকে আজ শ্মশানে পরিণত করেছে, যারা বাইশ বছর ধরে বাঙলাকে তাদের বাজার ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না––।' (পৃ. ২৮৪)। চেংটুর পরিষ্কার করা বৈরাগীর ভিটা হয়ে ওঠে 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'-র বিজয় মঞ্চ। গণআন্দোলনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে নব্য মহাজন আলাউদ্দিনের দল। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আবেগের যথেচ্ছ অপব্যবহারে নিশ্চিত হয় খয়বার গাজী, রহমতউল্লাহ্, অফিসের বড়কর্তা কিংবা ঢাকা ক্লাবের বাঙালি মাতালদের মতো শোষকদের পুনর্বাসন। আর আন্দোলনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় গণমানুষের মুক্তির প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মী চেংটু, জেল-জুলুম-হুলিয়া নেমে আসে বিপ্লবী নেতা আলিবক্স আর হাজার কর্মীর ওপর। এভাবে ইলিয়াস উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে উপস্থাপন করেন সর্বজনীন মুক্তির সম্ভাবনা-জাগানো 'বেহাত বিপ্লব' হিসেবে।

ঔপন্যাসিক প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে গিয়ে উনসত্তরের গণআন্দোলনকে ব্যর্থ বলেই থামেননি, তিনি এই ব্যর্থতার কার্যকারণগুলোকেও খতিয়ে দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে আনোয়ারকে ব্যবহার করেছেন পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে। আনোয়ার শ্রেণিগতভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি। ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা মনন ও চিন্তায় অগভীর এই মধ্যবিত্তশ্রেণির ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীবলয়ের বাইরে সর্বজনীন কল্যাণচিন্তায় উপনীত হওয়ার বৌদ্ধিক সামর্থ্যে যেমন ঘাটতি ছিল, তেমনি অভাব ছিল শ্রেণিসীমা পেরিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ-সংকটকে গভীর আন্তরিকতায় উপলব্ধির এবং দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধন সৃষ্টির সদিচ্ছার। উৎপাদনকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কহীন এই শ্রেণিটি ঐতিহ্যগতভাবেই আত্মসুখপরায়ণ, ক্ষমতাপ্রলুব্ধ এবং সংকীর্ণচিত্ত। নিখাঁদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও সর্বজনীন মানবিকবোধে প্রাণিত উদার-হৃদয় ব্যক্তিত্ব বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে ছিল দুর্লভ। ফলত শিক্ষিত নাগরিক পরিসরে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সর্বৈব অধিষ্ঠান ঘটে, বিপরীতে শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতি ছিল প্রায় অনুপস্থিত। শ্রেণিরাজনীতির প্রতি অনেকে রোমান্টিক ভাবাবেগে আক্রান্ত হলেও মধ্যবিত্তীয় মনস্তত্ত্বের কারণেই তারা সর্বান্তঃকরণে এই রাজনৈতিক দর্শনে সমর্পিত হতে পারেনি। তাদের জীবনবিবিক্ত রাজনৈতিক চিন্তা শেষপর্যন্ত তত্ত্বে সীমাবদ্ধ এবং মতাদর্শিক দ্বন্দ্বে আকীর্ণ। নিরেট বাস্তবতার কারণেই *চিলেকোঠার সেপাই*-এর আখ্যানে উনসত্তরের গণআন্দোলনের শহুরে পটে শ্রেণি-রাজনীতির ভূমিকা খুব গৌণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজপথের মিছিল-মিটিংয়ে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থিদের যুগপৎ উপস্থিতির উল্লেখ আছে। বামপন্থিদের স্লোগান শোনা গেলেও তাদের সাংগঠনিক পরিচয় পাওয়া যায় না। ছিন্নসূত্রের মতো উল্লেখে বামপন্থিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে খণ্ড-বিখণ্ড এবং রাজনৈতিক ভণ্ডামির চিত্রটিই উন্মোচিত হয়। গণমানুষের শৃঙ্খলমুক্তির কথা বললেও তাদের অধিকাংশই ছিল প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের লেজুড়। তাদের ভূমিকা অনেকটা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের বামপন্থি শাখার নেতৃত্বের, বামপন্থি রাজনীতির নেতৃত্ব মধ্যবিত্তশ্রেণির নিয়ন্ত্রণে রেখে ভিন্ননামে প্রান্তিক মানুষদের জাতীয়তাবাদী পতাকাতলে সমবেত করার। পাঞ্জাবি-পায়জামা-চশমা-পরা ইউনিয়ন লিডারকে লেখক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তুলে ধরেন শহুরে বামপন্থি নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে।

বামপন্থি রাজনীতির দ্বন্দ্বদীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু প্রেক্ষাপটে আনোয়ার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। মন-মননে ও বিশ্বাসে সে একজন নিষ্ঠাবান বামপন্থি; শোষণ ও শৃঙ্খলমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন সে দেখে, বিদ্যমান বামপন্থি

রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মসূচির মধ্যে আঁটে না। তাই তার কোনো সাংগঠনিক অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না; কার্যত তার কোনো রাজনৈতিক সংগঠনই নেই। সাংগঠনিক কাঠামোর বাইরে সে এককভাবেই চালিয়ে যায় তার শ্রেণিসংগ্রাম; তৎপর হয় কাঙ্ক্ষিত 'বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশনস'-এর ক্ষেত্র সন্ধানে। (পৃ. ৩৪)। প্রকৃত বামপন্থী সংগঠনের অভাবে খিজির যেমন বাঁধা পড়ে আলাউদ্দিনের শেকলে, আনোয়ারও ঢাকা শহরে রাজনীতির 'বেস' পায় না, বিপ্লবের জন্য ছোটাছুটি করে 'নোয়াখালী না পাবনা না যশোর না চিটাগাং'-এর (পৃ. ৩৪) মতো দূরবর্তী প্রান্তিক জনপদে। নগর-পর্বের আন্দোলনে আনোয়ারকে আমরা দেখি নিষ্ক্রিয় ভূমিকায়, এখানে তার ভূমিকাটা চলমান আন্দোলন নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের। তর্ক-বিতর্কে ও কথোপকথনে অভিব্যক্ত মন্তব্যে ধরা পড়ে তার রাজনৈতিক চেতনার সূক্ষ্মতা ও গভীরতা। যেমন, খবরের কাগজগুলি এনএসএফের গুণ্ডা খোকার গ্রেফতারের ঘটনাকে ধর্ষণের অপরাধে আইনি পদক্ষেপ বলে সাদামাটা খবর হিসেবে প্রচার করে, সেখানে আনোয়ার একে চিহ্নিত করে খোকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ হিসেবে : 'শেলটার বিহান্ড দ্য বার। গভর্মেন্ট দারুণ প্যানিকি। গভর্নর হাউসও এখন গুণ্ডাপাণ্ডাদের জন্য যথেষ্ট সেফ নয়।' (পৃ. ৭৭)। অন্যত্র আনোয়ার বলে, 'মানুষ কি রকম কনশাস আর মিলিট্যান্ট হয়ে উঠেছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রামের যারা মাথা, কয়েক জেনারেশন ধরে যারা ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে আসছে, কর্নার্ড হতে হতে তাদের অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে, ঘোরতর মুসলিম লীগাররা পর্যন্ত শেখ মুজিবের রিলিজ চায়। না হলে ওদের সেভ করবে কে?' (পৃ. ৪৩)। এধরনের ভিন্নধর্মী ও অন্তর্ভেদী মূল্যায়নে আনোয়ার উনসত্তরের গণআন্দোলনের ব্যাপকতা ও বৈধতার প্রতিবেদন তৈরি করতে করতেই উপস্থাপন করে এই আন্দোলনের অন্তর্গূঢ় ব্যর্থতার ভিন্নধর্মী বয়ান। ক্ষমতামুখী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জনবিমুখী প্রবণতাকে এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে আনোয়ার : 'ক্ষমতায় গিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের কোনো গ্যারান্টি তো তোমরা দিচ্ছো না। অটোনমি অটোনমি করে পাকিস্তান হয়েছে। তোমাদের অটোনমিতে বাঙালি সিএসপি প্রমোশন পাবে, বাঙালি মেজর সায়েব মেজর জেনারেল হবে, বাঙালি আদমজী ইস্পাহানী হবে। তাতে বাঙালি চাষার লাভ কী?' (পৃ. ৮০)। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনোন্নয়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি না থাকলেও আন্দোলনকে বেগবান করার প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মত্যাগকে ব্যবহার করেছে বেশ চাতুর্যের সঙ্গে। আনোয়ার প্রসঙ্গটিকে এনেছে এভাবে : 'তা ওর (তালেবের) ছোটো ভাইকে পাবলিকলি কান্নাকাটি করার জন্যে পটাতে পারলো? কেন ওর বাপ টাপ নেই? ... বুড়ো অথর্ব টাইপের বাপ হলে আরো জমে। কাঁপতে কাঁপতে স্টেজে দাঁড়াবে, কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যাবে। ব্যাস, সার্থক জনসভা! তারপর নাটক শেষ হলে অর্গানাইজাররা বুড়োর পাছায় লাথি মেরে বলবে, ভাগ শালা, বাড়ি গিয়ে প্যানপ্যান কর!' (পৃ. ৭৭)। আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়েও আনোয়ার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে না আন্দোলনের এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে। স্টুডেন্ট ফ্রন্টের ১১ দফা এই আন্দোলনে যুক্ত হলে সে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার যুক্তি পায় : 'স্টুডেন্ট ফ্রন্টে মনে হচ্ছে একসঙ্গে কাজ করা যাবে।' (পৃ. ৭৭)। শহরের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতিপর্বেই গ্রাম থেকে আসা চিঠির সুবাদে সে খোঁজ পায় তার কাঙ্ক্ষিত সংগ্রামের যথার্থ ক্ষেত্রের এবং কালবিলম্ব না করেই শহর ছেড়ে ছুটে যায় প্রত্যন্ত গ্রামের সংগ্রামী ময়দানে। স্থানীয় এক কলেজের ছাত্র আলিবক্স সেই রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা; চেংটু, করমালির মতো হাজার হাজার গরিব চাষা এই দলের কর্মী। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যেই চলে তাদের সংগ্রাম এবং সংগ্রামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও তাদের কাছে পরিষ্কার—গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের বিষয়ে আনোয়ার প্রকৃতই আন্তরিক; নেতৃত্ব নয়, সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবেই সে ভূমিকা রাখতে চায়; নিবেদিত হয় মূর্খ জনতার মিলিট্যান্ট স্রোতকে সংগঠিত করতে। কিন্তু গণমানুষের সঙ্গে তার এক অদৃশ্য অথচ অলংঘনীয় ব্যবধান স্পষ্ট হতে থাকে। যাদের সঙ্গে লড়তে চায় তারা তার নিকটাত্মীয় আর যাদের হয়ে লড়তে চায় জীবনবাস্তবতা ও ভাষার ক্ষেত্রে তার দুর্ভেদ্য দূরত্ব। অবচেতনে নিহিত 'নিজ-অপর' দ্বিত্বতা তাকে প্ররোচিত করে আলিবক্স, চেংটুদেরকে অধস্তন হিসেবে ভাবতে। সুপ্তচৈতন্যে সক্রিয় উচ্চৈমন্যতার কারণে আলিবক্সের নেতৃত্ব তার অহংবোধে ঝাঁকুনি দেয়; আলিবক্সের আঞ্চলিকতা-মিশ্রিত কথোপকথনে এবং লোকসংস্কারের মান্যতা তার নাগরিক মনে ধিক্কার জাগায়।

খয়বার গাজীর ক্রোধ ও প্রতিহিংসা থেকে চেংটুকে সে আন্তরিকভাবেই রক্ষা করতে চায়, কিন্তু চেংটুর অশিক্ষিত গোয়ার্তুমি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন আর বোধবুদ্ধিহীনতায় বিরক্ত হয়। তবে চেংটুর অকপট চিন্তা এবং সংগ্রামের দৃঢ়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আনোয়ার উপলব্ধি করে তার ভদ্রলোকি শিক্ষা ও তত্ত্বসর্বস্ব রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা। বটগাছের অশরীরী প্রাণিটিকে ঘিরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বৈরথে উন্মোচিত হয় তার উন্মূলিত মানসের আদর্শিক কৃত্রিমতা। চেংটু এই অশরীরী সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলে আর আনোয়ার এই ধরনের বিশ্বাসকে অপরাধ বলে চেংটুকে জ্ঞান দিতে দিতে ভয়ে চুপসে যায়। আনোয়ার সংস্কারমুক্ত হয়েও যেমন ভূতের ভয়ে কেঁপে ওঠে, তেমনি বিপ্লবী হয়েও শ্রেণিগত পিছুটানে পরাজিত হয়। আনোয়ারের এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বিচারিতার অন্তর্নিহিত কারণ সংগুপ্ত রয়েছে তার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। আনোয়ার ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রকল্পের মানুষ; তার চিন্তার শেকড় পাশ্চাত্যবাহিত 'আধুনিক' শিক্ষায়। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস তত্ত্বে সীমাবদ্ধ এবং অনিবার্যতই তা অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম। পক্ষান্তরে চেংটুদের রাজনৈতিক বিশ্বাস আসে নিজেদের জীবনযাপনের সংরক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এবং সংগ্রামের প্রেরণা আসে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বভূমের মানুষদের সংগ্রামী আত্মত্যাগের শতাব্দী-পরম্পরার ঐতিহ্য থেকে। ফকির-সন্ন্যাসীদের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামই তাদের সংগ্রামের অন্তঃশীল প্রেরণা। অথচ ফকির-সন্ন্যাসীদের আত্মত্যাগ ঔপনিবেশিক ইতিহাসে অপাঙ্‌ক্তেয় বা বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাসের পাঠক হিসেবে আনোয়ার এই লোকশ্রুত ইতিহাসকে গালগল্প বলে তাঁদের বীরত্বকে খাটো করে দেখেছে। উত্তরবঙ্গের জনচৈতন্যে সেই আত্মত্যাগী বীরেরা ইতিহাসের খেরোপাতা পেরিয়ে এক চিরঞ্জীব সংগ্রামী সত্তা। জালাল মাষ্টারের বর্ণনায় : 'ইঞ্চি দুয়েক উঁচু বাঁধানো একটি ইটের বেদি। চুনসুরকির খাবলা খাবলা প্লাস্টার এবং তার নিচে পাতলা চওড়া ইট। ... বৈরাগীর ঘর। এইখানে বৈরাগী বাস করছে।' (পৃ. ১৪৩)। আনোয়ার যখন বৈরাগীর প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ করে তখন জালাল মাস্টার জানায়, 'বৈরাগীটা নয়। এককালের সম্মানিত ব্যক্তি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ।' (পৃ. ১৪৪)। জালাল মাস্টারের সঙ্গে কথোপকথন সূত্র ধরেই আনোয়ারের গ্রহিষ্ণু চেতনায় ধরা পড়ে তার পঠনলব্ধ ইতিহাসজ্ঞানের বিভ্রম; লোকশ্রুত কাহিনির মধ্যে সন্ধান পায় প্রকৃত ইতিহাসের বুনিয়াদ। তাই লোক-কাহিনীকে নিরেট মূর্খ জনগোষ্ঠীর যুক্তিহীন কল্পনা বলে তাচ্ছিল্য করতে করতেই আনোয়ার উপনীত হয় বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের অন্দরমহলে। নিম্নবর্গের মানুষদের বিরুদ্ধে এদেশের উচ্চবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ইতিহাসও উঠে আসে এই ইতিহাসের সূত্র ধরে : 'ইংরেজদের হাতে তখন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এদেশী বড়োলোকেরা পরিণত হলো তাদের লাঠিয়ালে। মার খেয়ে সন্ন্যাসী-ফকিরের দল ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক। যমুনা তখন ছোট নদী, খাল বললেও চলে, তার পশ্চিম তীরে নওখিলা পরগণার এক প্রান্তে বনজঙ্গল। বনেজঙ্গলে লুকিয়ে তারা আরো বড়ো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ভবানী পাঠক কিছুদিনের জন্য এদিকে আসেন। ... শেষের দিকে ভবানী পাঠক ও মজনু শাহ একজোট হয়েছিলেন। তো এখানে এসে ভবানী পাঠক মিলিত হন ফকিরদের পলাতক কিছু কর্মীর সঙ্গে। বটগাছের তলায় এই বেদী ভবানী পাঠকের তৈরি। তাঁর কি স্থায়ী ঠিকানা থাকতে পারে? ভবানী পাঠক তাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে কখনো চলে যান মহাস্থান, বাঙালি নদী পেরিয়ে, করতোয়া পেরিয়ে মহাস্থান––মহাস্থান ফকিরদের বড়ো ঘাঁটি। কখনো বা ঘোড়াঘাট। আবার গঙ্গা পার হয়ে বিহার। কিন্তু বিদ্রোহ আস্তে আস্তে নিভে যায়। বিদ্রোহ নির্বাপিত হওয়ার গল্প বলতে বলতে জালালউদ্দিনের কণ্ঠও মিইয়ে আসে, 'খানদানীরা কেউ অগ্রসর হয়া ফকির-সন্ন্যাসীদের সহায়তা করলো না। তারা সব নীরব হয়া থাকলো।' (পৃ. ১৪৫)। জালাল মাস্টারের এই বিলাপের মধ্যেই ক্রান্তদর্শী আনোয়ার পেয়ে যায় বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বজাতিদ্রোহী ভূমিকার গোড়ার খবর : 'না নীরব ঠিক থাকেনি।... ইংরেজদের চাকর-বাকরে পরিণত হয়ে তারা হামলে পড়লো দেশবাসীর ওপর'। (পৃ. ১৪৫)। এই 'বড়ো বড়ো ঘরের' উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হয় এবং তাদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। অশিক্ষিত-দরিদ্র জনতা তাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলেও স্বভাবধর্ম অনুসারেই তারা ছিল জনবিরোধী; আনোয়ারের ভাষায়, 'বড়ো ঘরের মানুষদের যদি বিদেশি শাসকরা পোষে, তাহলে এই দুইয়ের স্বার্থ যদি এক হয় বড়ো ঘরের শিক্ষিত মানুষ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আসবে কেন?' (পৃ. ১৪৫)। ঔপনিবেশিক শাসনপর্বের মধ্যবিত্তের সঙ্গে ব্রিটিশোত্তর পাকিস্তানপর্বে দুই দশক পরে সংঘটিত উনসত্তরের গণআন্দোলনে

নেতৃত্বদানকারী বাঙালি রাজনীতিবিদদের মনস্তত্ত্বগত মৌলিক পার্থক্য আনোয়ার প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি আন্তরিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও নিজেও মুক্ত হতে পারেনি মধ্যবিত্তীয় জড়তা থেকে; অবহেলিত শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশার শরিক হতে চেয়েও অন্তর্গত বৈপ্লবিক শক্তির অভাবে পলায়নে বাধ্য হয়। তবে প্রখর অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভব করে নিজের সীমাবদ্ধতা আর গভীর অসহায়ত্বে প্রত্যক্ষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধুয়োয় সমাজবিপ্লব-সম্ভাবনার উপায়হীন আত্মসমর্পণ।

মধ্যবিত্তের অসহায়ত্ব ও স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত শিল্পিতরূপ আনোয়ার। সে সমাজবিপ্লব চায়, কিন্তু শ্রেণিগত পিছুটানে পরাজিত হয়। চেংটুদের সঙ্গেই সে সংগ্রাম করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে শ্রেণিগত ব্যবধান ঘোচাতে ব্যর্থ হয়। আনোয়ার চেংটুকে রাজনীতি বোঝাতে ব্যর্থ হয়, কারণ দুজনের মধ্যে ভাষার ব্যবধান বিদ্যমান। শ্রেণিগত দূরত্বের কারণেই চেংটু তার সঙ্গে কথোপকথনেও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। খয়বার গাজী, আফসার গাজী, হোসেন আলি পিতার প্রসঙ্গ টেনে আনোয়ারের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনটিকে সজীব রাখতে সচেষ্ট হয়। আত্মীয়তার বন্ধনটিকে আনোয়ারও উপেক্ষা করতে পারে না। ধারাবর্ষা চরে আনোয়ার দুর্ধর্ষ হোসেনের অতিথি হয় আত্মীয়তার সুবাদেই; আত্মীয়তার বন্ধনকে কাজে লাগিয়েই সে পচার বাপের গরু উদ্ধারের চেষ্টা চালায়। মেঝো চাচা ও জালাল মাস্টার আত্মীয়তার সম্পর্কের অবতারণা করে আনোয়ারকে খয়বার গাজীর সঙ্গে শত্রুতা থেকে নিরস্ত করতে চায় এবং তাতে কাজও হয়। খয়বার গাজী, হোসেনদের কঠোর শাস্তি প্রত্যাশা করলেও তার অবচেতনে সক্রিয় থাকে তাদের প্রতি সহানুভূতি। জনদাবির বিপরীতে গণআদালতে ঘোষিত খয়বার গাজীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকে বিলম্বিত করার উদ্যোগ নেয় এবং এক্ষেত্রে তার যুক্তিটিও পাশ্চাত্য-আধুনিকতার নৈতিকতাজাত : 'মরার আগে একটা দিন দিলে কি এসে যায়? সরকারী আদালতেও তো দেয়!' (পৃ. ২৬৭)। অবশেষে তার ইচ্ছানুসারেই খয়বার গাজী সময় পায় এবং রাখা হয় আনোয়ারেরই জিম্মায়। গাজীর আত্মীয়-স্বজন আওয়ামী লীগের ছাত্র-কর্মীরা দলে দলে এসে চড়াও হয়। প্রত্যক্ষত আনোয়ার না-চাইলেও তার কারণেই ধূর্ত খয়বার গাজী বেঁচে যায় এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ছত্রছায়ায় নিজের সামাজিক প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে চেংটু শিকার হয় হত্যাকাণ্ডের, হুলিয়া নেমে আসে আলিবক্সের ওপর। চেংটুর পরিষ্কার করা বৈরাগীর ভিটায় জাতীয়তাবাদীরা বিজয় সভা করে, সেই সভায় সদম্ভে বিচরণ করে আশরাফ গাজীর মতো গণশত্রুরা। নিজের প্রতি আত্মধিক্কারের পাশাপাশি নিম্নশ্রেণির মানুষের পক্ষে কাজ করার জন্য তাকে ধিকৃত হতে হয় আত্মীয়দের দ্বারা। এরপর পরাভূত আনোয়ারের গ্রামে আর কিছুই করার থাকে না, শহরের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন ছাড়া। ওসমানের অসুস্থতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে অনন্যোপায় আনোয়ার। শহরে ফিরেও সে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিক-নির্দেশনা পায় না, গ্রামে প্রত্যাবর্তনের উন্মুখ আহ্বান সত্ত্বেও উদ্যম পায় না। 'আত্মীয়-স্বজনের পুরুষানুক্রমিক শয়তানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া, আবার যাদের সঙ্গে কাজ করবে তাদের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েও কাজ অব্যাহত রাখা—এসব ভাবলেই অবসাদে গা এলিয়ে পড়ে। এ অবসাদ আনোয়ারের একার নয়। মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক কর্মীদের অনেকেরই সাময়িক বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার যৌক্তিক অবসানের পরবর্তী ধাপ।' (আনু মুহাম্মদ, ইলিয়াস ও প্রশ্নের শক্তি, ২০২২, গ্রন্থিক প্রকাশন, ঢাকা : ৩১-৩২)। গ্রাম থেকে আগত পলাতক কেরামত আলীর কাছে শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর ভয়াবহ নিপীড়নের সংবাদ পেয়েও সে আর গ্রামে যেতে চায় না। করমালির সামনে যুক্তি উপস্থাপন করে : 'ইচ্ছা হলো আর এই অসুস্থ লোকটাকে ফেলে রেখে চলে গেলাম, তা তো হয় না করমালি। হুট করে চলে গেলে কোন কাজ হয়?' (পৃ. ৩১২)। তদুপরি চাকরি দেওয়ার নামে করমালিকে সে শহরে আটকাতে চায় এবং শহরে রেখে তাকে রাজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত করতে উদ্যোগ নেয়। এক্ষেত্রে বাস্তববুদ্ধি থেকেই গ্রামের প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে আনোয়ারের শ্রেণিগত অলঙ্ঘনীয় দূরত্বটা বুঝতে পারে এবং আনেয়ারকে যথাযথ স্থানে রেখেই প্রত্যুত্তরে বলে: 'হুট কর‍্যা নিজের মানুষ ত্যাগ কর‍্যা আপনে যাবেন ক্যামন কর‍্যা? দ্যাখেন না, গাও ছাড়া এটি থাকতে হামার কেমন উটকা উটকা ঠেকে!' (পৃ. ৩১২)। মামলার ভয় আর চাকরির প্রলোভন সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে থাকার প্রেরণা থেকে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কেরামত গ্রামে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আর ওসমানের শুশ্রূষার অজুহাতে আনোয়ার বন্দি হয় চিলেকোঠায়। আনোয়ারের

এই ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে উনসত্তরের গণআন্দোলনের ব্যর্থতাকেই অভিব্যঞ্জিত করে। সমালোচকের পর্যবেক্ষণে এই ব্যর্থতার দুটি কারণ চিহ্নিত হয়েছে : 'এক) শ্রেণির ব্যাপারটা শুধু জ্ঞান, রাজনীতি বা সহানুভূতি দিয়ে অতিক্রম করা যায় না। ব্যাপারটা আরো গভীর। দুই) কার্যকর শ্রেণি-রাজনীতির জন্য কেবল জ্ঞান আর সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়। দরকার নিবিড় অভিজ্ঞতা–– বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রে বসবাস ছাড়া সেই অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়।' (মোহাম্মদ আজম, দীপন, সেপ্টেম্বর ২০২৩ : ৩৮৮)। আনোয়ারের সূত্রে শ্রেণিআন্দোলনের ব্যর্থতার দুটো কারণ উঠে আসে আলোচ্য পাঠকৃতিতে––এক. শ্রেণিআন্দোলনে যুক্ত শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীদের অনভিজ্ঞতা ও শ্রেণিচ্যুতিতে অক্ষমতা এবং গণমানুষের সঙ্গে তাদের নিবিড় যোগাযোগের ঘাটতি; দুই. নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার সীমাবদ্ধতা। গণআন্দোলন যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সাবেক অবস্থাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানুষের প্রকৃত মুক্তির প্রশ্নে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক সীমাবদ্ধতা যে অত্যন্ত প্রকট––এ-সম্পর্কে আনোয়ারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। গ্রামপর্বে ব্যর্থ আনোয়ার শহরে ফিরে গিয়েও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় না; কার্যত সে কোনো কর্মপদ্ধতিই ঠিক করতে পারে না। তাই পরাভূত আনোয়ার সক্রিয় আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে সরে গিয়ে অসুস্থ ওসমানের সেবার ছলে আশ্রয় নেয় সংকীর্ণ চিলেকোঠায়।

ঔপন্যাসিক জনমুক্তির রাজনীতির পরিণামী ব্যর্থতার কারণ হিসেবে মধ্যবিত্তের শ্রেণিচ্যুত হওয়ার অক্ষমতা এবং যথার্থ কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতির অনুপস্থিতিকেই চিহ্নিত করেছেন এবং আনোয়ারের মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে চিলেকোঠায় বন্দি করা ইলিয়াসের মতো একজন শ্রেণিরাজনীতিচেতন লেখকের অভীপ্সা নয়। চেংটু, খিজিররা তাদের প্রবল সক্রিয়তায় উনসত্তরের গণআন্দোলনে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ও স্থানীয় অভিজাতশ্রেণির ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে ফেলার যে-সম্ভাবনা তৈরি করেছিল, সে-সম্ভাবনা আপাত ব্যর্থ হলেও ঔপন্যাসিক প্রান্তিক জনতার মুক্তির স্বপ্নকে অলীক ভাবেন না; সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করেন অন্য কোনো সময়ের। শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতি ফলপ্রসূ করার জন্য নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্বেই লেখক আস্থা রাখেন; তবে এই নেতৃত্বকে শ্রেণির ঘেরাটোপ পেরিয়ে গণমানুষের জীবনযাপনের অভিন্ন সত্তায় গ্রথিত হতে হবে। শ্রেণিসংগ্রামে মধ্যবিত্তের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকার প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে ওসমানের মধ্য দিয়ে। মৃত খিজির মাটিতে নামতে পারছে না, সাহায্য চাচ্ছে ওসমানের আর উপন্যাসের শেষে অশরীরী খিজিরের অপ্রতিরোধ্য আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওসমান ঘরের তালা ভাঙে এবং আনোয়ারকে ঘুমন্ত রেখে সবার অগোচরে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। এটা কেবল নিজের কাপুরুষ, আত্মকেন্দ্রিক, পলায়নবাদী ওসমানের বিকারগ্রস্ত পরিবর্তন নয়, মধ্যবিত্তের শ্রেণিকাঠামোকে ভেঙেচুরে দেওয়া এক বৈপ্লবিক রূপান্তর : 'এখন খাকি বলো কালো বলো, সবুজ বলো সাদা বলো––কারো সাধ্যি নাই যে তাকে ওসমান গনি বলে শনাক্ত করে।' (পৃ. ৩২৯)। যদিও বদ্ধতাকে ভাঙতে আশ্রয় নেয়া হয়েছে মায়াবিভ্রান্ত বাস্তবের, তবে ওসমানের এই রূপান্তর ঘটেছে গণঅভ্যুত্থানে ব্যাপক আলোড়নের চাপে খুব স্বাভাবিক-স্বচ্ছন্দ গতিতে।

ওসমান দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এক উন্মূলিত মানুষ। ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ঘিরে নবোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে যে স্বপ্নের জাগরণ ঘটেছিল, সেই স্বপ্নের পেছনে ধাবিত হতে গিয়েই ওসমানের বাস্তু-উন্মূলন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে পরিবারের সদস্যদের রেখে সীমান্ত পেরিয়ে একাকী আবাস গাড়ে পুরনো ঢাকার পূতিগন্ধময় বস্তিপরিবেষ্টিত এক ঘিঞ্জি বাড়ির চিলেকোঠায়। বাড়ির মূলকাঠামোর সঙ্গে চিলেকোঠার সম্পর্কটি যেমন আলগা, ততোধিক আলগা এই বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে ওসমানের সম্পর্ক। এমনকি চিলেকোঠার সঙ্গে ওসমানের সম্পর্কটিও কেবল রাত্রিবাস ও প্রাতঃকৃত্যে সীমাবদ্ধ। খাবারের জন্য ছুটতে হয় হোটেল-রেস্তোরাঁয়। সরকারি এক অফিসের সামান্য কেরানি সে; কর্মশেষে ঘরে ফেরার কোনো প্রেরণা নেই। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা এড়াতে সে বন্ধুদের আড্ডায় যোগ দেয়; সেই আড্ডাসঙ্গীদের কাছেও সে একজন উনমানুষ। সে সবার কথা শোনে, কিছু বলে না। কদাচিৎ কিছু বললেও শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে তা যথেষ্ঠ জোরালো নয়। উদ্ভিন্ন ওসমান স্বজনহীন নগরে ভিড়ের মধ্যেও বিবিক্ত, একান্ত আত্মগত এবং অন্তর্মুখীন। এই প্রগাঢ় নৈঃসঙ্গ্যে তার মনে পর্যাবৃত্তে পুনরুৎপাদিত হতে থাকে গ্রামে যাপিত স্বজনলগ্ন শৈশব-

কৈশোরের স্বপ্নমেধুর স্মৃতি। এই স্মৃতি তার নৈঃসঙ্গ্যবোধকে প্রগাঢ় করে তোলে। সে মদ খায়, টক ঢেঁকুর তোলে, ন্যাংটো মেয়ের ছবিতে চুমো দেয়, যৌনতৃপ্তি খোঁজে স্বমেহনে।[৫] এ বাড়িতেই সে ঘনিষ্ঠ হয় কিশোর রঞ্জু ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। রঞ্জুর গোলাপি ঠোঁটের আকর্ষণে তার চিত্তচাঞ্চল্য জাগে; কারণ ডাকনামের সামঞ্জস্যসূত্রে ওসমানের কাছে রঞ্জু তার দ্বিতীয় সত্তা; বাল্যস্মৃতিমথিত যে সত্তাকে সে ফেলে এসেছে পূর্ব-বাস্তুতে। রানুর সান্নিধ্যে সে আকৃষ্ট হয় না বা রানুকে প্রেমিকা করে নেয়ার সম্মতি সত্ত্বেও তাতে সে সাড়া দেয় না। এটা অন্তর্মুখী ওসমানের বৈকল্যগ্রস্ত মানসের বিকৃতি, যার উদ্ভব ঘটেছে স্বজনবিচ্ছিন্নতাজনিত উৎকণ্ঠা ও চরম নৈঃসঙ্গ্য থেকে। এই ব্যক্তিগত মানসিক বৈকল্যের সঙ্গে নব্য-ঔপনিবেশিক সমাজ-পরিসরে রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্যসৃষ্ট হতাশার চাপে ওসমান পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে আত্মবিবরে ঢুকে পড়ে। চিলেকোঠার কোটরে আত্মমগ্ন থেকেই ওসমান রাস্তায় পিচ্চিদের পুলিশের গাড়িতে ঢিল ছোঁড়া এবং মিছিল-মিটিংয়ে হাড্ডিসার, কুৎসিত দর্শন খিজিরের বেপরোয়া সক্রিয়তায় উত্তেজনা অনুভব করে। কূপমণ্ডূকতা ঝেড়ে ধীরে ধীরে পা বাড়ায় মিছিলে, ক্ষীণ কণ্ঠে স্লোগানও ধরে। ওসমান হয়ে ওঠে এই গণআন্দোলনের ঘোরতর সমর্থক; ভালো কর্মী হয়ে ওঠার চেষ্টাও করে। মাঝে মাঝে মহিমান্বিত মৃত্যু প্রত্যাশা করে; আবার মৃত্যু এড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও চালায়। এই দ্বিধা তার শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য––'মধ্যবিত্তের গা-বাঁচানো স্বভাব, কর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত বাধা, নৈতিকতার ছক-বাঁধা গণ্ডিতে অভ্যস্ত জীবন'। (মোহাম্মদ আজম, দীপন, সেপ্টেম্বর ২০২৩ : ৩৮৩)। তদুপরি ওসমান বন্ধুদের রাজনৈতিক বিতর্কের শ্রোতা হিসেবে গণআন্দোলনের যুক্তিগুলো বোঝার চেষ্টা করে। মধ্যবিত্তশ্রেণির ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচি ও জাতীয়তাবাদী জাগরণের উন্মাদনার তুলনায় নিম্নবিত্তশ্রেণির শোষণমুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষাই তার কাছে গণআন্দোলনের প্রাণবস্তু হিসেবে প্রতিভাত হয়। স্বার্থতাড়িত মধ্যবিত্তের হিসাবি সক্রিয়তার বিপরীতে নিম্নবর্গের মানুষের বেহিসাবি আত্মত্যাগই তার কাছে গণআন্দোলনের প্রাণস্পন্দন হিসেবে প্রতিভাত হয়। সে লক্ষ করে, প্রান্তিক মানুষদের সক্রিয়তা যত বেড়েছে, আন্দোলন ততই বেগবান হয়েছে; আর আসন্ন পতন ঠেকাতে শাসকগোষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠেছে। আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে তারা মিছিল-মিটিংয়ে চালাতে থাকে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। ওসমান খুব কাছ থেকে খিজিরের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে। খিজির খেটে-খাওয়া শোষিতশ্রেণির প্রতিনিধি। সমাজের উচ্চশ্রেণির স্বার্থপরতায় বিরক্ত ও বিদ্বেষী খিজিরকে ওসমান আবিষ্কার করে এক মানবহিতৈষী মানুষ হিসেবে। 'ফ্যাটি সোহরাবের' সাথে ঠাট্টা-তামাশা করতে করতেই বিপদগ্রস্ত এই অভিনেতাকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৌঁছে দেয় নিরাপদ গন্তব্যে। গণআন্দোলনে খিজিরের অংশগ্রহণ শোষক-পীড়কের হাত থেকে শোষিত জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে। ওসমান লক্ষ করে, শাসকশ্রেণির দমনপীড়ন বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মিছিলে খিজিরের বেপরোয়া ভাব। তাকে কোনোভাবেই রোখা যায় না, স্লোগান দিতে দিতে সে মিছিলের সামনে এগিয়ে যায়। খিজিরের মধ্যে সে দেখে আন্দোলনের আগুন : '... তার ভাঙা গালের উঁচু হাড়গুলো আগুনের আভায় লাল...।' (পৃ. ১৬৫)। খিজিরদের প্রবল সক্রিয়তায়ই গণআন্দোলন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। গণআন্দোলনের এই আগুনের মধ্যেই ওসমান নৈরাজ্য ও অবরুদ্ধতা থেকে সর্বাত্মক মুক্তির স্বপ্ন দেখে। আন্দোলনের একপর্যায়ে অনিবার্যভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় খিজির এবং খিজিরদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যেন পরাভূত হয় পাকিস্তানি স্বৈরশাসকগোষ্ঠী। কিন্তু গণআন্দোলনের এই আপাত সাফল্যের গভীর থেকে বের হয়ে আসে এর ব্যর্থতার পিঠ। কিছু মানুষের বদল হয় মাত্র, শ্রেণিকাঠামোয় কোনো রদবদল হয় না। শ্রেণিবিভক্ত অন্যায্য বাঙালি সমাজে খিজিরের ন্যায়প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয় আলাউদ্দিনদের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। খিজিরের মহৎ আত্মত্যাগের এই পরিণামী ব্যর্থতা ওসমানের মনোজগৎকে তছনছ করে দেয়। ধীরে ধীরে তার মধ্যে জন্ম নিতে থাকে এক জটিল মনোরোগ ––চিকিৎসাশাস্ত্রে এই রোগের নাম প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অবরুদ্ধ চিলেকোঠার মধ্যে সে অসংলগ্ন প্রলাপ বকতে থাকে; হত্যা করতে উদ্যত হয় রঞ্জুকে। রঞ্জুকে হত্যার মধ্য দিয়ে ওসমান তার নিজের সত্তাকেই হত্যা করতে চায়, যে সত্তার সঙ্গে মূলীভূত তার মধ্যবিত্তীয় শ্রেণিচেতনা। প্রচল ধারণামতে পাগল বা বাতুল বা অপ্রকৃতিস্থ বলা হয় তাদেরকেই, যারা সমাজের প্রচলিত আইন, অনুশাসন, মূল্যবোধ ও আচরণ অনুযায়ী

চলতে ব্যর্থ হয়। মিশেল ফুকো একে বলেছেন শ্রেণিচ্যুতি। সমাজে এই শ্রেণিচ্যুতিকে দেখা হয় নৈতিক স্খলন হিসেবে। এই পাগলদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সামাজিক বৈকল্য থেকে সমাজকে সুস্থ রাখার লক্ষ্যে; কঠোর নিপীড়ন-নির্যাতন-শাস্তিও এক্ষেত্রে বৈধ। আবার সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চিকিৎসাযোগে তাদেরকে সুস্থ করার উদ্যোগকে উচ্চনৈতিক দায়িত্ব হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। উপন্যাসে ওসমান পাগলের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থাপিত এবং তাকে সুস্থ করে তোলার নৈতিক দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নিয়েছে আনোয়ার। এটা আনোয়ারের শ্রেণিচ্যুত হওয়ার ব্যর্থতার বর্ধিতাংশ; সুস্থ করার মাধ্যমে ওসমানকে মধ্যবিত্তের শ্রেণিকাঠামোয় ধরে রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস। কিন্তু ওসমান আনোয়ারের সকল প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে অনিবার্য শ্রেণিচ্যুতির দিকে পা বাড়ায়। ওসমান আনোয়ারকে আর বন্ধু হিসেবে চেনে না; আনোয়ার তার কাছে শত্রুশিবিরের আর্মি অথবা পুলিশের লোক। এ-পর্যায়ে মূর্খ, নিঃস্ব, ব্রাত্য খিজিরই এখন তার জীবনের ধ্রুবতারা, খিজিরের আহ্বানে তালা ভেঙে বের হয়ে আসে ওসমান : 'খিজির দাঁড়াও বলে ওসমান পা বাড়ায়।... কিন্তু খিজিরের গতি বড়ো দ্রুত, ওসমান তাই পা চালায় একটু জোরে। ... হাওয়ায় হাওয়ায় রাত্রির জমাটবাঁধা কালো শরীর রঙ বদলায়। আকাশ তাই এই কালো, এই কালচে নীল, এই গোলাপী কালো, এই গোলাপী নীল, আবার দেখতে দেখতে নীলচে নীল। ... কিন্তু রাস্তায় মানুষ না থাকলে কি হবে, আশেপাশের বাড়িঘরের মানুষের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে গলি-উপগলি ফেঁপে উঠে গোটা সুভাষ বোস এভেন্যুকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জনসন রোডের মোহনায়। না, হাঁটার জন্য ওসমানকে তেমন কোনো উদ্যম নিতে হয় না, রাস্তার স্রোতে তার পা জোড়া ঢেউয়ের মতো এগিয়ে চলেছে। ... ওসমান তো প্রায় দৌড়েই চলছে, খিজিরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সোজা কথা? খিজির চলে পানির মধ্যে মাছের মতো। দ্যাখো তো এই লোকটির সঙ্গ নেয়ার জন্য ছুটতে হয় ওসমানকে।' (পৃ. ৩২৭)। ওসমান যখন তালা ভাঙায় ব্যস্ত, তখন আরামে ঘুমায় আনোয়ার। স্বপ্নে খোঁজে চেংটুকে, কিন্তু পায় জালাল মাস্টারকে, যে প্রচলিত সমাজকাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখায় সচেষ্ট। ক্ষতবিক্ষত দেহে রাস্তায় নেমে আসে ওসমান, খিজিরের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ওসমান ঢুঁ মেরে চলে বস্তির ঘরে ঘরে। (দ্র. পৃ. ৩২৯)। খিজির-কবলিত ওসমান নিজের মধ্যবিত্তীয় পরিসীমা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। দিশাহীন আনোয়ার যখন দিন বদলের আহ্বানে সাড়া দিতে অপারগ অথবা ইতস্তত, স্বপ্নদর্শীরূপে বের হতে পারছে না চিলেকোঠার স্বেচ্ছাবন্দিত্ব থেকে; বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে জীবনপ্রবাহের সংযোগ সাধনে ব্যর্থ আনোয়ার যখন চার দেয়ালের ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতে মশারির আড়ালে ঘুমাতে থাকে; তখন দরজা ভেঙে বের হয়ে আসে ওসমান। সাধারণ চোখে সে পাগল, কিন্তু অভ্যাসের ঘেরাটোপ ভাঙতে তাকে নিয়মাতীত হতেই হতো। আজকের বিধিশৃঙ্খলিত সভ্য দুনিয়াই আসলে উন্মাদের বন্দিশালা, বিচিত্র এক কূটাভাসে ঐ বন্দিত্বের বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে ওসমানকে পাতি বুর্জোয়া সমাজের রীতিনীতিকে চূর্ণ করে বের হতে হয় পথে। যে পরিসর ওসমান স্বাভাবিক অভ্যাসের জগতে খুঁজে পায়নি, তা সে খুঁজে পেল মিলিটারির গুলিতে নিহত খিজিরের অলৌকিক আহ্বানে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওসমান বের হয়ে এলো, আর উত্তীর্ণ হলো রূপকের বাস্তবতায়। এভাবে ইলিয়াস 'পাগলামিতত্ত্ব'কে যুৎসইভাবে কাজে লাগিয়ে পশ্চিম-প্রযোজিত কথিত-আধুনিকতা ও এর মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির কদর্য স্বার্থপরতা ও কপটতাকে তীর্যক ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন এবং এর বিপরীতে খিজিরের মর্মমূলে প্রোথিত সত্যনিষ্ঠতা, মানবিক দায়িত্ববোধ ও শোষণ-বঞ্চনামুক্ত কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে তার আত্মত্যাগী শুভবোধকেই মহিমান্বিত করেছেন।

প্রায় দুই শতকের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়েছে। কেবল দারিদ্র্য নয়, অশিক্ষা ও অপমানে তাদের মানবিক মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, তাদেরকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে অসভ্য, বর্বর, পশুতুল্য জনতা হিসেবে। মানুষ হিসেবে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর তাদের সকল সক্ষমতাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানি শাসনামলেও বাংলার আপামর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষের জীবনে বঞ্চনা-বিড়ম্বনার অবসান ঘটেনি। নতুন শাসকগোষ্ঠী পুরনো বিভাজনভিত্তিক শোষণের কাঠামোকে দৃঢ়তর করেছে। প্রতিরোধ আসে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে; দানা বেঁধে ওঠে

বাঙালি জাতীয়তাবাদ। দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় জর্জরিত একটি জাতিগোষ্ঠীর অগ্রসর অংশ হিসেবে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির ওপর নেতৃত্বের দায় বর্তায় এবং সময়ের দাবি মেনে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণও হয়। গণমানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অকৃপণ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে উনসত্তরের গণআন্দোলন সফল হয় এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামোর এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এক অবিসংবাদিত বাঙালি নেতৃত্বের অভ্যুদয় ঘটে; এই নেতৃত্বের কাছেই পরাভব ঘটে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর স্বৈরশাসকের। বাঙালি গণমানুষের অসংকোচ আস্থা ও অবিচল সমর্থনে ভর করেই বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন। এই আহ্বানে পূর্ববাংলার আপামর জনতা অভূতপূর্ব সাড়া দেয় এবং মরণপণ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা ঘটায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। তবে বাঙালি গণমানুষ আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রতি যতটা অসংকোচ আস্থা স্থাপন করেছিল, বঙ্গবন্ধু ও কতিপয় নেতা ব্যতিরেকে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃত্বই ততটা আস্থার প্রতীক হয়ে উঠতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন; তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল 'জনকল্যাণের জন্য ক্ষমতা'। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনে তাঁর দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীই বিশ্বাসী ছিলো না; বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন হওয়াটাই ছিল তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা। জনকল্যাণ নয়, ক্ষমতার পক্ষপুটে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাদের অভিপ্রায়। সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার বাইরে গণমানুষের আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে সর্বজনীন কল্যাণবোধে প্রাণিত হওয়ার মতো মানসিক সক্ষমতা, ঔদার্য ও দূরদৃষ্টি তাদের ছিল না। ঔপন্যাসিক এই পাঠকৃতিতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অভিঘাতে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সামূহিক সম্ভাবনার পটে তার ভবিষ্যৎ ক্ষমতাকাঠামোর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। উনসত্তরের গণআন্দোলনে এই সংকীর্ণচিত্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়। রাজনীতিতে শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরনো ক্ষমতাকাঠামোর জনবিদ্বেষী নেতাদের নিজেদের কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেয়। আর দমন-পীড়নের শিকার হয়ে রাজনীতির ময়দান থেকে নির্বাসিত হতে থাকে জনগণের অধিকার ও মুক্তির প্রতি দায়বদ্ধ রাজনৈতিক কর্মীরা। উপন্যাসে খিজিরদের রক্তসিক্ত সংগ্রামের সাফল্যের পটে রহমতউল্লাহ্‌র জায়গায় আলাউদ্দিন, খয়বার গাজীর জায়গায় আফসার গাজীরা ক্ষমতায়িত হয়, আর আনোয়ার তার শুভচিন্তার ব্যর্থতা নিয়ে ঢুকে পড়ে আত্মবিবরে, মাথায় হুলিয়া নিয়ে পলাতক হয় আলিবক্স, উদ্বাস্তু জুম্মনের ঠাঁই হয় কমলাপুর স্টেশন কি স্টেডিয়ামের বারান্দায়, কিংবা সদরঘাট টার্মিনালে। প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হতচেতন সমর্থনে ক্রমাগত সুদৃঢ় হতে থাকে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা; রক্তসিক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য অর্জিত বাংলাদেশের ক্ষমতাকাঠামোতেও তাদেরই দাপট। নতুন দেশে নতুন শাসকগোষ্ঠী আসে, কিন্তু থেকে যায় পুরনো শোষণমূলক ক্ষমতাকাঠামো। দুর্বৃত্তদের আধিপত্যে প্রতিহত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর কল্যাণমুখী রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা। নিজ দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন এবং অবশেষে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে নিজেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন তিনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক হঠকারিতা, চরম স্বার্থান্ধতা স্বাধীন দেশে গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দলিতমথিত করে দেয়। ইলিয়াস গণমানুষের স্বপ্নভঙ্গের বীজ উনসত্তরের গণআন্দোলনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জাতীয়তাবাদী বয়ানে সফল এই গণআন্দোলনকে অনেক সম্ভাবনা-জাগানো ব্যর্থ বিপ্লব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু গণমানুষের মুক্তির স্বপ্নকে তিনি ভুলে যান না, মুক্তির অনিঃশেষ সম্ভাবনায় তিনি আস্থাশীল। তাই তিনি আনোয়ারকে চিলেকোঠার চৌহদ্দিতে বন্দি করে ওসমানকে টেনে আনেন বিস্তৃত অঙ্গনে, যেখানে 'খিজিরের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ওসমান ঢুঁ মেরে চলে বস্তির ঘরে ঘরে।' (পৃ. ৩২৯)। লেখক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও প্রান্তিক মানুষদের মুক্তির স্বপ্নের অপমৃত্যুর জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্বের স্বার্থপরতাকে যেমন অভিযুক্ত করেন, তেমনি বাংলাদেশের সর্বজনীন কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব ও এদেশের সকল স্তরের মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির প্রশ্নে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিই অকুণ্ঠ আস্থা রাখেন; অপেক্ষা শুধু ওসমানের মতো শ্রেণি-কোটর থেকে বের হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণির সর্বমানবিকবোধে প্রাণিত দায়িত্বশীল ভূমিকায় নিবেদিত হওয়ার। কেবল ঔপনিবেশিক

শাসকচক্রের হাত থেকে ক্ষমতার হাতবদলকে তিনি স্বাধীনতা ভাবেন না, প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই আসবে, যখন ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকাঠামোকে দুমড়েমুচড়ে দিয়ে নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে। এর জন্য বিপ্লব দরকার; বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি আর বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিপ্লবের ভিত গড়ে উঠবে গ্রামে, কর্মসূচি আসবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে। গ্রামই হবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু, কারণ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বাস গ্রামে আর গ্রামই এদেশের সম্পদের উৎস। *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে আলিবক্স লেখকের অনুমোদিত বিপ্লবী চরিত্র এবং তার দল লেখকের অনুমোদন পাওয়া বিপ্লবী পার্টি। দলটির রাজনৈতিক কর্মীরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। তারা নিজেদের সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং সুসংগঠিত। আলিবক্স এই জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তর থেকে উঠে আসা নেতা; গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাষায় তার অনায়াস দখল। এই জনগোষ্ঠী মূলে সংস্থিত থেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। একারণেই করমালিকে চাকরির বন্ধনে শহরে আটকানো যায়নি, পুলিশি নির্যাতনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে সংগ্রামের ব্রত নিয়ে সে তার উৎসে ফিরে আসে। ভদ্রলোক, পুলিশ, মিলিটারির ত্রিপক্ষীয় আক্রমণ মোকাবিলা করেই এই দলের কর্মীরা তাদের বিপ্লবী কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। এর মধ্য দিয়ে লেখক স্বাধীন বাংলাদেশের অনিঃশেষ সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ রাজনীতির পথের দিকে ইশারা করেন।

উপন্যাসে নারীর প্রান্তিকতার বিষয়টিও বিশেষ তাৎপর্যে উপস্থাপিত হয়েছে। পুরুষ দ্বারা নারীর নিগৃহীত ও প্রান্তিক হওয়ার কার্যকারণ নিপুণ ডিটেইলসে উঠে এসেছে। নারীর দেহ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পুরুষ নারীকে প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেয়। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীর পুরো জীবনটাই কাটে পুরুষের অভিভাবকত্বে। তবে নারীর জীবনে পুরুষের প্রতাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৈবাহিক জীবনে। নারীর স্বামী ছাড়া কার্যত কোনো সম্পদ নেই; নিজের সম্পদও স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্বের আওতায় নিজের থাকে না। এ-অবস্থায় নারীর শরীর ও মনের ওপর নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালানো স্বামীর অধিকারে পর্যবসিত হয়। আর যে নারী পিতৃহীন অথবা সহায়সম্পদহীন, বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা তার মতো অসহায় আর কেউ নয়। এই অসহায়ত্ব তার ইচ্ছাশক্তিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়, পরিণত হয় নির্বাক পুতুল সত্তায়। অসহায়ত্বের ফাঁদে ফেলে পুরুষরা তার শরীরের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে; শ্রম নিংড়ে নেয়ার পাশাপাশি তার শরীরকে ব্যবহার করে যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী হিসেবে। সর্বোপরি মাতৃত্ব নারীকে চূড়ান্ত অসহায়ত্বে নিপতিত করে। সন্তানের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সে তার সর্বস্ব সমর্পণেও দ্বিধা করে না। খিজিরের মা ও স্ত্রী এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খিজিরের মা ফালু মিস্ত্রীর ঘর ছেড়ে পালিয়েছে স্বামীর নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে খিজিরকে বাঁচাতে। দু-মুঠো খাবার আর একটু আশ্রয়ের প্রয়োজনে গৃহকর্মে সারাদিনের গতর-খাটুনির পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে তাকে গতর-খাটাতে হয়েছে রহমতউল্লাহ্‌র যৌন-ভোগে। ছিনালিপনার ফলস্বরূপ তার অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয় এবং রহমতউল্লাহ্‌র নির্দেশে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে ব্যাপক রক্তপাতে তার মৃত্যু হয়। জীবন দিয়েও তার রেহাই মেলে না, কলঙ্কের দায় তাকেই বহন করতে হয়। অপরাধী রহমতউল্লাহ্‌র জবানিতেই সে চিহ্নিত হয় 'খারাপ মেয়ে মানুষ' হিসেবে। আর আশ্রয় প্রদানের প্রলোভনে জড়িয়ে রহমতউল্লাহ্ কেবল খিজিরের স্ত্রীর শ্রম ও যোনির দখল নেয়নি, তাদের দাম্পত্যজীবনের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দুই স্বামীর সংসার করেছে জুম্মনের মা; তবে স্বামী নয়, তার ওপর মহাজন রহমতউল্লাহ্‌র কর্তৃত্বটাই দৃশ্যমান। রহমতউল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই প্রথম স্বামী কামরুদ্দিনকে ত্যাগ করে খিজিরের সঙ্গে সে সংসার পাতে। পরবর্তীতে যখন খিজিরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কামরুদ্দিনের সঙ্গে পুনর্বিবাহের আয়োজন করে এবং গর্ভজাত সন্তান হত্যার উদ্যোগ নেয় তখনও জুম্মনের মা নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ রহমতউল্লাহ্‌র অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকে সে নিজের ও সন্তানের জন্য সুরক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাকে চটিয়ে সেই সুরক্ষাবলয় সে ভাঙতে চায়নি, বরং নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। তবে রহমতউল্লাহ্‌র যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে হতে তার মনোজগতেও যন্ত্রণা জমাট বাঁধে, তবে চরম অসহায়ত্বের কারণেই তা বিস্ফোরণের অবকাশ পায় না। রহমতউল্লাহ্ নির্বিবেকভাবে নারীকে চিরকালীন অধস্তন ও পুরুষের ভোগযোগ্য সামগ্রী হিসেবেই জেনেছে। নিজের জন্য

যেমন, অন্যের জন্যও নারীকে ভোগের উপাচার হিসেবে থালায় পরিবেশনের উদ্যোগ নেয়। স্কুল-ভেঙে তৈরি করা মার্কেটের মালিক মৌলিক গণতন্ত্রী লতিফ সর্দারের ছেলের সঙ্গে রানুর বিয়ের প্রস্তাব দেয়। শিক্ষা নয়, পুরুষ মানুষের যোগ্যতার মানদণ্ড হলো সম্পদ। আর বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামত তার কাছে গুরুত্বহীন। কন্যাপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে সে চাপ সৃষ্টির কৌশল নেয়। অসহায় মকবুল সাহেব ওসমানের সহযোগিতা চায়। নারীর প্রতি ওসমানের দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক। সে নিজের জীবনের বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারকে সমর্থন করে এবং এক্ষেত্রে সহযোগিতা করাটাকে দুর্গত মানবতার পক্ষে যুদ্ধ হিসেবেই বিবেচনা করে : 'কোনো মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার আয়োজন প্রতিহত করতে ওসমান সবসময় প্রস্তুত। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি তার সাহায্য চায় তো কথাই নাই, তার নিরাপত্তার জন্যে এগিয়ে না যাওয়া আর রায়টের সময় আক্রান্ত কোনো মহিলার আর্তনাদে সাড়া না দেওয়া একই ধরনের অপরাধ।' (পৃ. ২৩৯)। অপরদিকে আরেক ভদ্রলোক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মজীবনে উন্নতির প্রশ্নে নিজের অপহৃত স্ত্রীকে উদ্ধারে উদ্যোগী হয় না, নিরাপদে তাকে ধর্ষিত হতে দেয়। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে লম্পট রহমতউল্লাহ্ ও ঐ শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে শেষপর্যন্ত কোনো ফারাক থাকে না। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত পুরুষদের কাছে নারীর মর্যাদা 'অধম' ও 'অপর' হিসেবে এবং তার অস্তিত্ব ব্যবহারযোগ্য বস্তুর গণ্ডিতে আবদ্ধ। দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পায় না, নারীকেও মুক্তি দিতে সে অক্ষম। অথচ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণপ্রাচুর্যে বাঁচার এবং প্রত্যেকের নিজের মতো বিকাশিত হওয়ার অবাধ সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। উপন্যাসের পরিণামে সর্বহারা ওসমান উপনিবেশ-উত্তরপর্বে রাষ্ট্রনির্মাণের শর্ত ও প্রক্রিয়াগুলোকেই সামনে আনে।

নির্বাসিত একজন[৬]

কায়েস আহমদের *নির্বাসিত একজন* (১৯৮৬) একটি মিত কলেবরের উপন্যাস। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জঙ্গিজোশে অগ্নি-অশ্রু-মৃত্যুর ভেতর দিয়ে সংঘটিত দেশভাগের পর ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণাকাতর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পটভূমিতে এই উপন্যাসটি রচিত। জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে খোকার ক্লান্তিহীন লড়াইয়ে বিম্বিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘুর দেশান্তর, উদ্বাস্তুর অসহায়ত্ব ও অপরিচিত স্বজনহীন পরিবেশে নিঃস্বতার বেদনা। উপন্যাসটি বাহ্যত দেশভাগ, স্বাধীনতা ও দাঙ্গা এবং বিভাজিত দেশ ও সময়ে খোকার আত্মপরিচয় সন্ধানের কাহিনি; তবে নিহিতার্থে এই কাহিনি ব্যক্তিবিশেষের নয়, 'খোকা' এখানে দাঙ্গা ও দেশভাগের অভিঘাতে ছিন্নমূল ও সর্বস্বহারানো নামহীন এক বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর শহরের নিকটবর্তী এক প্রত্যন্ত গ্রামে খোকার জন্ম। জন্মাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে তার বসবাস; আর এই আজন্ম দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের ক্রূরতার ইতিহাস। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে কলকাতার অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীরামপুর ছিল একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্পসমৃদ্ধ শহর; বিশেষত চটকল, বস্ত্রশিল্প ও কাগজকলের জন্য বিখ্যাত। এই শিল্পসমৃদ্ধিই ইউরোপীয় বণিকদের প্রলুব্ধ করেছে এখানে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয় কলকাতাকে ঘিরে এবং অতি নিকটবর্তী হিসেবে এই এলাকা দ্রুতই উপনিবেশায়নের শিকার হয়। ঔপনিবেশিক অবশিল্পায়ননীতির আওতায় শ্রীরামপুরের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শিল্পের স্থানীয় মালিক ও শ্রমিকেরা ব্যবসা ও কর্ম হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে ও বেকার জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধাক্কায় কৃষি বিপর্যস্ত হয়, কৃষকের ছেলেরাও বেকারদলে সারিবদ্ধ হয়। বিপুল বেকারত্ব ও শোষণের অভিঘাতে দুর্বহ দারিদ্র্যে নিপতিত হয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। মহাজনি শোষণ পরিস্থিতিকে নাজুক করে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসন যেমন শোষণ-জুলুম-দুর্বৃত্তায়নের, তেমনি নৈতিক স্খলনের বিকৃত ব্যবস্থা। উপনিবেশিত জনগণের ভেতরে লোভ-লালসা-হিংসা উদ্রিক্ত করে সমাজের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেয়। উপনিবেশায়নের নিয়মেই বাংলার জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তর থেকে জন্ম নেয় একদল শোষকের। সংখ্যায় তারা অল্প, কিন্তু সম্পদশালী

এবং ঔপনিবেশিক শাসকের অনুকূলে তারাই সমাজনিয়ন্ত্রক। ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ সময়জুড়ে তারা উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করেছে প্রমত্ত ভোগে––মদ, নারী, জুয়ার মতো নৈতিকতারিক্ত কর্মকাণ্ডে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিমপর্বে এসে তাদের সঞ্চিত অর্থ সীমিতভাবে পাটকল, বস্ত্রশিল্পের মতো শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ পায়। বেকার জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ এই শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করে। তবে এই শিল্পোদ্যোগও ছিল শ্রমশোষণের হাতিয়ার। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি যুদ্ধের বাজার তৈরি হয়। যুদ্ধের মতোই এই বাজারও বৈনাশিক––যুদ্ধে সমর্থন, পণ্যসরবরাহ ও মুনাফা সবদিক থেকেই। এক শ্রেণির ধূর্ত ও নৈতিকতাভ্রষ্ট লোক যুদ্ধবাণিজ্যে পণ্য জুগিয়ে বিপুল মুনাফা হাতিয়ে নেয়। এই ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা খোকাকে পাই।

উপন্যাসের কাহিনি উন্মোচিত হয়েছে দাঙ্গার সংবাদে এবং খোকার শ্রীরামপুর ত্যাগের সহৃদয় পরামর্শে : 'শহরের হাওয়া বেশ গরম, কখন কি হয় বলা যায় না, তুই দেশে চলে যা।' (পৃ. ৭৯)। খোকা তখন যুবক এবং পেশায় ট্যাক্সিচালক। জাতিতে মুসলমান এবং শ্রীরামপুরের হিন্দু অধ্যুষিত জনপদে দুর্বল সংখ্যালঘু; সুতরাং হিংস্র দাঙ্গার সে সহজ লক্ষ্যবস্তু। চৌদ্দ বছরের কৈশোরে তার শ্রীরামপুরে আগমন এবং সময় পরিক্রমায় শহরটিকে আপন করে নেয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। নির্বিবাদী খোকা তাই পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে আমলে নিতে উদাসীন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের তীব্রতা এবং দাঙ্গার হিংস্র উন্মাদনা আঁচ করতে পারে স্ট্যান্ডে গিয়ে। শঙ্কর, মাধব, ফণি প্রমুখ যাদের সঙ্গে তার ঠাট্টা-কৌতুকের সম্পর্ক, তাদের চোখে সে প্রত্যক্ষ করে জান্তব ক্রূরতা : ' –এই শঙ্কর। আমার গলার আওয়াজে কি যেন ছিল। শঙ্কর চমকে তাকালো। আরে খোকা যে... কেমন যেনো জোর করে হাসতে গিয়ে থমকে গেলো। আমি ওর চোখের ওপর চোখ রেখেছি। দৃষ্টি ক্রমশঃ সরু হচ্ছে। জ্বালা করছে। স্পীডোমিটারের কাঁটার মতো রক্ত ওঠানামা করছে পা থেকে মাথায়।' (পৃ. ৭৯)। এভাবে অজানা আতঙ্ক, অবিশ্বাস আর বিদ্বেষে দীর্ঘদিনের সম্পর্কগুলো ভেতর থেকে ভেঙে পড়তে থাকে। আবার দাঙ্গার উন্মত্ততায় সকলেই শুভবোধ হারিয়ে রক্তখেকো জন্তু হয়ে যায়নি; তবে দাঙ্গাবিরোধী পক্ষ হিসেবে তখন তারা নিজেরাই সংখ্যালঘু। কারণ দাঙ্গাই তখন ভারতীয় ক্ষমতার রাজনীতির প্রাণবায়ু আর রাজনীতির কুশীলবেরা দাঙ্গার ইন্ধনদাতা। দাঙ্গার প্লাবন প্রতিরোধে ব্যর্থ হলেও মানবিকচেতনার মানুষেরা সংখ্যালঘুর জানমালরক্ষায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। গৌরদা, ধীরেনদা খোকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল এবং তাকে দ্রুত শহর ত্যাগের পরামর্শ দেয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় তাকে শ্রীরামপুর ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খোকার স্মৃতিতে অতীত, বর্তমান, সেদিন ও এদিনকার সব ছবি ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে দোলে; আর আমরা পেয়ে যাই তার কাঁটাখচিত জীবনের কাহিনি।

খোকার শৈশব-কৈশোরের গ্রামের জীবন ছিল চরম দারিদ্র্য আর ক্ষুধায় কণ্টকিত। এই দারিদ্র্য ছিল পিতার বোহেমীয় জীবনাচরণ ও সাংসারিক দায়িত্বপালনে উদাসীনতার ফলশ্রুতি। যুদ্ধবাজারের ঠিকাদার হিসেবে দেদার উপার্জন করতো, কিন্তু মদ-জুয়া-পতিতাগমন এসবের পেছনে সেই অর্থ হাওয়াই বাজির মতো উড়িয়ে দিতো। ঔপনিবেশিক যুদ্ধসংস্কৃতির দোসর হিসেবে তার মধ্যে সুস্থ জীবনবোধের বিকাশ ঘটেনি। সে সম্পূর্ণরূপে মানবিক মূল্যবোধরহিত এক প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষ। দুর্মদ ভোগের নেশায় স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ দূরের কথা, নিয়মিত খোঁজখবর রাখার গরজও অনুভব করেনি। পরিবারের কর্তা হলেও কার্যত সে পরিবারের কেউ ছিল না। কদাচিৎ সে বাড়ি আসতো, শাহি হালে কয়েকদিন অবস্থান করে আবার লাপাত্তা হয়ে যেত। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো, গালাগালি, মারধোরে পরিবেশকে অস্বস্তিকর করে তুলতো। খোকারা তিন ভাই পিতার জঘন্য উৎপাতকে ঘৃণামিশ্রিত নীরবতায় হজম করতো। তার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই ছিল সকলের জন্য স্বস্তিদায়ক। পিতার দায়িত্বজ্ঞানহীন অবিমৃষ্যকারিতায় মাকেই দায়িত্ব নিতে হয় সাংসারিক ভরণপোষণের : 'মা পরের বাড়ির ধান ভানে, রশিকলের সুতো তোলে, তাঁতের নলি তোলে চরকায়। ফিতে বোনে, পটকা মোড়ে।' (পৃ. ৮১)। একটি নারীবৈরী সমাজে একজন প্রান্তিক নারীর জন্য সহজ কোনো কর্মক্ষেত্র ছিল না, নারী হিসেবে তার পারিশ্রমিকও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। মায়ের এই প্রচণ্ড পরিশ্রমসাপেক্ষ জীবনসংগ্রাম কতটা দুর্বহ ছিল তা সহজেই

অনুমেয়। ফলত অভাব-অনটন ও ক্ষুধার কষ্ট ছিল তাদের দুর্ভর নিয়তির মতো। দারিদ্র্যের বিদীর্ণ চেহারা প্রকটিত হয় খোকার বর্ণনায় : 'মেজো ভাইয়ের নিউমোনিয়া। ঘরে পয়সা নেই্ বাপের কোন খবর নেই। মুদির দোকানে দেনা, মানুষের কাছে টাকা পয়সা থেকে চাল আটা এমনকি তেল নুনেরও দেনা্ মা'র গয়নাগাটি যা দু'চারখানা ছিল তাও পোদ্দার বাড়ি বন্ধক। কারুর কাছে ধার চাইবার মুখ নেই। আগের দিন থেকে একটানা উপোস চলছে।' (পৃ. ৮২)। অচিকিৎসা আর ক্ষুধার তাড়নায় মুমূর্ষুপ্রায় মেজভাইয়ের জন্য দোকান থেকে সাবুও পায়নি। এহেন নির্মম দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে বড় ভাই কর্মের সন্ধানে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়। এরই মধ্যে বিনা চিকিৎসায় রোগে ও ক্ষুধায় ভুগে মেজভাই মারা যায়। এর মাসখানেক পরে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে মায়ের নামে ২০ টাকার মানি অর্ডার আসে। এরপর রাজগঞ্জ মিলে চাকরির বেতনের টাকায় তাদের অভাবের সংসারে সচ্ছলতা আসে, খোকা পুনর্বার স্কুলে যায়। এর মধ্যে হাঁপানি রোগ নিয়ে অকর্মণ্য ও নিঃস্ব অবস্থায় পিতা ফিরে আসে গ্রামে। এক পর্যায়ে ভাইয়ের টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। দারিদ্র্য তার রাগি চেহারা নিয়ে পুনর্বার প্রবেশ করে সংসারে। মিল মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনে বড় ভাই জড়িয়ে পড়ে। ফলত সে কেবল চাকরিচ্যুতই হয় না, তার বিরুদ্ধে শ্রমিক খ্যাপানোর অভিযোগে মামলা ও হুলিয়াও জারি হয়। পুলিশ বাড়ি পর্যন্ত হানা দেয়। একপর্যায়ে মিল মালিকের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডা বাহিনীর হাতে সে খুন হয়। এর মাস পাঁচেক আগে পিতার মৃত্যু ঘটে। বড় ভাইয়ের অপঘাত মৃত্যু সংসারকে গভীর হতাশা ও অতল দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করে। দিশেহারা খোকা ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ার যুবক কাদেরের সহযোগিতায় শ্রীরামপুরে ট্যাক্সির ক্লিনার হিসেবে কাজ জোটে। গ্রামে শেকড় না পেয়ে শহরে খোকার শেকড় গাঁড়ার সংগ্রাম চলে। শহরে স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পরিচয়টিও মুছে যায়। পিতৃদত্ত নাম মুছে 'খোকা' নামে তার পরিচয়ের নবনির্মাণ ঘটে। হীরা সিংয়ের বদান্যতায় ট্যাক্সি ক্লিনার থেকে ট্যাক্সি ড্রাইভারে উত্তরণ ঘটে। গাড়ির মালিকানা বদল হলেও ড্রাইভার হিসেবে সে বহাল থাকে। এই পরিচয়েই শ্রীরামপুর শহরে থিতু হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এই স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। মুসলিম সংখ্যালঘু হওয়ার অপরাধে জীবন বাঁচাতে তাকে শ্রীরামপুর ছাড়তে হয়। গ্রামে ফিরেও সে রেহাই পায় না; ভয়ানক দাঙ্গা হানা দেয় তার দারিদ্র্যকবলিত নিস্তরঙ্গ গ্রামেও। দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে ঘর ভস্মীভূত হয়, ছুরিকাঘাতে নিহত হয় মা, অপহৃত ও ধর্ষিত হয় ষোল বছরের বোন নূরী। সর্বস্ব হারিয়ে তার কাছে জীবন নিরর্থক মনে হয়। আত্মহননের লক্ষ্যে পা বাড়ায় রেললাইনের দিকে। পেছন থেকে ডাক দেয় প্রতিবেশী অজিত। হতভাগ্য বোনকে নিয়ে অজিতের অশ্লীল বাক্যে খোকার অতলান্ত হতাশা মুহূর্তে রূপ নেয় প্রবল জিঘাংসায়। শখের বশে কেনা ডেগার দিয়ে হত্যা করে অজিতকে। এরপর হিন্দু দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করতে বল্লম হাতে গ্রামের পাহারায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু এতো হিংস্রতা ও রক্তপাতের মধ্যে এই পাহারা তার আত্মগত ভাবনায় নিরর্থক মনে হয় : 'কয়েক ঘণ্টা আগে আমি আত্মহত্যা করবার জন্যে কতবেল তলায় গিয়েছিলাম, অথচ সেখানে এখন অজিত পড়ে আছে আমার হাতে খুন হয়ে, আর একটু আগে মাকে কবর দিয়ে এখন আমি ভোলার আমতলায় রাত জেগে বল্লম হাতে বসে বসে গ্রাম পাহারা দিচ্ছি। ভাবতে ভাবতে থ হয়ে গেলাম, গোটা ব্যাপারটাকে স্রেফ একটা ফালতু হেঁয়ালি মনে হলো, মনে হলো, তাহলে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া, ভালবাসা কিংবা দুঃখ এসবের মানেটা কি? বল্লম হাতে আমি কাকে পাহারা দিচ্ছি।' (পৃ. ১০০)। এরপর হিংসাত্মক দাঙ্গার মীমাংসাহীন চক্রাবর্ত থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে সে দেশান্তরে পা বাড়ায়। নতুন দেশে তার পরিচয় হয় উদ্বাস্তু হিসেবে। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক অপশাসন তাকে নিষ্করুণ দারিদ্র্য উপহার দিয়েছে, কিন্তু দাঙ্গাকবলিত রক্তসিক্ত স্বাধীনতা তাকে উপহার দিয়েছে উদ্বাস্তু পরিচয়। তার আত্মজিজ্ঞাসাবিদ্ধ ভাবনায় এই স্বাধীনতা দেশহারা মানুষের কাছে পরাধীনতার নতুন অধ্যায় : 'রিফ্যুজি মানে কি? উদ্বাস্তু? তার মানে যার ঘরবাড়ি নেই? কিন্তু আমার তো বাড়িঘর আছে। তবু আমি রিফ্যুজি, কেননা আমি দেশহারা। এই তো? তাহলে সেই যে ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীনতা–হিন্দুস্তান পাকিস্তান–সে কি মানুষকে রিফ্যুজি বানাবার জন্যেই? না হলে হিন্দুস্তান থেকে হাজারে হাজারে মানুষ বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে পাকিস্তানে আসছে কেন? কিংবা হাজারে হাজারে মানুষ একইভাবে কেন পকিস্তান থেকে চলে যাচ্ছে হিন্দুস্তানে! এর নামই কি স্বাধীনতা? রিফ্যুজি হবার স্বাধীনতা?' (পৃ. ১০১)। আজীবন স্বনির্ভর আত্মপরিচয় নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর খোকা অচেনা নতুন দেশেও রিফ্যুজির পরাশ্রয়ী পরিচয়কে

প্রত্যাখ্যান করে ঢাকার পথে পা বাড়ায়। এরপর চলে তার স্বজনহীন ভিনদেশে শেকড়িভূত হওয়ার রুদ্র-কঠোর জীবনসংগ্রাম। খোকার আত্মভাষ্যে প্রতিভাসিত হয় সেই সংগ্রামের স্বরূপ : 'রাস্তার ধারে দেড় টাকা রোজে খোয়া ভেঙে, দোকানের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটিয়ে, পুরনো ঢাকায় ঘুপচি গলির ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়া টিনের বেড়া দেওয়া 'ভাই ভাই লজেন্স ফ্যাক্টরী'তে কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে, ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে আমি মরলাম না।' (পৃ. ১০১)। খোকার উদ্বাস্তু জীবনের ব্যক্তিগত সংগ্রামের সমান্তরালে পূর্ব-বাংলার রাজপথে চলে আরেক লড়াই। খোকার ভাষ্যমতে সেই লড়াইয়ের ধরন : 'মিছিলে শ্লোগানে ডগোমগো হয়ে কতোবার শহর নেমে এলো রাস্তায়। কারফ্যু, গুলি আর রক্তের ভেতর দিয়ে আমি হাজার মানুষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে গেলাম।' (পৃ. ১০১)। অতি সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যেই আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় সেই লড়াইয়ের পটভূমি। পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা কার্যত একটি নতুন উপনিবেশে পরিণত হয়। ভাষিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে বাঙালিকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি সুগভীর নীলনকশা তৈরি করে। বাঙালি জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেই নীলনকশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ভাষা আন্দোলন দিয়ে শুরু করে পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসনামলই ছিল বাঙালির অবিরাম লড়াইয়ের মঞ্চ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বেপরোয়া দমনপীড়নের মুখে বাঙালির এ রাজপথের লড়াই ছিল বিপুল রক্তক্ষয়ী আত্মত্যাগের। খোকাও সে লড়াইয়ের সক্রিয় অংশীদার। কঠিন লড়াইয়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে খোকা অবশেষে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুটের ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসেবে থিতু হয়। গাড়িচালনার উপার্জনে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের পরই পরিবারকেন্দ্রিক শেকড় নির্মাণের। আমানত আলীর এতিম শ্যালিকা রাবেয়াকে বিয়ে করার মাধ্যমে খোকা সেই আয়োজনটিও সম্পন্ন করে। কিন্তু খোকা উদ্বাস্তু হওয়ার নিয়তি থেকে রক্ষা পায় না। বিয়ের অনতিকাল পরেই জানতে পারে স্ত্রী রাবেয়ার গর্ভে আমানত আলীর সন্তান। বিয়েটি হয়েছিল আমানত আলীর অভিভাকত্বে। স্বজনহীন খোকা আমানত আলীর সহৃদয় ও সহমর্মী আচরণে মুগ্ধ হয়েছিল এবং নির্ভরশীল অভিভাবক হিসেবে আস্থা স্থাপন করেছিল। কিন্তু আমানত আলীর অভিভাবকসুলভ ভালোবাসার আড়ালে ছিল একজন অসহায় উন্মূল মানুষের প্রতি নিখাদ কপটতা ও নির্মম প্রতারণা। উন্মূলতার দুর্ভর যন্ত্রণা তাকে গভীরভাবে চেপে ধরে। কিন্তু বার বার মার খেয়েও খোকা তার সদর্থক জীবনবোধে আস্থা হারায় না। প্রকৃতির পরিচর্যায় ফুটে ওঠে সেই জীবনের সদর্থকতা : 'সন্ধ্যা নামছে। ওপারে নীলচে-কালো জমাট গাছপালা। পাখিরা ঘরে ফিরছে। তিরতির করে নদী বয়ে যাচ্ছে। ধার ঘেঁষে বাঁধা নৌকোয় নৌকোয় রান্নার ব্যস্ততা। ইঁটের ভাটির চিমনির আকাশমুখী ধোঁয়া অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। আমানত আলীর সন্তান পেটে নিয়ে রাবেয়া চোখের পানিতে আমার পথ চেয়ে বসে আছে।' (পৃ. ১০২)। প্রতারিত হয়েও খোকা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে না। জীবনের পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতা থেকেই সে উপলব্ধি করে, তার স্ত্রীও তার মতোই আমানত আলী দ্বারা প্রতারিত। রাবেয়া একদিকে এতিম, তদুপরি যুবতী নারী; পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতায় তার অসহায়ত্ব সীমাহীন। এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েই আশ্রয়দানের বিনিময়ে আমানত আলী রাবেয়ার দেহকে ভোগের আওতায় নিয়েছে। রাবেয়ার আসলে কিছুই করার ছিল না, আমানত আলীর অসহায় শিকার হওয়া ছাড়া। নারীর এই অসহায়ত্ব সে মর্ম দিয়ে অনুভব করেছে পিতা কর্তৃক মায়ের নিগৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে, একদল পুরুষ কর্তৃক বোন নূরীর ধর্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। মা ও বোনের, বিশেষত বোনের মর্মান্তিক পরিণতি তাকে স্ত্রীর প্রতি স্নেহসিক্ত করে তোলে : 'একটু আগে হঠাৎ নূরীর মুখটা ভেসে উঠেছিল অনেকদিন পর। অল্পক্ষণ। তারপর চোখভরা পানি নিয়ে রাবেয়া।' (পৃ. ১০২)। এরপর তার অপেক্ষা পরের সন্তানের জনক পরিচয়ে জীবননির্মাণের : 'মাস কয়েক পরে রাবেয়া একটি সন্তানের জন্ম দেবে। সে যেমন– ছেলে বা মেয়ে– আমার পরিচয় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে, বড়ো হবে, বেঁচে থাকবে, আমিও তেমনি ভুল পরিচয় নিয়ে এই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বেঁচে থকবো, ভুল পরিচয় নিয়ে একদিন মরে যাবো।' (পৃ. ১০২)। এই ভুল পরিচয় আর উন্মূলতাই খোকার মতো উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর নিয়তি; স্বাধীনতা তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায়, কিন্তু ভুল নেতৃত্বের হঠকারিতায় সেই স্বাধীনতা প্রহেলিকায় রূপ নেয়। তবে অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষ তার সার্বভৌম পরিচয়নির্মাণের লড়াইটা চালিয়ে যায়; আর আশাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এই লড়াইয়ের চলমানতাটাই উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রত্যয়।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি[৭]

উপনিবেশোত্তর যুগে নাগরিক পরিসর অতিক্রম করে ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় সভ্যতাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষদের বঞ্চনাক্লিষ্ট সংগ্রামী জীবনের প্রতি। উপনিবেশবাদ-উৎসারিত মূল্যবোধ ও পুঁজির দৌরাত্ম্যে পর্যুদস্ত হয়ে কীভাবে এই মানুষেরা গহিন দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি অর্জনের বিচিত্র সংগ্রামশীলতা হয়ে ওঠে এ পর্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য। ভাগ্যবিড়ম্বিত অন্ত্যজ মানুষদের সংগ্রামীজীবনের আলেখ্য হিসেবে সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬) একটি বিশিষ্ট সংযোজন। এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার 'সমুদ্র তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর বহুভুজ জীবন রূপ'। (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৩৪৩)। 'অঞ্চলগত সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য' এ উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্যে উপস্থাপিত। এই অঞ্চলের ধীবরেরা ঐতিহ্যগতভাবে কৌম জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এরা প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এখানে 'মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোনো ফারাক নেই' (পৃ. ৪৫০); প্রকৃতিই জোগায় তাদের জীবন-জীবিকার রসদ। তবে বিপুলা প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা শুধুই মিতালির নয়, প্রবল দ্বৈরথেরও। বিস্তীর্ণ জলরাশির অতল গভীরে লুকিয়ে থাকা ধনভাণ্ডার তাদেরকে করায়ত্ত করতে হয় অমিত সাহসী বীরত্বের মাধ্যমে। সমুদ্রজয়ী এই বীরদের হৃদয় সমুদ্রের মতোই উদার, প্রশস্ত, নির্লোভ, 'ওদের চাওয়া অল্প' (পৃ. ৪৩২)। সহৃদয় যূথবদ্ধতায় গ্রথিত এই পরম্পরাবাহিত জীবন ছিল গভীরভাবে প্রশান্তিপূর্ণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক মূল্যবোধলালিত পুঁজির আগ্রাসনে ভেঙে পড়ে ধীবরদের কৌমসমাজ; ব্যক্তিগত লোভের ফাঁদে পড়ে জন-ঐক্যচেতনা হয় ভূলুণ্ঠিত; কতিপয়ের শোষণ-দমন-পীড়নের শিকার হয়ে পুরো জনগোষ্ঠী নিপতিত হয় গভীর দারিদ্র্যে। গনি মিয়া, তোরাব আলি, গফুরের মতো গুটিকয়েক মানুষের পুঁজির দাসত্ববরণে বাধ্য হয় পুরো ধীবরসমাজ : 'প্রকৃতির সব বস্তুই আপন আপন কাজ করে। শুধু গনি মিয়ারাই একা একা বেড়ে উঠতে চায়–– সুখ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি নিয়ে অন্য দশজনের কলজে মাড়িয়ে।' (পৃ. ৩৭৬)। অবাধে শোষণের জন্য গনি মিয়ারা প্রতিনিয়ত প্রতারণার ফাঁদ পাতে আর শোষণ-বঞ্চনার অপ্রতিরোধী প্রতারণাচক্রে আবর্তিত হতে থাকে জেলেপাড়ার জনজীবন : 'ফাঁকি আর বঞ্চনা, দুঃখ আর হাসির মধ্যেই মানুষ বেড়ে ওঠে। জীবনকে ভালোবাসে, লাঞ্ছনায় কুঁকড়ে গিয়ে পোকা হয়ে মরে।' (পৃ. ৪০৮)। শোষণ-জুলুমে জর্জরিত এই অন্ত্যজ মানুষেরা নানাভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে–– এক. কেউ স্বীয় অধঃপতিত অবস্থাকে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে গভীর অসহায়ত্বে আত্মসমর্পণ করে; দুই. কেউ এই ব্যবস্থাটিকে সমর্থন করে ভবিষ্যতে এর সুবিধা নেবে বলে; তিন. কেউ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার পথ বেছে নেয়; এবং চার. কেউ শোষণ-দমন থেকে মুক্তির স্থায়ী ও কার্যকর পন্থা সন্ধান করে। প্রথমোক্ত তিনটি প্রতিক্রিয়াই জেলেসমাজের নিশ্চেতন বা অবশচেতন মনের আবেগ-উৎসারিত তাৎক্ষণিকতায় বিপথগামী। বলাবাহুল্য, জেলেপাড়ার সমগ্র নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া এই প্রথম তিনে বৃত্তবন্দি। শোষণ-পীড়নমূলক ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যাভিসারী যুক্তিভিত্তিক পন্থার একক ও নিঃসঙ্গ সারথি মালেক। চার সহোদরকে কেন্দ্র করে চতুষ্কোণ কাঠামোতে উপন্যাসটির আখ্যানভাগ পরিকল্পিত; আর এই চতুষ্কোণের গ্রন্থির ভূমিকা অন্ধ জননীর। উপন্যাসের অন্য চরিত্র-পাত্রদের ভূমিকা চতুষ্কোণ কাঠামোর পূর্ণতা দানে। এখানে অন্ধ জননী জেলেসমাজের সর্বংসহা চিরায়ত শুভবোধের প্রতীক, যিনি জীবনব্যাপী বঞ্চনা-উৎপীড়নের যন্ত্রণা ভোগ করেও সত্তায় লালন করেছেন শাশ্বত ন্যায়বোধ ও কল্যাণচিন্তা। এই দরিদ্র-জননী শুভ্র ভালোবাসা ও স্নেহশীলতায় স্বামী-সন্তানকে নিয়ে একটি সুন্দর পরিবার গঠনে মনোযোগী ছিলেন, সন্তানদেরকে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত পালন করেছেন। অপত্য স্নেহ তার ন্যায়নিষ্ঠাকে কলঙ্কিত করতে পারেনি, গর্ভজাত সন্তান সালেকের অপরাধকে তিনি বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি, বরং অপরাধী সন্তানের জননী হিসেবে আত্মধিক্কারে ফেটে পড়েছেন এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন; আর পরার্থে নিবেদিত সন্তান মালেকের মাথায় রেখেছেন আশীর্বাদের হাত। আরেক জননী জয়গুনেও পরিলক্ষিত হয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় আত্মনিবেদিত চিরায়ত মাতৃরূপ।

মালেকের বাবা ছিল 'দুঃসাহসী জেলে' (পৃ. ৩৫৮), 'তার রক্তের মধ্যে সাগরের নেশা ছিল'। (পৃ. ৩৬০)। মালেকের মায়ের ভাষ্যে, 'তোঁয়ার বাবা মানুষটার বুকে একফোঁটা ভয়-ডর ন আছিল। ঝড়-জল রোদ-বৃষ্টি কোন কিছুই ন মাইনত।' (পৃ. ৩৬১)। সাগরের বুকে প্রবল প্রতাপ এই পুরুষটি ডাঙায় ছিল মহাজনি শোষণে জর্জরিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক পরাভূত মানুষ। নির্দয় উপেক্ষা পেলেও স্বামীর সাহসী পৌরুষসত্তার প্রতি মালেকের মায়ের ছিল গর্বমিশ্রিত অগাধ শ্রদ্ধা। পিতার স্পর্ধিত পৌরুষের গল্প ছেলেদের মনেও শিহরন জাগায়। তাই মায়ের কাছে তারা আবদার করে : 'তুই বাবার কথা খ। বাবার কথা শুনতে ভালো লাগে।' (পৃ. ৩৬১)। বাবার উত্তরাধিকার তাদের রক্তেও প্রবল, ব্যতিক্রম কেবল আশেক। ভীতুপ্রকৃতির আশেক প্রতিকূল পরিবেশে বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের পরিবর্তে কোনোমতে টিকে থাকাটাই শ্রেয় মনে করে; উত্তাল সমুদ্রে হাঙর শিকারের পরিবর্তে খাল থেকে ছোট মাছ শিকারেই তার উৎসাহ। এই সংগ্রামবিমুখ পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য তার প্রতি তার মায়ের রয়েছে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। সেকেন্দার, বশির, বাদলরাও একই মনোভাবের পরিপোষক। শোষকেরা তাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ শোষণের পাশাপাশি শুষে নিয়েছে তাদের প্রাণশক্তিকেও। সমাজের সম্পদশালীরা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের ভারে ন্যুব্জ এই জনগোষ্ঠীকে 'ছোটলোক' বলে অভিহিত করেছে। ধনিকশ্রেণির পৌনঃপুণিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে তাদের মনে দানা বাঁধে হীনম্মন্যতার বোধ। সমাজের প্রভাবশালী ধনবানদের দৃষ্টি দিয়েই নিজেকে দেখে, নিজের প্রতি কোনো সম্মান অবশিষ্ট থাকে না, অধঃপতিত 'ছোটলোক' এই আত্মপরিচয়টাকে তারা নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবেই মেনে নেয়। তাই সেকেন্দারের মুখ থেকে অবলীলায় উচ্চারিত হয় : 'আঁরা ছোডলোক, জন্মি ছোডলোক হইয়ারে, মইরগ্যামও হেইভাবে, আঁরার দরকার কি চাঁদ ধরনের শখ করার।' (পৃ. ৪৫০)। মানসিক বৈকল্য আর অথর্ব নিষ্ক্রিয়তায় মানুষ হয়ে বাঁচার স্বপ্ন তারা বিসর্জন দেয়, যাপন করে জল-কাদার পোকামাকড়ের মতো জীবন। দারিদ্র্যে জর্জরিত হলেও ইতর লোভ ও প্রতারণায় তারা নিজেকে কলুষিত করে না।

অন্ত্যজ সমাজের বৃহদংশই স্বপ্নচারিতায় পুঁজিবাদের পরিপোষক। পুঁজি দ্বারা শোষিত হতে হতেই তারা পুঁজিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ধীবরসমাজের ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছে গনি মিয়া, তোরাব আলিদের মতো সম্পদবুভুক্ষু কতিপয় পুঁজিপতি। এদের নোংরা সাফল্য শোষণে নিঃস্ব মানুষদের কাছে এক অন্তহীন অনুপ্রেরণা। এভাবে শোষক-শোষিতের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই প্রবল প্রতাপে টিকে থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি। মালেকের বীক্ষণে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত শক্তি : 'আসলে ওর চারপাশে হাজার হাজার গনি মিয়া। সেন্টমার্টিনের গনি মিয়াকে সাগরে ফেলে দিলে কী হবে? আরো তো লক্ষ গনি মিয়া আকাশ ছোয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ... জেলেপাড়ায় ওর চারপাশের ভাত খেতে না পাওয়া মানুষগুলো বুকের ভেতর গনি মিয়া হওয়ার স্বপ্ন পোষে। এর শেকড় এত গভীরে যে টেনে উপড়ানো যায় না।' (পৃ. ৩৭৮)। সালেক তোরাব আলির শুঁটকির কারখানায় কাজ করতে করতে কল্পনা করে, '... একদিন এই বদরমোকামের শুটকির কারখানা ওর নিজের হবে। ... ও স্বপ্ন দেখে একদিন বড়লোক হবে, শাহপরি দ্বীপের সবচেয়ে বড় দালানটা হবে ওর।' (পৃ. ৩৭১)। মুখ্যত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই সালেক তার সামাজিক উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছে : 'কাম করে একদিন তোরাব আলি হইয়্যম।' (পৃ. ৩৬৬)। কিন্তু সে জানে পরিশ্রম নয়, কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য ধূর্তবুদ্ধি ও শঠতাই মূল অবলম্বন : 'চালাকি করি উডিত না পারিলে কেউ হাতর কাছে আনি ন দেয়।' (পৃ. ৪৪৭)। 'বহুত ট্রলার, জাল, হাজার হাজার মাছ, লাখ লাখ টাকা'-র মালিক হতে হতদরিদ্র বশিরের মেয়ে জুলেখার সঙ্গে প্রতারণা করে সে ধনাঢ্য গনি মিয়ার একমাত্র মেয়ে রহিমুনকে বিয়ে করে। এক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাফিয়ার মনোভাবও অভিন্ন : 'বেশি ভালোমানুষি করলে ওঠা যায় না, তাই ছলচাতুরি চাই। এটাই এখন বেঁচে থাকার অবলম্বন। শুধু শারীরিক শ্রম কতটুকুই বা এগিয়ে দেয়! বাপ-দাদার আমলের ধ্যান-ধারণা নিয়ে বসে থাকলে এখন কিছুতে বাঁচা যাবে না। ... ভোটের সময় কতবার কত লোকের বড় বড় কথা শুনেছে। দেখা আছে কে কোন কলাটা করেছে। ভোটের পর আর পাত্তা মেলেনা। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে যায়।' (পৃ. ৪১৭ – ৪১৮)।

উগ্র-শোষণে বিপর্যস্ত মানুষদের কেউ কেউ নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে প্রতিহিংসার পথ বেছে নেয়। এপথে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিরোধ হয়ে ওঠে নৈতিকতারিক্ত ও অমানবিক : 'পেট না ভরলে মগজ হাঙরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণ হয় এবং যেকোনো জিনিস অবলীলায় কেটে টুকরো করে ফেলার কৌশল আবিষ্কার করে।' (পৃ. ৪২৭)। তোরাব আলির সর্বগ্রাসী সম্পদের আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে সুজার সচ্ছল-শান্তিময় পরিবারের স্বপ্ন, ভূলুণ্ঠিত করেছে তার পৌরুষস্পর্ধিত আত্মপরিচয়কে : 'তোরাব আলি কর্তৃত্ব করে ওদের ওপর, ওরা কর্তৃত্ব করে ঘরে। এই কর্তৃত্বটুকু না থাকলে বুঝি পৌরুষ ভেস্তে যায়। ... যারা পেট পুরে খাবার জুটাতে পারে না তাদের আবার পৌরুষ কি? তারা কি মানুষ?' (পৃ. ৩৯৪)। বঞ্চনা ও অপমানের গভীর যন্ত্রণা সুজার মতো নৈতিকতাপুষ্ট মানুষকে শত্রুর বিরুদ্ধে অনৈতিক পন্থায় লড়াইয়ে প্ররোচিত করে : 'ও তোরাব আলির মতো শত্রুর বিপক্ষে লড়বে, লড়ে জিতবে। লড়াইয়ের পথটা কি ভালো? না হোক ভালো, তবু একটাই এখন ওর পথ। এভাবেই ও শত্রুকে জখম করবে। এভাবে কি অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে? না হোক, ওদের স্বাচ্ছন্দ্য আসবে, ওরা পেট পুরে খেতে পাবে।' (পৃ. ৩৯১)। এই বেপরোয়া লড়াইয়ে সে অবলীলায় ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে ফেলে হত্যা করে মানিককে এবং হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে একটি গল্প ফাঁদে। গল্পটি আবার তাদের প্রত্ন-জীবনবোধ উৎসারিত : 'শৈশবে শোনা দাদির মুখের গল্পের মতো রূপকথা, যেন রাজপুত্র তেপান্তরের মাঠ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে –– পদ্মপুকুর থেকে কৌটো উঠিয়ে ভোমরাটা মারার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যটা মরে গেছে। রাজপুত্রের এখন আর চিন্তা নেই, সামনে তার রাজকন্যা আর রাজত্ব।' (পৃ. ৪৩২)। আনাড়ি প্রতারকের বানানো গল্পের ফাঁকিটা অভিজ্ঞ প্রতারক তোরাব আলির চোখ এড়ায় না : 'মানিকের জন্য ওদের এই কান্নার কারণ নেই; ওর সঙ্গে ওদের সারাক্ষণ লেগে থাকত। তোরাব আলিকে বহুবার হাতাহাতি থামাতে হয়েছে। ওদের এই বিরোধকে কাজে লাগিয়েছিল তোরাব আলী। মানিক কিছুটা গোয়ার আর বোকা। হয়তো ওদের কোন প্যাঁচে পড়েছে। মুহূর্তে তোরাব আলির মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।' (পৃ. ৪৩৩)। মানিকের মৃত্যুর রহস্য ফাঁস হয়ে গেলে তোরাব আলির সঙ্গে সাজুর শুরু হয় মুখোমুখি লড়াই। এই লড়াইয়ে সাজু অনেক বেশি শক্ত, দৃঢ়চেতা, বেপরোয়া এবং কৌশলী। তোরাব আলির নৌকা ব্যবহার করেই সুজা মাদক চোরাচালানে যুক্ত হয় এবং আত্মরক্ষার সুচতুর কৌশলে তোরাব আলিকে ধরাশায়ী করে : 'সুজার সামনে রাত্রির অন্ধকারের মত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তার বুকে কাঁপুনি নেই, এখন এমনই শক্ত হয়ে গেছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে তৈরি করতে পারে, ঘাবড়ায় না, সাহস হারায় না, অবলীলায় বুদ্ধির জাল বোনা হয়ে যায়। ওর নিশ্চিত ধারণা নৌকার জন্য তোরাব আলি পুলিশের সঙ্গে আপস করবে, বড় বিপদ এড়ানোর জন্য ওদেরকেও ছাড়াবে। ওরা তো কর্মচারী, হুকুমের দাস। শুধু চোরাচালানিতে তোরাব আলিকে প্যাঁচে জড়ানোর উপায় ও জানে। ... অল্পে ছেড়ে দেবে না তোরাব আলিকে।' (পৃ. ৪৬১)।

শেষপর্যন্ত তোরাব আলির মরণ-কামড় থেকে সুজা নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, ডাকাতির সাজানো নাটকে ফেঁসে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের চরম অসহায়ত্বে ফেলে তাকে যেতে হয় কারান্তরালে। প্রবল ক্ষমতাধর তোরাব আলির বিরুদ্ধে সুজার ব্যক্তিগত সহিংস লড়াইয়ের ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। কারণ, বৈশ্বিক পুঁজিবাদের প্রান্তিক সংস্করণ হলো তোরাব আলি, গনি মিয়ারা। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রশ্রয়ে সৃষ্ট পুঁজিবাদ সুপরিকল্পিত কলাকৌশল সমন্বিত একটি পরাক্রমশালী সিস্টেম; আর উত্তর-উপনিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এই পুঁজিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আর জনসমাজের গহিনে রয়েছে পুঁজিবাদের প্রতি বিপুল সমর্থন। প্রান্তিকসমাজের অভ্যন্তর থেকেই আবির্ভূত হয়েছে তোরাব আলি, গনি মিয়ারা। বলাবাহুল্য তারা কেবল গণশত্রুই নয়, গণসমাজের এক অন্তহীন অনুপ্রেরণাও। সুজা তো তোরাব আলির সঙ্গে লড়াই করে আরেকজন গনি মিয়াই হতে চেয়েছিল; কিন্তু প্রশ্ন হলো 'সুজা একা বড়লোক হলে কি বাদলের দুঃখ ঘুচবে, নাকি বশির আলির চোখের জল শুকোবে?' (পৃ. ৪৪০)। ঘৃণা ও সহিংসতার প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেই মালেক তার সমাজে একক ও নিঃসঙ্গ মানুষ। এশীয় কৌমসমাজের যৌথ কল্যাণবোধ তার মর্মমূলে নিহিত। তার মনে উদ্রিক্ত কিছু মৌলিক প্রশ্ন ও তার সমাধানসূত্রই এই উপন্যাসের উপজীব্য।

মালেক জেলেপাড়ার এক 'দাপুটে পুরুষ' (পৃ. ৩৫৯), সুদক্ষ হাঙর শিকারী, কর্মনিপুণতায় অতুলনীয়; সবকিছু ছাপিয়ে সে 'হিংসা-মলিনতার ঊর্ধ্বে এক সিংহ-হৃদয়ের মানুষ' (পৃ. ৪১০)। সমুদ্রের বুকে সে 'রাজা', কিন্তু ডাঙার জীবনটা তার 'ছেঁড়াবেড়া ত্যানার মতো' (পৃ. ৪১০)। জেলেপাড়ার প্রতিটি পুরুষই তার মতো কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু তাদের জীবনবলয় চরম দারিদ্র্যে দীর্ণশীর্ণ। ধীবরসমাজের করুণ জীবনচিত্র সে প্রত্যক্ষ করে বশির আলির মুখাবয়বে : 'চোয়াল ভাঙা, চোখ বসে গেছে, ঘোলাটে দৃষ্টি, খাড়া নাকের তীক্ষ্ণতা ধারালো। ওই মুখটা কি জেলেপাড়ার মানচিত্র? হবে হয়তো। মানুষগুলো দোমড়ানো, মাটি এবড়োখেবড়ো, প্রত্যেকের বুকের মধ্যে টিকলো নাকের মত খাড়া স্বপ্ন, কখনোই বাস্তবায়িত হবে না; তাই ঘোলাটে দৃষ্টির অবাধ বিস্তার। জেলেপাড়ার বালুর মধ্যে সে দৃষ্টি কণা কণা হয়ে ছড়িয়ে আছে।' (পৃ. ৩৮৬)। এই বঞ্চনালাঞ্ছিত মানুষদের সঙ্গে সে আত্মিক বন্ধনে গ্রথিত[৮] এবং তাদের বঞ্চনা-লাঞ্ছনায় 'যন্ত্রণার লোহার শিক [তার] মগজের মধ্যে আটকে থাকে'। (পৃ. ৪০৮)। জেলেজীবনের প্রথাসিদ্ধ নিশ্চেতনার বৃত্ত ভেঙে মালেকই প্রথম প্রশ্নশীল হয়ে ওঠে তাদের দুর্ভাগ্যবিষয়ে এবং উপনীত হয় বস্তুনিষ্ঠ উত্তরে : 'একলা বেড়ে ওঠার বাসনা-ভরা গনি মিয়ারা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—– ওরা সংখ্যায় কম কিন্তু ওদের বিশাল বপু, দৈত্যের মতো হিংস্র। আসলে জেলেপাড়ার লোকগুলো এক হলে গনি মিয়ার মতো দশজনকে হটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কেউ এক হতে চায় না। সবাই চায় নিজে বড় হতে। জেলেপাড়ার উন্নতি কেউ ভাবেও না, বোঝেও না।' (পৃ. ৩৭৬-৭৭)। স্পষ্টতই, জেলেসমাজের দুর্গতির জন্য গনি মিয়াদের সম্পদ-মোক্ষণের আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা সক্রিয় থাকলেও মালেক কেবল গনি মিয়াদের ওপর সম্পূর্ণ দায় চাপিয়ে সন্তুষ্ট হয় না, বরং জেলেসমাজের অন্তর্নিহিত অনৈক্যকেই মুখ্যত চিহ্নিত করে। মালেক তাই জেলেদের ভাগ্যোন্নয়নে কার্য-কারণভিত্তিক ও লক্ষ্যাভিমুখী স্থায়ী সংগ্রামের কথা বলে। এই সংগ্রামের দুটি দিক—এক. সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিমানুষের আত্মবোধন ও আত্মশোধন, যেখানে ব্যক্তি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সমাজের সামষ্টিক কল্যাণে প্রাণিত হবে; দুই. শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা, যেখানে নিজেদের সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গৃহীত হবে সমাধানভিত্তিক কর্মসূচি। মালেক উপলব্ধি করে, জেলেপাড়ার দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার বহিরারোপিত কোনো সমাধান নেই, সমাধান আসতে হবে সমাজের অভ্যন্তর থেকে, নিজেদের সমস্যার প্রতিকারের পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে নিজেদেরকেই। এই জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এবং গড়ে তুলতে হবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী সাংগঠনিক কাঠামো। মালেক এশীয়সমাজের কর্তৃত্ববিরোধী সংগ্রামী পুরুষ, যার সত্তার গভীরে নিহিত 'পিতৃত্বের বোধ' (পৃ. ৪৮৯) আর মননে দায়িত্বশীল অভিভাবকের কল্যাণচিন্তা। সে বিজয়ী হতে চেয়েছে ভালবাসা ও কর্মনিষ্ঠায় মানবিক মূল্যবোধের পথে।[৯] অগ্রসরচিন্তার সক্ষমতার কারণেই সে নিজেকে বিবেচনা করেছে ধীবর-অধ্যুষিত 'একটা বিশাল পরিবারের প্রধান পুরুষ' হিসেবে। অভিভাবকত্বের অবস্থান থেকে সে স্বসমাজের দুর্ভোগ-দুর্যোগে গভীর যন্ত্রণা অনুভব করে এবং শোষণ-দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমাজবিনির্মাণের স্বপ্ন দেখে।[১০] এই নবনির্মিত জীবন হবে আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ : 'সারাদিনের কাজের পর জ্যোৎস্নারাতে পুঁথিপাঠের আসর, নয়তো ঢোল বাজিয়ে গান, নয়তো যাত্রা। কাজের শেষে আনন্দ, আনন্দের মধ্য দিয়ে শক্তি অর্জন, তারপর আবার কাজ। এভাবেই জীবনের চক্রাকার ঘূর্ণাবর্ত।' (পৃ. ৪৮৯)। সমুদ্র ও সমুদ্রবেষ্টিত ভূপ্রকৃতি, বিশেষত তার প্রিয় সেন্টমার্টিন দ্বীপের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য তার মনোগঠন ও কর্মপ্রবৃত্তির অনিঃশেষ অনুপ্রেরণা : 'সেন্টমার্টিনের প্রবালগুলো হাজার বছর ধরে জমতে জমতে পাথর হয়েছে, মানুষেরা এমন জমে না কেন? জমে কালো মিশমিশে পাথর হয়ে মালার মতো বেড় দিয়ে রাখবে নিজেদের ভূখণ্ড। সেই পাথরে চমৎকার ফুল ফুটবে, সুরভিত ফুল, যা কোনোদিন শুকিয়ে ঝরে পড়বে না।' (পৃ. ৪৪৪-৪৪৫)। সমুদ্রের গভীর থেকে হাঙর শিকারের দক্ষতা তার আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র; মালেকের স্বপ্ন 'বেগ্যত্তুন ডঅর' (পৃ. ৪০১) হাঙর ধরা। আর এই হাঙর তো আর কিছু নয়, গনি মিয়া, তোরাব আলি ছাড়া—'যার শরীরে হাঙরের মতো বিশাল ধারালো দাঁত, মালেকের মতো জোয়ান ছেলের যৌবন সে দাঁতে কামড়ে ধরে রাখে।' (পৃ. ৪০৩)। 'হাঙর-মানুষের লড়াইয়ের ধ্রুপদী প্রতীকে' অভিব্যঞ্জিত হয় শোষিত জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা। 'অক্ষরজ্ঞানহীন, মূর্খ' (পৃ. ৪০৮) মালেকের শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার রাজনৈতিক চেতনা ও স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারযোগে আগত ডক্টর চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনসূত্রে মালেকের প্রকৃতিপ্রেম পরিবেশরক্ষার

আন্দোলনে পর্যবসিত হয়; মালেক উপলব্ধি করে মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের নিবিড়তা ও পরিবেশ সুরক্ষার দায়বদ্ধতা। ডক্টর চৌধুরীর কাছ থেকেই মালেক জানতে পারে, মানুষের সীমাহীন সম্পদলিপ্সাই পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ।

মালেক সংগ্রামী সংগঠনের ভিত নির্মাণ করতে চেয়েছে সমাজের গভীর থেকে, সকলকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে।[১১] মালেকের আন্তরিক আহ্বানে নিস্তরঙ্গ জেলেপাড়ায় অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে[১২] এবং জেলেপাড়ার ঐক্যচেতনার প্রথম সাফল্য আসে সাজানো ডাকাতি মামলায় সাজুকে ফাঁসিয়ে দেয়ার তোরাব আলির ষড়যন্ত্র প্রতিহতকরণের মধ্য দিয়ে। তোরাব আলি তার পথের কাঁটা মালেককে স্তব্ধ করতে সহিংসতার আশ্রয় নিলেও মৃত্যুঞ্জয়ী মালেক তার সংগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে দৃঢ়তর প্রত্যয়ে। মালেকের অদম্য সাধনায় তোরাব আলির প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ধীবরসমাজ সমিতির কাঠামোয় পুনঃসংগঠিত হয়, সমবায়িক প্রচেষ্টায় তৈরি হয় নিজেদের নৌকা ও জাল। নিজেদের নৌকা-জাল নিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় হাঙর শিকারের প্রত্যয় নিয়ে মালেক পাড়ি জমায় বিস্তীর্ণ সমুদ্রে; তার সমুদ্রসারথি হয় তোরাব আলির 'হুকুমের দাস' বাদল ও সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ করম; আর এই যাত্রায় জড়িয়ে আছে সংঘচেতনায় উজ্জীবিত জেলেপাড়ার মানবেতর মানুষদের সমৃদ্ধ জীবনপ্রাপ্তির মানবিক আকাঙ্ক্ষা : 'আদিগন্ত নীল সমুদ্রের বুকে মালেকের স্বপ্ন আজ সত্যি হতে যাচ্ছে। শাহপরি দ্বীপের ছেলেবুড়ো, নারী পুরুষ ভেঙে পড়বে হাঙর দেখতে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাবে ওর দিকে। ... মালেকের জয়জয়কারে মুখরিত হয়ে ওঠবে ডাঙা। খবর চলে যাবে টেকনাফে। তারপর আরও দূরে। আরো–।' (পৃ. ৪৯৪)। অসহনীয় ধৈর্যের পাঁচদিন পর কাঙ্ক্ষিত হাঙর মালেকের বড়শিতে গাঁথে এবং আরও পাঁচদিনের তুমুল লড়াইয়ের পর দেড়মন ওজনের প্রকাণ্ড হাঙরটি শক্তি হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। শিকার-সাফল্যের তুঙ্গমুহূর্তে মৃতপ্রায় হাঙর অসতর্ক মালেকের ডানহাতে বসায় মরণ-কামড়। এখানে নিঃশেষিত শক্তির হাঙরের কামড়ের প্রতীকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে হাঙর-রূপী তোরাব আলিদের পর-সম্পদ শোষণের অনিঃশেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রায়-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হাতের যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপহীন মালেকের চৈতন্যে সক্রিয় জোড়-হাঙর শিকারের অনমনীয় অভীপ্সা; বাদলকে তাই তাড়া দেয় মালেকের অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় শিকারের কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার।

পুঁজির আগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ ও শোষণে জর্জরিত ক্ষুধালাঞ্ছিত ও শিক্ষাবঞ্চিত সমুদ্র-উপকূলবর্তী ধীবর জনগোষ্ঠী মানবিক মর্যাদা হারিয়ে পরিণত হয় পোকামাকড়তুল্য জন্তুসত্তায়। জান্তব মানুষগুলো মানবিক মর্যাদায় উন্নীত হতে চায় পুঁজিবাদী পন্থায়। কিন্তু পুঁজিবাদের পথে তাদের মুক্তি নেই, পুঁজিবাদ তাদের শোষণমুক্তির যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে রাখে। পুঁজির শক্তি অপরিসীম, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেই প্রবল শক্তিধরের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টা। এর জন্য মানুষগুলোকে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে সমগ্রের কল্যাণবোধে উজ্জীবিত হতে হবে। এর জন্য সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত করতে হবে। পুরো জনগোষ্ঠীকে ঐক্যের চেতনায় শানিত করার জন্য প্রয়োজন পরার্থপর, বিচক্ষণ ও অদম্য নেতৃত্ব। আর এই নেতৃত্ব গড়ে উঠবে সমাজের ভেতর থেকে, যে সমাজ-অন্তর্গত মানুষের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত এবং নিজ সমাজের মানুষের যন্ত্রণা নিজের বলে উপলব্ধি করবে, তাদের প্রতি পোষণ করবে অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসা। মানুষের নিজের বৃত্তি থেকে ছিন্ন করে নয়, সেখানে স্থিত রেখেই তাদের জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলবে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকা পরিবেশ-প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখা। হতচেতন মানুষের মধ্যে অধিকারবোধ ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি এবং সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তোলায় দায়িত্বশীল পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বুদ্ধিজীবী সমাজ। উত্তর-উপনিবেশবাদ উপনিবেশোত্তর দেশের দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকবলিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তির পথ এভাবেই সন্ধান করে।

১৯৭১[১৩]

হুমায়ূন আহমেদের ১৯৭১ (১৯৮৬) উপন্যাসের ঘটনাকাল ঐতিহাসিক একাত্তরের 'পহেলা মে', ঘটনাস্থান চল্লিশ-পঞ্চাশ পরিবারের জনপদ জলা-জঙ্গল পরিকীর্ণ এক ক্ষুদ্র নিভৃত গ্রাম নীলগঞ্জ, চরিত্রসমূহ একান্ত প্রান্তিক, তুচ্ছ খেটে-খাওয়া মানুষ। এর পেছনে বিশাল কোনো প্রস্তুতি নেই, ঘটনার ঘনঘটাও নেই। এই সাধারণ মানুষের জীবনযাপনগত প্রাত্যহিক বাস্তবতার কয়েকটি বিবরণে অঙ্কিত হয়েছে বাঙালি জাতির মহাকাব্যিক ঘটনা 'মুক্তিযুদ্ধ'। বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যে ও নির্মাণকলায় উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে শিল্পসামর্থ্যের এক অনন্য দলিল।

ভারত উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গোড়াপত্তন ঘটেছে ঔপনিবেশিকতার আঁতুড়ঘরে এবং এর প্রবল বিক্রম বিকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক শাসকদের সযত্ন পরিচর্যায়। উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতা এবং উপনিবেশে শাসক হিসেবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার প্রয়োজনে ইউরোপে যে স্বাতন্ত্র্যবাদী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, তা ঔপনিবেশিক শাসনপ্রকল্পের প্রযোজনায় ভারতের উপনিবেশিত মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে এই উপনিবেশিত জাতীয়তাবাদ ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে একটি ভূখণ্ডের সমগ্র মানুষের সমন্বিত ঐক্যে গড়ে ওঠেনি; জাতপাত-ধর্ম-ভাষা-আঞ্চলিকতার মতো বিভাজকগুলোকে খুঁচিয়ে এর জন্ম-বিকাশ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের শেষপর্যায়ে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ চণ্ডমূর্তি ধারণ করে এবং ভারত-বিভাগকে নিশ্চিত করে। কিন্তু উপনিবেশোত্তরকালে ব্রিটিশ মূল্যবোধলালিত শাসকগোষ্ঠী ভারত ও পাকিস্তান উভয় নতুন রাষ্ট্রেই আঞ্চলিক বা জাতিগত উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিক, ভাষিক, জাতিতাত্ত্বিক বা ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়। পাকিস্তান পূর্ববাংলার ওপর আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বাঙালি জাতিকে এক সামূহিক বৈষম্যে নিপতিত করেছিল। ভারতও বহুজাতিসত্তার পরিচয়কে আড়াল করে হিন্দিবলয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বহু সম্প্রদায় ও বহু ভাষিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিলীন করতে ভারতকে হিন্দুস্তান, হিন্দু ও হিন্দি – এই পরিচিতিদানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংসাত্মক চর্চা অব্যাহত আছে। এতে আঞ্চলিক বৈষম্য যেমন বেড়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আস্থার সংকট; বিভাজন, হিংসা ও বিদ্বেষে জেরবার হয়েছে বৃহত্তর জনগণের মধ্যকার ঐক্যবোধ। উপনিবেশবাদ যে কায়দায় জনগণের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করেছে, একই কায়দায় স্বাধীন দেশের শাসকেরাও নিজের দেশকে জনগণকে খণ্ড-বিখণ্ড করায় লিপ্ত হয়। ফলত একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় স্বাধীন দেশে নতুন করে উপনিবেশিত হওয়ার বোধ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আধিপত্যে পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত হয়ে পড়ে; পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে শোষণোপযোগী অধস্তন করার উদ্যোগ চলতে থাকে। বাঙালি মুসলমানদের উন-মুসলমানত্ব হয় এখানে বৈষম্য নির্মাণের চাবিকাঠি। মুসলিম হিসেবে বাঙালির উনত্বেই নিহিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের, বিশেষত পাঞ্জাবিদের শ্রেষ্ঠত্ব। মুসলমানত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা আসলে বাঙালি জাতিসত্তার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬১-৬২-র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষণে ক্ষণে খানিক পেছালেও বাঙালিকে অধস্তন করার মানদণ্ডটি কিছুমাত্র পরিবর্তন করেনি; বরং এ-মানদণ্ডে ভর করেই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির ওপর গণহত্যার যুক্তি তৈরি করেছে। পুরো পাকিস্তানি আমল জুড়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতিই কেন্দ্রীভূত ছিল বাঙালির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঘৃণা উৎপাদনে এবং বাঙালি দমন-শোষণে। দেশের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিকবাহিনীর কদর ও ব্যবহার দুটোই বাড়ে। দেশ সামরিকায়নের দিকে হাঁটে; রাষ্ট্র সামরিক-সন্ত্রাসকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় ক্ষমতার সোপান বা ভিত্তি হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধেও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ত্রাস-সৃষ্টি করে পাকিস্তানের পক্ষে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে পুরো দেশটিকে সেনাছাউনির নিয়ন্ত্রণে আনতে সামরিকবাহিনী প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম––পূর্ববাংলার পুরো সামরিকবাহিনীর পরিকল্পিত সন্ত্রাসে তছনছ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কেবল রাজনৈতিক নেতা আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির কর্মকাণ্ড আর ত্যাগের বন্দনায় মুখরিত, নাম না-জানা অসংখ্য প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ হয়েছে উপেক্ষিত।

হুমায়ূন আহমেদ ১৯৭১ উপন্যাসে যে-মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করলেন, তাতে সকলের চেনা যোদ্ধা বা নায়কেরা নেই, আছে সাধারণ মানুষজন, যাদের জীবনের ওপর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বয়ে গেছে ঝড়ের মতো অথবা কোনো না কোনো ভাবে মুক্তিযুদ্ধ তাদের জীবনকে স্পর্শ করেছে। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা বা সম্পৃক্ততার মধ্যেই নিহিত ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূলশক্তি। ফলে হুমায়ূনের বর্ণনায় মুক্তিযুদ্ধ স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে, উপন্যাসোক্ত ঘটনার তারিখ ১৯৭১-এর পহেলা মে। যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা শুরু হয়নি; ময়দানে তখন এক পক্ষই উপস্থিত; অন্যপক্ষটি তখনো জমাট বেঁধে ওঠেনি। যুদ্ধের ময়দান শহর থেকে বহুদূরবর্তী দুর্গম-বিচ্ছিন্ন দারিদ্র্যজীর্ণ গ্রাম নীলগঞ্জ। গুটিকয়েক নতুন টিনের ঘর বাদে বাকি সবগুলোই খড়ে-ছাওয়া। সেনদের প্রকাণ্ড দালান এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম; তবে সেনরাও হতদরিদ্র। জয়নাল মিয়াই কেবল প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক। দারিদ্র্যের ফাঁক গলে গ্রামীণ জীবনে কিঞ্চিৎ সম্পন্নতা কারো কারো জীবনে প্রবেশ করেছে। পরিবর্তনটা অন্ধ মীর আলির অভিজ্ঞতায় দৃশ্যমান : 'ঘরে এখন চামুচ আছে। নতুন সাইকেল আছে। গত বছর বদি তাকে লেপ বানিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে গত শীত কোন দিকে গিয়েছে বুঝতেই পারা যায়নি। অথচ বদিকে বিয়ে করানোর আগে কি হাল ছিল সংসারের! ... অনুফা এ বাড়িতে আসার পর তারা কি কখনো একবেলা না খেয়ে থেকেছে? না। নীলগঞ্জে এরকম ভাগ্য কয়জনের আছে?' (পৃ. ৩৬)। গ্রাম্য-সালিশীতেই এখানে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়; থানা-আদালতের দ্বারস্থ হয় খুব কম লোকই। সম্পদ ও শিক্ষার বিবেচনায় জয়নাল, নীলু সেন, আজিজ মাষ্টার, মসজিদের ইমাম সাহেব—এরাই গ্রামের ওপরতলার মানুষ; বাকি সবাই দারিদ্র্যপীড়িত অন্ত্যজ মানুষ। বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, রাজনীতি ও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই প্রান্তিক মানুষেরা জলা-জমির সঙ্গে লড়াই করে আপন জীবনটাই যাপন করে। এই গণ্ডগ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করে। বিষয়টি গ্রামবাসীর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে এবং তারা ভীতসন্ত্রস্তও হয়। মিলিটারির এই আগমনকে গ্রামবাসী ভেবেছে তাদের অন্যত্র গমনের সাময়িক বিরতি হিসেবে। কিন্তু মিলিটারি স্কুলঘরে ঘাঁটি স্থাপন করেছে এবং জানা গেল মিলিটারির আরও দল বিকালের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। রাতে তারা একটি অপারেশন পরিচালনা করবে মধুবনের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু জোয়ান এবং কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি দুজন সেনা অফিসারকে অপহরণ করা তাদের অপরাধ। একদল বিদ্রোহী সেনার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অপারেশন যুদ্ধনীতিতে যৌক্তিক। নীলগঞ্জে আগত ছোট্ট সেনাদলের অধিনায়ক মেজর এজাজ আহমেদের ঘোষণামতে যুদ্ধটি রাতে হবে। কিন্তু তিনি রাতের যুদ্ধের আগেই দিনের আলোয় আরেকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ সশস্ত্র কোনো গোষ্ঠী নয়; নিরীহ, নির্বিবাদী, নিরস্ত্র গ্রামবাসী। এই যুদ্ধের প্রথম ধাপে তিনি গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিদের একে একে তলব করেন; খোঁজ-খবর নেন গ্রামের মানুষদের খুঁটিনাটি বিষয়ে। খোঁজখবরের অন্যতম বিষয় ছিলো কার ঘরে ট্রানজিস্টর আছে। ট্রানজিস্টর ছিলো গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো এবং মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা পরিমাপের মানদণ্ড। এছাড়া গ্রামে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অবস্থা ও অবস্থান তাদের অন্যতম অনুসন্ধেয়। কথিত বিদ্রোহী সেনাদের সহযোগিতা করার সামর্থ্য এবং যোগসূত্র খুঁজে বের করাই ছিল প্রাথমিক কাজ। এরমধ্যে আজিজ মাষ্টারের সঙ্গে সুভাষিত কথোপকথন, হত্যাকাণ্ডের বিচার, অন্ধ মীর আলির প্রতি সালাম ও কালবৈশাখীর প্রমত্ত তাণ্ডবের মুহূর্তে অকুতোভয় আচরণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারির ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের মিথটির প্রদর্শনী হয়ে যায়। একটি যুদ্ধকে নৈতিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য এ মিথটি বিশেষ জরুরি। একারণেই মেজর এজাজকে রফিকের মনে হয় 'লোক ভালো' (পৃ. ২৭), আজিজ মাষ্টারের মনে হয় 'অত্যন্ত শরিফ আদমি' ((পৃ. ২৭), 'একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক' (পৃ. ৩০)। এই মিথে ভরসা রেখেই আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসী শেষ পর্যন্ত আশ্বস্ত হতে চেয়েছে। স্থানীয় মানুষেরা আতঙ্ক কাটাতে চেয়েছে তাদের সারল্যমিশ্রিত যুক্তিতে ভর করে। তারা কোনো অন্যায় বা অবাধ্যতা করেনি এবং পাকিস্তানি মিলিটারি 'বাঘও না ভালুকও না' (পৃ. ২৩), তারা মানুষ এবং সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা 'মুসলমান' এবং 'মুসলমানদের খুব খাতির করে'; 'তবে পাক্কা মুসলমান হওয়া লাগে' (পৃ. ২৪)।

'আতঙ্ক' সত্ত্বেও বদিউজ্জামান মধুবন বাজারে দোকানের উদ্দেশে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সে তার মত বদল করে নীলগঞ্জের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। কারণ, 'যাই হবার হোক, এসময় বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া ঠিক না।' (পৃ. ৩৭)। কিন্তু দ্বিতীয় মিলিটারির দলকে উত্তরদিক থেকে আসতে দেখে ভয়ে-উৎকণ্ঠায় আত্মরক্ষার্থে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে জঙ্গলা মাঠের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক গর্তে এবং এক-কোমর পানিতে বসে থাকে। তার ধারণা ছিল অচিরেই মিলিটারি সেখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু মিলিটারি অবস্থান নেয় তার খুব কাছেই। প্রাণভয়ে ডোবায় আত্মগোপন করেও বদিউজ্জামানের আত্মকথনে পরিস্ফুট হয় মিলিটারির ওপর আস্থা : 'মিলিটারিদের সম্পর্কে যেসব গল্প শোনা যায় সেগুলি সত্যি? শুধু শুধু এরা মানুষ মারবে কেন? এরা নাকি নতুন কোনো জায়গায় গেলেই প্রথম ধাক্কায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মানুষ মেরে ফেলে ভয় দেখানোর জন্য? এটা একটা কথা হলো? সব গুজব। এরাও তো আল্লাহর বান্দা।' (হুমায়ূন, ২০১৯ : ৪৩)৪৩)। ইমাম সাহেব বন্দি অবস্থায়ও পাকিস্তানি মিলিটারির ওপর আস্থা রাখে এই যুক্তিতে : 'পাক্কা মুসলমানদের এরা খুব পেয়ার করে। এরাও তো সাচ্চা মুসলমান।' (পৃ. ৪১)। মানুষের প্রতি সহজাত বিশ্বাস বাঙালির চিরায়ত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হিংস্রতার সংবাদকে সে সর্বনাশের মধ্যে বসেও বিশ্বাস করতে চায়নি। কিন্তু মেজর এজাজের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বে ধস নামে দ্রুতই এবং সামরিক বাহিনীর প্রতি প্রান্তিক মানুষদের আস্থা-বিশ্বাসও হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ক্রমাগত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। এটি ছিল নিগ্রহ-নির্যাতনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে বাঙালির অস্তিত্ব-রক্ষার প্রাণের দায়। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যেই মুক্তিসংগ্রামের স্পৃহাটা তীব্র ছিল। সংগ্রামের অধিক্ষেত্রটা ছিল বিভিন্ন শহর ও মফস্বল শহরে সীমাবদ্ধ। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আবেগ গ্রামের মৃত্তিকা-কর্ষী জীবনকে স্পর্শ করলেও তা তাদের নিরীহ নিস্পৃহতাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি; তারা শাহরিক উত্তুঙ্গ আন্দোলন-মুহূর্তেও নিজেদের নিরিবিলি জীবনটাই যাপন করতে চেয়েছে। কিন্তু বাঙালির কাছে যা ছিল শোষণ-বিরোধী সংগ্রাম, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা ছিল উপনিবেশ ধরে রাখার যুদ্ধ। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে মুক্তিকামী বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র সহিংসতা। নৈতিক ভিত্তি দেওয়ার প্রয়োজনেই তারা এই সহিংসতাকে 'যুদ্ধ' নামে অভিহিত করেছে। কারণ যুদ্ধে যে-কোনো ধরনের অন্যায়ও বৈধ হিসেবে গণ্য। যুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষ লাগে; প্রতিপক্ষ না-থাকলে আগ্রাসীশক্তিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিতে হয়। নীলগঞ্জে মেজর এজাজকে তা-ই করতে হয়েছে। নীলগঞ্জে প্রবেশের যুক্তি হিসেবে মধুবনের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহী সেনাদের কথা বলা হয়েছে। অথচ সেখানে বিদ্রোহী সেনারা আছে এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে গ্রামবাসীর সারল্যমিশ্রিত কথোপকথনে এর সাক্ষ্য মেলে না। তদুপরি পাকিস্তানের প্রতি যুদ্ধংদেহী মনোভাবও গ্রামবাসী কারোর আচরণে প্রকাশ পায়নি। স্পষ্টতই নীলগঞ্জবাসীরা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ কোনো পক্ষ নয়। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারির আগ্রাসননীতি অনুসারে হত্যা-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণকে স্তব্ধ-নির্বাক করে দেওয়াটাই ছিল কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। তারা নিরীহ নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর ওপর পরিকল্পিত সন্ত্রাস তৈরির যুদ্ধনীতি সাজিয়েছে পুরনো জাতিগত ঘৃণাকে আশ্রয় করে। এই নীতিতে পুরো বাঙালি জনগোষ্ঠীই দমন-পীড়নযোগ্য অপরাধী। মেজর এ কৌশলেই তার রণনীতি সাজায়; নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নীলগঞ্জবাসীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। নীলগঞ্জের সমগ্র মানুষকেই সে বিদ্রোহী সেনাদের সহযোগী হিসেবে শত্রুর তালিকায় আনে এবং জিজ্ঞাসাবাদের নামে বন্দি গ্রামের গণ্যমান্যদের বন্দি করে এবং পীড়ন চালায়। অপরাধী মনাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিরপরাধ শিশু বিরুকে হত্যা করে জনমনে ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে; এবং অন্যায়ের পক্ষে যুক্তি তৈরি করে : 'প্রয়োজন আছে। এর প্রয়োজন আছে। আমি নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চাই। ... আজ এই ঘটনাটি ঘটবার পর মিলিটারির নাম শুনলে ওরা কাপড় নষ্ট করে দেবে। গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে।' (পৃ. ৫০)। তার উপর্যুপরি যুক্তি হলো : 'রফিক, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। সারভাইভালের প্রশ্ন। এই সময়ে অন্যায় কিছু হবেই। উল্টোটা যদি হতো—ধরো বাঙালি সৈন্য আমার গ্রামে

ঠিক আমাদের মতো অবস্থায় আছে। তখন তারা কী করতো? ... যে অন্যায় আমরা করছি তারা কি সেগুলি করতো?' (পৃ. ৫৪)। মেজর এজাজ তার অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন খোঁজে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় : 'এসব কথা পরবর্তী সময়ে কেউ মনে রাখবে না। অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজাণ্ডারের নৃশংসতার কথা কি কেউ জানে? সবাই জানে––আলেকজান্ডার দি গ্রেট।' (পৃ. ৫০)। প্রথমদিকে ত্রাস-সৃষ্টির এই কৌশলটা বেশ ভালোই কাজে দিয়েছে। ভীতু গ্রামবাসী পাকিস্তানের পতাকা হাতে স্লোগান দিয়েছে, মিলিটারি দেখে জয়নাল দিগ্‌বিদিক ছোটে, বদি উর্ধ্বশ্বাসে লাফিয়ে পড়ে পচা ডোবায়, আজিজ মাস্টার ন্যাংটা হয়ে যায় এক ধমকেই। আজিজ মাষ্টারকে উলঙ্গ করে তার যৌনাঙ্গে ইট ঝুলিয়ে দেওয়া নৃশংসতা ও ধৃষ্টতার চরম সীমা লংঘন। যুদ্ধের নামে ধর্ষিত হয়ে যায় নিরীহ সফদর উল্লাহ্‌র স্ত্রী ও স্ত্রীর বারো বছর বয়সী বোন। প্রচণ্ড জাতিবিদ্বেষের উগ্র আক্রোশে উন্মত্ততা পেয়ে বসে মেজর এজাজকে : 'বাঙালিদের মান-অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্মসম্মান থাকে, এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে (আজিজ মাস্টারকে) বলি, যাও, ঐ ইমামের পশ্চাদ্দেশ চেটে আস। ও তাই করবে।' (পৃ. ৬৬-৬৭)। বাঙালি হত্যাকে সে গরু-ছাগল জবাইয়ের সঙ্গে তুলনা করে। এভাবে তীব্র ঘৃণা আর সহিংসতায় গ্রামবাসীকে যখন অস্তিত্বের প্রান্তসীমায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তখন মরণপণ লড়াই ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। পাকিস্তান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নীলগঞ্জের সাধারণ মানুষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে: 'মানুষ সেক্যুলার অস্তিত্বে বাস্তবের ঐ জীবনটাই যাপন করে, যেখানে মতাদর্শিক বা ভাবাদর্শিক সক্রিয়তা কিছুতেই তার অস্তিত্বের চেয়ে গুরুতর নয়। এখানেও হয়েছে তা-ই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ওদের সবার হয়তো বিরাগ ছিল না। কিন্তু তাই বলে জিন্নাহকে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা বা ইকবালের কবিতা এস্তেমাল করার কথাও তাদের মনে হয়নি। ঠিক তেমনি নিজ অস্তিত্বের পক্ষে আওয়ামী লীগ বা শেখ মুজিবুর রহমান বা স্বাধীন বাংলা বেতারের তৎপরতা তাদের চাপা উল্লাসের কারণ হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। 'পাকিস্তান' নামের মতাদর্শিক নির্মাণের প্রতি তখনো তাদের কারও আবেগ বা নিরপেক্ষ অবস্থান যদি থেকেও থাকে, এজাজের নিপীড়ন সে ব্যাপারে তাদের বিভ্রম কাটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্তমান পরিস্থিতি আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট তৎপরতার প্রতি তাদের নিষ্ক্রিয় আবেগ ও সমর্থনকে সক্রিয় করেছে, এবং সবশেষে অস্তিত্বের শেষ সীমানায় ফেলে দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে।' (মোহাম্মদ আজম, ২০২০ : ১৩৮)। নীলগঞ্জের গহিন প্রান্তবাসী, নির্বিবাদী মানুষেরা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। চরম অপমান থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য আজিজ মাস্টার মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে এবং 'অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে বলল––মেজর সাহেব, আমি মরবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।' (পৃ. ৭৪)। এরপর আজিজ মাস্টারকে রাজাকাররা বিলের দিকে নিয়ে চলে : 'আজিজ মাস্টার বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেল।' (পৃ. ৭৪)। যাবার আগে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্লামালাইকুম'। মৃত্যুতে তার ভয় আছে, তবে অপমানের যন্ত্রণা আরও তীব্র। ধর্ষিত স্ত্রী-বোনের প্রতিশোধ নিতে নিরীহ সফদর উল্লাহ্‌ সহিংস হয়ে ওঠে : 'সফদর উল্লাহ্‌ একটা দা হাতে মাঠে নেমে পড়লো। সে দুজনকে খুঁজছে। একজন তালগাছের মতো লম্বা। গোফ আছে। অন্যজন বাঙালি, তার মুখে বসন্তের দাগ।' (পৃ. ৬৮)। জয়নাল মিয়া ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পলাতক সৈন্যদের বিষয়ে তথ্য-বন্যা বইয়ে দেয় কোনো জড়তা ছাড়াই। জঙ্গলা মাঠে একশ জনের মতো বাঙালি সৈন্য লুকিয়ে আছে এই সংবাদে মেজর এজাজের বীরত্ব টাল খায়––'সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার হাত কাঁপতে লাগল।' (পৃ. ৭৫)। ডোবায় আশ্রয় নেয়া বদিউজ্জামানের জমাটবাঁধা মৃত্যুভীতি সশব্দ হাসিতে চৌচির হয়ে যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে রফিক হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগী নায়ক। রফিকের মহিমান্বিত পরিণতিই এই উপন্যাসের চুম্বক; এই চরিত্রেই নিহিত রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ও প্রেরণার বীজ।

রফিক রোগাটে গড়নের ত্রিশ বছর বয়সী এক বাঙালি যুবক। বি.এ. পাস এ তরুণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। উপন্যাসে তার ভূমিকা পাকিস্তানের পক্ষে স্থানীয় সহযোগীর। মেজর এজাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক দোভাষীর এবং যুদ্ধের গ্রামীণ ময়দান, বিশেষত গ্রামীণ মানুষ আর ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশকের। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য থাকলেও বাঙালি জাতিসত্তা নিয়ে গর্বও তার সুপ্তচৈতন্যে সক্রিয়। নীলু সেনের হত্যাকাণ্ডের নীরব সাক্ষী হলেও মৃত নীলু সেন, তার ভ্রাতুষ্পুত্র বলাই ও শিশু বিরুর প্রতি সহমর্মিতায় এবং

কালী-মূর্তির প্রতি প্রদর্শিত শ্রদ্ধাবোধে স্ফূরিত হয় তার সহজাত সেক্যুলার জীবনবোধ। বাঙালি জাতিসত্তার গভীরে নিহিত শাশ্বত অহিংসা ও সমতার বাণী উচ্চারিত হয় রফিকের কণ্ঠে : 'পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই আসলে এক রকম।' (পৃ. ৫৩)। 'মানুষের ইন্সটিংটের মধ্যে আছে ... অন্যকে পায়ের নিচে রাখা। তোমার নাই?' (পৃ. ৫২)––মেজর এজাজের এই প্রশ্নে রফিকের সুস্পষ্ট উত্তর ––'না'। নিরীহ বাঙালির প্রতি অপমান, নির্বিচার অত্যাচার ও বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি মেজর এজাজের জাতিবিদ্বেষ তার ভেতরসত্তায় ভাঙচুর ঘটিয়েছে এবং মেজর এজাজের যে-কোনো অন্যায় আচরণে আপত্তি জানিয়েছে। পাকিস্তানি মিলিটারির সহযোগীর ভূমিকায় থেকেও রফিকের মনে হয়––'এখন সময় খারাপ।' (পৃ. ৪৬)। স্বতঃস্ফূর্ত ন্যায়বোধ থেকে নিরপরাধ বাচ্চা বিরু-হত্যার উদ্যোগকে রফিক অপ্রয়োজনীয় বলে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আজিজ মাস্টারের অপমানের জবাবে রফিক বলে, 'আপনি শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছেন না, আপনি আমাকেও লজ্জা দিচ্ছেন। আমিও ওর মতো বাঙালি।' (পৃ. ৬৬)। বাঙালির প্রতি মেজর এজাজের পুঞ্জীভূত ঘৃণার উদ্গীরণ লক্ষ করে রফিকের উপলব্ধি : 'কোনো বাঙালিকেই আপনি বিশ্বাস করেন না।' (পৃ. ৭১)। পাকিস্তানি মিলিটারির সহযোগী হিসেবে রফিকের ভূমিকাটা একজন যোদ্ধারই; কিন্তু উপলব্ধির স্তর বেয়ে বেয়ে রফিক বুঝতে পারে এ যুদ্ধটা আসলে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধ। নবলব্ধ উপলব্ধির প্রেক্ষিতে এ অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করা ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় থাকে না এবং প্রতিবাদটি করেছে নিজের জীবন দিয়ে। রফিকের ওপর মেজরের সন্দেহ ঘনীভূত হয় এবং রফিককে হত্যার উদ্দেশ্যে বিলের দিকে নিয়ে যায়। নির্ভীক চিত্তে, আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গিতে রফিক বিলের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। রফিক বাঁচতে চায় কিনা মেজর এজাজের এই প্রশ্নে রফিকের স্পষ্ট জবাব ছিল, 'চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না? ... মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এদেশ থেকে।' (পৃ. ৭৯)। উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে 'ভীতু' রফিক এক প্রবল সাহসী মানুষ, 'এ অন্য রফিক', যে প্রত্যয়-দীপ্ত কণ্ঠে পহেলা মে-র রাত্রির প্রথম প্রহরেই মেজর এজাজের আগাম মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করে। আর সামনে দণ্ডায়মান 'নতুন' রফিককে প্রত্যক্ষ করে 'মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।' (পৃ. ৮০)। হানাদার বাহিনীর সহযোগী রফিকের নবলব্ধ উপলব্ধি-প্রাণিত আত্মত্যাগেই যুদ্ধ প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধে। বিলের মৃত্যুর দিকে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে-যাওয়া 'রফিক' হয়ে ওঠে 'নির্বিশেষ' আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার প্রতি-রূপক। অগণিত নির্বিশেষ 'রফিক'দের আত্মোৎসর্গিত যুদ্ধের ভেতর থেকে জেগে ওঠে স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। অস্তিত্বের শেষ সীমানা থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অবতীর্ণ হয়েছে এই যুদ্ধে, যার কারণে মুক্তিযুদ্ধটা গণযুদ্ধও। আর এভাবেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপনের ভেতর থেকে হুমায়ূন আবিষ্কার করেন মুক্তিযুদ্ধকে, যা প্রচলিত জাতীয়তাবাদী বয়ানের বিপরীত পিঠ। হুমায়ূন আরও আবিষ্কার করেছেন, আপাত নিরীহ ও নিস্পৃহ সাধারণ মানুষের সামষ্টিক শক্তির অসীম সম্ভাবনা, যা বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নের মূল উপজীব্য।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা[১৪]

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮) উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতাকেন্দ্রিক অবক্ষয়িত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণমানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগমণ্ডিত মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতা এবং স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিকচক্রের সদম্ভ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আখ্যান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন রাজনীতি ছিল পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই বলয়ে বিভক্ত এবং দুই পক্ষেরই লক্ষ্য ছিল অভিন্ন––ক্ষমতাকেন্দ্র দখল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া আর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব বহাল রাখা। তবে দুই পক্ষের ক্ষমতাকেন্দ্র দখলের অভিন্ন সমীকরণের মধ্যে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য : মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিতে ছিল বাঙালি জাতির অধস্তনতামুক্ত স্বাধীন আত্মবিকাশের গৌরবময় আকাঙ্ক্ষা আর বিপক্ষীয়দের আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত ছিল নিরেট দাসত্বের

বিনিময়ে ক্ষমতার স্বাদগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধকালে ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী একটি তৃতীয় পক্ষও ছিল––বলাবাহুল্য সংখ্যাগত দিক বৃহত্তম পক্ষ––তারা সাধারণ মানুষ। তাদের স্বপ্ন ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শোষণ-শাসন থেকে মুক্তি এবং মানুষ হিসেবে সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠা। সংগতকারণেই তাদের শর্তহীন নিরঙ্কুশ সমর্থন ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি। শুধু সমর্থন নয়, তারাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে সক্রিয় অংশ। মুক্তিযুদ্ধে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও বিপুল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক কায়দায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির চর্চা শুরু হয়। এই রাজনীতিতে রাজনৈতিক আদর্শ ও নৈতিকতা নির্বাসিত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষের সমীকরণটিও ভেঙে পড়ে। বাস্তবতা এমন দাঁড়ায় যে, রাজনৈতিক হানাহানি সত্ত্বেও সকল রাজনৈতিক দল মিলে একপক্ষ, আর তাদের প্রতিপক্ষ সাধারণ জনতা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন ও নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি রাজনীতিবিদদের প্রতারণা প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মুক্তিকামী মানুষেরা হতাশায় মূহ্যমান হয়ে পড়ে। নানাপক্ষের টানাপোড়েনে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বে ভর করা মুক্তিযুদ্ধের পরিণামী ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু।

উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৮৫ সাল, ঘটনাস্থান পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার, কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামাপ্রসাদ লেনের যুবক আবদুল মজিদ। আখ্যান উন্মোচিত হয় নিম্নোক্ত বর্ণনায় : 'উনিশ শ পঁচাশি সনে একদিন লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ লেনের যুবক আবদুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়ে ফট করে ছিঁড়ে যায়। আসলে বস্তুর প্রাণতত্ত্ব যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে হয়তো বলা যেত যে, তার ডান পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতে বস্তুর ব্যর্থতার জন্য নয়, বরং প্রাণের অন্তর্গত সেই কারণে ছিন্ন হয়, যে কারণে এর একটু পর আবদুল মজিদের অস্তিত্ব পুনর্বার ভেঙে পড়তে চায়।' (পৃ. ১১)। আবদুল মজিদের মধ্যে অস্তিত্বনাশী এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয় জনতার উদ্দেশে আবুল খায়েরের 'ধন্যবাদ' জ্ঞাপনসূচক বক্তৃতা শ্রবণে। আখ্যানের বর্ণণানুসারে পরিপ্রেক্ষিতটি এমন : '...আগের দিন বিভিন্ন দলের আহ্বানে যে হরতাল হয়েছিল, পরদিন, কাকের চিৎকার এবং যান্ত্রিক শব্দের ভেতর আবুল খায়ের তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেয়। আবুল মজিদের মনে হয়, তার হৃদয়টি বহুদিন থেকেই বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এই দিন, উঁইপোকার হত্যাযজ্ঞের বিষণ্ন বিকেলে আবুল খায়েরের কথা শুনে তার হৃদয়ের তন্তু তার স্যান্ডেলের ফিতার মতো পুনরায় ছিন্ন হয়। আবদুল মজিদ যখন তার দৃষ্টি আবুল খায়েরের দীর্ঘ এবং তরুণ শ্মশ্রু আর নীল রঙের জোব্বার ওপর রাখে, তার মনে হয়, আকাশে যত কাক ওড়ে সেগুলো আবুল খায়েরের জোব্বার ভেতর থেকেই যেন বের হয়ে আসে।' (পৃ. ১২)। তার স্মৃতিসত্তায় জেগে ওঠে 'কাকের সঙ্গে আবুল খায়েরের পারিবারিক সূত্রে ঘনিষ্ঠতা।' কাকের জন্য আবুল খায়েরের পিতা বদরুদ্দিন মাওলানার ছিল এক অজ্ঞাত রহস্যময় ভালোবাসা : 'একাত্তর সনে বদু মাওলানা নরম করে হাসত আর বিকেলে কাক ওড়াত মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে ওঠে যেত বদু মাওলানা আর তার ছেলেরা। ... বদু মাওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরোগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস।' (পৃ. ১২)। স্পষ্টতই বদু মাওলানার কাকপ্রীতির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালে নৃশংস গণহত্যার দুঃসহ স্মৃতি বিজড়িত। পিতার সঙ্গে আবুল খায়েরের আদর্শিক সংযোগ আবদুল মজিদের স্মৃতিসত্তায় জাগিয়ে তোলে পনের বছর আগের মুক্তিযুদ্ধকালীন কাক-উড়ানো রাজনীতির বিভীষিকাময় ইতিহাস। রাজনৈতিক বাস্তবতায় পিতা-পুত্রের যোগসূত্রে আবদুল মজিদের স্মৃতিরোমন্থনে উন্মোচিত হয় একাত্তরের বাংলাদেশে সংঘটিত রক্তখচিত নৃশংস ইতিহাস।

উপন্যাসের আখ্যানে বদু মাওলানার একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ নেই। যতটুকু উল্লেখ আছে, তাতে বোঝা যায় সে উগ্রভাবে ধর্মান্ধ এবং বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী। তের বছরের আলাউদ্দিনকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল, 'হারামযাদা, খাঁড়ায়া খাঁড়ায়া মুতচ, খাঁড়ায়া মোতে কুত্তা' আর আবদুল মজিদের বড় বোন মোমেনাকে গান গাওয়ার জন্য গালি দিয়েছিল, 'মাগি, ডিম পাড়বার যাও।' (পৃ. ১৬)। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জোয়ারে পকিস্তানপন্থি ধর্মীয় রাজনীতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্তাল সময়ে জনধিকৃত বদুর দিন কেটেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠা আর হীনম্মন্যতার মধ্যে। পঁচিশ মার্চের কালরাত্রিতে বাঙালির ওপর পাকিস্তানি

বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে : 'পঁচিশে মার্চের গোলাগুলি আর ঢাকার আকাশের আগুনের শিখা দেখে সে বুঝতে পারে যে, 'জয় বাংলা' শেষ হয়ে গেছে'। (পৃ. ৩৪)। নয়াবাজারে গণহত্যার বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে পাকিস্তানি হানাদারেরা তাকে আবিষ্কার করে এবং এক ঘণ্টার প্রলয়ের পর গোটা এলাকায় তার বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পায়। উপন্যাসে ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে এভাবে :

> 'মহল্লায় প্রথমবার মিলিটারি আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বদু মাওলানাকে খুঁজে বের করা; বদু মাওলানা প্রথমেই 'হাজির হুজুর' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তারপর মহল্লার লোকেরা চিনেছিল মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের মালিকরূপে। ... সেই মিলিটারিদের নেতা, ক্যাপ্টেন ইমরান জিপে ওঠার আগে ভেবেছিল যে, তার পেশাব করা প্রয়োজন এবং সে তখন একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে, দেয়ালের কিনারায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে প্যান্টের সামনের বোতাম খুলে আয়েশ করে পেশাব করতে থাকে। এ সময় মিলিটারির সিপাইরা তাদের ট্রাকে গিয়ে ওঠে, ক্যাপ্টেনের জিপের ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বসে থাকে; তখন, মধ্যাহ্নের রোদের ভেতর শুধু বদু মাওলানা হাত দুটো নাভির নিচে বেঁধে বিনীত ও কোমল এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের পেশাব করা দেখে। ... বদু মাওলানা পেছন থেকে, দীর্ঘদেহী যুবক পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের দু পায়ের মাঝখানে তরলবিদ্যুৎ রেখার মতো একটি সাদা ধারা মাটিতে ক্রমাগতভাবে বিদ্ধ হতে দেখে। বদু মাওলানার সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়ে এই জল-পতনের শব্দ ছড়িয়ে থাকে এবং ক্যাপ্টেন এত আয়েশ করে এই ক্রিয়াটি সম্পাদন করে যে, মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল ধরে সে এই কাজটি করে যাবে এবং বদু মাওলানার চেতনা জুড়ে ক্যাপ্টেনের পেশাব করার ভোঁতা শব্দ একটি হালকা সঙ্গীতধ্বনির মতো তার জীবনকাল পর্যন্ত ভেসে বেড়াবে। ... পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ক্যাপ্টেন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বদু মাওলানাকে পুনরায় শনাক্ত করে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল জিপে ওঠার আগে। ... বোতাম লাগানোর সময় ক্যাপ্টেনের হাতে প্রস্রাব লেগে যায় এবং সে তার ভেজা হাত নিজের পকেটে রুমাল না থাকায় বদু মাওলানার পিঠের কাপড়ে মোছে। ... তাকে ক্যাপ্টেন ছুঁয়েছিল এই ব্যাপারটির প্রতি সম্মান দেখানো ও স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই সে তার জোব্বাটি সংরক্ষণ করেছিল।' (পৃ. ৩৫)।

বলাবাহুল্য, ক্যাপ্টেনের স্পর্শপ্রাপ্ত ও প্রস্রাবসিক্ত জোব্বাই হয়ে ওঠে তার ক্ষমতার উৎস এবং সেই ক্ষমতাবলেই মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে সে লক্ষ্মীবাজার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশে কাক উড়িয়েছে। একাত্তরের মার্চের সেই রাতে বদুর প্রদর্শিত পথে নয়াবাজারের প্রতিটি ঘরে হানা দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা। সেই ভয়াল রাতে নিহত হয়েছিল সাতজন পুরুষ এবং ধর্ষিত হয়েছিল তিনজন নারী। সেই তাণ্ডবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পুরো এলাকা—স্বজনহারা মানুষদের কান্না আর ধর্ষিত নারীর যন্ত্রণাও ছিল নিঃশব্দ। উপন্যাসে ভয়াবহতার নমুনা এরূপ : '...একমাত্র মুরগির ভয় থাকে বলাৎকারের শিকার হওয়ার আর ছিল গুহাচারী আদিম মানবীর। কিন্তু পাকিস্তানি মিলিটারি এক ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষের বুনে তোলা সভ্যতার চাদর ছিঁড়ে ফেলে এবং লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা তাদের মহল্লায় মানুষের গুহাচারিতা এক মর্মান্তিক অক্ষমতায় পুনরায় অবলোকন করে; তারা মা এবং ছেলে, পিতা এবং যুবতীকন্যা একসঙ্গে বলাৎকারের অর্থ অনুধাবন করে।' (পৃ. ৩০-৩১)। নয়াবাজারের আকাশে আগুনের লেলিহান শিখা আর বেপরোয়া গুলিবর্ষণের শব্দে দিশেহারা মানুষেরা ভীত মূঢ় জন্তুর মতো বোবা আতঙ্কে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। কয়েকদিন ছুটাছুটির পর যখন তারা অনুভব করে পালানোর মতো নিরাপদ কোনো জায়গা কোথাও অবশিষ্ট নেই, তখন বাস্তুহারা জীবনের অসহায়ত্বের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে নিজের বাস্তুতে। তবে প্রাণরক্ষার কঠিন দায়ে সকলেই অবলম্বন করে কঠোর স্তব্ধতা। আর জনগণের স্তব্ধতা পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় বদু মাওলানার ওপর এবং দায়িত্বপালনে সে এতই নিখুঁত ছিল যে, পুরো নয় মাসে এই এলাকা নিয়ে সামরিক বাহিনীকে আর ভাবতে হয়নি। সামরিক বাহিনী আরেকবার মাত্র এই এলাকায় প্রবেশ করেছিল, তাও বদু মাওলানার অনুরোধে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে রাজাকার বাহিনীর নিশ্ছিদ্র প্রহরায় গোটা এলাকায় চলে বদু মাওলানার গুম, হত্যা, ধর্ষণ আর লুণ্ঠনের রাজত্ব। তার আধিপত্যের পথে ন্যূনতম প্রতিরোধের সম্ভাবনাকেও অঙ্কুরেই নির্মূলীকরণের ব্যবস্থা জারি করে, যার বাস্তব প্রতিফলন ছিল নির্মম হত্যাকাণ্ডসমূহ। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং প্রকাশ্য ও গোপন যুক্তি। অবাধ্য বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরতরে গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পাকবাহিনী একাত্তরের মার্চে যে নির্মম হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে, রাজাকার বাহিনী তাতে যুক্ত হয় কওমের অখণ্ডতা রক্ষার নামে। কিন্তু কওমের নামে চালানো যুদ্ধের নির্মমতা খাজা আহমদ আলীর মতো খাঁটি মুসলমানকেও হতবাক করেছিল। বদু রাজাকারের কাকের উদ্দেশে ছিটিয়ে দেওয়া মাংসের এক টুকরো

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে পড়ে আহমদ আলীর পায়ের কাছে। সে আবিষ্কার করে এটি একজন নারীর নাকের মাংস : 'সেই বিকেলে মাংস টুকরোটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি দেখেন যে, সেটার গায়ে ছোট্ট মসুরের ডালের মতো একটি পাথরের ফুল। তিনি হাহাকার করে ওঠেন, দুহাতের অঞ্জলিতে টুকরোটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বড় ছেলে খাজা শফিকের সহায়তায় সেটা দাফন করেন নিজের বাড়ির আঙিনায়।' (পৃ. ১২)। এই অদেখা ভাগ্যাহত মেয়ের প্রতি করুণাসিক্ত আবেগ এবং তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সাহসী ভূমিকার চরম মূল্য হিসেবে মেয়েটির কবরের পাশে পিতা-পুত্রকে জোড়া কবরে সমাহিত হতে হয়েছে। অথচ বদু রাজাকার তাদেরকে হত্যার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছে 'মূর্তিপূজক কাফের' ও 'মোনাফেক'-এর তকমা দিয়ে। আহমদ আলী ও তার ছেলেকে হত্যা করেই বদু মাওলানা থামেনি, তাদের কবরের পাশেই পাকবাহিনীর গুলিতে নিহত হওয়া কুকুর ভুলুকে কবরস্থ করেছে এই যুক্তিতে যে, 'এই কবরে কোন পীর নাই, কুত্তা আছে'। (পৃ. ৪১)। মহল্লার মানুষের প্রতি তার ক্রোধ আর ঘৃণা এমন তীব্রতায় পৌঁছেছিল যে, সাতটি মানুষের লাশের চেয়ে কুকুরের মৃতদেহ তার কাছে ছিল অধিক প্রিয়। বস্তুত একাত্তরের মৃত্যুর মহাযজ্ঞে দুটি মাত্র মৃত্যু তাকে বেদনার্ত করেছিল—একটি তার ছেলের পোষা কুকুর ভুলুর, অন্যটি রাজাকার আবদুল গণির। সে তের বছরের আলাউদ্দিনকে হত্যা করেছে মুখের ওপর ভেঙচি কাটা আর অশ্লীল কথা বলার প্রতিশোধ হিসেবে। ইসমাইল হাজমকে হত্যা করেছে তার ছেলে আবুল বাশারের ক্লীবত্ব গোপন রাখার প্রয়োজনে। এই ক্লীবত্বের খবর একমাত্র হাজমেরই জানা ছিল এবং তা ফাঁস হওয়া ছিল বদুর সামাজিক মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর। আবু করিমের বড় ছেলে হারিয়ে যায় একটি টুকরো মাংস কুড়িয়ে পাওয়ার অপরাধে। এটি ছিল এক হিজড়ার পায়ের নখের টুকরা, যা বদুর সর্বাত্মক নৃশংসতার স্মারক। সে তার নৃশংসতার নমুনা এবং সাক্ষীর অস্তিত্ব রাখতে চায়নি। শুধু নির্বিচার হত্যাকাণ্ডেই তার নৃশংসতা সীমাবদ্ধ ছিল না, বাড়িতে বাড়িতে আগুন দিয়েছে, চালিয়েছে ব্যাপক লুঠতরাজ। ধর্মের বর্মে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সম্পদলিপ্সা চরিতার্থ করাই ছিল তার মূল অভিপ্রায়। নৃশংসতার মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন আর লুঠতরাজ চালিয়ে সম্পদ স্তূপীকৃত করাতেই সে সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করে। লুঠতরাজের ক্ষেত্রে হিন্দু ও হিন্দু বাড়ি তার সহজ শিকার হলেও মুসলমানদের বাড়িঘরও তার হাতে রেহাই পায়নি। আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা আজিজ পাঠানের বাড়ির সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে বদু মাওলানার বাড়িতে। বদু রাজাকারের নিশ্ছিদ্র নৃশংস পাহাদারির মধ্যেই দানা বাঁধতে থাকে প্রতিরোধের চেতনা; যারা মহল্লা থেকে নিখোঁজ হয়, তারা সবাই রাজাকারদের বলি হয় না, কেউ কেউ যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীতে। আর অসহায়ত্ব ও ত্রাস নিয়ে মহল্লায় যারা স্তব্ধতার চর্চা করে, তাদের মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ক্রমে প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গে রূপান্তরিত হতে থাকে। রাজাকারদের ধর্মান্ধতার বিপরীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতি বাড়িতে গজিয়ে উঠতে থাকে তুলসী গাছ। পূজার উপচার জবাগাছ লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে মুসলমান বাড়িতে। রাজাকার বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে বাড়িতে বাড়িতে গজিয়ে ওঠা এসব 'হিন্দু গাছ' নিধনে। প্রথম প্রতিরোধ আসে মোমেনার পক্ষ থেকে; তার প্রিয় জবাগাছ রক্ষা করতে কাটারি নিয়ে সে ছুটে যায় রাজাকারদের দিকে। এরপর ত্রাস আর স্তব্ধতা ভেঙে মোমেনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে মহল্লার নিরস্ত্র মানুষেরা। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে কেউ একজন চপেটাঘাত করে এক রাজাকারের গালে। এই খবরে আতঙ্ক শিরশির করে রাজাকার সর্দার বদু মাওলানার মনে : 'সে পুরো জিনিসটার ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া সাহসের এক পুনরুত্থানের ইঙ্গিত যেন দেখতে পায়'। (পৃ. ৪৭)। মহল্লায় সংঘটিত এই অভ্যুত্থান দমনের জন্য তাকে সামরিক বাহিনীর শরণ নিতে হয়। এরপর মহল্লা জুড়ে চলে নারকীয় তাণ্ডব। খোঁজ করা হয় অভ্যুত্থানের হোতা মোমেনার। তবে রাজাকাররা মোমেনাকে খুঁজে পায় না; কারণ তখন সে কুয়োতলার পেছনে পরিত্যক্ত ও ভগ্ন কুঠুরির মেঝেতে ছাই ও মাটির নিচে কবরের শয্যা নিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার নিষ্কৃতি মেলেনি; রাজাকারদের সতর্কদৃষ্টি চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকা মোমেনাকে খোঁজে বের করে নিয়েছিল। ডিসেম্বরের দশ তারিখ, স্বাধীনতা আসন্নপ্রায়; সমাগত পতনের মুখে উন্মত্ত হয়ে ওঠা রাজাকার বাহিনী তার নারীদেহে চালায় পাশবিক নির্যাতন। চারদিন পর বুড়িগঙ্গার বালুচরের জলাভূমিতে যখন তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তার সারা দেহে পৌরুষেয় জান্তবতার ক্ষতচিহ্ন : 'তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে উরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডান উরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ

করে রাখা; সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো দেহের নিচে চাপ পড়ে ছিল, মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত।' (পৃ. ৫১)। এরপর বদু রাজাকারের লাল আগুনের সন্ত্রাস, রক্তের নদী আর ত্রাসের দীর্ঘ অমানিশা পেরিয়ে মহল্লার মানুষ পায় পরম কাঙ্ক্ষিত মুক্তির বার্তা : 'হেমন্তের এক বৃহস্পতিবারে স্টেনগান হাতে, জলপাই রঙের পোশাক আর মুখ ভর্তি লম্বা দাড়ি নিয়ে একদল মুক্তিযোদ্ধা। তারা বলে, আর ভয় নেই, শালারা খতম। মহল্লার লোকেরা রাস্তায় নেমে এসে জংলি চেহারার লোকগুলোর কাঁধে চাপড় দিতে থাকে। তখন গাঢ় সবুজ রঙের ভেতর লাল সূর্য এবং সোনালি মানচিত্র আঁকা একটি পতাকা নিয়ে আবুল কাশেমের ছেলে জসিম দৌড়ে এসে চিৎকার করে ওঠে, জয় বাংলা...।' (পৃ. ২০)। বদু রাজাকার আত্মগোপনে চলে যায় এবং স্বজনহারানোর অবরুদ্ধ কান্নার সশব্দ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহল্লাবাসী অভূতপূর্ব মুক্তি অনুভব করে। বদু রাজাকারসহ পাঁচ রাজাকার পালাতে সক্ষম হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে কুখ্যাত রাজাকার আবদুল গণি। তার দেওয়া তথ্যে উঠে আসে একাত্তরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের বীভৎস চিত্র। নয় মাসের নিরাপদ আত্মগোপন শেষে বিজয়ী সেনাপতির মতো পরিবারসহ ফিরে আসে আওয়ামী লীগ নেতা আজিজ পাঠান। তার প্রত্যাবর্তনে মহল্লার মানুষ উল্লসিত হয়ে ওঠে, 'তাকে দেখে পুত্র ও স্বামীহারা নারীরাও হর্ষধ্বনি করে'। (পৃ. ২৪)। মহল্লার প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় উপস্থিত হয়ে, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে, আহমদ আলী ও তার ছেলের কবর জিয়ারত করে, নিজের বাসার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা-জানালার চৌকাঠ-ওপড়ানো দগ্ধ, বিধ্বস্ত বাসার কঙ্কাল দৃশ্য দর্শনেও তার মুখাবয়বে কোনো দুঃখ বা বিষাদের ছায়া ভর করে না। হাত বাতাসে উড়তে থাকা পতাকার মতো অপেক্ষমাণ জনতার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে সে স্মিতমুখে বলে ওঠে, 'আমাগো অনেক কিচু দেওন লাগচে, তবু আমরা স্বাধীন হইচি।' (পৃ. ২৪)। আজিজ পাঠানের কাছে স্বাধীনতা মানেই ক্ষমতা; আর এই কারণেই বিধ্বস্ত বাড়ি তাকে ব্যথিত করে না। ক্ষমতার স্বাদ তাকে পরিতৃপ্তি দেয়। এই স্বাধীনতার জন্য তাকে কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি; বাড়ি, লুঠ হওয়া সম্পদ সবকিছুই সে ফিরে পেয়েছে; এমনকি বিধ্বস্ত হওয়া বাড়িটিও পুরনো অবয়ব ফিরে পায় অচিরেই। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এই সত্যই উদ্ঘাটিত হয় যে, 'বদু মাওলানা আজিজ পাঠানের সম্পত্তির জিম্মেদারি নিয়েছিল মাত্র'। (পৃ. ২৪)। আজিজ পাঠানের সম্পদ পুনরুদ্ধারের ঘটনায় আরেকটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়, ক্ষমতার সঙ্গে সম্পদ অবস্থান করে, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সম্পদের হস্তান্তর ঘটে মাত্র। ক্ষমতার রাজনীতিতে আজিজ পাঠান ও বদু রাজাকার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী; আবার ক্ষমতাকৌশলের অংশ হিসেবে তারা মিত্রও। ক্ষমতা যখন রাজনীতির মূল লক্ষ্য, ক্ষমতান্ধ রাজনীতিকদের কাছে রাজনীতি তখন কৌশলের খেলা; তার মধ্যে নৈতিকতার ভান থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিকতা থাকে না। এই নৈতিকতাভ্রষ্ট 'রাজনীতিতে চিরদিনের বন্ধু অথবা চিরদিনের শত্রু বলে কিছু নেই' (পৃ. ৪০)। ক্ষমতাকৌশলের অংশ হিসেবেই স্বাধীনতার মাত্র দুই বছরের মধ্যে জনজীবনে প্রলয় বইয়ে দেওয়া ঘাতক রাজাকারেরা রাজনৈতিক ক্ষমা পেয়ে যায় এবং মহল্লায় তাদের পুনরুদয় ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের চৈতন্যে হিম-আতঙ্ক ছড়িয়ে বদু মাওলানা ধীর পদক্ষেপে হাজির হয় তাদের আঙিনায় : 'মৃত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিকের বিধবা স্ত্রীরা, আলাউদ্দিনের মা, পুত্রহারা আবু করিম এবং আরো তিনজন পুরুষ ও রমণী সেই শীতের মঙ্গলবারে তাদের বাড়ির প্রাঙ্গণের ভেতর বদু মাওলানাকে দণ্ডায়মান দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।' (পৃ. ৩৭)। তাদের কাছে মনে হয় 'আযাযিলের পুনঃপ্রবেশ'। পুনর্বাসিত হওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বদু মাওলানা ক্যাপ্টেনের স্পর্শধন্য পুরনো আলখাল্লা পরিধান করে তার হাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া আট পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ক্ষমা চাইতে বা অনুশোচনা প্রকাশ করতে নয়, 'এই দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা সে আসলে সাতটি ক্ষতচিহ্ন পরীক্ষা করতে চেয়েছিল মাত্র'। (পৃ. ৩৬)। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাকে ক্ষমা করলেও সন্তানহারা মা ও তার স্বজনেরা তাকে ক্ষমা করেনি; রাজনৈতিক ক্ষমাকে তাদের কাছে পরিহাস মনে হয়েছে। এক মঙ্গলবারের হিমেল অপরাহ্নে বদু মাওলানা উঠানে দাঁড়িয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলে আবদুল মজিদ বাকরহিত হয়ে যায়; তার কন্যাহারা মা ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে; তার কণ্ঠ থেকে বিস্ফোরিত হয় হৃদয়বিদীর্ণ হাহাকার ও ঘৃণাভরা অভিসম্পাত : 'থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে'। (পৃ. ৩৬)। খাজা আহমেদ আলীর বাড়ির প্রাঙ্গণে হাজির হলে বিধবা জয়নব 'খবরদার, খবরদার' বলে পথরোধ করে দাঁড়ায়। তার প্রবল বাধায় কোন বাক্যব্যয়

ছাড়াই বদু রাজাকার অপছায়ার মতো উঠান থেকে দ্রুত অপসৃত হয়। আবু করিমের স্ত্রী বদু মাওলানাকে উঠানে দেখে রান্নাঘরের ছড়ানো-ছিটানো তৈজসপত্রের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে আর আলাউদ্দিনের মা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হাতে-থাকা বাসনকোসন বদুর মুখের ওপর ছুড়ে মারে। আলাউদ্দিনের রণচণ্ডীবেশী মা তাড়া-খাওয়া শৃগালের মতো পলায়নরত বদুর পেছনে ধাওয়া করে এবং লোহার ফুঁকনি ছুড়ে মারে। সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখে তার নিরাপদ আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় আজিজ পাঠান : 'যে মঙ্গলবার বিকেলে মোমেনার মার হাহাকার শোনা গিয়েছিল, 'থুক দেই মুখে' তার পরদিন সকালে আজিজ পাঠান ক্রন্দনরত বদু মাওলানাকে বলেছিল কাইন্দেন না মাওলানা, কাইন্দেন না।' (পৃ. ৩৯)। আজিজ পাঠান এই বলে যুক্তি তৈরি করে, 'তার নেতা যেহেতু বদু মাওলানাদের মাফ করেছে, তার নিজের কোনো প্রতিহিংসা নাই।' (পৃ. ৩৮)। প্রকৃতকথা হলো, বদু মাওলানার প্রতি আজিজ পাঠানের প্রতিহিংসা থাকার কোনো কারণ নেই; হিংসার শিকার হলে তো প্রতিহিংসার প্রশ্ন আসে। তাই আজিজ পাঠান সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারে; উপরন্তু অতীতকে ভুলতে পারে না বলে যারা ক্ষমা করতে পারে না, তাদেরকে অতীত ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারে অবলীলায় : 'সময়ে মানুষকে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয়, বাস্তবতা অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে।' (পৃ. ৫১)। রাজনীতিকদের কাছে রাজনীতি হলো ক্ষমতার সিঁড়ি; ক্ষমতায় যাওয়ার হিসাবনিকাশই এখানে সারকথা; আর মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে জনগণের আবেগ-অনুভূতি আর তাদের অনিঃশেষ ক্ষত ও ক্ষতিগুলো রাজনীতির হিসাবনিকাশে গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু রাজনীতিতে জনসমর্থনটাও অতীব জরুরি; এই জনসমর্থন ধরে রাখার জন্য তাদেরকে আশ্রয় নিতে হয় ভণ্ডামির। বদুর রাজনৈতিক উত্থানে আবদুল মজিদ বিপন্নতা অনুভব করলে আজিজ পাঠানের প্রতিক্রিয়াটা এখানে প্রণিধানযোগ্য : 'হরতালের পর যেদিন সব পক্ষই মহল্লার লোকদের 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে ধন্যবাদ দেয় এবং যেদিন বাজারে যাওয়ার পথে আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে ফট্ করে ছিঁড়ে যায় তার পরদিন সে আজিজ পাঠানকে একমুহূর্তের জন্য রাস্তায় পায়; তখন দুএকটি কথার ভেতর সে তাকে এ-ও বলে যে, বদু মাওলানারা এখন তাদের 'ভাইসব' বলে ডাকে এবং হরতাল করার জন্য ধন্যবাদ দেয়। এই কথা শুনে তখন আজিজ পাঠান যেন তার মর্মস্থল দেখতে পায় এবং বিষণ্ণভাবে হেসে আবদুল মজিদের কাঁধের ওপর প্রাচীন বৃক্ষ শাখার মতো তার শিরা-ওঠা হাত রাখে। সে তাকে বাসায় নিয়ে যায় বহুদিন পর এবং তার সঙ্গে এত কথা বলে যে, আবদুল মজিদ তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না, ...।' (পৃ. ৩৯)। আজিজ পাঠানের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বদু রাজাকার মহল্লার মানুষের প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যানে আর বিচলিত বোধ করে না; বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক বুনিয়াদ পুনর্নির্মাণে তৎপর হয়। বদু মাওলানা মহল্লাবাসীদের কাছে আজিজ পাঠানের বদান্যতা প্রচার করতে গিয়ে বলে, 'একমাত্র মানী লোক-ই মানীর সম্মান রাখতে জানে।' (৩৯)। আজিজ পাঠানকে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে এবং নিজেকে আলেকজান্ডারের সামনে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী রাজা পুরু হিসেবে চিহ্নিত করে একাত্তরে নিজের কৃতকর্মকে বীরত্বের মহিমা দেওয়ার যুক্তি তৈরি করে : 'বালক-বালিকাদের স্কুলের গল্পের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে যে, বীর রাজা পুরুর মতো সে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দেখেছিল যে, আলেকজান্ডাররা সবসময় পুরুদের সঙ্গে একই ব্যবহার করে; কারণ একমাত্র বীরই চিনতে পারে বীরের লক্ষণ সকল।' (পৃ. ৩৯)। আজিজ পাঠানদের ক্ষমার সুযোগ নিয়ে কোনো প্রকার অনুশোচনা বা অপরাধবোধ ছাড়াই বদু রাজাকাররা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি বিকৃত পাঠ উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়। এই বিকৃত-ইতিহাসে স্বাধীনতার দুই বছরের মধ্যেই বদু রাজাকার নিজেকে দাবি করে একজন দেশপ্রেমিক অথচ পরাজিত বীর হিসেবে। স্বাধীনতার নয় বছর পরে ১৯৮০ সালে এসে বদু রাজাকার তার কুখ্যাত দোসর আবদুল গণিকে সদম্ভে ঘোষণা করে 'শহিদ' আর হত্যাকারী জনতাকে সে চিহ্নিত করে 'কুকুর' বলে : 'আবদুল গণি কুকুরের মতো জনতার ক্রোধের কারণে নিহত হয়েছিল—সে শহীদ হয়েছিল আসলে।' (পৃ. ৪৩)। ইতিহাস-বিকৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে মহল্লার বিজ্ঞ অভিভাবক এবং একাত্তরের গণহত্যার শিকার হওয়া খাজা আহমদ আলীকে 'মোনাফেক' ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এরপর ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ সকল রাজনৈতিক দল এক কাতারে শামিল হয়। স্বাধীনতার মাত্র পনের বছরের ব্যবধানে ক্ষমতার রাজনীতির সমীকরণে স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল স্বাধীনতাবিরোধীদের সঙ্গে

জোট গঠন করে এবং হরতাল সফল করার জন্য জনগণকে অভিন্ন ভাষায় 'ধন্যবাদ' জ্ঞাপন করে। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির চূড়ান্ত নৈতিক পরাজয়। আজিজ পাঠান রাজনৈতিক বাস্তবতার পটে একাত্তরে স্বাধীনতাবিরোধীদের কর্মকাণ্ড যতই ভুলে যেতে চান না কেন, নৃশংসতার শিকার হওয়া আবদুল মজিদেরা এবং সহিংসতাকারী বদু রাজাকার কেউই কিছু ভুলে যায় না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আবদুল মজিদ এক কিশোর। মুক্তিযুদ্ধের পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও রাজাকারদের ভয়াবহ গণহত্যা ও বড় বোন মোমেনার বিভীষিকাময় হত্যা স্মৃতি চৈতন্যে ধারণ করে আবদুল মজিদ যৌবনে পদার্পণ করে এই প্রত্যয়ে যে, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীশক্তি বাংলাদেশের মাটিতে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু স্বাধীনতার মাত্র পনের বছরের মধ্যে সেই অপশক্তির সহুঙ্কার পুনরুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক জোটবদ্ধতা তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে : 'কৈশোরের আতঙ্কের সেই দিনে সে যে বিষয়টি বাদ দেওয়ার কথা বলেছিল সেটা কোনোভাবেই বাদ হয়ে যায় নাই এবং তাই, পনের বছর পর সেই আলখাল্লা পরা বদু মাওলানার ছেলে, খায়ের মাওলানার কথা শুনে রায়সা বাজারে বাজার করতে যাওয়া ত্যাগ করে সে ছেঁড়া স্যান্ডেল হাতে বাসায় ফিরে তার স্ত্রী ইয়াসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে ইয়াসিমিনের শীর্ণ গ্রীবার গোড়ায় একটি শিরা দপদপ করে, সে সেখানে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে; মোমেনার গলার পাশে এই জায়গায় বেয়োনেট গেঁথে দেয়া হয়েছিল। ... জরাগ্রস্তের মতো আবদুল মজিদ ইয়াসমিনের গলা জড়িয়ে ধরে 'আপা, আপা' বলে ফোঁপায়।' (পৃ. ১৫-১৬)। মোমেনা তার বোন, মাতৃসমা বোন। মুক্তিযুদ্ধে বদু মাওলানার করুণতম শিকার। মুক্তিযুদ্ধে তার প্রতি তীব্র ঘৃণা সত্ত্বেও সামান্য 'মান্দারপো' গালি দেওয়ার সুযোগও পায়নি, যুদ্ধে সেই মাওলানা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের মাত্র দুই বছরের মধ্যে তার প্রত্যাবর্তন ও পনের বছরের মধ্যে তার রাজনৈতিক পুনরাধিষ্ঠানের সে অসহায় দর্শক। মধ্যবিত্তসুলভ ভীরুতার যূপকাষ্ঠে সে বন্দি। ভীরুতা সত্ত্বেও বদু মাওলার প্রতি ঘৃণাটা সে জারি রাখে; মুক্তিযুদ্ধে বোনের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থেই সে তার সদ্যভূমিষ্ঠ কন্যার নাম রাখে 'মোমেনা'; 'ছোট মোমেনার অস্তিত্বের ভেতর বড় মোমেনা ফিরে আসে'। (পৃ. ৪৯)। আবদুল মজিদ যেমন ভুলতে পারে না একাত্তরের বিভীষিকাকে, তেমনি বদু মাওলানাও সেই ঘটনা ভোলেনি। এই ঘটনায় বদু মাওলানার শাঁসানিতে পড়ে যায় আবদুল মজিদ : 'বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা?' (পৃ. ৫১)। এই অবস্থায় সে মহল্লার বাস্তু ত্যাগ করে বাড্ডায় শ্বশুরবাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; 'এটাই একমাত্র যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। প্রথমত, সে চায় না, তার মেয়েটি তার বোনের মতো বদু মাওলানা কিংবা তার ছেলেদের জিঘাংসার শিকার হোক এবং তার মনে হয়, বাস্তবতা এভাবে এগোলে এ রকম যে ঘটবে না তা কেউ বলতে পারে না। তার মনে হয়, বদু মাওলানা একাত্তর সনের সেই একই রাজনীতির চর্চা করে এবং সে এখনো জানে আবদুল মজিদ এবং তার পরিবার, মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনো তাকে ঘৃণা করে। তার মনে হয়, এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় বদু মাওলানা এবং তার দল সুবিধা করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে ছেড়ে দেবে না এই ঘৃণার জন্য।' (পৃ. ৫২)। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির যে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষভূক্ত রাজনীতিবিদদের হঠকারিতায় সেই ঐক্য চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদদের ক্ষমতালিপ্সা দুর্বৃত্তায়নের ফাঁকফোকর দিয়ে সুযোগসন্ধানী স্বাধীনতাবিরোধীরা শেকড়বাকড় নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলার আপামর মানুষের মধ্যে যে একটি সর্বাত্মক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদেরা সেই স্বপ্নের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ স্বরচিত গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে মানুষ এখন আর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের স্পৃহা অনুভব করে না, আত্মরক্ষার ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিপুল আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার করুণ ব্যর্থতাই জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসের উপজীব্য এবং উত্তর-উপনিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের করুণ বাস্তবতা। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু মনস্তত্ত্বে লালিত ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি অর্জন সম্ভব হয় না।

কাঁটাতারে প্রজাপতি[১৫]

সেলিনা হোসেনের *কাঁটাতারে প্রজাপতি* উপন্যাসটি (১৯৮৯) বাংলার কিংবদন্তিতুল্য রাজনৈতিক নেত্রী ইলা মিত্রের সংগ্রামমুখর জীবনের আখ্যান। এই ধরনের উপন্যাসে 'সংগ্রামী বিদ্রোহের সারাৎসারকে সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির মিথস্ক্রিয়ায় পুনর্জন্ম' দানের পেছনে সক্রিয় থাকে বৈরী-সময় মোকাবিলার প্রেরণা। উপন্যাসে ইতিহাসের মৃতকাঠামোর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের লক্ষ্যে ঔপন্যাসিককে অনেক অনৈতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটাতে হয়; তবে তা হতে হয় ইতিহাসানুগ ও বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক চরিত্রের সামবায়িক ঘটনাবর্তে স্থাপন করে লেখক জায়মান করেছেন ইলা মিত্রকে। তবে ইতিহাসের পুনর্বয়নে প্রচলিত জাতীয়তাবাদী বয়ান ছাপিয়ে উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামী ইতিহাসের ভিন্ন পাঠ। গণবিচ্ছিন্ন ও স্বার্থসর্বস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইলা মিত্রের আত্মোৎসর্গীকৃত নেতৃত্ব এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে সদ্যস্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ববাংলার শ্রমজীবী মানুষকে নতুন করে উপনিবেশিত করার নিষ্ঠুর অধ্যায়ের এক বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ এই উপন্যাস।

দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বের ও পরের নাচোলের তেভাগা আন্দোলন *কাঁটাতারে প্রজাপতি* উপন্যাসের পটভূমি। রাজশাহী জেলার ক্ষুদ্র জনপদ নাচোলে সংঘটিত এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলো সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী। কৃষিজীবী এই মানুষেরা সুঠামদেহী ও কঠোর পরিশ্রমী; স্বভাবগতভাবে সহজ-সরল ও কোমলপ্রকৃতির; জীবনযাপনে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ; নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যূথবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত। এই কোমলমতী মানুষগুলো আবার শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সংগ্রামে দুঃসাহসী, আত্মত্যাগে অকুতোভয়; প্রচণ্ড দমন-পীড়নেও সংকল্পে অটল। ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর রয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্য। সাঁওতাল-বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৮), বিশেষত নাচোল বিদ্রোহ (১৯৪৯-৫০) আদিবাসী সাঁওতাল-সম্প্রদায়ের সংগ্রামী ঐতিহ্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাঁওতাল বিদ্রোহের মৌল প্রেরণা ছিল বর্ণহিন্দু মহাজন-সম্প্রদায় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির ফৌজি বাহিনীর অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। এই 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'কে উপজীব্য করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) উপন্যাস। তাঁর *কালিন্দী* (১৯৪০) উপন্যাসের একটি বিশেষ অংশে ব্যবহৃত হয় ঐ আন্দোলনের স্মৃতিসূত্র। উপনিবেশ-আমল ও উত্তর-স্বাধীন ভারতের দুই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ব্যবধান সত্ত্বেও এই উপন্যাসদ্বয়ে প্রতিফলিত হয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনামুক্ত স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন এবং অপরাজেয় জীবনচেতনা। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সাঁওতালদের বিদ্রোহ পুনরায় দানা বেঁধে ওঠে। ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বাংলার প্রান্তবর্তী সাঁওতাল জনপদেও আঘাত হানে। মন্দার ধাক্কা সামলাতে জোতদার-মহাজনেরা সাঁওতাল বর্গাচাষীদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশ দাবি করে এবং এ-দাবি বাস্তবায়নে দমনপীড়নের আশ্রয় নেয়। বর্গাচাষীদের মধ্যে জমি বিলিবণ্টন ও ফসলের হিস্যানির্ধারণে জোতদারদের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল ব্রিটিশ আইন-অনুমোদিত। অসহায়ত্বের ফাঁদে ফেলে জোতদারেরা তাদের আরোপিত শর্তে বর্গাচাষীদের জমি চাষে বাধ্য করতো এবং নানা অজুহাতে উৎপাদিত ফসলের প্রায় পুরোটাই নিজেদের দখলে নিয়ে নিতো। স্বৈরাচারী শোষণ সহনক্ষমতার বাইরে চলে গেলে অস্তিত্বসংকটে পড়া এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় ব্রিটিশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী সাঁওতালদের বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসে। দমন-পীড়ন সত্ত্বেও জমিতে স্থায়ী দখলিস্বত্ব ও উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে এই প্রান্তিক কৃষকদের আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে, যা ইতিহাসে 'তেভাগা আন্দোলন' নামে সুপরিচিত। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্ট পার্টি। সোমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের অসামান্য আত্মত্যাগী নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার উত্তরাঞ্চলের নাচোলের সাঁওতালদের সঙ্গে শরিক হয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নিষ্পেষিত কৃষকজনতা। জমিদার-জোতদার পরিবারের অনেক সন্তান এবং শিক্ষিতশ্রেণির একাংশও এই আন্দোলনে অসামান্য অবদান রাখে। সমিতি গঠন,

মহিলা কর্মী গড়ে তোলা, সংগ্রামী তহবিল এবং রাজনৈতিক শিক্ষাদানের ক্লাস––এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের আন্দোলন অভূতপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করে। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদে। তবে সাঁওতালদের অসীম সাহসী ও আত্মত্যাগী কর্মকাণ্ডে রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষুদ্র জনপদ নাচোলই হয়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলনের পাদপীঠ। উল্লেখ্য, দেশভাগের অব্যবহিতপূর্বে পুরো ভারতবর্ষ যখন সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত, সেই ভয়াল সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার পটভূমিতে ক্ষুদ্র জনপদের এই আন্দোলন ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম; নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রাণিত। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় কমিউনিস্ট পার্টির অসাম্প্রদায়িক চেতনাও হোঁচট খায়। জনমানুষের সমর্থন লাভের ধূর্ত প্রচেষ্টা হিসেবে মুসলিম লীগ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিগুলোকে নিজেদের কর্মসূচিতে আত্তীকৃত করে নেয়। এই চাতুর্যপূর্ণ কৌশলে বিভ্রান্ত হয় শ্রমজীবী জনতা। কমিউনিস্ট পার্টিও বাধ্য হয় আপসের নীতি গ্রহণে। এক্ষেত্রে মুসলিম লীগের বামপন্থি অংশের কর্মসূচি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। মুসলিম লীগের সহযোগীর ভূমিকায় অবস্থান নিয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব দেশভাগেই সন্ধান করে শান্তি ও শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন রাষ্ট্রের জন্মোৎসবও তাঁরা ধুমধামের সঙ্গে পালন করে। কিন্তু দেশভাগের পর পাকিস্তানের মুসলিম লীগের অভিজাত শাসকগোষ্ঠী স্বরূপে আবির্ভূত হয় এবং মনোযোগী হয় গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণে; পদদলিত করে জনমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণের সুবিধার্থে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাটি অবিকল বহাল রাখে। স্বপ্নভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন দুই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে শোষিত জনগোষ্ঠীর আন্দোলন বেগবান হয়। পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক কায়দায় কমিউনিস্ট পার্টি ও মুক্তিকামী জনগণের ওপর নেমে আসে নৃশংস দমন-পীড়ন। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, পুলিশ ও সেনাবাহিনী––এককথায় গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন দমনে। সদ্য সাবেক ঔপনিবেশিক শাসনের যথার্থ উত্তরসূরি হিসেবে নতুন রাষ্ট্র জনবান্ধব হওয়ার পরিবর্তে হয়ে ওঠে জননিপীড়ক। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে চিহ্নিত করে ভারতের দালাল ও নবগঠিত রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে এবং গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে নৃশংস কায়দায় দমনের যুক্তি তৈরি করে। এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আত্মগোপনে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং গোপন ক্যাম্পে রাজনৈতিক কর্মীদের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রশিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারেই রমেন মিত্র, ইলা মিত্র সহ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নাচোলে তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও জুলুমের মধ্যেই নাচোলের কৃষক আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে এবং জোতদার-মহাজনেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড এবং অমানুষিক নিপীড়নের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে চল্লিশের দশক জুড়ে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুক্তি হিসেবে যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্যবাদ ও ন্যায়পরায়ণতার কথা প্রচার করা হয়েছিল, নাচোলের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সেই যুক্তিভূমিটিকেই ধসিয়ে দেয়। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে যায়; একটি ধনবাদী রাষ্ট্র হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ধনিক-অভিজাতশ্রেণির স্বার্থের গরজে গণমানুষের ওপর শোষণ চালানোর পথকে অবারিত করতে রাষ্ট্রকে একটি নিপীড়ক যন্ত্র হিসেবে গড়ে তোলে। গণমানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পূর্ববর্তী ব্রিটিশ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কমিউনিস্ট পার্টি নির্মূলীকরণে সর্বাত্মক শক্তি ও কৌশল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বর্তমান উপন্যাস রচনাকালের জীবন্ত কিংবদন্তি ইলা মিত্রের জীবনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দুই দশকের এবং পাকিস্তানি শাসনের গোড়ার দুই-তিন বছরের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি, সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসক ও তার পরবর্তী পাকিস্তানি শাসকদের নৃশংসতার চিত্র ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইলা মিত্রকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাসের অনেক বাস্তব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে আলোচ্য পাঠকৃতিতে। এদের মধ্যে রমেন মিত্র, সাঁওতাল সর্দার মাতলা মাঝি, সাঁওতাল যুবক হরেক, তফিজুদ্দিন দারোগা, কমিউনিস্ট নেতা অনিমেষ লাহিড়ী, আজাহার হোসেন, ফণীভূষণ মাস্টার, ওয়াজেদ মোড়ল, বৃন্দাবন, থানার ওসি রহমান, ডা. আয়ুব আলী প্রমুখ ইতিহাস থেকে উঠে আসা বাস্তব চরিত্র। রমেন মিত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে (১৯৪৫) কলকাতার মেয়ে ইলা সেনের ইলা মিত্র হয়ে সাঁওতাল অধ্যুষিত প্রান্তিক জনপদ নাচোলে আবির্ভাব। জমিদার-তনয় রমেন মিত্র নাচোল অঞ্চলে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠক ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। রাজনৈতিক আদর্শে একনিষ্ঠ রমেন ইতোমধ্যেই নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রাচুর্যের মোহ ত্যাগ করে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং নিজ জমিদারিতে তেভাগা কার্যকর করেন। লেখকের অভীষ্ট অনুসারে রমেন মিত্রকে ছাপিয়ে আলোচ্য পাঠকৃতিতে ইলা মিত্রের সংগ্রামমুখর জীবনই হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় উপজীব্য। পুরুষপ্রাধান্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাজ আরোপিত প্রান্তিকতা পেরিয়ে একজন নারীর একটি বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠাকেই ঔপন্যাসিক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ছাত্রজীবনেই ইলা মিত্রও কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। রাজনৈতিক আদর্শই তাঁদের দাম্পত্য-সম্পর্কের বন্ধনসেতু। নিছক গৃহবধূ হিসেবে জমিদার বাড়িতে ইলা মিত্রের আগমন হয়নি, এসেছেন স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গী ও সহযোদ্ধা হিসেবে মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে অংশ নিতে। রমেন মিত্র ইতোমধ্যেই জমিদারি আভিজাত্যের শেকল ভেঙে জনমানুষের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। তাই ইলা মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি রামচন্দ্রপুরে প্রবেশ করেন, তখন সাঁওতাল জনগোষ্ঠী উৎসবের আমেজে তাঁদেরকে বরণ করে নেয়। এই অভ্যর্থনা ছিল রমেন মিত্রের প্রতি এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার্দিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। এই অভ্যর্থনায় আপ্লুত ইলা মিত্র এক গভীর দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত হন; এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুক্তি ও জীবনমান উন্নয়নের সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। গ্রামীণ জীবনে অনভ্যস্ত ইলার চিত্ত যখন সংশয়ে দোল খায়, তখন তার সংগ্রামী অতীত তাঁকে প্রত্যয়দীপ্ত করে তোলে। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন তুখোড় অ্যাথলেট; সাঁতার, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন খেলায় ভারতের অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এই গৌরবময় দিনগুলোই তাঁর নতুন কর্মযজ্ঞের অনুপ্রেরণা : 'বার বার মনে হয়, মাঠের খেলা শেষ করে এবার জীবনের খেলা শুরু। ... এখন আর সবুজ মাঠে নরম ঘাসের ওপর দৌড় নয়। দৌড় গ্রামের এই এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় এবং এসব মানুষের সঙ্গে। এগিয়ে গেলে হবে না, এদের সাথে নিয়েই এগোতে হবে। ... পরাজিত হতে আমি জানি না। খেলা যেভাবেই হোক না কেন, জয়ী হওয়াটাই প্রথম কথা।' (পৃ. ৩৬)। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে অচিরেই ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্মযজ্ঞে। প্রথমেই হাত দেন নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে। কিন্তু ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রতিবন্ধকতার দেয়াল। তাঁকে প্রথমে অতিক্রম করতে হয়েছে জমিদারবাড়ির সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের ধ্যান-ধারণা। এরপর স্কুলের শিক্ষার্থী সংগ্রহের পালা; যা নারীশিক্ষার পক্ষে প্রচণ্ড বৈরী রক্ষণশীল সমাজে দুরূহ ব্যাপার। তাঁকে বাড়ি বাড়ি ছুটতে হয়েছে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে। অদম্য আগ্রহ ও নিষ্ঠার বলে তিনি একাজে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন। মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী নিয়ে চালু হওয়া প্রতিষ্ঠানে মাস তিনেকের ব্যবধানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশজনে। নারীশিক্ষার পাশাপাশি তিনি যুক্ত হন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। দিনে স্কুল, রাতে কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির কাজ; গ্রামের পর গ্রামে অক্লান্ত ছুটে বেড়ান কৃষকদের সংগঠিত করতে, বক্তব্য দেন সভা-সমাবেশে। তাঁর শিক্ষা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অভিন্ন উদ্দেশ্যে গাঁথা––শোষণ-বঞ্চনাহীন এক মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি এমন মানুষ গড়ার ব্রত নিয়েছেন, 'যারা অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার, যারা নিজেদের পায়ের নিচে শক্ত মাটির ভিত চায়।' (৮২)। শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর স্কুলটিকে ব্রিটিশ কলোনিয়াল ধাঁচের সার্টিফিকেটসর্বস্ব, শেকড়বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কৃত্রিম মানুষ তৈরির কারখানা বানাননি; বরং এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা এঁকেছেন, যেখানে গড়ে উঠবে আত্মনির্ভর, মুক্তমনা, যৌথকল্যাণভাবনায় উজ্জীবিত, শেকড়প্রোথিত মানুষ। তিনি এমন একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন দেখেছেন, যারা ক্ষমতামুখী হবে না, নিজ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ওপরতলার মানুষ হবে না,

নিজের সুখ-সুবিধা-প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য অন্যের ওপর শোষণ-জুলুম-নিপীড়ন চালাবে না, যারা ক্ষমতাচর্চার পরিবর্তে নিজ জনগোষ্ঠীর মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে, প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গভীর দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত হবে। আভিজাত্যের ঘেরাটোপে বন্দি রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে ভেঙে দিয়ে তিনি রাজনীতিকে করেন জনজীবনঘনিষ্ঠ। তিনি এমন এক রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদর্শ স্থাপন করেছেন, যেখানে নেতা উঁচু মঞ্চ ছেড়ে নেমে আসেন জনতার কাতারে, মিশে যান তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে; সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে অন্তরঙ্গ মমত্বে অনুধাবন করেন, সুবচনে মুগ্ধ না করে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বুঝিয়ে দেন জনগণের দুর্ভোগের কারণ ও করণীয়। ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নয়, জনমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ এবং এই আদর্শে তিনি একনিষ্ঠ।

নাচোলের রাজনীতিতে ইলা মিত্রের আবির্ভাব ঘটে কৃষ্ণগোবিন্দপুরের হাটে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। সেই সভায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়; প্রায় শ-তিনেক মহিলাও অংশ নেয়। তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস; মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে সবাই; প্রবল উদ্দীপনা তৈরি হয় কৃষকজনতার মাঝে; তুমুল হর্ষধ্বনিতে অভিনন্দিত হন তিনি। ঔপন্যাসিকের জবানিতে তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া : 'সভা শেষে এক বিশাল মিছিল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। ... গর্জে ওঠে স্লোগান : জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কর, লাঙল যার জমি তার-- লাঙল যার জমি তার-- লাঙল যার জমি তার। এসব স্লোগান হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হয়, ওদের ভাঙা পাঁজর থেকে বেরিয়ে আসে নিঃশ্বাসের মতো।' (পৃ. ৮৭)। ইলা মিত্রের কর্মকাণ্ড গোটা অঞ্চলে গণজাগরণ সৃষ্টি করলে অবধারিতভাবেই বাধা আসে গ্রামের প্রভাবশালী মহল থেকে। কারণ এই শোষকশ্রেণি ভালো করেই জানে অন্ত্যজশ্রেণির শিক্ষিত ও অধিকারচেতন হওয়ার অর্থই হলো তাদের শোষণ-শাসন ও আধিপত্যের নিশ্চিত পতন। আর সমাজটা যখন পুরুষতান্ত্রিক, তখন নারীর অধিকারবোধ পুরুষের আধিপত্যের পক্ষেও ভয়ংকর। তাই ইলা মিত্রকে ঘায়েল করতে তারা তাঁর স্কুলকেই টার্গেট বানায়। নারীশিক্ষার নামে পরিচালিত এসব কাজকর্ম 'শরীয়তবিরোধী' এবং মেয়েদের বেপর্দা ও অবাধ্য করার মাধ্যমে মুসলমানসমাজকে ধ্বংস করার গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার চালায়। এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বে পুরো ভারতবর্ষ যখন কম্পমান, তখন এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাকে প্রত্যাখ্যান করে আশ্চর্য সচেতনতায়। নিরক্ষর ক্ষেতমজুর ওয়াজেদ মোড়লের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই অনলবর্ষী প্রত্যাখ্যান : 'গলা ফাটিয়ে বলে, মেয়েরা স্কুলে গ্যালে শরীয়ত বেপর্দা হয় বুল্যা চোঁচাচ্ছে গাঁয়ের বড় মানুষরা। হামার কথা হলো, শরীয়তবিরোধী কাজ হয় কুন্‌টা? জোতদারের বাড়িত কাম করল্যে বেপর্দা হয় না? বাঁদীগিরি করল্যে বেপর্দা হয় না? বড় মানুষের বাড়ির লাগ্যা যে মেয়েরা মেলা দূর থ্যাকা পানি অ্যানতেছে, কৈ এর লিগ্যাতো বেপর্দার কথা উঠে না? জোতদাররা যে ম্যায়া মানুষের ইজ্জত নষ্ট করে, তা শরীয়তবিরোধী কাজ লয়? জোতদাররা হামারঘে চুষ্যা খায় বুল্যা চ্যায় না হামরা কিছু জ্যানব্যার পারি!' (পৃ. ৮৯)। ভীতু স্বভাবের, যার সাত চড়ে রা কাড়ে না, সেই কায়েস মণ্ডলের কণ্ঠ গর্জে ওঠে শোষণের বিরুদ্ধে : '...হামরা জানি শরিয়তে সুদ খাওয়া হারাম। কিন্তু হামারগ্যে চারপাশে যারা আছে, তারা সুদের টাকার পাহাড় বানাচ্ছে। তাদের কি সুদ হালাল? জোতদাররা, মহাজনরা ঋণের ট্যাকার সুদ খায় ক্যান? হ্যাকের মুখে কি বড় কথা মানায়/ ক্যাবল যত দোষ হামারঘেহামরা হামারঘে গায়ের চ্যামড়া দিয়্যা সুদের ঢোল ব্যানাই?' (পৃ. ৯০)। এটা কেবল ওয়াজেদ, কায়েসের মতো দু-চারজন চাষাভুষোর বিচ্ছিন্ন আর্তনাদ নয়, এক মূক-জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের স্তব্ধতা ভাঙা সশব্দ বিস্ফোরণ; শোষণ-জর্জর এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভূতপূর্ব জাগরণ। এই জাগরণের কারিগর ইলা মিত্র। তিনি ভীরুর মনে জুগিয়েছেন বিপ্লবের সাহস, ধর্মাচ্ছন্ন চোখে সঞ্চার করেছেন যুক্তির আলো, স্তব্ধবাক্ কণ্ঠে জুগিয়েছেন আত্মপ্রকাশের ভাষা আর স্বপ্নহীন হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন মুক্তির জপমালা; শোষিত-নিগৃহীত মানুষকে চিনিয়েছেন তাদের শত্রু-মিত্র, বুঝিয়ে দিয়েছেন তাদের করণীয়। ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত-ধনী-দরিদ্রের সকল বিভাজক সরিয়ে তিনি সকলকে ঐক্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। তাদের কাছে ইলা মিত্র আর বাইরের কেউ নন, দিন-রাতের কর্মযজ্ঞে ও গভীর ভালবাসায় হয়ে উঠেছেন একান্ত আপনজন; পরিণত হয়েছেন এক গভীর নির্ভরতা ও আস্থার প্রতীক 'রানিমা'। ইলা মিত্রের শেকল ভাঙার আহ্বান শুধু নারীদের প্রতি ছিল না,

শোষণ-শাসনে ন্যুব্জ চাষাভুষোর কণ্ঠেও জুগিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা। সুযোগ পেলে বাক্‌হারা মানুষও যে নিজের অধিকার আদায়ে মুখর হয়ে উঠতে পারে, অচেতন মনও প্রশ্নশীল হতে পারে নিজেদের দুর্ভোগের কার্যকারণ বিষয়ে, সোচ্চার হতে পারে সকল অবরোধ সরিয়ে মুক্তির পথ সন্ধানে, ওয়াজেদ-কায়েসরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; আর সেই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন ইলা মিত্র। তাই ধর্মীয় অনুভূতির জাল বিছিয়ে ইলা মিত্রকে জনশত্রু বানানোর অশুভ ষড়যন্ত্র মানুষের মিলিত শক্তির কাছে পরাভূত হয়। প্রান্তিক মানুষরা অভিজাতশ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠিত সমাজকাঠামোটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং সেই ব্যবস্থাটিকে ভেঙে দিয়ে নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইলা মিত্র প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুটো সীমাবদ্ধতা ভেঙেছেন––১. আভিজাত্যের খোলস ভেঙে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনজীবনের সমতলে পৌঁছা; এবং ২. পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির পুরোভাগে নারীনেতৃত্বের অধিষ্ঠান। কলোনিয়াল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা দেশীয় অভিজাতশ্রেণি ছিলো ঔপনিবেশিক শাসনের মূল স্তম্ভ। শাসকদের হয়ে আপামর মানুষের ওপর শোষণের কাজটি তাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। শাসকদের প্রতি একান্ত আনুগত্যের বদৌলতে তারা অর্জন করেছে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার অধিকার। বাংলা তথা ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন একের পর এক আছড়ে পড়েছে, তখন এই অভিজাতশ্রেণির ভূমিকা ছিলো শাসকমিত্রের। শোষিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন মোকাবিলার কৌশল হিসেবেই ব্রিটিশ শাসকদের তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসীন হয় ব্রিটিশদের হাতেগড়া দেশীয় অভিজাতশ্রেণি। এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িক বিবাদ মুখ্য হয়ে উঠলেও দুই বিবাদমান দলের নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিলো অভিন্ন–– দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ; আর ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিলো স্থানীয় রাজনীতিতে এই স্বার্থান্ধগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করে তাদের সহযোগিতায় যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকে প্রলম্বিত করা এবং প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান হলেও ফেলে-যাওয়া উপনিবেশে অনুগত শাসকদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ ও প্রভাব বজায় রাখা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক এবং কংগ্রেস-মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে ত্রিমুখী দ্বৈরথ সত্ত্বেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ছিলো এক গভীর সমঝোতা; সেটি হলো ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট রাজনীতিকে প্রতিহত করা। মতাদর্শিকভাবে পুঁজিবাদী এই তিনপক্ষের অভিন্ন ও গুরুতর শত্রু ছিলো কমিউনিস্ট পার্টি। রুশ বিপ্লবের পর বিশ্বজুড়ে কমিউনিজমের ব্যাপক প্রসারের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমের পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক দেশগুলো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষে কমিউনিজমের বিস্তার ঠেকানোর জন্য ব্রিটিশ শাসকেরা কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ও নেতাকর্মীদের দমন-পীড়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে নিজেদের ভেতরকার বৈরিতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা ও বিরোধিতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুগপৎ সক্রিয় ছিলো। কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে ভিড়ে যায়। কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে বামপন্থীদের ছিলো বিপুল প্রভাব। সুভাষ বসুর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব মূলত মতাদর্শিক এবং কংগ্রেস থেকে সুভাষ বসুকে হটানোর ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর সহায়কশক্তি ছিল কংগ্রেসের উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী এবং খোঁদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী। অপরপক্ষে চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতি তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল মূলত আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন বামপন্থি নেতাকর্মীদের প্রবল সক্রিয়তায়। উগ্র ডানপন্থি নেতৃবৃন্দ বামপন্থিদের সঙ্গে সহিংস বিবাদে লিপ্ত থাকলেও বামপন্থিদের সহ্য করেছে পাকিস্তান আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে; স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মুসলিম লীগের ডানপন্থি অভিজাত অংশটি ক্ষমতাকেন্দ্র দখলে নেয় এবং জনমূললগ্ন বামপন্থি অংশটি কোণঠাঁসা হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের মূল কাজ দাঁড়ায় তুমুল ভারত-বিরোধিতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা। এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে ধর্মবিরোধী, ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানের আদর্শবিরোধী এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক শত্রু ভারতের দালাল হিসেবে অবিরাম প্রচারে লিপ্ত

হয়। পাকিস্তানের শাসকপক্ষের এই চতুর প্রচারণাকৌশলের লক্ষ্য ছিলো কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে জনমনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি ও জনবিচ্ছিন্ন করা এবং রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত করে রাজনৈতিক দলটিকে নিষিদ্ধ ও নির্মমভাবে দমনের ক্ষেত্র তৈরি করা। এই প্রচারে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছিল। বামপন্থি ভাবধারার নেতৃত্বের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া এবং অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হতে না-পারা ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গুরুতরভাবে দুর্বল করেছে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত বুর্জোয়াশ্রেণির মানুষ। তাঁরা নিজ শ্রেণিস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সর্বান্তঃকরণে আদর্শনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগে উজ্জীবিত হয়ে শ্রমজীবী মানুষের সমতলে নেমে এসে তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেননি; অকুণ্ঠ আস্থায় বাঁধতে পারেননি খেটেখাওয়া জনমানুষকে। অন্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের মতো তাঁরাও সুপ্তচৈতন্যে লালন করেছেন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, আভিজাত্যের কাঠামোয় অবস্থান করে নিম্নবর্গের মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। শ্রমজীবী মানুষের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থতা ও জনজীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘাটতির কারণেই তাঁদের পক্ষে বাস্তবোপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার অভাব, জনমনস্তত্ত্ব ও দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ছিলো অতিমাত্রায় তত্ত্বনির্ভর এবং কর্মসূচি প্রণয়নে পরমুখাপেক্ষী। কর্মসূচিগুলো ছিলো বহিরারোপিত, পরিপ্রেক্ষিতবর্জিত ও জনবিচ্ছিন্ন; তদুপরি অনেকক্ষেত্রে নেতৃত্বের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ছিল আবেগ ও গোষ্ঠীস্বার্থতাড়িত। অনিবার্যতই কর্মসূচিগ্রহণে ছিলো প্রচণ্ড মতভেদ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব। আর কমিউনিস্ট পার্টির উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন অনেকাংশে অন্য বুর্জোয়া দলগুলোর মতোই ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো; ব্রিটিশ শাসনের অবসানকেই তারা বিবেচনা করেছে স্বাধীনতা ও মুক্তি হিসেবে। ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোটিই যে ভারতবর্ষের জনমানুষের জন্য বেশি বিপজ্জনক, তা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিকচিন্তার পরিকাঠামোর মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারেননি; আর যাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা হয় শ্রেণিবৃত্ত অতিক্রম করে জনমানুষকে বিপ্লবে উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, নতুবা গোষ্ঠীস্বভাবের অন্তর্নিহিত নিরাসক্তির কারণে নিজেই বিপ্লবে প্রাণিত হননি। ফলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন সংঘটনে এবং সর্বাংশে ঔপনিবেশিকতামুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে যে বিপ্লবী ভূমিকা পালনের ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছিল তাতে কমিউনিস্ট পার্টি চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটিশোত্তর স্বাধীনতার সূচনাপর্বে জনগণের আশাভঙ্গের পটভূমিতেও কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যর্থতার বৃত্তে আটকে ছিল। সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতার পটে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নাচোলের তেভাগা আন্দোলন। এই ক্ষুদ্র জনপদে রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের আদর্শনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগপ্রাণিত নেতৃত্ব মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। ওপরতলায় অবস্থান করে ফাঁপাবুলিতে মুগ্ধ করে নিচতলার জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নয়, তাঁরা জনজীবনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভঙ্গিতে মিশেছেন, আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তাঁরা চাষাভুষোদের সঙ্গেই বসবাস করেছেন, একই খাবার গ্রহণ করেছেন। নিপীড়িত মানুষের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে গভীর মমত্বে আত্তীকৃত করেই গণমানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সহৃদয় নেতৃত্বে গণমানুষ এবং শোষণবিরোধী লড়াইয়ে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠেছে। এক্ষত্রে আত্মত্যাগে ও নেতৃত্বগুণে রমেন মিত্রের চেয়ে ইলা মিত্র অনেক বেশি দীপ্তিময়। পুরুষ হিসেবে রাজনীতির ময়দান রমেন মিত্রের জন্য যতটা উন্মুক্ত ছিল, ইলা মিত্রের জন্য ছিলো ততটাই কণ্টকাকীর্ণ। রাজনৈতিক নেতৃত্বে একজন নারীকে গ্রহণ করে নেয়ার মতো ঔদার্য এই পশ্চাদ্‌পদ ও সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের ছিল না। কিন্তু অদম্য নিষ্ঠায় সকল প্রতিবন্ধকতা উতরিয়ে ইলা মিত্র তেভাগা আন্দোলনের অকুণ্ঠ নেতৃত্ব অর্জন করেন। এক্ষত্রে রমেন মিত্রের প্রথাভাঙা মূল্যবোধ ইলা মিত্রকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুপ্রশস্ত করেছে। রমেন মিত্রের প্রত্যাশা ছিল বিপ্লব : 'প্রয়োজন সব উল্টেপাল্টে ফেলা, সব নতুন করে গড়া'। (পৃ. ১২৩)। এই বিপ্লবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে যুক্ত করার প্রক্রিয়াটি শুরু করেন নিজের স্ত্রীকে এই বিপ্লবের পথে টেনে এনে। আর স্বামীর বিপ্লবীচেতনার

অভিন্ন সাথি হিসেবেই ইলা মিত্র নিজেকে বিপ্লবে উৎসর্গ করেন। তিনি এমন এক দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন দেখেছেন, যা 'বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে আসা জীবন, যে জীবনের চারদিকে অবরোধের নিগড় লোহার শেকল হয়ে আটকে থাকবে না।' (পৃ. ৮২)। শুধু নিজের জন্য মুক্তি চাননি, অর্গলমুক্ত করতে চেয়েছেন পুরুষের হাতে বন্দি নারীসমাজকে, মুক্ত করতে চেয়েছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র নিষ্পেষিত মানবসমাজকে; মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর সমগ্রসত্তায়। ইলা এমন এক সুষম ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন, যেখানে 'কোনো শিশু ন্যাংটো থাকে না, কোনো গৃহবধূ খেতে না পেয়ে বারবণিতা হয় না, কোনো পুরুষ মানুষ অক্ষমতার লজ্জায় গলায় ফাঁসি লাগিয়ে মরে না।' (পৃ. ২২০)। ইলা মিত্র শুধু স্বপ্ন দেখেননি, স্বপ্নপূরণের প্রতিজ্ঞায় অসীম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়েন কর্মযজ্ঞে। নাচোল এলাকাকেই তিনি গ্রহণ করেন রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে। সাঁওতালরা এই অঞ্চলের প্রধান শক্তি; তাদেরকে প্রাণবিন্দু করেই তিনি গড়ে তোলেন আন্দোলন। সাঁওতালদের সাহস, সততা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও অটল মানসিকতা তাঁকে উজ্জীবিত করে; তাদের 'দৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞার আগুন' (পৃ. ১৭৯) লক্ষ করে বিপ্লবের উজ্জ্বল আভায় শানিত হন তিনি। দলের কার্যক্রম কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালিত করেন। বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে তিনি স্বাধীনভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। সাঁওতালদের ভাষা ও আবেগকে রপ্ত করেন নিখুঁতভাবে। যে ধর্মীয় সংস্কৃতি তাদের জীবনবোধের অপরিহার্য অংশ, তার প্রতি তিনি কোনো উন্নাসিকতা দেখাননি, বরং গভীর শ্রদ্ধায় সেই সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। ইলা মিত্র বিশ্বাস করতেন, মানুষের জীবনের শেকড় তার সংস্কৃতি; আর এই শেকড়ের পরিচর্যার মধ্য দিয়েই মানুষ তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পায়। তিনি সাঁওতালদের জীবনযাপনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সঙ্গে তৈরি করেন নিবিড় বন্ধন। সকলের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন ইলা। সাঁওতালি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সাঁওতালদের অনুপ্রাণিত করেন জোতদার-মহাজনদের শোষণবিরোধী সংগ্রামে। তিনি বুঝিয়ে দেন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তা; স্মরণ করিয়ে দেন শোষকদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা; তুলে ধরেন উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ে আত্মত্যাগী বীরদের মহিমান্বিত ইতিহাস। শুধু বিপ্লবে উজ্জীবিত করেই তিনি থামেন না, বিপ্লবকে সফল করার জন্য তিনি সাঁওতালদের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত করেন। ইলার সাংগঠনিক দক্ষতায় সাঁওতালদের মধ্যে ইস্পাতকঠিন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জোতদারদের স্বেচ্ছাচারী শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে প্রবল প্রতিরোধ। পরিকল্পনা হয় জোতদারদের গোলা লুণ্ঠনের। শোষকদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসে তাদের পৃষ্ঠপোষক কলোনিয়াল পুলিশ বাহিনী। এরই মধ্যে সমগ্র ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ডামাডোলে স্তিমিত হয়ে আসে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন। তবে পুরো বাংলা তথা ভারত যখন রক্তাক্ত দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত, তখন নাচোল এলাকা আশ্চর্যজনকভাবে দাঙ্গামুক্ত। ইলা মিত্রের দুর্লভ নেতৃত্বে এ এলাকার প্রান্তজনেরা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমগ্র শক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রক্তাক্ত পরিণতি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। অন্য সকলের মতো রমেন ও ইলাও ভেবেছিলেন বাংলার রাজনীতিতে রক্তক্ষয়ী পর্বের অবসান ঘটেছে। নাচোলের গণমানুষের অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ তাঁদেরকে গভীর আশাবাদে প্রাণিত করেছিল। কিন্তু অচিরেই এই আশা হতাশায় রূপান্তরিত হয়; নতুন রাষ্ট্রে ক্ষমতার পক্ষপুটে কৃষকের ওপর জোতদার-মহাজনদের শোষণের কাজটি আরও অপ্রতিহত ও বেগবান হয়। ফুলেফেঁপে ওঠে জোতদার, জমিদার, উঠতি বণিকরা। (দ্র. পৃ. ১৪৫)। নানান শর্তজালে জড়িয়ে ঋণের চক্রে আটকে থাকে কৃষকের ভাগ্য; কৃষকরা পরিণত হয় জোতদারদের অর্থ-দাসে। কৃষক-জনতা উপলব্ধি করে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে মাত্র, শাসন-শোষণের অবসান ঘটেনি। বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে নিঃস্ব-ভাগচাষীদের মনে; তাদের চোখে টগবগ করে প্রতিশোধের আগুন; প্রতিশোধের স্পৃহা থেকে জন্ম নেয় প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন। নিভুনিভুপ্রায় তেভাগা আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন বিপ্লবের পথে পরিচালিত হতে থাকে। পুলিশি দমন-পীড়নে অনেকে নিহত হয়; কিন্তু প্রতিটি আত্মাহুতি এই আন্দোলনে হয়ে ওঠে অনিঃশেষ প্রেরণা। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনায় ঝাঁপিয়ে পড়েন ইলা মিত্র। তিনি সংক্ষুব্ধ কৃষকের চেতনায় সঞ্চারিত করেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র। বিপ্লবের প্রয়োজনে সন্তান গর্ভে নিয়েই

আত্মগোপনে যান; আবাস গাড়েন সাঁওতাল জনপদে। লালপেড়ে শাড়ি পড়ে, রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে, ধুলিধূসরিত খোলা তৈলহীন রুক্ষ চুলে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে বিপ্লবে উদ্দীপিত করেন নিপীড়িত কৃষকদের; নিপুন শিল্পীর দক্ষতায় স্বপ্নহারা মানুষের বুকে আঁকেন শোষণহীন, সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন। গর্ভে সন্তান, কিন্তু ক্লান্তি তাকে ক্ষান্ত করে না। সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনে অল্পদিনের জন্য কলকাতায় যেতে হয় তাঁকে; কিন্তু এই সাময়িক বিচ্ছিন্নতাও তাঁকে মরমে পোড়ায়। মাত্র ষোলদিনের সন্তানকে শাশুড়ির কাছে রেখে প্রত্যাবর্তন করেন আন্দোলনের ময়দানে। ক্ষুদ্র মাতৃত্বের চেয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জননীর দায়িত্বই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পায়। কারণ ইতোমধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছেন গোটা জনপদের শোষিত, বঞ্চিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষদের 'রাণীমা'। গোটা জনগোষ্ঠীর কাছে তিনি প্রেরণা ও ভরসার স্থল। আবহমান বাংলার মায়েরা নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে, নিজেকে রক্তাক্ত করে রক্ষা করে তার সন্তানদের, রচনা করে তাদের সমৃদ্ধ জীবনের সোপান। ইলা মিত্র সেই আবহমান জননীর প্রতীক। এই মর্যাদা তিনি অর্জন করেছেন অনেক ত্যাগ আর পরিশ্রমের বিনিময়ে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর অর্জনতৃপ্ত আত্মভাষ্যে : 'সপ্তগ্রাম আমার সন্তানের মতো প্রিয়। এ-আন্দোলনের জন্য আমি দুধের-শিশুর মুখ ভুলেছি, সবকিছু তুচ্ছ করেছি।' (পৃ. ২০১)।

ইলা মিত্রের প্রত্যাবর্তন আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করে; তাঁর আত্মত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত কৃষক-জনতার স্তব্ধবাক্ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিরোধের ইস্পাতদৃঢ় স্লোগান : 'জান দিব, তবু ধান দিব না'। (পৃ. ১৪৮)। ইলার নির্দেশে কৃষক ফসল নিজেদের বাড়িতে উঠিয়ে দুই ভাগ রেখে এক ভাগ পৌঁছে দিয়েছে জোতদারদের বাড়িতে। জনতার অসীম সাহসের কাছে জমিদার-জোতদাররা 'একদম কেঁচো' বনে যায়। প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেও তারা ভীতসন্ত্রস্ত। সর্বত্র তেভাগা স্বেচ্ছাসেবীদের দাপুটে বিচরণ। এভাবে গোটা জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রতিরোধে ভেঙে পড়ে জোতদারদের শোষণের দুর্গ। নাচোল 'মুক্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষিত হয়; চালু হয় নতুন আইন ও প্রশাসন। এ যেন পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর বাইরে এক নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। এই সাফল্য ইলাকে বৃহত্তর বিপ্লবে উজ্জীবিত করে। তিনি স্বপ্ন দেখেন নাচোলের মতো অসংখ্য মুক্ত এলাকা গড়ে তুলবেন, যেখানে একসঙ্গে সবাই ধান কাটবে, উৎসব করবে, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করবে, কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে নিজেদের জীবনের উপকরণগুলো নিজেরাই উৎপাদন করবে। জোতদারবিরোধী আন্দোলনে সাঁওতালদের অভূতপূর্ব ঐক্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং অধিকার আদায়ে আত্মত্যাগের মানসিকতা তাঁকে বিপ্লবে প্রত্যয়দীপ্ত করে তোলে। পার্টি সভায় তিনি দেশজুড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে মত দেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর যুক্তি হলো—সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য পার্টি প্রস্তুত নয়; আর অপ্রস্তুত অবস্থায় সংগ্রাম হিতে বিপরীত হতে পারে। ইলার বক্তব্যে ছিল আবেগের প্রাবল্য; নাচোলের বাস্তবতা দিয়ে তিনি পুরো দেশকে বিবেচনা করেছেন। তাঁর কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী নেতৃত্বে নাচোলে কমিউনিস্ট পার্টি যতটা সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল সংগঠনে পরিণত হয়েছিল, নাচোল ও নিকটবর্তী জনপদের বাইরে পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা ছিল অনেক নড়বড়ে ও অগোছালো। কারণ—১. ঐসব অঞ্চলের নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতা ও দলীয় আদর্শের প্রতি একাগ্রতার অভাব, ২. সাঁওতালদের সঙ্গে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর মূল্যবোধগত পার্থক্য, এবং ৩. রাষ্ট্রের আধুনিক মারণাস্ত্রসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত সুবিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গেরিলা গণবাহিনীর অসম প্রস্তুতি। প্রথম কারণটি আগেই আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আমরা আগেই জেনেছি সাঁওতালরা অসীম সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, লক্ষ্যে অবিচল, সংগ্রামে অকুতোভয়, নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ত, নিজের ধর্ম উৎসবের আমেজে উদ্‌যাপন করে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি অসাম্প্রদায়িক, যৌথকল্যাণবোধে প্রাণিত এবং নিবিড় বন্ধনে গ্রথিত। সাঁওতালদের নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যগুলো ইলা মিত্রের কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের জন্য ছিল অনুকূল এবং এর সুফল তিনি পেয়েছেন। কিন্তু পূর্ববাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালি একটি সংকর জাতি। বিভিন্ন সময়ে এদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে; পারস্পরিক বিবাদ ও আপসের মধ্য দিয়ে তারা এদেশে থিতু হয়েছে। গায়ের রঙে তারা যেমন মিশ্রবর্ণের, তেমনি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও স্থিতিস্থাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ; পরিস্থিতি সাপেক্ষে নিজেকে দ্রুত বদলে নেয়। একারণেই একই ব্যক্তি

কখনো উগ্র সাম্প্রদায়িক, কখনো অসাম্প্রদায়িক, আবার কখনো প্রগতিবাদী। অনেকটা এদেশের পলিমাটির মতো––বর্ষায় কাদা, গ্রীষ্মে ধুলো। একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার ধরনের কারণেই তাদের মধ্যে আদর্শে একনিষ্ঠতা নেই; তারা কোনো বিশ্বাসে থিতু হতে পারেনি এবং মানসিকভাবে উন্মূলিত ও সন্দেহপরায়ণ। জাতপাত ও ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজন তাদের যৌথ অবচেতনে সক্রিয়; স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা মগজে-মননে প্রোথিত। একারণেই যৌথকল্যাণবোধপ্রাণিত একটি অভিন্ন জাতিসত্তা হিসেবে বাঙালি জাতির বিকাশ ঘটেনি; তাদের মধ্যে জন্ম নেয়নি নিখাঁদ দেশাত্মবোধ। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসকেরা বাঙালির এই বিভাজক রেখা আর স্বভাবনিহিত স্বার্থপরতাকে অতি যত্নে সজীব রেখে তাদের শাসনকাজে জুৎসইভাবে ব্যবহার করেছে। দুর্নীতি ও শোষণের সুযোগ দিয়ে একশ্রেণির অনুগত মানুষের মাধ্যমে তাদের শাসন পাকাপোক্ত করেছে এবং পুরো দেশকে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে শোষণ করে নিয়েছে। এই ব্রিটিশ-অনুগত স্বার্থসর্বস্ব ও দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রেণির দখলে থাকা রাজনীতিতে জনগণের কল্যাণচিন্তা ছিল না। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিল তারাই, তবে যথার্থ কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য যে সর্বস্বত্যাগের মানসিকশক্তি ও সর্বমানবিকবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার ঔদার্য প্রয়োজন, তা অধিকাংশ নেতারই ছিল না। আবার পূর্ববাংলার প্রান্তিক-জনতার সুপ্ত মনস্তত্ত্বেও সক্রিয় ছিলো চিরাচরিত জাতপাত ও ধর্মের বিভাজকগুলো; বিশেষত ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের প্ররোচনায় গণমানুষের অবচেতনে থাকা সাম্প্রদায়িকতা বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুবিদ্বেষ বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পরিণতিতে গণস্তরে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হলেও সাধারণ মানুষের মননে পাকিস্তানপ্রীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ বেশ তাজাই ছিল। জনগণের ক্ষোভকে ভিন্নদিকে প্রবাহিত করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জনমনস্তত্ত্বের এই দিকটিকে অবিরাম ব্যবহার করেছে। শাসকেরা কমিউনিস্টদেরকে হিন্দু এবং কাফের বলে প্রচার করে জনমনে তাঁদের প্রতি ঘৃণা উসকে দিতে চেয়েছে এবং তাতে ভালোই ফল দিয়েছে। কতিপয় ক্ষুদ্র জনপদ বাদ দিলে পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ প্রান্তিক মানুষের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ধারণা ছিল নেতিবাচক। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর ইলা মিত্র নাচোলের সাপেক্ষে পুরো দেশকে বিবেচনা করতে গিয়ে বাস্তবতাবর্জিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত হয়েছেন। যে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, তার শক্তিমত্তা বোঝার ক্ষেত্রেও ইলা মিত্রের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। বিপ্লবের জন্য জনস্তরে যেমন সর্বাত্মক সমর্থনের ঘাটতি ছিল, তেমনি সমরপ্রস্তুতিও ছিল অপ্রতুল। ইলা মিত্র সাঁওতাল যুবকদের নিয়ে তীর-ধনুক-বর্শা-বল্লম ব্যবহারে সুদক্ষ যে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তা পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও সমরাস্ত্রের আধুনিকতা বিবেচনায় ছিলো খুবই দুর্বল। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সাঁওতালদের দুর্মর সাহস ও অপরাজেয় মানসিকতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগে বেহিসাবি আবেগই ছিল ইলা মিত্রের বিপ্লবের প্রেরণা। বিপ্লবের জন্য অবশ্যই অপরিমিত আবেগ প্রয়োজন, কিন্তু সেই আবেগকে কাজে লাগাতে হয় যৌক্তিক প্রক্রিয়ায়। আবেগাতিশয্যে মানুষ অকাতরে রক্ত দিতে পারে, কিন্তু বিপ্লবে জেতার জন্য প্রয়োজন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পর্যাপ্ত শক্তিমত্তা ও পরিকল্পনা। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে না পারলে সেটা রক্তের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রস্তুতির ঘাটতি বৃন্দাবন সাহা ও অনিমেষ লাহিড়ী যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম আপাতত স্থগিত রাখার প্রস্তাব রাখেন। তাঁদের যুক্তি ছিল––অপ্রস্তুত অবস্থায় সংগ্রাম হিতে বিপরীত হতে পারে। এই ভিন্নমত প্রকাশের জন্য তাঁরা পার্টিসভায় তিরস্কৃতও হন। বাঙালির স্বভাবজাত আবেগের কাছে যুক্তি পরাভূত হয় এবং ইলা মিত্রের ইচ্ছানুসারেই পার্টি বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়। নাচোলকে 'মুক্ত এলাকা' ঘোষণার পর সেখানে পুলিশ আসে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে। বিপ্লবী জনতার হাতে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে রাষ্ট্রযন্ত্র পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয় বিদ্রোহদমনে। পুলিশি তাণ্ডবে একদিনেই তছনছ হয়ে যায় পুরো জনপদ; একদিনের আক্রমণেই সাঁওতাল গেরিলারা ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। পুলিশকে সমর্থন দিতে এগিয়ে আসে সেনাবাহিনী; দুই হাজার সেনাসদস্য ঘিরে ফেলে পুরো জনপদ। শিকারি কুকুরের মতো খুঁজে বেড়ায় ইলা মিত্র

ও অন্য বিপ্লবীদের। চারশ স্বেচ্ছাসেবীর পাহারায় সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টাও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়; পুরো দলসমেত ধরা পড়তে হয় সেনাবাহিনীর কাছে। সেনাবাহিনীর খুব বেশি চেষ্টা করতে হয়নি; পথ হারিয়ে নিজেরাই ধরা দেয়। যে ছোট জনপদে তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল, তার ভূগোল-জ্ঞানটাও তাদের আয়ত্তে ছিল না। রাতের অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে তারা সেনাছাউনির কাছে উপনীত হয়, যেখানে ওত পেতে বসেছিল সেনাবাহিনী। এটা শুধু একটি সাধারণ পথ-হারানোর বিষয় নয়, পুরো সংগ্রামেরই পথ হারিয়ে ফেলা। ঔপন্যাসিক এই ব্যর্থতার দিকটিতে আলো ফেলেছেন এই আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং একটি মহান আন্দোলনের করুণ পরিণতির বেদনাবোধ থেকে। ইলা মিত্রের নেতৃত্বের ব্যর্থতা নয়; তাঁর আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল মহান নেতৃত্বের দিকটিই এই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। এছাড়া নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিতে উপনিবেশমুক্ত দেশসমূহে ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা এবং প্রকৃত উপনিবেশমুক্তির পন্থা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসকেরা ছিল উগ্রভাবে জাতীয়তাবাদী; নিজেদের জাতিশ্রেষ্ঠত্বের বিপরীতে উপনিবেশিতকে তারা 'ইতর', 'ছোটলোক' ইত্যাদি ঘৃণাসূচক অভিধায় 'নিকৃষ্ট' জাতিগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করেছে পরদেশ শাসন-শোষণের নৈতিক বৈধতা। শাসকদের জাতিশ্রেষ্ঠত্ববাদে ন্যুব্জ উপনিবেশের শিক্ষিতশ্রেণির আহত চৈতন্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে একটি সম্মানজনক আত্মপরিচয় নির্মাণের তাগিদ। শুরু হয় ইতিহাস-ঐতিহ্য খনন করে পরিচয়সূচক জাতিসত্তা নির্মাণের কর্মযজ্ঞ। এই প্রতিক্রিয়াসম্ভূত ও প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসত্তা নির্মাণে আবেগাতিশায্যবশত ইতিহাস-বহির্ভূত বহু অপতথ্যের সংযোগ ঘটেছে, যা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে জটিলাবর্তে নিক্ষেপ করেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে বহু ভাষী ও ধর্মবর্ণের মানুষের বসবাস। এই বিশাল ভূখণ্ড একটি দেশ হিসেবে শাসিত হয়েছে খুব অল্প সময়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ শাসনাধীনেই পুরো ভারতবর্ষ একছাতার নিচে আসে এবং জাতীয়তাবাদী ভাষ্যকারগণ ব্রিটিশ-অধ্যুষিত পুরো ভূখণ্ডটিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন। এক দেশ, এক জাতি—এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ভাষা, সংস্কৃতি, জাতপাত, ধর্মীয় রীতিনীতিকে আশ্রয় করে ভারতে হাজার হাজার ধরে যে বহু জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে, তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হলো। ধর্মই হয়ে উঠলো এই জাতিসত্তা নির্মাণের মূল নিয়ামক। এই সংজ্ঞায় হিন্দুরাই হলো ভারতীয়; আর মুসলমানরা নিরূপিত হলো বহিরাগত জাতিগোষ্ঠী হিসেবে। ভারতীয় মুসলমানরাও এই অখণ্ড ভারতীয়ত্বের বাইরে স্বাতন্ত্র্যসূচক মুসলিম জাতীয়তাবাদে নিজেদের আত্মপরিচয় নির্মাণে নিবেদিত হলো। ঔপনিবেশিক শাসকদের তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হলে এই উপনিবেশের রাজনীতিবিদেরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে দীক্ষিত হন এবং জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেন। অনিবার্যতই সেই আন্দোলন ছিল দুই দ্বন্দ্বাত্মক জাতীয়তাবাদে বিভক্ত এবং পরিণামে দুই রাষ্ট্রের জন্ম। জনগণকে জাতীয়তাবাদে প্রাণিত করেই রাজনীতিবিদেরা স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করেছে; জনগণকে বুঝিয়েছে স্বাধীনতা মানেই সকল শোষণ-শাসনের অবসান। কিন্তু রাজনীতিবিদ, আমলা, পুলিশ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গড়া দেশীয় 'উচ্চবর্গ' সাধারণ খেটেখাওয়া 'নিম্নবর্গে'র জনগোষ্ঠীকে ব্রিটিশদের মতোই ছোটলোক, অসভ্য, বর্বর, নীচপ্রকৃতির বলেই বিবেচনা করতো। অভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নতুন দেশে নতুন শাসকদের হাতে 'শোষণের জন্য শাসন'—এই ঔপনিবেশিক শাসনধারা অব্যাহত থাকে। শোষণ-পেষণের নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রান্তিক মানুষদের আবার নতুন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। অন্যদিকে, আন্দোলন-দমনে নতুন শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকেও ছাপিয়ে যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে কৃষক-জনতার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য। তাই শাসকগোষ্ঠীর পুরো আক্রোশ এই পার্টির ওপর গিয়ে পড়ে। এই পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং নেতৃবৃন্দকে স্তব্ধ

করতে চলে সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন। দেশ জুড়ে নেতৃত্বের দুর্বলতা সত্ত্বেও অঞ্চল বিশেষে আঞ্চলিক নেতৃত্বের আন্তরিক প্রয়াসে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ইলা মিত্রের নেতৃত্বে নাচোলের তেভাগা আন্দোলন এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইলা মিত্র ছিলেন অকৃত্রিম কমিউনিস্ট। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মূর্খ জনতার অচেতন মগজে কমিউনিস্ট তত্ত্ব ঢুকবে না, তত্ত্বের সঙ্গে জীবনের সংযোগ ঘটাতে হবে। তাই তিনি তত্ত্ববুলিতে মানুষকে মুগ্ধ করতে চাননি; তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে রচনা করেছেন হার্দিক বন্ধন। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, শোষণে-পেষণে দিশেহারা, অপমান-লাঞ্ছনায় ক্ষতবিক্ষত, পশুর স্তরে অবনমিত মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আপন করে নিয়েছেন, তাদের জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন; সন্তানতুল্য স্নেহে ও দায়িত্ববোধে তিনি তাদের কল্যাণকামনা করেছেন। ইলা এই ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীর কাছে রাজনৈতিক নেত্রী হয়ে থাকেননি, হয়ে উঠেছেন সন্তানের মঙ্গলকামনায় আত্মনিবেদিত এক 'জননী'; পরম নির্ভরতার প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মিলিত শক্তির কাছে পরাভূত হয় অশুভ চক্রান্ত। তিনি মনে করতেন, মানুষের বিশ্বাসের দৃঢ়তাই মানুষকে কর্মের পথে পরিচালিত করে। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তার সঙ্গে কখনো আপস করেননি। তিনি তাঁর বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বাস-হারানো মানুষের মনে; আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উজ্জীবিত করেছেন স্বপ্নহীন মানুষদের। তাই তাঁর কোনো রাজনৈতিক নির্দেশ তাঁর অনুসারীদের কাছে ছিল মাতৃ-আজ্ঞার মতো অলংঘনীয়; এবং সেই আজ্ঞা পালনে তারা ছিল আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি প্রান্তিক মানুষদের আত্মত্যাগের ইতিহাসের তল থেকে খোঁজেন সংগ্রামের প্রেরণা। তিনি অনুসারীদের সুসং দুর্গাপুরের গারোদের সংগ্রাম, হাজং বিদ্রোহ, টংক আন্দোলনের কথা বলেন; তন্নারায়ণ, কম্পরাম সিং, জয়মণি, সরলাদি, মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, তিতুমীর প্রমুখের অকুতোভয় আত্মত্যাগের কাহিনি বয়ান করেন। প্রীতিলতার গল্প বলতে বলতে ইলা নিজেই প্রীতিলতা হয়ে যান। বিভিন্ন এলাকার বিপ্লবীদের মর্মান্তিক মৃত্যু এক অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলে নাচোলের বিপ্লবী জনতার মনে। ইলার কণ্ঠে আত্মত্যাগের গল্প শুনতে শুনতে প্রান্তিক মানুষেরা আত্মত্যাগের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়। আমরা লক্ষ করি, ইলার অনুপ্রেরণায় প্রান্তিক নারীরাও জমিদার-জোতদারদের শোষণ প্রতিরোধে অসীম সাহসী হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়েও তাঁরা শপথচ্যুত হয় না। শুধু অনুপ্রেরণা নয়, প্রতিরোধ গড়ার জন্য চলে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। তীর, বল্লম, বর্শা, লাঠি-সড়কি—সাঁওতালদের নিত্যব্যবহার্য এসব সামগ্রীকেই বেছে নেয়া হয় বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে এবং গোপনে চলে এসব দেশীয় অস্ত্রের সুনিপুণ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ। নিজেদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শত শত সাঁওতাল এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ইলা মিত্রের আহ্বানে নাচোল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তেভাগা আন্দোলন। নেংটি-পরা মানুষদের সাহসকে জোতদাররা বরদাশত করতে পারেনি; তবে সাঁওতালদের সম্মিলিত সংগ্রামের সামনে তারা ছিল একান্ত অসহায়। অনন্যোপায় হয়ে তারা থানায় লুঠের মামলা দায়ের করে। পুলিশ এগিয়ে আসে জোতদারদের সাহায্যে এবং অবতীর্ণ হয় দুর্বৃত্তের ভূমিকায়। গ্রামে গ্রামে চলে পুলিশি ত্রাস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠা এই পুলিশবাহিনী চিরাচরিতভাবে জনবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত। পুলিশের দৃষ্টিতে এদেশের কৃষক-জনতা 'ছোটোলোকের দল' এবং এই ছোটলোকদের শায়েস্তা করা ও বাগে রাখা পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব। জনমনে আতঙ্ক ছড়াতে তারা ছোটে গাঁয়ে-গাঁয়ে, যখন-তখন যাকে-তাকে ধরে পেটায়, ঘুষ-চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়; কেড়ে নেয় গৃহস্থ-সামগ্রী, সর্বস্ব; করম আলির কাঁসার থালা, ভগিরথের দুই খাসি, আজমলের কোমরে গোঁজা পঞ্চাশ টাকা—কোনো কিছুই বাদ যায় না তাদের লুটপাট থেকে। তারা রাষ্ট্রের হয়ে, রাষ্ট্রের আইনের অধীনেই কাজ করে; রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার রক্ষার নামেই কাজ করে। কিন্তু ঔপনিবেশিক নিয়মে রাষ্ট্র মানেই শাসক; আর শাসকগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা মানেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা। পাকিস্তান রাষ্ট্র জনগণের হয়নি; হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দোসর হিসেবে গড়ে ওঠা ধনিক অভিজাতশ্রেণির। তাই দুর্বৃত্ত জোতদারদের স্বার্থরক্ষায় পুলিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং শোষিত-নিষ্পেষিত জনগণকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর চালায় বেপরোয়া দমন-পীড়ন। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রতিশোধের আহ্বান আসে ইলার কণ্ঠ থেকে। সাঁওতালপল্লিতে পুলিশ ঢোকে; সংখ্যায় মাত্র চারজন। বাদান ও ফালু নামের দুই সাঁওতাল যুবককে আটক

করে। প্রতিবাদে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নারী-পুরুষ তীর-ধনুক-লাঠিসোটা-বর্শা-বল্লম হাতে ঘিরে ফেলে পুলিশকে। সশস্ত্র-জনতার সম্মিলিতশক্তিকে অবজ্ঞা করে দারোগা তফিজউদ্দিন প্রবল ঔদ্ধত্যে তাদেরকে 'দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রের দুশমন, ভারতের দালাল' (পৃ. ২২২) বলে গালাগাল করে, তাদের আন্দোলনকে অভিহিত করে পাকিস্তানের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র হিসেবে এবং এই ষড়যন্ত্রের জন্য 'পিঁপড়ের মতো গলা টিপে মারার' ও ভয়াবহ পরিণামের হুঁশিয়ারি দেয়। উন্মত্ত জনতাকে ধমকে বাগে আনতে না পেরে নির্বিচার গুলি চালায়। হিংস্রতার প্রতিক্রিয়ায় পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহী জনতা, মনে তাদের দুর্মর প্রতিশোধের স্পৃহা : 'একজন কৃষকের শোণিত থেকে ক্রোধের নদী উৎসারিত হয়েছে, একজন কৃষকের শোণিত থেকে প্রতিশোধের স্পৃহা প্রবাহিত হয়েছে, একজন কৃষকের শোণিত লাল পতাকা হয়ে ওদের চেতনায় ওড়ছে—ওরা তেভাগা চায়—চায় জোতদারদের শোষণের অবসান।' (পৃ. ২২৩)। ক্ষিপ্ত জনতা কেড়ে নেয় তাদের অস্ত্র, থ্যাঁতলে ফেলে চারজনকে; গণপিটুনি চলে তাদের মৃত্যু অবধি; তাদের থ্যাঁতলানো শরীর মাটিচাপা দেয় উন্মত্ত ক্রোধ ও ঘৃণায়। লালুনাথ নামের এক সাঁওতাল গাড়োয়ানের মাধ্যমে থানায় পৌঁছে যায় এই সংবাদ। এখানে উল্লেখ্য, প্রান্তিক জনতার ঐক্যের গভীরে লুকিয়ে থাকে বিশ্বাসঘাতকের দল; অল্প কিছু সুবিধার কাছে আত্মবিক্রীত এই গোষ্ঠী গণশত্রুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সাধারণ মানুষের সরলতার বিপরীতে এরা ধূর্ত, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও হিংস্র। গাড়োয়ান লালুনাথ, খাদ্যবিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন ও পরিমাপক সফল খানদের মতো দালালদের অন্তর্ঘাতী ভূমিকা নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। দালালদের জোগানো তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আক্রমণের পরিকল্পনা সাজায় এবং উন্মত্ত হিংস্রতায় পুরো জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েই তারা থামে না; এই সংগ্রাম সমূলে উৎপাটিত করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দূরদর্শী কমিউনিস্ট নেতা বৃন্দাবন সাহার ভাষ্যানুসারে : 'মুসলিম লীগ সরকারের এটাই শেষ নিপীড়ন নয়, এটা কেবল শুরু। এর পরিণতি আরো ভয়াবহ হবে। ওরা ধরতে পারলে চরম প্রতিশোধ নেবে, একটু একটু করে মারবে।' (পৃ. ২৩৮-৩৯)। দু হাজার সৈন্য এসে নামে রোহনপুর রেল স্টেশনে; শিকারি কুকুরের মতো খোঁজে ইলা মিত্র ও তাঁর অনুসারীদের। তাদের চাই জীবিত অথবা মৃত ইলা মিত্রকে। কারণ এই নারীর নির্দেশে পুলিশ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, আর পুলিশ হত্যা করা মানেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা। অন্যদিকে, ইলা মিত্র ধ্বংসের মধ্যেই খোঁজেন ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা : 'ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেই প্রস্ফুটিত হয় সৃষ্টির ফুল। আমরা আবার শুরু করবো, আমরা থেমে যাব না' (পৃ. ২৩৮); অনমনীয় দৃঢ়তায় তিনি শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে চান; চরম দুর্যোগের সময়েও তাঁর কণ্ঠে রাজনৈতিক কর্মী ও শোষিত মানুষের পাশে থাকার প্রত্যয় : 'আমি তোমাদের ছেড়ে যাব না, হরেক।' (পৃ. ২৩৮)। ছোটখাট গড়নের এই ইলা যেন 'সাহসের বারুদ, শ্যামলা চেহারায় চাপা আগুনের আভা।' (পৃ. ২৩৮)। কিন্তু শ্রেণিসংগ্রাম নতুন করে শুরু করার কৌশল হিসেবে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ভারতে পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং পাকিস্তানি সেনাদের চক্ষু এড়াতে সাঁওতাল মেয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কিন্তু কয়েকশ সাঁওতাল যুবকের সশস্ত্র পাহারায় সীমান্তের দিকে যাত্রা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ পুলিশ ও স্থানীয় জোতদারদের দেওয়া তথ্যানুসারে সাঁওতালদের বিশাল দল সেনাবাহিনীর চোখে সহজেই শনাক্ত হয়ে যায় বিদ্রোহী দল হিসেবে : 'এরাই নাচোল থানার শত্রু, পুলিশ হত্যাকারী এবং আন্দোলনের হোতা।' (পৃ. ২৪৩)। সেনা অফিসারের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েন ইলা মিত্র। প্রতিশোধের নেশায় পেয়ে বসে অফিসারকে; প্রচণ্ড ঘৃণায় সে থু থু ছিটিয়ে দেয় ইলার মুখে। পুরো দলকে 'গরু-ছাগলে'র মতো ধরে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়, যেখানে 'তফিজউদ্দিনের প্রেতাত্মা নির্মম নিষ্ঠুরতায় চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে।' (পৃ. ২৪৪)। পুলিশ পৈশাচিক উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ইলার ওপর। আর এই পৈশাচিকতা শুধু একজন রাজনৈতিক নেতার ওপর নয়, একজন নারীর ওপরও। এক বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্বে একজন কৃশকায় শ্যামাঙ্গী তরুণী এবং সেই আন্দোলন আবার শুধু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার জন্য নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙেচুরে দিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার ধৃষ্টতা। এই ধৃষ্টতা পাকিস্তানের দাম্ভিক পুরুষতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর পক্ষে হজম করা কঠিন ছিল। পাকিস্তানি সেনাঅফিসারের দৃষ্টিতে ইলা মিত্র 'ডাইনি', যে হত্যার আগুন জ্বালিয়ে পাকিস্তানকে নরক বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর পুলিশের দৃষ্টিতে ইলা 'কুত্তির বাচ্চা

কুত্তি', 'ডাইনি মাগি', 'বজ্জাত মেয়েমানুষ'। কোনো রাজনৈতিক বন্দির প্রতি যে সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করার রীতিনীতি ব্রিটিশ পুলিশ মেনে চলতো, তার কোনো কিছুই পাকিস্তানি পুলিশ ইলার প্রতি প্রদর্শন করেনি; বরং একজন নারীর ওপর নির্যাতনে পুরুষের হিংস্রতা ও বর্বরতার কোনো কিছুই বাদ রাখেনি; তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে বইয়ে দেয় 'শতাব্দীর ঝড়'। (পৃ. ২৪৪)। দুর্গন্ধযুক্ত, দমবন্ধ-করা, নোংরা, ছোটো ঘরের ভৌতিক নিস্তব্ধতায় দিনের পর দিন ইলার শরীরের ওপর চলে পাশবিক উল্লাস। লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত, মুখে পেশাব করে দেওয়া, সম্মিলিত ধর্ষণ, যৌনাঙ্গে গরম ডিম প্রবেশ করানো, তলপেটে লাথি মারা, চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা, 'পাকিস্তানি ইনজেকশন' ইলার ওপর নির্যাতনে পুরুষের পশুপ্রবৃত্তির কোনো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এক নারীর দুর্বল শরীরে আঘাত করতে এক পুরুষের শক্তি যথেষ্ট অনুভূত হয় না, প্রয়োজন হয় একাধিক পুরুষের সম্মিলিত শক্তি; কাউকে হাত, কাউকে পা, আবার কাউকে মাথা চেপে ধরতে হয়। হাজার শকুনে মিলে ছিন্নভিন্ন করে তাঁর ক্ষুদ্র শরীর; ছিন্নভিন্ন করতে করতে ক্লান্ত হয় শকুনেরাই; কিন্তু ইলার প্রবল ব্যক্তিত্ব আর শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিন্দুমাত্র চিঁড় ধরাতে পারেনি : 'ও লাল-নীল সবুজ হলুদ আলো দেখতে পায়—মাথার ভেতর হাজার প্রজাপতি—রঙের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।' (পৃ. ২৫৩)। ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'প্রজাপতি' পরিবর্তন, রূপান্তর আশা, নতুন শুরু এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। আর লাল রঙ ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষার; নীল রঙ শান্তি, বিশ্বাস, স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার; সবুজ রঙ নতুন জীবন ও সমৃদ্ধির এবং হলুদ রঙ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উজ্জ্বলতার প্রতীক; আর সব রঙ মিলিয়ে তা হয়ে ওঠে সমতার প্রতীক। পাকিস্তানি শাসকদের লেলিয়ে দেওয়া নরপশুদের নির্যাতনে তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়ে আসে, তখনো তাঁর লুপ্ত 'চৈতন্যে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ প্রজাপতি' খেলা করে। ইলার অবচেতনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পলাশ ফুল, যা নতুন জীবন, উদ্দীপনা এবং বিদ্রোহের প্রতীক। জ্ঞান ফিরে এলে জানালার পাশে তিনি দেখেন দোয়েল পাখি। দোয়েল বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক জীবনধারা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। তিনি বাংলাদেশের নিষ্পেষিত মানুষের জীবনধারা ও প্রকৃতি থেকে সঞ্চয় করেন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেওয়া নরপশুদের পাশবিক অত্যাচার অস্বীকার করার প্রেরণা ও মানসিক শক্তি। পাকিস্তানি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চাপিয়ে দেওয়া সকল অপমান ও নির্যাতনকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন নিদারুণ অবজ্ঞায়। তাঁর ওপর যতো নিষ্ঠুরতা, সবই অপরাধ স্বীকার করে নেয়ার জন্য। কিন্তু অপরাধ তিনি স্বীকার করেননি; কারণ তিনি জানেন, নিজে কোনো অপরাধ করেননি বা কাউকে অপরাধে প্ররোচিত করেননি। তিনি যা করেছেন, তা আদর্শিক বিশ্বাসের তাড়নায়ই করেছেন; শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শোষকশক্তির বিরুদ্ধে গণমানুষকে বিপ্লবে প্রাণিত করেছেন। রাষ্ট্র তাঁকে অপরাধী প্রমাণে সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করেছে, কিন্তু তাঁর কাছে রাষ্ট্রই অপরাধী এবং তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া নির্যাতন রাষ্ট্রীয় অপরাধ। এই অপরাধের কাছে তিনি মাথা নত করেননি; বরং প্রবল মানসিক শক্তি দিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন : '... দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রাখে, না কিছুতেই পরাজয় নয়। শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে রুখতে হবে এই পাশবিক অত্যাচার।' (পৃ. ২৫৫)। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাঁর আদর্শে গড়া প্রান্তিক মানুষেরাও। ইলা মিত্রের সঙ্গে ও আগে-পরে গ্রেফতার হওয়া কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও সাঁওতাল যুবকদের ওপরও নেমে আসে নিষ্ঠুর নির্যাতন। তাঁদের ওপর অকথিত অত্যাচার চালানো হয় শুধু একটি স্বীকারোক্তি আদায়ের লক্ষ্যে : 'মারবার হুকুম দিয়েছিল ইলা মিত্র।' (পৃ. ২৪৬)। এই নির্যাতনে পাশবিকতার কিছুই বাকি থাকেনি। দমবন্ধ করা ঘরে তিন-চারজনে মিলে একজনকে পেটায়। লাঠি ও চাবুক দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত, বুকে বুটের অবিরাম লাথি, মোটা লাঠি দিয়ে শরীর চেপে ধরা নির্যাতনের সকল পদ্ধতিই ব্যবহার করে। এই নির্যাতনে হাতের কব্জি, কাপ, পায়ের গোড়ালি, বুকের পাঁজর ভেঙে যায়, মুখ-ঠোঁট ক্ষত-বিক্ষত হয়, মুখ দিয়ে হয় রক্তবমি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকেই মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে, তারা নির্বাক, যেন পূর্বপুরুষের ভাষা ভুলে গিয়েছে, অথবা কর্ণ বধির বা জিহ্বা কর্তিত। ব্যর্থ হয় রাষ্ট্রশক্তির পাশবিকতা এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয় রাষ্ট্রের নৈতিকতা। এই ব্যর্থতার পটে উপন্যাসে প্রচ্ছন্নভাবে উদ্রিক্ত হয় বেশ কিছু প্রশ্ন—১. ১৯৪৭-এ পাকিস্তান কি আদৌ স্বাধীন হয়েছে?, ২. স্বাধীন হয়ে থাকলে, এই স্বাধীনতার স্বরূপ কী?, এবং ৩. স্বাধীনতা ব্যর্থ হলে, এই ব্যর্থতার কারণ কী? এই তিনটি প্রশ্নের

উত্তর আবার পরস্পর সম্পর্কিত। ১৯৪৭-এ ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভূখণ্ডগত স্বাধীনতা পেয়েছে, অর্থাৎ ব্রিটিশরা আর এই ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষ শাসনের সঙ্গে জড়িত নেই। যাঁদের হাতে ব্রিটিশরা শাসনভার অর্পণ করেছে, তাঁরা তাঁদেরই হাতে গড়া এলিটশ্রেণির মানুষ। তাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের ব্রিটিশ ক্ষমতাকাঠামোর অংশীদার হিসেবে তাঁদের সুপ্তচৈতন্যে সক্রিয় ছিল সাম্রাজ্য শাসনের আকাঙ্ক্ষা। ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর এই নতুন শাসকগোষ্ঠীর সামনে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অবারিত সুযোগ তৈরি হয়। তাঁরা শুরু থেকেই পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক কায়দার শাসন জারি করে; ক্ষমতার দাপটে পিষ্ট করে সাধারণ মানুষের জীবন; জুলুম-অত্যাচারে তাদেরকে নিঃস্বতার শেষপ্রান্তে ঠেলে দেয়। দোসর হিসেবে পাশে পায় ঔপনিবেশিক আমলের আমলা, সেনা ও পুলিশবাহিনীকে। উপনিবেশ শাসনের উপযোগী করে প্রশিক্ষিত এই সরকারি কর্মচারীগোষ্ঠী স্বাধীনদেশে দায়িত্ব পালনেও ছিল ঐতিহ্যনিষ্ঠ। কলোনিয়ালদের মতো তারাও দরিদ্র-মূর্খ জনতাকে 'জানোয়ারের দল' হিসেবেই বিবেচনা করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পুলিশ ও সেনাবাহিনী কখনো জনবান্ধব হতে পারেনি, শাসক ও অভিজাতশ্রেণির সেবাদাস হিসেবে তারা জননিপীড়কের ভূমিকা পালন করেছে। যে জনগণের জোগানো অর্থে তারা জীবনজীবিকা নির্বাহ করে, যে জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা দেওয়ার জন্য তাদের নিয়োগ, সেই জনগণকেই তারা জঘন্য শত্রু হিসেবে গণ্য করে। দমন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই কথিত শত্রুর ওপর পাশবিক হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হিংস্র সাফল্যে তাদের বুক বীরত্বের গর্বে স্ফীত হয়; মনে ভর করে দায়িত্বপালনের তৃপ্তি। অথচ তারা জানেই না, তারা যা করে তা দায়িত্বপালন নয়, নিরেট দাসত্ব; বীরত্ব নয়, কাপুরুষতা; গর্বের নয়, লজ্জার; সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের প্রভুত্ববাদী আচরণ নির্বোধ ও ব্যক্তিত্বহীন মানুষের আস্ফালন। এই মানসিক বিকারের কারণেই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্বত্যাগী মহান নেতা ইলা মিত্র তাদের কাছে রাষ্ট্রদ্রোহী 'ডাইনি'; আর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিবেদিত প্রান্তিক জনতা ভয়ানক দুর্বৃত্ত, গুরুতর অপরাধী। এমনই দুর্বৃত্ত যে, তাদেরকে শায়েস্তা করতে শুধু পুলিশের শক্তি পর্যাপ্ত নয়, মাঠে নামাতে হয় সেনাবাহিনীকে; পুরো জনপদ জুড়ে চালাতে হয় তাণ্ডব, বেহিসাবি নিপীড়ন ও গণহত্যা। যে রাষ্ট্র জনগণের অধিকারকে স্বীকার করে না, জনগণকে দুর্বৃত্ত আখ্যা দিয়ে তাদেরকে দমনে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে, সেই রাষ্ট্র জনগণের নয়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করলেও সেই স্বাধীনতা ধনবান অভিজাতশ্রেণির, কোনোভাবেই দরিদ্র জনগণের স্বাধীনতা নয়।

অপরিসীম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তেভাগা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়। এই আপাত সাফল্যের অন্তরালে সংগুপ্ত আছে গূঢ় ব্যর্থতা। কারণ ইলা মিত্র বা প্রান্তিক কৃষকদের কেউ অপরাধ স্বীকার করেনি; তাদের নির্বাক স্তব্ধতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছে তাদের আন্দোলনের ন্যায্যতা। কিন্তু দুর্বৃত্ত শাসকচক্র তো কখনো ব্যর্থতা স্বীকার করে না। ইলা মিত্রকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতেই হবে; অন্যথায় তাদের মুখ রক্ষা হয় না এবং আন্দোলনদমনে এতো নিপীড়নের যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না। দস্যুতায় যখন কাজ হয়নি, তখন তাদেরকে অবলম্বন করতে হয় চৌর্যবৃত্তি; ইলার হাতে কলম গুঁজে দিয়ে সাদা কাগজে চেপে ধরে তাঁর আঙুল এবং অর্ধচেতন ইলার হাত দিয়ে নিজেরাই স্বাক্ষর করে নেয়। কিন্তু আদালতে জবানবন্দিতে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়ার প্রেক্ষাপট সবিস্তারে বর্ণনা করে এই স্বাক্ষরের বৈধতা অস্বীকার করেছেন তিনি। এটা যে রাষ্ট্রযন্ত্রের কত বড় হীনতা, দীনতা ও লজ্জার স্মারক, তা অন্তঃসারশূন্য, দাম্ভিক শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পারেনি। নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহে একটি শাসকগোষ্ঠী কতটা নীচ ও নির্লজ্জ হতে পারে, এই ঘটনা তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

বাংলার সমাজকাঠামোতে শোষণমুক্তি ও শোষণ টিকে থাকার জনমনস্তত্ত্ব নিহিত দিকটির ওপরও ঔপন্যাসিক আলোকপাত করেছেন। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাংলার ঐতিহ্যগত বিনিময় ব্যবস্থায় পণ্যের পরিবর্তে নগদ অর্থের প্রচলন। পুঁজির প্রতাপ আমাদের জনসমাজের যৌথজীবনবোধকে ভেঙেচুরে ব্যক্তিগত লাভলোকসানের হিসাবকে প্রকট করে তোলে। আর ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির এই প্রণোদনা

থেকেই শোষণব্যবস্থার সূত্রপাত। এই ব্যবস্থায় আমাদের সমাজের অভ্যন্তর থেকেই উদ্ভূত হয় এক ধনবানশ্রেণি। অর্থের জোরেই তারা সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক শাসক ও অভ্যন্তরীণ ধনবানদের যৌথশোষণে চরম দারিদ্র্যে নিপতিত হয় বাংলার অধিকাংশ মানুষ। এই শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ যেমন ছিল, তেমনি শোষণের পক্ষে অনুমোদনও ছিল। সম্পদহীনেরই সম্পদের প্রতি আকর্ষণ প্রবল থাকে। প্রান্তিক মানুষ তাই শোষিত হতে হতেই শোষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে; শোষিত হওয়ার যন্ত্রণা ও ক্ষোভই তাকে এই স্বপ্নে প্ররোচিত করে। এভাবে কেন্দ্র-প্রান্তের যৌথসম্মতিতেই টিকে থাকে শোষণব্যবস্থা। পুঁজি ও কূটবুদ্ধি যেহেতু শোষণের হাতিয়ার, সেহেতু এর অভাবে শোষিতের পক্ষে শোষণটাই তার চিরকালের নিয়তি হয়ে থাকে; আর শোষণব্যবস্থা শোষকের পক্ষেই বহাল থাকে। আলোচ্য পাঠকৃতিতে আমরা লক্ষ করি, অন্ত্যজ সাঁওতাল জনগোষ্ঠী যখন তেভাগা নিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ, তখন ঝড়ু, বিপিন, বাসুদের মতো কেউ কেউ এই তেভাগাবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাদের যুক্তি হলো : 'আধ-পেটা থাকাই গরিবের ভাগ্য। যার জমি নাই, তার আবার পেটভরে খাবার শখ কেন? ভগবান একদলকে বড়লোক বানিয়েছে, একদলকে ছোটলোক। মানুষের সাধ্য কি তা রদ করার?' (পৃ. ১৯৪)। শোষণটাকে তারা ঈশ্বরনির্ধারিত নিয়তি হিসেবেই মেনে নেয় এবং এই আন্দোলনকেই তারা অন্যায় ও অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। ঈশ্বরনির্ধারিত নিয়ম রক্ষার্থেই তারা পুলিশে খবর দিয়ে তেভাগাকর্মীদের ধরিয়ে দেয় এবং ভ্রাতৃঘাতী কাজের জন্য তাদের কোনো অপরাধ বা অনুশোচনাবোধ নেই। আবার ক্ষমতাবলয়ের প্রান্তিক অংশীদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেও কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়; যেমন খাদ্যবিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন ও পরিমাপক সফল খান। প্রভাবশালী জোতদারদের কাছ থেকে সামান্য উচ্ছিষ্ট ভোগের বিনিময়ে তারা কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সরকারের সামান্য বেতনভোগী এই কর্মচারীরা কৃষক-জনতাকে 'অপর' হিসেবেই ভাবে এবং তাদেরকে দমন-পীড়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা জোগায়। এই অপকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করা হলে বিদ্রোহী জনতার প্রতি উন্মত্ত হিংসায় জ্বলে ওঠে। সাধারণ মানুষের সরলতার বিপরীতে এরা অত্যন্ত ধূর্ত ও সুযোগসন্ধানী। কূটবুদ্ধির সঙ্গে তাদের রয়েছে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা, যার কাছে পরাভূত হয় শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। আর যারা পুলিশের কনস্টেবল বা সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক, তারাও তো প্রান্তিক শোষিত জনগোষ্ঠীরই অংশ। কর্মস্থলে তারা নিতান্ত অমর্যাদা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার। কিন্তু তাদের মনস্তত্ত্বেও কৃষক-জনতা পোকা-সদৃশ প্রাণী; প্রবল ঘৃণা ও আক্রোশে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রান্তিক মানুষের ওপর। তাদের নির্বোধ চেতনা যেমন আপন-পর চেনায় অক্ষম; অবজ্ঞাত ও শোষিত মানুষের সংগ্রামটা যে তাদেরও, এ সত্য অনুধাবনেও তারা অপারগ। অন্ত্যজশ্রেণির এই অন্তঃসারশূন্য, বোধবুদ্ধিহীন লোকদের অন্তর্ঘাতী কর্মকাণ্ডে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়, সদম্ভে টিকে থাকে পুঁজির আধিপত্য। আজিজ-আকমল এই দুই চরিত্র তেভাগা আন্দোলনে মুসলমান অভিজাতশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। তারা সম্পর্কে পরস্পরের মামাতো-ফুফাতো ভাই। দুজনেই স্থানীয় প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান এবং দুজনেই পিতার আশ্রয় ছেড়ে শ্রেণিসংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। ইলা মিত্র তাদের প্রেরণা; সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আর্ত-মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্র তারা ইলা মিত্রের কাছ থেকেই পেয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসেবে নাসির আলী জোতদারই সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র। তবে নাসির জোতদার যতটা না ঘটনায় সক্রিয়, তার চেয়ে বেশি আজিজ-আজমলের সঙ্গে কথোপকথনে। সে তেভাগা আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক আজিজের পিতা এবং নাচোল এলাকার এক প্রভাবশালী জোতদার। কৃষকের সম্পদ নিংড়ে নিয়ে নিজের সম্পদ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলাই তার নেশা। নাচোলের বর্গাচাষীরা তার দাপটের কাছে অসহায়। প্রচণ্ডভাবে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও বদমেজাজি নাসির আলীর সঙ্গে বড় ভাই মকবুল ও স্ত্রী শেফালীর বিরোধ নিত্যদিনের। আজিজ তার পিতার বিপরীত মূল্যবোধের মানুষ : 'হাজার জনকে কষ্ট দিয়ে ও একা সুখে থাকতে চায় না।' (পৃ. ৬০)। সে রমেন মিত্রের ভাবশিষ্য; সম্পদের মোহ থেকে সে মুক্ত। অর্থগৃধ্নু পিতার প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে পিতার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ। সে বাবার

সম্পদের তোয়াক্কা করে না, বরং ভেঙে ফেলতে চায় সেই সম্পদের দুর্গ : 'চাষিরা যদি ওদের বাড়ি আক্রমণ করে, তবে চাষিদের সঙ্গে মিশে যাবে। ছারখার করে ফেলবে বাড়িঘর।' (পৃ. ৬০)। কমিউনিজমে দীক্ষিত এই যুবক আসলে বৈষম্যসৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই গুঁড়িয়ে দিতে চায়; স্বপ্ন দেখে সকলের জন্য সমানাধিকারভিত্তিক এক সমাজব্যবস্থার। এর জন্য দরকার বিপ্লব; আর বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন আদর্শিক একনিষ্ঠতা, অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রত্যয়; সর্বোপরি সেই আদর্শনিষ্ঠা ও সংগ্রামী প্রত্যয়ে গোটা জনগোষ্ঠীকে সঞ্জীবিত করা। সমগ্র বৈশিষ্ট্য নিয়েই আজিজ একজন বিপ্লবী। তার দুর্নিবার সাহস, বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা ও অমিততেজ ব্যক্তিত্বের বিপরীতে তার পিতা সদম্ভ দাপটের আড়ালে নিতান্তই ভীতসন্ত্রস্ত এক 'নেংটি ইঁদুর'। নবগঠিত পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় জোতদার পরিবারের সন্তানেরা যখন সম্পদলুঠের মহোৎসবে ব্যস্ত, তখন আজিজ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম; সে নিবেদিত সর্বমানবিক কল্যাণবোধপ্রাণিত এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণে।

আজমল এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র। উপন্যাসের শুরু ও শেষবিন্দুতে আজমল এবং তার বীক্ষণবিন্দুতেই পুরো আখ্যান উপস্থাপিত। জন্মমাত্রই মাতৃহীন হওয়া আজমলের শৈশব কেটেছে মাতুলালয়ে। সেই সূত্রে মামাতো ভাই আজিজের সঙ্গে তার একান্ত ঘনিষ্ঠতা। জীবনাদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধে তারা সমসূত্রে গ্রথিত এবং অভিন্ন-আত্মা বান্ধব। আজমলের পিতা ইয়াসিন বসনি একজন ধনাঢ্য রেশম ব্যবসায়ী; জোতদার না হলেও তার আচার-আচরণ জোতদারের মতো। নাসির আলীর মতো সেও অর্থলোলুপ, ধূর্ত, 'লুচ্চা, বদমাশ'। বারো বছর বয়সে আজমলকে পিতৃগৃহে ফিরতে হয় পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য। পিতৃগৃহে সে তার আকাঙ্ক্ষিত পিতাকে পায় না; তার দৃষ্টিতে, 'লোকটা জন্মগতভাবে অসৎ, হারামিপনা মজ্জাগত'। (পৃ. ৫৫)। এমন ঘৃণা নিয়ে বাবার সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়নি; একজন ভালো বাবার অভাব তাকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করেছে। তার একনায়কসুলভ আচরণে সন্তানের প্রতি স্নেহ ছিল না, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা-শ্রদ্ধা ছিল না; আসলে কাউকেই সে সম্মান-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। চরম ঔদ্ধত্যে সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ও নিজের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বে সকলকে পিষ্ট করার মধ্যেই সে আত্মগরিমা অনুভব করে। তার জীবনবোধ নিজের পৌরুষ ধারণায় প্রতিষ্ঠিত : 'পুরুষ মানুষ হবে পুরুষের মতোই, জওয়ানকিতে ভরে থাকবে শরীর ও মন। যেমন কাজ করবে, তেমন ফুর্তি করবে। ... জড়িয়ে পড়বে যেমন অনায়াসে, ছিঁড়বে তেমনি সহজে। পুরুষ মানুষ হবে নিজের রাজ্যে রাজা, নইলে কিসে তার পৌরুষ?' (পৃ. ৫৯)। লাম্পট্য ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সে পৌরুষ হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং সীমাহীন ঔদ্ধত্যে নারীকে চিহ্নিত করেছে শরীরী ভোগের বস্তু। ঘরে দুই স্ত্রী থাকার পরেও চলিশোর্ধ্ব বয়সী সুন্দরী আছিয়ার সঙ্গে সে সম্পর্কে জড়ায়; কারণ ভোলাহাটের সেরা সুন্দরী নারীদের ভোগের অধিকারে আনাটাকে সে পৌরুষের গরিমা মনে করে। আছিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ শারীরী ভোগের, তাতে কোনো হার্দিক বন্ধন নেই। এই সম্পর্কে আছিয়া অস্বস্তিবোধ করে, নিজেকে মনে হয় 'নির্যাস বের করে নেয়া ছোবড়া। (পৃ. ১০৩)। অথচ আছিয়া উপার্জনে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। রেড়ির পাতায় সে রেশম পোকা পোষে; রেশম গুঁটি নিজ হাতে জ্বাল দিয়ে সুতো ওঠায়। চারজন মেয়ে ওকে একাজে সাহায্য করে। গুণগতমানের কারণেই তাঁতিদের কাছে তার সুতার অনেক চাহিদা। পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রেই তার এই শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক; তার বাবার দাদার দাদা ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য রেশমশিল্পী। এই সোনালি সুতোর নেশা তার সারাজীবনের। স্বামীর জীবদ্দশাতেই তার ব্যবসায়ের হাল ধরে আছিয়া এবং মৃত্যুর পরও চমৎকারভাবে সেই ব্যবসায় চালিয়ে যায়। সে একজন সফল নারী শিল্পোদ্যোক্তা; কিন্তু নিজের অন্তর্গত কামনার তাড়নায় সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে ইয়াসিন বসনির ভোগের কারাগারে, পোকা যেমন বাঁধা পড়ে নিজের সুতার আবরণে। পোকার জীবনচক্রের মধ্যেই তার জীবন বাঁধা : 'ওর নিজের মনের মধ্যে এমন একটা পোকা আছে। যেটা কখনো শক্ত এবং কালো হয়ে মরে যায়, কখনো সজীব প্রজাপতি হয়।' (পৃ. ৭৮)। আর্থিকসামর্থ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আছিয়া ইয়াসিন বসনির একক কর্তৃত্বে বশীভূত : 'ইয়াসিনের সামনে রাগ প্রকাশ করার সাহস ওর নেই। ইয়াসিন দাবড়িয়ে রাখে, মাথা তুলতে দেয় না। জমিরুদ্দিন সহজ মানুষ ছিল,

জোরজবরদস্তি খাটাতো না। কথা বলে আরাম পেত, কখনো হাসি-তামাশাও করত। ইয়াসিনের ঐসব বালাই নেই, চায় ভোগ, চায় অধিকারের প্রতিষ্ঠা, আইন মাফিক অধিকার না হলেও কিছু এসে যায় না।' (পৃ. ১০৫)। ইয়াসিন বসনির স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বে আছিয়ার 'প্রজাপতি-মন' মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু সেই কর্তৃত্ব-ভাঙার সাহস ও আত্মবিশ্বাস তার নেই। কারণ ইয়াসিন বসনির এই কর্তৃত্ব আসে পুঁজির ক্ষমতা ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে; এই ক্ষমতাপুটেই আছিয়া সন্ধান করে তার ব্যবসায় ও নিজের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। আছিয়া আমাদের সমাজব্যবস্থায় পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রান্তিক হওয়ার একটি নমুনা। আছিয়া নিজের প্রান্তিকতার বিনিময়েই হয়ে ওঠে স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর অংশীদার এবং এর সুবিধাভোগী। সাম্যের বাণী তার অপছন্দ; শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষেই তার দৃঢ় সমর্থন। একারণেই সে প্রচণ্ডভাবে তেভাগাবিরোধী; জোতদারদের পক্ষে বজ্রকণ্ঠ : 'জমি যার, ফসল তার'। (পৃ. ১০৮)। তার তেভাগাবিরোধিতা কঠিনভাবে হিসাবকষা এবং স্বার্থঘেষা; তেভাগার মধ্যে সে নিজের পতনের অশনিসংকেত পায় : 'তেভাগার সূত্র ধরে সব সাধারণ মানুষই দাবি আদায়ে নামবে তখন ব্যবসার ক্ষতি হবে।' (পৃ. ১০৮)। ভালোবাসার জন্য তার মুহূর্তের ভাবাবেগ উবে যায় উগ্র স্বার্থের উত্তাপে। পুঁজিবাদে মানবিক আবেগ ও সম্পর্ক মূল্যহীন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ভোগই চূড়ান্ত কথা। স্বার্থই আছিয়া-ইয়াসিনের সম্পর্কের ভিত্তি এবং একজন অপরজনের পরিপূরক। ইয়াসিন বসনির স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বলি হয় কন্যা জোহরা-কুতুবের নিষ্পাপ ভালোবাসা। কুতুবকে সে নিজ কন্যার যোগ্য পাত্র মনে করেনি; কারণ অর্থবিত্তকেই সে পুরুষের যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করে, যা কুতুবের নেই। আত্মাহুতিতেই জোহরা ইয়াসিনের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে। কুতুব আত্মাহুতি দিতে পারেনি, তীব্র হতাশায় সে জীবনের স্বাভাবিকতা হারায়। ইয়াসিন বসনির প্রতি নীরব ঘৃণা এবং প্রতিশোধের স্পৃহা তার মধ্যে ধূমায়িত হতে থাকে, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ইয়াসিনের হত্যাকাণ্ড। শ্রমিকের শ্রমশোষণের ওপর ভর করেই ইয়াসিন গড়ে তোলে তার রেশম-সাম্রাজ্য। তার শোষণ থেকে মুক্তি পায়নি পুত্র আজমলও। এসএসসি পাসের পর আজমলকে আর পড়াশুনার সুযোগ না দিয়ে জুড়ে দিয়েছে রেশমশিল্পের কাজে। এবিষয়ে আজমলের উপলব্ধি : 'বাবা এখন ওর শ্রম দোহন করছে এবং নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকে সে দোহনের সুযোগ দিচ্ছে। নাকের সামনে মুলোর মতো ঝুলে আছে সম্পত্তি। বাবা মরার পর পাবে।' (পৃ. ৬৩)।

আজমল তার পিতা ইয়াসিন বসনির বিপরীত পিঠের মানুষ; তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটাও দ্বান্দ্বিক ও প্রবল ঘৃণার। জীবনবোধের বৈপরীত্যই তাদেরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ইয়াসিন বসনি যেখানে একনায়কসুলভ আধিপত্যে ও প্রমত্ত ভোগের তলায় সকলকে স্পৃষ্ট করতে চায়, সেখানে আজমল 'সবাইকে নিয়ে থাকতে চায়। দরকার হলে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে হলেও'। (পৃ. ৫৯)। সব মানুষের প্রতি মোহের কারণেই তার পিতা তাকে অপছন্দ করে। 'সামাজিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, শ্রদ্ধা-ভালবাসা'––এসবকে সে জীবনের মৌল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে। মানুষকে ছোট করে দেখা তার কাছে নীচতা ও দীনতা মনে হয়। তার কাছে মানুষের পরিচয়ের ভিত্তি হলো প্রবৃত্তি-জয়ের সামর্থ্য : 'রিপুতাড়িত মানষ ওর কাছে সবচেয়ে নিচু স্তরের। এই স্তরে ওর বাবা পড়ে। মানুষ অশিক্ষিত হয়, দারিদ্র্যপীড়িত হয়––ইত্যাদি আরো অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে স্খলিত হলে তার মেরুদণ্ড সোজা থাকে না।' (পৃ. ৫৮)। আজমল ছাব্বিশ বছরের এক কর্মঠ যুবক, সুস্বাস্থ্যের জন্য গাঁয়ের লোকে তাকে বলে 'কোয়ান মরদ', কিন্তু স্বভাবে সে চুপচাপ, নিরীহ ও গোবেচারা। পিতার কর্তৃত্ববাদী, নৈতিকতারিক্ত, বেপরোয়া জীবনযাপন তার ভেতরে রক্তক্ষরণ ঘটায়; কিন্তু অন্তর্গত মূল্যবোধের ভিন্নতা সত্ত্বেও পিতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। পিতার সঙ্গে স্বার্থের রজ্জু ছিন্ন করার সাহস তার নেই; মামাতো ভাই আজিজ যেমনটি অনায়াসে পেরেছে। এজন্য মানসিক দহনও তার কম নয়। পিতার প্রতি চরম ঘৃণা সত্ত্বেও রেশমশিল্পের প্রতি তার অগাধ ভালবাসা; এই ব্যবসায়ের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। কারণ এই শিল্পটির সঙ্গে মিশে আছে এদেশের সমৃদ্ধি ও গৌরবের ঐতিহ্য। এদেশের রেশমপণ্যের গুণগতমান ছিলো অত্যন্ত উন্নত এবং এর খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া; নিজ দেশ-মহাদেশের সীমা পেরিয়ে মন জয় করে নিয়েছিল ইউরোপের অভিজাতগোষ্ঠীর। দেশে দেশে বিপুল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিদেশি বেনিয়া কোম্পানি প্রচুর বিনিয়োগে গড়ে তোলে কারখানা

এবং পরবর্তীতে শাসনক্ষমতাকে ব্যবহার করে রেশমশিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপের বস্ত্রশিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এই শিল্পকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়, আর যতটুকু টিকে থাকে তাতে ব্রিটিশ বণিকদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। শাসকদের বৈরিতায় রেশমশিল্পের দেশীয় মালিকেরা হয় ব্যবসায় ছেড়ে দেয়, অথবা যোগ দেয় ব্রিটিশ কারখানার সস্তা শ্রমিক হিসেবে। শাসকদের নিশ্ছিদ্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কেউ কেউ প্রবল আবেগ এবং দক্ষতার গুণে রেশমশিল্পের উদ্যোক্তা হিসেবে টিকে থাকে; ইয়াসিন, আছিয়া তার দৃষ্টান্ত। তবে তাদের টিকে থাকাটাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও মন্ত্রে ভর করেই—শ্রমিকদের শ্রম নিংড়ে নিয়ে। ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসকেরা এদেশের একাংশ মানুষের মনস্তত্ত্বে সাম্রাজ্য গড়ার আকাঙ্ক্ষা গেঁথে দিয়েছে, তারই প্রণোদনায় দেশীয় ক্ষুদ্র ধনাঢ্যশ্রেণি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করেছে; জুলুমে, অত্যাচারে নিঃস্ব করে দিয়েছে তাদের জীবন। কলোনিয়াল শাসনেতিহাসের গভীরে প্রবেশ করে আজমল উপলব্ধি করেছে সম্পদের ঘাটতি নয়, শোষণই এদেশের মানুষের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মূল হেতু; এবং শোষণমুক্ত উৎপাদনব্যবস্থাই এদেশের অর্থনীতির মূলশক্তি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানেই সাধারণ মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, দরকার শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন। পাকিস্তানে শুধু শাসকের পরিবর্তন হয়েছে, শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। তাই করতলগত ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশীয় ধনবানশ্রেণি জনগণের ওপর নবউদ্যমে শোষণব্যবস্থা জারি করে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই একমাত্র পথ। আজমল তাই সুষম মানবিক ব্যবস্থার পক্ষে রাষ্ট্রের বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে তার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা আজিজ; আর আজিজের সূত্রে রমেন মিত্র ও ইলা মিত্রের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি মুগ্ধতা ও আত্মনিবেদন। শেষপর্যন্ত ইলা মিত্রের সর্বমানবিকবোধে উদ্দীপ্ত আত্মত্যাগী রাজনীতিই হয়ে ওঠে তার ধ্রুবদর্শন। ইলা মিত্রের নেতৃত্বগুণ বিষয়ে আজমলের উপলব্ধি : 'এমন মানুষই তো চাই, যারা মানুষের জীবনকে পাল্টে দেয়, সবাইকে নিয়ে সুখে থাকতে চায়, সবার দুঃখের ভাগী হয়।' (পৃ. ১৫৭)। আজমলের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে 'পবিত্র জিনিস' 'রানীমা' (পৃ. ২৭০), তাঁর 'জীবনের বিনিময়ে রাজনীতি' করার আদর্শে আজমল অনুপ্রাণিত। ইলা মিত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্পদের উত্তরাধিকারের মোহ ত্যাগ করে আজমল তেভাগা আন্দোলনে আত্মনিবেদন করে। এই আন্দোলন দমনে পাকিস্তানি পুলিশ ও সেনাবাহিনী নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনকর্মীদের ওপর, ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গোটা জনপদ। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও প্রবল স্বপ্ন দানা বেঁধে ওঠে আজমলের মনে : 'আজকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়েছে, সেই ছাই কালো নয়, এই জ্যোৎস্নার মতো নরম, পেলব, এখান থেকেই তৈরি হতে পারে স্বপ্নের ঘর।' (পৃ. ২৪১)। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে অনেকের মতো আজমলও ধরা পড়ে; সবার মতো তার ওপরও নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন; সবশেষে তাকে প্রেরণ করা হয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। পিতার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সে প্রবেশ করে রাষ্ট্রের কারাগারে। এই কারাগারে ইলা মিত্রের অবিনাশী জবানবন্দি পাঠ করতে করতেই নিদারুণ শ্বাসকষ্টে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে : 'পড়া হয়ে গেলে প্রবল বিবমিষায় ওর চারপাশ ঘোলাটে হয়ে যায়, নিস্তেজ হয়ে আসে শরীর। ও দুহাতে লোহার খাটের রড আঁকড়ে ধরে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকের ব্যথা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ওর ফুসফুসে কোনো বাতাস নেই। একজন কেউ যদি ওই জানালাটা খুলে দিত? বন্ধ জানালার এ-পাশে ও স্নিগ্ধ, নির্মল বাতাসের জন্য মুখ হাঁ করে। ওর চোখ স্থির হয়ে যায়। এবং সে হাঁ আর বন্ধ হয় না।' (পৃ. ২৭২)। এই কারাগার শুধু পাকিস্তান রাষ্ট্রের কারাগার নয়, আজমলের কাছে পুরো পূর্ববাংলাই এক দমবন্ধ-করা কারাগার; এই কারাগারে দম আটকে তিলেতিলে মারা যায় অধিকার আদায়ে সোচ্চার অসংখ্য নিপীড়িত মানুষ। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎপাতে কাঁটাতারে ঝুলে যায় শতাব্দী পরম্পরায় শোষিত-নিষ্পেষিত মানুষের বর্ণময় মুক্তির স্বপ্ন। তবে শত নিপীড়নেও মুক্তিকামী মানুষের শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন শেষ হয়ে যায় না; পরাভূত মানুষ অনিঃশেষ শক্তি নিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখে। এই ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে 'স্নিগ্ধ, নির্মল বাতাসের' জন্য হাঁ-করা মুখ মৃত্যুতেও বন্ধ না-হওয়ার সংকেতে। অবরুদ্ধ কক্ষের জানালার ফাঁক দিয়ে আজমলের চোখে ভেসে ওঠে 'জবাগাছের ডালে হলুদ আলো' (পৃ. ২৬৯)। জবাফুল সাহস, তেজ, জাতীয় বিক্রম ও দ্রুত বৃদ্ধির প্রতীক;

আর হলুদ রঙ চলা বা থামার প্রস্তুতির প্রতীক। দমনপীড়নে মুক্তিকামী মানুষের বিপ্লব সাময়িকভাবে স্তব্ধ হতে পারে, কিন্তু এই স্তব্ধতা বিপ্লবী স্বপ্নের ইতি নয়, নতুন করে শুরুর প্রস্তুতি। তেভাগা আন্দোলনই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-পেষণের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলার শোষিত জনতার প্রথম প্রতিরোধ প্রচেষ্টা; সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তেভাগার অনির্বাণ শিখার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে মুক্তিযুদ্ধে।

সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ফলপ্রসূ স্বাধীনতা অর্জনের উপায়ও সংকেতিত হয়েছে *কাঁটাতারে প্রজাপতি* উপন্যাসে। শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এর প্রধানতম শর্ত। শিক্ষিত ও অভিজাত জনগোষ্ঠীর কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা পরিহার করে সকল মানুষের প্রতি সম্মানজনক ও দায়িত্বশীল আচরণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অশিক্ষিত ও অসচেতন জনগোষ্ঠীকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা, সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার অন্যতম শর্ত। দেশের ভূ-প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষমতা এবং জনগণের দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং উন্নয়নকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া যথার্থ স্বাধীনতা অর্জনের অন্যতম শর্ত। একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বিক পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। রাজনীতিবিদদের চরিত্রই নির্ধারণ করে রাষ্ট্রের চরিত্র; রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি ও নীতিমালা অনেকাংশেই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতিগতির ওপর নির্ভরশীল। তাই কলোনিয়াল শাসনে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অনেক বেশি দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান, সর্বান্তঃকরণে সৎ ও জনবান্ধব হতে হবে। কারণ উপনিবেশ ত্যাগ করে গেলেও সাবেক শাসক ও তাদের দোসরেরা তাদের ছড়ানো উপনিবেশায়নের জালটি গুটিয়ে নেয় না; বরং সদ্য অর্জিত স্বাধীনতাকে ব্যর্থ করার লক্ষ্যে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে। দেশকে উন্নয়ন ও প্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে সেই ধূর্ত-জটিল ষড়যন্ত্রগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও মোকাবিলা করা অপরিহার্য। প্রবল ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম সাহস, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও অগাধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বই পারে সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দেশকে সর্বাত্মক মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে। এর জন্য তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহ; আভিজাত্যের গরিমা ভুলে মিশে যেতে হয় সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে; তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। নিপীড়িত মানুষের প্রতি করুণা নয়, দায়িত্ববোধই তাদের কর্মপ্রেরণা। বিপন্ন দেশ ও নিষ্পেষিত জনতার ভাগ্যোন্নয়নের কাজ ওপরতলায় বসে করা যায় না; তাদের সঙ্গে গড়তে হয় হার্দিক বন্ধন ও আস্থার সম্পর্ক। ক্ষমতার দাপটে অবদমিত করা নয়, পরম মমতায় প্রতিটি নাগরিককে আত্মবিশ্বাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করাই একজন যথার্থ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃত ভূমিকা। দেশের প্রত্যন্ত জনপদ পর্যন্ত তার নিবিড় যোগাযোগ থাকবে, দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে থাকবে সুস্পষ্ট ধারণা, সবকিছুকে আমলে নিয়েই প্রণয়ন করবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা—ইলা মিত্র এমন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মানদণ্ড। আমলা, পুলিশবাহিনী, সেনাবাহিনী ও ব্যবসায়ীশ্রেণিকে প্রভুত্ববাদী মনোভাব ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে জনবান্ধব হতে হবে; নিজের কাজকে ক্ষমতাচর্চা নয়, দায়িত্ব হিসেবে পালন করতে হবে। বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে নিয়োজিত করবেন জাতীয় উন্নয়নের রূপরেখা অংকন ও বাস্তবায়নে। পুঁজিবাদী আগ্রাসনে প্রাণ-প্রকৃতি বিধ্বস্ত হয়েছে; অথচ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাতে হবে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে এবং প্রকৃতির সঙ্গে আপস করে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে বিবেচনায় নিয়ে। মুনাফার জন্য নয়, আমাদের উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে উঠবে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে। পশ্চিমের পুঁজিবাদী কায়দায় আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি নিহিত প্রকৃতি ও মানুষের মিতালিতে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী উৎপাদনব্যবস্থায়। এভাবে *কাঁটাতারে প্রজাপতি* উপন্যাসে ইলা মিত্রের আত্মত্যাগমণ্ডিত রাজনীতির পটে উন্মোচিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চারিত্র্য এবং অঙ্কিত হয়েছে উপনিবেশমুক্তির শেকড়সন্ধানী রূপরেখা; আর এখানেই ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

প্রতিমা উপাখ্যান[১৬]

মঞ্জু সরকারের (১৯৫৩) *প্রতিমা উপাখ্যান* (১৯৯০) উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির পুনরুত্থান এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নতুন করে বাস্তু-উন্মূলনকে উপজীব্য করে রচিত। রক্তসিক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছাপিয়ে স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়ে যাওয়ার কার্যকারণ সন্ধানেই ঔপন্যাসিক তাঁর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বজনীন গণযুদ্ধ। ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের পটভূমিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ব্যাপ্তি মাত্র নয় মাস, কিন্তু ত্যাগের ব্যাপ্তি বিপুল। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা এবং সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের নিরঙ্কুশ জয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। প্রত্যেকের অভীষ্ট ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে বাঙালি জাতিকে দমন-পীড়ন-শোষণের লক্ষ্যে যে বৈষম্যের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, তার অবসান ঘটিয়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল পাকিস্তানি কাঠামোর মধ্যেই সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের স্বার্থান্ধ একগুঁয়েমি ও আগ্রাসী তৎপরতা যখন তা অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে নিয়ে যায়, তখন পূর্ববাংলার নিজস্ব ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাঙালি জাতি সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে বাঙালি জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং বাঙালি জাতিসত্তাগত পরিচয়ে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছে, যার ফলশ্রুতি স্বাধীন 'বাংলাদেশ'। কিন্তু স্মরণে রাখা বিশেষ জরুরি যে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষভুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ অভিন্ন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর মানুষ নয়। পেশায়, বৃত্তিতে, অর্থনৈতিক সামর্থ্যে, ধর্মে, লৈঙ্গিক পরিচয়ে তারা যেমন খোপে খোপে বিভক্ত, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, স্বার্থ, জীবনাচার সবকিছুই বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংগতকারণেই তাদের মনস্তত্ত্বে বৈষম্যের ধারনাগুলোও অভিন্ন নয়। যেমন বাঙালি আমলা পশ্চিম পাকিস্তানি আমলার কাছে, বাঙালি সেনাসদস্যরা পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের কাছে, বাঙালি পুঁজিপতিরা পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বৈষম্যটা প্রকট হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে; বাঙালি নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অস্বীকৃতিতে। বাঙালি চাকরিজীবী, পেশাজীবী, বণিক, রাজনীতিবিদদের ওপর পাকিস্তানি বৈষম্য বাঙালি কৃষক-শ্রমিকের সমস্যা নয়; বরং তাদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ স্বার্থের গ্রন্থিটা এতো জটিল ও সাংঘর্ষিক যে, একজনের স্বার্থপূরণ অন্যজনের স্বার্থহানির কারণ। বিচিত্র রকমের স্বার্থের ফাটলগুলোকে অগ্রাহ্য করেই বাঙালি এক অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে তুলেছিল। স্বার্থগত বৈষম্যের কারণেই বাঙালি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু গোটা বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য এবং তাদের পক্ষে প্রবল ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তদুপরি বাঙালি রাজনৈতিকবলয়ে ছিল গুরুতর বিভক্তি এবং এই বিভক্তি ছিল রাজনীতিবিদদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। পাকিস্তানের অখণ্ডতার সমর্থক বাঙালি রাজনীতিবিদেরা ছিল স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী এবং 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র বাতাবরণে পাকিস্তানের বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোর সক্রিয় অংশ। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি থেকে; যাঁরা আবার জাতীয়তাবাদী, প্রগতিপন্থি ইত্যাদি বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী। আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাগত মতপার্থক্য সত্ত্বেও বাঙালির অধিকার আদায় আর স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মুখোমুখি স্বার্থের সংঘাত না থাকলেও ক্ষমতাবলয়ের বাইরে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। শুধু সমর্থন নয়, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের বিশালতা বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধটা শেষপর্যন্ত সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর। অশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই বিশ্বাসে যে, বাঙালির হাতে ক্ষমতা এলে তাদের দারিদ্র্য দূর হবে, একটি স্বস্তির

জীবন পাবে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের প্রয়োজনে বাঙালি জনসমাজের চাপা-দেওয়া ফাটলগুলো ভয়ংকর চেহারায় উন্মোচিত হয়। গোষ্ঠী ও শ্রেণিস্বার্থের দ্বন্দ্ব মারমুখী হয়ে ওঠে। রাজনীতিবিদ, আমলা, সেনা, পুলিশ, বণিক সকলে মিলে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পারস্পরিক সমঝোতা ও দ্বন্দ্বে দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, লুঠপাট মহামারী রূপ ধারণ করে। ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় চলে এই লুটপাট, দুর্বৃত্তায়ন; আর একারণেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ পায়। আর এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শরিক হয় আমলা, পুলিশ, ব্যবসায়ীরা। রাজনীতি সহিংস হয়ে ওঠে, গুম-হত্যা নৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকদের যুদ্ধাপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া হয়। কেননা মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যার মতো অপরাধ করলেও কোনো না কোনোভাবে তারা নিজেদেরই আত্মীয়স্বজন। নিজেদের ক্ষমতাবলয়ে তাদের যুক্ত করে নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করার গোপন উদ্যোগ চলে। ক্ষমতার দাপটে রাজনীতিবিদরা ভুলে যায় মুক্তিযুদ্ধে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি। জনগণ অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে, তাদের জীবনের দুর্ভোগগুলো কমে না, বরং শনৈ শনৈ বেড়ে চলে। যুদ্ধে তাদেরই ত্যাগ বেশি, তাই স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও তাদের সুগভীর এবং এই বেদনার ভারে তারা মূহ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক-বিভাজন। সংখ্যালঘুদের মনস্তত্ত্বে জমাট বাধে নিরাপত্তাহীনতা ও বাস্তুহারানোর আশঙ্কা। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর রাজনৈতিক পুনর্বাসন শুরু হয় এবং এই পুনর্বাসন পরিণতি পায় স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে। ক্ষমতাকেন্দ্রের বিভিন্ন স্তরে তখন স্বাধীনতাবিরোধীদের একচ্ছত্র প্রভাব। ক্ষমতাকেন্দ্রে স্থান পেয়েই তারা ক্ষান্ত হয় না, একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে নির্মূল করতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতির এই বাস্তবতার এক অনুপুঙ্খ আখ্যান হিসেবে *প্রতিমা উপাখ্যান* বিশেষ মূল্যবান।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রণজিৎ। সে ভোলারহাট হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। শিক্ষকতা ছাপিয়ে তার প্রধান পরিচয় 'রাজনীতিগ্রস্ত যুবক' হিসেবে। সে কমিউনিস্ট পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সে নিজের গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে রাজধানী থেকে দূরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করে। তার সুবাদে গ্রামের একজন নিরক্ষর কামলাও জানে, 'ঢাকা শহরে কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটি পার্টি আছে।' (পৃ. ৩৩)। রাজধানীকেন্দ্রিক জনবিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক দলের দেওলিয়াত্বের পটভূমিতে তার সাংগঠনিক কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। অন্যায়, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে সে সোচ্চার ও প্রতিবাদী : 'হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে সে দল পাকায়, আবার গ্রামের গরিব ক্ষেতমজুরদের একজোট করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও করতে চায়।' (পৃ. ৩৩)। পার্টির কার্যক্রমে দক্ষতা ও আন্তরিকতার কারণে পার্টির ওপরমহলেও তার বিশেষ সুনাম ও প্রভাব : 'পার্টিতে রণজিতের এমন কদর যে, পার্টি থেকে তাকে রাশিয়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত' গৃহীত হয়। রাজনৈতিক আদর্শচ্যুতির কারণে সে নিজ দলের সমালোচনা করতেও ছাড়ে না। রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণেই ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও শুচিতা পরিহার করে মুসলমানের বাড়িতে অবাধে যাতায়াত করে এবং অনায়াসে গরুর মাংস দিয়ে ভাত খায়। 'গাঁয়ের রাঘব বোয়ালদের সে ডরায় না' (পৃ.২৪)। একজন অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ই তার সাহসের ভিত্তি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাজাকার ও গ্রামের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান শরফ হাজীকে বিচারের মুখোমুখি করে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে গুলি করে হত্যার অভিমত প্রকাশ করে। সদ্য মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরিবেশেও শরফ হাজী আত্মরক্ষার্থে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, 'স্বাধীন হয়া দ্যাশটা কি হিন্দুস্তান হয়া গেইছে বাহে! শেষ পর্যন্ত এক হেঁদুর বেটার হাতে বিনা দোষে মরতে হবে?' (পৃ. ৩২)। শরফ হাজীর এই ধর্মদ্বেষী বাক্যে উপস্থিত জনতার মনস্তত্ত্ব টাল খায়। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা চাপা দিতে সেদিনও রণজিৎকে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আবেগময় দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হয়েছে। পরিস্থিতি রণজিতের নিয়ন্ত্রণেই থাকে, কিন্তু শরফ

হাজীকে গুলি করে মারার রণজিতের মতামত কার্যকর হয় না। উপন্যাসের আখ্যানে শরফ হাজীর পুরনো প্রভাব নিয়ে প্রত্যাবর্তনের কথা থাকলেও বেঁচে যাওয়ার বিষয়ে কোনো কথা বা ইঙ্গিত নেই। তবে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, জনচৈতন্যে সংগুপ্ত ধর্মীয় আবেগই তাকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শরফ হাজী গ্রামের 'দেওয়ানি' হারায়, নতুন 'দেওয়ান' হয়ে ওঠে রণজিৎ। ৯৫ ভাগ মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রামে তার 'দেওয়ানি' প্রতিষ্ঠা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বড় অর্জন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ও স্বার্থপরতার পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। উপন্যাসের আখ্যানে অবিনাশ চক্রবর্তীর আত্মভাবনায় ধরা পড়ে সেই উত্থানের স্বরূপ : 'বড়ভাই তাকে পৈতৃক ভিটায় একলা রেখে ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পর পুরাতন ধর্ম ও রাষ্ট্রভীতি পারিবারিক সম্পত্তির মতো সে একাই আগলে রেখেছে। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় ভয়টা অনেকখানি কমে গিয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতা হয়েছিল রাষ্ট্রের আদর্শ। কিন্তু শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর থেকে বিজয়ী বাঙালিদের বাংলাদেশি করা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা কেড়ে সংবিধানে বিসমিল্লাহ লেখা হয়েছে, বাংলাদেশিদের মুসলমান পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্যে এখন বর্তমান রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজিত রাজাকার–সকলেই সোচ্চার।' (পৃ. ৭২)। স্বৈরশাসকের রাজনৈতিক বুনিয়াদ তৈরির জন্য মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একটি নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শ তৈরির প্রয়োজন ছিল। মতাদর্শের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে জনচৈতন্যে গেঁথে থাকা সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখা, যে রেখাটিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা বহু যত্নে গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে, তাদের সৃষ্ট বিভাজনরেখাটি জনচৈতন্যে অক্ষয় হয়ে আছে; পরিস্থিতিসাপেক্ষে কখনো তা সুপ্ত হয়ে থাকে, কখনো প্রচণ্ড গর্জনে জেগে ওঠে। শরফ হাজীদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন এরশাদের সামরিক শাসনের ছায়ায়। সরকারি দলে যোগ দিয়ে তারা স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে; পুনরুদ্ধার হয় পূর্ববর্তী প্রভাব-প্রতিপত্তি। কিন্তু ক্ষমতার আশ্রয়েও তারা নিরাপদ বোধ করে না; কারণ বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যেও সক্রিয় আছে রণজিৎরা। আর নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে শরফ হাজীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তো রণজিৎরাই : 'হাজি ও রণজিতের বিরোধ মানে তো রাজাকারের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার বিরোধ, প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিকের সঙ্গে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বিরোধ, জামাতে ইসলামের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ এবং স্বৈরাচারী-সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরোধও বটে।' (পৃ. ৪০)। তাই নিজেদের ক্ষমতা সুরক্ষিত করতে রণজিৎকে রাজনীতি থেকে উৎখাত করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামে তার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেক মজবুত; তাই তাকে কাবু করতে ষড়যন্ত্রের জাল ছড়াতে হয়। আর ষড়যন্ত্রের মূল হাতিয়ার হিসেবে সে ব্যবহার করে তার পুরনো অস্ত্র ধর্ম আর নতুন অস্ত্র ধর্মলালিত নারীর প্রান্তিকতাকে। ব্রাহ্মণকন্যা প্রতিমা ও পরহেজগার মুসলমান যুবক আহমদকে কেন্দ্র করে আন্তঃধর্মীয় প্রণয়ের কাহিনি সাজায়। আপাতনিরীহ এই কাহিনীর শুরু হয় দেয়াললিখনে, পরে তা জনশ্রুতি আকারে ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র এবং ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মসজিদের বিচারসভায় হাকিমুদ্দির নালিশের মধ্য দিয়ে : 'বামনরা মোর বিয়েস্যি বেটাকে বাড়ির ভেতরে ডাকায় নিয়া যাইত। পড়াবার নাম করিয়া সেয়ানা বেটিকে খালি ঘরত বিয়েস্যির কাছে পাঠায় দিত। মাসে মাসে আবমদ টাকা পইসা আর কত জিনিস যে কিনিয়া দিছে, সেই হিসাব না হয় বাদ দাও। কিন্তু মোর বেটার চাকরিটা খাইল কায়? গ্রাম থাকিয়া তাকে নিরুদ্দেশ করল কাঁয়? মোর পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়া বেটাকে কলঙ্ক দিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইল, আর হিদুর বেটা বাহাদুরি করিয়া থাকপে? মুই এই ঘটনার বিচার চাই।' (পৃ. ৩৬-৩৭)। বিচারসভায় টুপির ঐক্যে রণজিৎকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি; তবে রণজিতের প্রতি জনগণের অটল আস্থা ও অকুণ্ঠ সমর্থনে চিড় ধরে। বিচারসভায়ই কাহিনিটা থেমে থাকে না; নানাজনের কল্পনার মিশেলে লোকরঞ্জক কাহিনিটি এক পর্যায়ে বিশ্বস্ততা অর্জন করে। চূড়ান্তপর্যায়ে তা 'এলাকার ৯৫% মুসলমানের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টে'র (পৃ. ১০৬) বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অবিনাশ তার জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে সমাজে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের গভীরতা : 'জাতধর্ম না মেনে রণজিৎ গ্রামের ছোটোলোক মুসলমানদের যতই আপন ভাবুক, অবিনাশ জানে, মালাউন বেধর্মী বলে ওকে তারা চিরদিন দূরে সরিয়ে রাখবে। নগদ স্বার্থের সামান্য ক্ষতি হলে গ্রামের মানুষ তার বিপদে কেউ পাশে দাঁড়াবে না।' (পৃ. ৪২)। অবিনাশ যেমন মুসলমানদের 'ছোটলোক' বলে বামুনবাড়ির সীমানা থেকে দূরে রেখেছে, তেমনি মুসলমানরাও বিচ্ছিন্ন ধর্মদুর্গ হিসেবে বাড়িটির প্রতি গোপন বিদ্বেষ পোষণ করেছে। একই

ভূমণ্ডলে অবস্থান করেও পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন। রণজিৎ এই সীমারেখাটিকে অতিক্রম করে গেলেও চৈতন্য থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। আহমদকে বন্ধু হিসেবে বরণ করলেও আহমদ প্রতিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে অবচেতনস্তর বেয়ে বের হয়ে আসে তার প্রকৃত স্বরূপ : 'প্রতিমা তোর মতো মুসলমান চাষার ছেলেকে ভালোবাসতে পারে না।' (পৃ. ৮০)। তাই শরফ হাজীর পুনরুত্থান আর পরবর্তীতে রণজিতের দেশত্যাগের ঘটনাকে শুধু সরল রাজনৈতিক হিসাবে ধরা যাবে না; এর পেছনে গভীরভাবে সক্রিয় আছে আপাত সম্প্রীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার চিনচিনে বিষ। প্রতিমার চরিত্রে কলঙ্ক রটিয়ে এবং রণজিতের বিরুদ্ধে একজন পরহেজগার মুসলমানের ইজ্জতহানির অভিযোগ এনেও যখন সুবিধা করা যায়নি, তখন মামলা-মোকদ্দমার বিষয়টি সামনে আসে। তাতে ভালোই কাজ হয়; অবিনাশ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং শরফ হাজীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর রণজিতের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে; কারণ বিদ্যমান বিচারব্যবস্থা শরফ হাজীদের অনুকূলে। রণজিতের অনড় দৃঢ়তার প্রেক্ষাপটে চূড়ান্ত আঘাতটি আসে এক বেনামি চিঠিতে বাহিত হয়ে; সে চিঠিতে থাকে দেশত্যাগের নির্দেশ; অন্যথায় প্রতিমা অপহরণ ও রণজিতের প্রাণনাশের হুমকি। এই হুমকিতে রণজিতের আত্মবিশ্বাস ধসে পড়ে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্র ওয়ারেস চেয়ারম্যানের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে অন্ধ মুজিবভক্ত, আওয়ামী লীগ দলের নেতা এবং পুরনো জোতদারের আসল স্বরূপ। জনগণের ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট তার বিপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষভুক্ত রাজনৈতিক শক্তিও তাকে সমর্থন দিতে নারাজ, আর নিজের রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা–সবকিছুই মিলেই রণজিতের মনস্তত্ত্বে ভর করে এক অসহায়ত্ববোধ। যে রণজিতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'দ্যাশটা কি খালি মুসলমান হাজির বাপের সম্পত্তি? হামরা যুদ্ধ করি স্বাধীন করি নাই এ দ্যাশ?' (পৃ. ২৮-২৯), সেই মুক্তিযোদ্ধা রণজিৎ এক গভীর বিপন্নতাবোধ থেকে সিদ্ধান্ত নেয় দেশত্যাগের। যদিও দেশত্যাগের আগে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, সেই প্রতিশ্রুতিতে কোনো দৃঢ়তা থাকে না।

যার পলায়নের মধ্য দিয়ে আন্তঃধর্মীয় প্রণয় ঘিরে রণজিতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটি ডালপালা বিস্তারের সুযোগ পায় এবং রণজিৎকে সপরিবার উদ্বাস্তু হওয়ার ভাগ্য বরণ করতে হয়, সেই আহমদের গড়ে ওঠার মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনতার ব্যর্থতার বীজ সংগুপ্ত থাকে। গরিব কৃষকের সন্তান আহমদ। 'শুধু নিজ পরিবারের গৌরব নয়, গোটা গ্রামেরও। খুব কষ্ট করে এতো বড় ডিগ্রিটা সে নিয়েছে। এখন ডিগ্রিটাই তার নাম।' (পৃ. ১৭)। উপযুক্ত মামা না থাকায় সরকারি চাকরি জোটেনি। তবে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার একটি শ্রেণি-উত্তরণ ঘটেছে। মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার কারণেই সে নিরাপদ জীবনযাপনে বিশ্বাসী; 'ভোটযুদ্ধ, দলাদলি ও ঝগড়া-কাজিয়ার ধারেকাছে' সে নেই। শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দিক থেকেও তার রূপান্তর ঘটে গেছে, সেটি হলো সম্প্রদায়-অতিক্রমী মানবিক জীবনবোধ, যা তাকে প্রণোদিত করেছে আন্তঃধর্মীয় প্রণয়ে। কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকে পরিণয়-প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে নীরব অভিমানে চাকরি ছাড়ার আবেদন জমা দিয়ে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার এই গ্রামত্যাগ যেমন মধ্যবিত্তসুলভ পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক, তেমনি তার চিন্তার সীমাবদ্ধতা ও অদূরদর্শিতার নিদর্শন। মধ্যবিত্তের সস্তা তরল আবেগ একজন সংখ্যালঘু তরুণীর জন্য কতটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে তা তার বোধগম্য ছিল না। স্বার্থপরের মতো সে গ্রামত্যাগ করে ব্যর্থপ্রণয়ের যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছে। এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আন্তঃধর্মীয় প্রণয়ের জন্য যে সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রয়োজন তা সদ্য মধ্যবিত্ত পরিমণ্ডলে পা-রাখা আহমদের কাছে প্রত্যাশা করা বাতুলতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বার্থে যে সফল হয়নি, মুক্তির স্বাদ জনজীবনে পৌঁছেনি এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, বঞ্চনা, বৈষম্য আরও গভীর হয়েছে, তার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্তের বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা এবং হঠকারিতা অনেকাংশে দায়ী, তারই প্রতীকী দৃষ্টান্ত *প্রতিমা উপাখ্যান*-এর আহমদ চরিত্র এবং সম্ভবত এখানেই উপন্যাসটিরও সার্থকতা নিহিত।

খোয়াবনামা[১৭]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সর্বাত্মকভাবে রাজনীতিমনস্ক লেখক এবং তাঁর এই রাজনৈতিক সম্পৃক্তি মুখ্যত শ্রেণিদ্বন্দ্বের ভিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা-স্ফুরিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে *খোয়াবনামা*-য় (১৯৯৬)। এই উপন্যাসের বিশদ কাঠামোয় তিনি শ্রেণিভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জনজীবনকে আবিষ্কার করেছেন বহুস্তর ইতিহাসের মধ্যে, জনশ্রুতিবাহিত প্রত্ন-ঘটনাবলির সংশ্লেষে। একইসঙ্গে দূরবর্তীকালের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে অনতিদূরকালের তেভাগা আন্দোলনের শতাব্দীবাহিত ঐতিহ্য ভেঙে ব্রিটিশশাসনের অন্তিমপর্যায়ে ঔপনিবেশিকতা-বিমুখ প্রান্তবাসী জনচৈতন্যের ঔপনিবেশিক-মূল্যবোধ-আচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আত্মসমর্পণ ও প্রতারণাময় অমোঘ পরিণতির নিপুণ উপস্থাপন ঘটেছে আলোচ্য পাঠকৃতিতে। 'স্থান ও কালের পরিবর্তনে কাৎলাহার বিল সংলগ্ন জনপদের স্বপ্নময় কৌমজীবনকাঠামো, ধনতন্ত্রের আগ্রাসনে ধারাবাহিকভাবে সেই স্বপ্ন-ভাঙার-বেদনা এবং ক্লিন্ন রাজনীতির ছদ্ম-প্রতিশ্রুতিতে আবারো স্বপ্নে-বিভোর-হওয়ার বৃত্তায়িত সঞ্চারপথকেই আলোচ্য পাঠকৃতিতে বিন্যস্ত করেন ঔপন্যাসিক।' (সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, উলুখাগড়া, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৫ : ৮৩)।

বাংলার অন্ত্যেবাসী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনালেখ্য *খোয়াবনামা*-র কেন্দ্রীয় উপজীব্য। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা বাংলার বিস্তীর্ণ জনমানুষকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বলয়ে আবদ্ধ, সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন, একান্তভাবে ধর্মাশ্রয়ী ও কুসংস্কারমজ্জিত, নিজের ভালোমন্দ সম্পর্কে নিশ্চেতন, আইন অমান্যকারী ও অপরাধপ্রবণ একটি নিম্নমানের (a class of low classness) জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। উত্তর-উপনিবেশবাদী বিশ্লেষণে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার আশ্রয়ে বাংলার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এই আদিকল্প তৈরি ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত––(ক) নিম্নবর্গ হিসেবে চিহ্নিত এই অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য জনগোষ্ঠীকে সভ্যকরণের পশ্চিমের দায়িত্ব হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসনকে নৈতিক ভিত্তি দেওয়া; (খ) অসভ্যকে শাসন করার উপযোগী কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বৈরতান্ত্রিক ঘরানার প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলাকে যৌক্তিক করে তোলা। এই যুক্তিতে অসভ্যকে সভ্যকরণে দমন-পীড়ন-নির্যাতনও বৈধ ও কল্যাণকর; বিপরীতে আড়াল হয়ে গেছে উগ্র সম্পদ-শোষণ ও উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মানবিক মর্যাদা অবনমনের মতো গুরুতর অপরাধ। বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও লৌকিক-আচার সম্পর্কে ঔপনিবেশিকদের চিহ্নায়নে কিছু বাস্তব দিকও প্রতিফলিত হয়েছে, তবে তা উপস্থাপিত হয়েছে নেতিবাচকভাবে। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন সাধারণত গ্রামের সীমা দ্বারাই ছিল নির্ধারিত। জীবনযাপনে তারা কঠোর পরিশ্রমী ও শান্তিপ্রিয়। নিজস্ব পরিমণ্ডলে তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ সুষম জাতি; যেখানে জাত-পাতের, ধর্মের, শিক্ষা-অশিক্ষার বৈষম্য নির্বাসিত। নিম্নবর্গের এই মানুষদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ সমূহের (Community) চৈতন্যে, গোষ্ঠী আর কৌমের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে। তাদের চৈতন্য ধর্মভাবে পরিষিক্ত হলেও এই ধর্মভাব নিছক উৎসের আর সূত্রের সমত্বে নির্ধারিত নয়, এর শেকড় লোকজ সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত এবং তা লোকায়ত নৈতিকতার ধ্যানধারণায় সমন্বিত।[১৭] তাদের অন্তর্নিহিত যূথবদ্ধতায় ঐহিক ও পারত্রিক জগৎ মিলেমিশে একাকার, মর্তবাসী মানুষের সঙ্গী অন্য সময়ের অপার্থিব মানুষ, এমনকি অমর্ত্যবাসী দেবতা-দানোরাও। অতীত-বর্তমানের সীমারেখা অতিক্রমী এই জীবনযাপন যতটা না মূর্ত বাস্তবতার, তার চেয়ে বেশি বিমূর্ত স্বপ্নাচ্ছন্নতার। এই লোকজ ঐতিহ্যে ব্যক্তি নির্বিশেষ, ব্যক্তিসত্তা সমূহে বিলীন; ব্যক্তিগত অধিকারের চেয়ে ব্যক্তির কর্তব্যই মুখ্য। এই কর্তব্য আর অধিকার ধর্মীয় নৈতিকতা ও প্রথা দ্বারা সুনির্দিষ্ট––বিশ্বাস, আনুগত্য, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় এসব বোধ এই নৈতিকতার ভিত্তি। এই ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমাজের গহিন থেকে উঠে আসা অজ্ঞাতকুলশীল অলৌকিক ক্ষমতাধর পির-ফকির-সন্ন্যাসীরাই গণমানুষের নেতা। গণচৈতন্যে তাঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি; বিপদ-আপদ, আধি-ব্যাধিতে এঁরাই তাদের ভরসাস্থল; তাই গণমানুষের নিরঙ্কুশ আনুগত্য এই পির-ফকির-সন্ন্যাসীদের প্রতিই এবং এই আনুগত্যে ধর্মীয় সীমারেখাগুলোও মুছে গিয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দ্বি-ফলা আনুগত্যের দ্বিতীয় মুখটি রাজা ও তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রতি নিবদ্ধ। রাজার প্রতি ক্ষমতার সম্পর্কটি রাজনৈতিক এবং এ আনুগত্যের সম্পর্কটিও ধর্মীয় নৈতিকতায় নিষিক্ত––রাজধর্ম ও প্রজাধর্মে বিন্যস্ত। রাজধর্মে রাজা প্রজাদের সুখশান্তি বৃদ্ধি,

তাদের ধর্ম ও স্বার্থ রক্ষার্থে এবং অত্যাচার-নিপীড়ন নিবারণার্থে ন্যায়পরায়ণ হবেন; আর বিপরীতে প্রজাধর্ম অনুসারে প্রজারা ন্যায়সংগত খাজনা প্রদান করে রাজার অনুগত থাকবে। কিন্তু রাজা যখন রাজধর্ম ভুলে গিয়ে নিপীড়ক হয়ে ওঠে, তখনই রাজার বিরুদ্ধে প্রজার আনুগত্য ধসে পড়ে এবং গণবিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে, ঔপনিবেশিক ভাষ্যমতে বাংলার প্রজাসাধারণকে যে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চেতন অবোধ মানবসমষ্টি হিসেবে চিহ্নায়নের চেষ্টা হয়েছে তা একান্তভাবেই ভ্রান্ত; বরং তাদের বিদ্রোহীসত্তার রাজনীতিবোধ বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন; রাজার চোখে যখন আইনই গুরুত্বপূর্ণ, তখন প্রজার কাছে অত্যাচার শুধু আইনবিরুদ্ধ নয়, নীতি ও ধর্মবিরুদ্ধও। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা এখানে উত্তরিত হয় অতিলৌকিক জগতে, ঐহিক রূপান্তরিত হয় পারত্রিকে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী সমাজের চোখে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একটি বাইরের অনুপ্রবেশকারী শক্তির বিচরণক্ষেত্র। ঔপনিবেশিক শাসককুল যখন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বত্র নিজেদের সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়, তখন শাসকের আধিপত্যকে পাশ কাটিয়ে প্রান্তজ মানুষেরা তাদের মৃত্তিকা-কর্ষিত একান্ত নিজস্ব জীবনটাই যাপন করতে চেয়েছে। দেশজ প্রান্তিক পর্যায়ে পশ্চিমাবাহিত 'আধুনিকতা', 'প্রগতি', 'উন্নতি'—এই প্রপঞ্চসমূহ শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয়কে যেভাবে ও যে-মাত্রায় প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করেছে, প্রান্তিক মানুষেরা ঠিক ততটাই ছিল তার প্রতি পরাঙ্মুখ। এই রাষ্ট্রবিরোধিতার সূত্রেই যূথবদ্ধ প্রান্তিক সমাজ আরও বেশি আত্মসংবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস চালিয়েছে। রাষ্ট্র বনাম সমাজ/গোষ্ঠীর বিরোধের ব্যাপ্তি আমাদের গণ-ইতিহাসের নানা স্তরে ছড়িয়ে আছে; এই বিরোধ স্থানে স্থানে খোলাখুলি সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে এর তির্যক প্রকাশ ঘটেছে নানামাত্রিক চিন্তায় ও প্রতীকী আচরণে। *খোয়াবনামা*-য় পোড়াদহের মেলায় গণমানুষের সর্বজনীন সম্মিলন আপাতদৃষ্টিতে নিরীহগোছের হলেও বিশ্বাসে ও প্রেরণায় এর অন্তস্তলে সংগুপ্ত উপবিবেশ-বিরোধিতার গনগনে আগুন। আর মুন্সীর পাকুড়গাছ গোটা অঞ্চলের মুক্তিকামী মানুষের এক অন্তহীন প্রেরণার প্রতীক। উল্লেখ্য, রাজনীতিবোধে ঔপনিবেশিক ও পরবর্তীতে আধুনিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষদের বিরোধটা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বিদ্রোহের উপাদান হিসেবে ধর্মের ভূমিকা এখানে সংহতিসূত্র হিসেবে, মূল উপাদানটি ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী প্রথম প্রতিরোধ আসে ফকির-সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে, পলাশিযুদ্ধের অত্যল্পকাল পরে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে এবং পরবর্তী চার দশক এই আন্দোলন চলমান থাকে। এই আন্দোলনের সূত্রপাত পলাশিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী কোম্পানির বণিকদের অবাধ লুটপাটে বাংলার শান্তিপূর্ণ গ্রামীণজীবন তছনছ হওয়ার পটভূমিতে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রাপ্ত বৈধ শাসনের আড়ালে রাজস্ব আদায়ের নামে পরিচালিত নৈরাজ্যে গ্রামবাংলার মানুষের ওপর নেমে আসে চরম দুর্যোগ, যার অভিঘাতে ১৭৬৯-এ সংঘটিত মন্বন্তরে তিন কোটি জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ না-খেয়ে মারা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সংঘচেতনার ফকির-সন্ন্যাসীদের ধর্মসিক্ত মুক্ত-জীবনও। নিজস্ব অস্তিত্বসংকটের পাশাপাশি জনমানুষের দুর্ভোগে বিক্ষুব্ধ হয়ে এই ধর্মীয় সম্প্রদায় কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে ফকির-সন্ন্যাসীদের আন্দোলনই জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনপুষ্ট বাংলার প্রথম উপনিবেশবিরোধী গণসংগ্রাম। এ আন্দোলনে নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন ফকির মজনু শাহ এবং ভোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক। দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদহ, কোচবিহারসহ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সমরশক্তি প্রয়োগে ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই গণসংগ্রামকে দমন করতে সক্ষম হলেও ফকির-সন্ন্যাসীদের আত্মত্যাগী বীরত্বের স্মৃতি জনচৈতন্যে ছিল অম্লান। ঔপনিবেশিক শাসকচক্র কর্তৃক উচ্ছৃঙ্খল, ভয়ংকর দুর্বৃত্ত ও লুটেরা হিসেবে অভিধাপ্রাপ্ত এই ফকির ও সন্ন্যাসীরাই জনচৈতন্যে অভিষিক্ত হলেন মরণোত্তর নেতা হিসেবে। ফকির-সন্ন্যাসীদের চরিত্র-হননকারী ঔপনিবেশিক বয়ান নানাভাবে প্রভাবিত করেছে এদেশের শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী

সমাজকেও। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বাগ্রে উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি *আনন্দমঠ* উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়বাদী আন্দোলনের একটি ভিন্নপাঠ উপস্থাপন করেছেন, যেখানে বহিরাগত মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা দেশোদ্ধারের প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ। এই বয়ানে ইতিহাসনিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একটি আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনাটাই ছিল মুখ্য। এ-রাষ্ট্রভাবনা নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে অভিনব ও সমকাল থেকে অনেক অগ্রবর্তী; কিন্তু তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রটি ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের। এর মধ্য দিয়ে তিনি একটি আন্দোলনের ইতিহাসকে কেবল বদলে দেননি, বদলে দিতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকেও। তাঁর অসম্ভব কল্পনা-শক্তির গুণে এই ভুল-ইতিহাসটিই বাংলার বৃহদংশ জনগোষ্ঠীর চেতনায় মিথের মর্যাদা লাভ করে। এই মিথে ভর করেই ভারতীয় রাজনীতিতে ও জনজীবনে সাম্প্রদায়িকতা পুনরুত্থিত হয়েছে। যে ইতিহাস-উৎস ভারতবর্ষের অনেক কলঙ্কের কারণ, তার একটি ইতিহাসনিষ্ঠ পাল্টা-আখ্যান দরকার ছিল; *খোয়াবনামা* সেই পাল্টা-আখ্যান। এই উপন্যাসে ইলিয়াস আঘাত করেছেন ঔপনিবেশিক ইতিহাসবোধকে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে, পশ্চিমা নন্দনতত্ত্বকে, নায়কসর্বস্ব উপন্যাসের একস্বরিত প্লটকে, এককথায় পশ্চিমের আধিপত্যশীল প্রতিটি প্রপঞ্চকে, যা আমাদের মনন-চিন্তা-কল্পনা-সংস্কৃতিকে কব্জা করে রেখেছে। গ্রেকো-রোমান নন্দনতত্ত্বে পরিকল্পিত উচ্চ, শুদ্ধ, ধীরোদাত্ত নায়ককে ভরকেন্দ্রে স্থাপন করে নায়কের দুরন্তগতির সঙ্গে ছুটে-চলা প্লটনির্ভর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচুর এবং এটা আমাদের কথাসাহিত্যে সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতারই অবক্ষেপ। প্লটের ঔপনিবেশিক গড়নের বিপরীতে *খোয়াবনামা*-র বহুস্বরিত আখ্যান উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্যকর্মের এক অসামান্য নিদর্শন। এই আখ্যানে কেবল জীবিত মানুষই নয়, পরলোকগত ফকির-সন্ন্যাসীরা ইতিহাস থেকে জেগে ওঠে, এমনকি ভূতপ্রেতরাও সমবেত হয় মানবিক কলস্বরে। এই আখ্যানে প্রতিটি চরিত্রই বৃহৎ সমাজের পরিধিভুক্ত একেকজন স্বতন্ত্র মানুষ, যারা নিজেদের চিন্তা, জ্ঞান, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। অসংখ্য লোকের কোলাহল থেকে জেগে ওঠে লেখকের অন্বিষ্ট ব্যক্তি, যে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামর্থ্যবান ও দৃঢ়চেতা, সমাজ-পরিবর্তনে প্রতিশ্রুতিশীল এবং তার শেকড় বাংলার কৃষি-ও শ্রমজীবীশ্রেণির গভীরে। বলাবাহুল্য, ঔপনিবেশিক নিয়মে গড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণিভুক্ত কাউকে নায়কত্বে অভিষিক্ত করেননি ঔপন্যাসিক; কারণ তাঁর বীক্ষণে এ-শ্রেণি স্বভাবে স্বার্থপর ও পরাশ্রয়ী, মানসিকতায় পঙ্গু, স্যাঁতস্যাঁতে আবেগের অতি দুর্বল চিত্তের মানুষ। আপাতভাবে ব্রাত্য, নিম্নবর্গীয় মানুষকে মহিমান্বিত করা সুস্পষ্টভাবে ঔপনিবেশিক প্রথাবিরোধী এবং পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিরোধ। *খোয়াবনামা*-র শুরুটা হয়েছে স্বপ্ন, আধা-জাগরণ, অর্ধচেতন ইতিহাসের মধ্যে। কালরেখাহীন এই গহিন অতীতকে *খোয়াবনামা* আবিষ্কার করেছে জনশ্রুতির মধ্যে, যার অধিষ্ঠান মানবপ্রকৃতির অবচেতনে। ইতিহাসের অবচেতনা থেকে লেখক বাস্তব ইতিহাসের জগতে প্রবেশ করেছেন; আর ইতিহাসের অবচেতনা হলো মানুষের সেই স্বপ্ন এবং স্মৃতি, যার মধ্যে পোঁতা থাকে মানুষের অস্তিত্বের শেকড়। তমিজের বাপ ইতিহাসের অবচেতন থেকে জন্ম-নেয়া এক কাদামাটির দলা, যে জাগরণের চেয়ে স্বপ্নেই বেশি বাস্তব। পায়ে শ্যাওলা জড়ানো, শালুকের ছেঁড়া খণ্ড হাতে বিল থেকে উঠে-আসা তমিজের বাপ প্রকৃতির অভেদে গড়া আধা-প্রাকৃতিক, আধা-মানব, আধা-দেবতার এক নির্বিশেষ সত্তা। নামহীন এই মানুষটি 'তমিজের বাপ' নামেই পরিচিত, যার আগের পরিচয় ছিল 'বাঘাড় মাঝির নাতি'। প্রচণ্ড শক্তিধর ও দারুণ পরিশ্রমক্ষম কিন্তু দারিদ্র্যে ন্যুব্জ, নিরন্ন, বুভুক্ষু, 'জাহেল' 'আবোর' মানুষটিই ধীবর জনগোষ্ঠীর কাছে বিশেষ মর্যাদাবান মানুষ, তাদের প্রচ্ছন্ন নেতা। কেরামত আলীর 'খোয়াবনামা'র মালিক সে, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এই জনগোষ্ঠীর ভবিতব্যের গুপ্তরহস্য। প্রত্ন-বীরত্বের ঐতিহ্যকে সে সমগ্রসত্তায় ধারণ করে এবং বিপর্যস্ত ঘোর বাস্তবে সে অবস্থান করে জনশ্রুতিবাহিত অতীত-গৌরবের খোয়াবি-আচ্ছন্নতায়। সত্তানিহিত বীরত্বের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েই সে বিপর্যস্ত বাস্তব থেকে উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর। কাৎলাহার বিলে মাছ ধরার অধিকার হারালেও বিলই ছিল তার জীবনচক্রের ময়দান, স্বপ্ন-জাগরণের গন্তব্য। বিলের অধিকার সে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেনি; তীব্র অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পারবশ্য স্বীকার করেনি শরাফত মণ্ডলের কাছে। বিল পুনরুদ্ধারে তার ছিল অনড়-স্বপ্ন এবং পাকুড়গাছ ছিল তার বিশ্বাসের খুঁটি। এ খুঁটিটি অকস্মাৎ সে হারিয়ে ফেলে এবং খুঁটির সন্ধানে

ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় সে নিজেই হারিয়ে যায় চোরাবালির অতলে। এ-মৃত্যু প্রান্তিক মানুষের উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের অবসানকেই সংকেতিত করে। বাংলার পরবর্তী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে কেবলই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অভিজাতশ্রেণি একক কর্তৃত্বে আসীন।

ঔপনিবেশিক ধনবাদী আগ্রাসনে কাৎলাহার বিলে মৎস্য-শিকারের অধিকার হারিয়ে এই অঞ্চলের মাঝি সম্প্রদায় অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ায়; ক্ষুধা-দারিদ্র্যে তাদের জীবন জর্জরিত। বিদ্যমান বিপর্যয়ের মধ্যেও বিগত জীবনের যূথবদ্ধ সম্পন্নতা ও বীরত্বের গৌরব তাদের স্মৃতিসত্তায় ছিল জাগরূক। পরম দুর্যোগ-দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়েও তাদের আনুগত্য ঔপনিবেশিক শাসনমুখী হয়নি, তাদের আনুগত্য অটল ছিল ফকির-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে; তাদের অনুপ্রেরণা ছিল ফকির-সন্ন্যাসীদের বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামের স্মৃতিতে। ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের এক অখ্যাত শহিদ এবং কার্যত নিরন্তিত্ব মুনসি বয়াতুল্লাহ্ই ছিল গোটা এলাকার অধিকর্তা। হাতে-পায়ে জিঞ্জির ও গলায় ফুঁটো নিয়ে গাছের ওপর বসে জালের মায়ায় বেঁধে সে মণ্ডলপাড়া, মালোপাড়া, চাষাপাড়ার হিন্দু-মুসলিম-বৈষ্ণব সকলকে শাসন করে। এই ন্যারেটিভ বাংলার কৌম জনগোষ্ঠীর সম্মিলনের ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। গোটা জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে এই মৃত-শাসকই ব্রিটিশ কলোনিয়াল শাসকের প্রতিস্পর্ধী শাসক; বিপদ-আপদ-বিপর্যয়ে তারা মুক্তি অন্বেষণ করে শাসন-ক্ষমতায় তার সর্বাত্মক পুনরাধিষ্ঠানে। কিন্তু কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে যে পাকুড় গাছে বসে মুন্সী শাসনকাজ চালাতো, তা সকলের অলক্ষ্যে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। তমিজের বাপের আগে তমিজই প্রথম আবিষ্কার করে গাছটির এই অস্তিত্বহীনতা। (দ্র. পৃ. ৪৮২)। তমিজ প্রচ্ছন্ন সচেতনতায় অনুভব করে এই গাছটির হন্তারক আর কেউ নয়, এই অঞ্চলেরই প্রভাবশালী ব্যক্তি শরাফত মণ্ডল, যে করতলগত করতে চায় গোটা অঞ্চলের মানুষের ওপর কর্তৃত্ব এবং তাদের সম্পদ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূরণের পথে শরাফতকে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবিলা করতে হয়েছে খুব চাতুর্যের সঙ্গে। উল্লেখ্য, আঞ্চলিক কর্তৃত্ব অর্জনের পথে তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কালাম মাঝি। উভয়েই যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে গজিয়ে ওঠা নতুন আগ্রাসী শক্তি, যারা উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে অন্ত্যজ মানুষের ঐতিহ্যগত কৌম-আত্মীয়তাবোধ ও তার বিকৃত রূপান্তর সাম্প্রদায়িকচেতনাকে ব্যবহার করেছে সুকৌশলে।

বিশ শতকের গোড়ায়, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পূর্ব-বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে একটি নতুন সামন্তশ্রেণির উত্থান এবং পূর্ববাংলার রাজনীতিতে তাদের নিয়ন্ত্রকশক্তি হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি নিপুণ ডিটেইলসে উপস্থাপিত হয়েছে শরাফত মণ্ডল ও কালাম মাঝির পরিবারের চিত্রায়ণে। একইসঙ্গে কার্যকারণসমেত উন্মোচিত হয়েছে বাংলার উপনিবেশিত রাজনীতির বীভৎস চেহারা এবং গণমানুষের জীবনে এর করুণ কুফল। শরাফত মণ্ডলের ভাষ্য অনুসারেই তার পিতা ছিল 'লাঙুলে কৃষক'। যদিও ছেলেদের কাছে পিতৃব্যের এই পরিচয় নবার্জিত আভিজাত্যের পক্ষে সম্মানহানিকর, তবু শরাফত মণ্ডল পিতৃপরিচয়টি উন্মোচন করে তার প্রতিষ্ঠাভূমি তৈরির জরুরি গরজে––আভিজাত্যসুলভ দূরত্বে অবস্থান করে স্বগোত্রীয় মানুষদের সঙ্গে দূরবর্তী সম্পর্কটিকে জিইয়ে রেখে তাদেরই ওপর চালানো শোষণকে গোপন করা আর গোষ্ঠীচেতনা উসকে দিয়ে নিজ গোত্রের মানুষের সমর্থনকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো। স্ব-উন্মোচিত পরিচয়-উৎস থেকে আমরা অবগত হই, মাত্র এক প্রজন্ম আগেও হুরমতুল্লাহ্ এবং শরাফত মণ্ডল ছিলেন আত্মীয়তা-বন্ধনে সম্পর্কিত একই সমতলের মানুষ। এক প্রজন্মের ব্যবধানে হুরমতুল্লাহ্ ভূমিহীন বর্গাচাষী আর শরাফত মণ্ডল পরিণত হয় প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীতে। একই উৎসের এই দুই ভিন্ন যাত্রা রচিত হয়েছে শোষণের ইতিবৃত্তে। ব্যবধান-রচনার প্রাথমিক বীজটি ছিল খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর প্রভাবসঞ্চারী; কোনো বছরের উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্তকে পুঁজিতে রূপান্তর করার সুচতুর বুদ্ধি। এই গরিব-বাংলায় সেই পুঁজির ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ছিল অত্যন্ত লাভজনক, সুদ বা লভ্যাংশের নামে পুঁজির কয়েকগুণ প্রসার। ঋণ-পরিশোধের অবধারিত অপারগতার একপর্যায়ে বন্ধক-রাখা ভূমিটির মালিকানা চলে আসে ঋণদাতার হাতে। এভাবে সেই স্বল্পায়তন পুঁজি বছরে

বছরে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে বেড়ে কয়েক বছরের মধ্যেই দানবীয় রূপ লাভ করে; একের পর এক কৃষকের ভূমিহীন হওয়া মানেই শরাফত মণ্ডলদের ভূমি-বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি।[১৮] নতুন ভূমি-মালিকের বদান্যতায় ভূমিহীন কৃষক পায় নিজের হৃত-ভূমিতে বর্গাচাষের অধিকার; কঠোর শর্তে বন্দি এই বর্গাপ্রথা কৃষকের শ্রম-নিংড়ে নেয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থা।[১৯] সম্পন্নতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শরাফত সন্তানদেরকে শিক্ষিত করায় মনোযোগ দেয়; কারণ ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষাই হলো ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-আভিজাত্য অর্জনের সর্বোত্তম উপায়। শিক্ষার বদৌলতেই তার বড় ছেলে আবদুল আজিজ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কেরানি; বৈধ–উপরি নানান পথে উপার্জনে তার দক্ষতা অসাধারণ: 'বাম হাত ডান হাত দুটোই তার ভারি সচল'। (পৃ. ৩৭০)। ছোট ছেলে আবদুল কাদেরও কেরোসিনের দোকান খোলে গোলাবাড়ির বাজারে। চাকরি ও ব্যবসায় লব্ধ অর্থ ছিল কৃষি-অধ্যুষিত জনপদে সম্পদ ও সম্মান বৃদ্ধির বিশেষ অনুঘটক। শরাফতের সম্পদ দ্রুত স্ফীত হতে থাকে এই প্রক্রিয়ায়। সম্পদ যত বাড়ে, জমি বিস্তারের স্বপ্নও তার পাল্লা দিয়ে বাড়ে।[২০] সম্পদ-অর্জনের জন্য যেমন জমিদারের নায়েবকে উৎকোচ ও তোয়াজে বশীভূত করে, অন্যদিকে জমিদার-বিরোধী আন্দোলনকেও উসকে দেয়। সম্পদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ-রক্ষার উৎকণ্ঠাও তৈরি হয়, বিশেষত অদূরবর্তী খিয়ারের কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন তার গভীর আতঙ্কের কারণ। এজন্যই জমি বর্গা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে ধূর্ত হিসাবি; কখনো বর্গা দেয় সগোত্রীয়দের, আত্মীয়তা জোরালো করে তাদেরকে বশে রাখার উদ্দেশ্যে; আবার মাঝিদের জমি বর্গা দেয় বিল থেকে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে। তমিজকে জমি দেওয়ায় তার যুক্তি হলো : '[তমিজকে] ফিরিয়ে দিলে ছোঁড়াটা হয় কাৎলাহার বিলে মাছ চুরি শুরু করবে, চুরি করতে করতেই একদিন বিলের হক দাবি করে বসবে। নইলে সে চলে যাবে খিয়ারে। খিয়ারের চাষাদের বেয়াদবি দেখতে দেখতে তারও মাথাটা বিগড়ে যাবে না কে বলতে পারে?' (পৃ. ৩৭৬)। সম্পদ-রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোতে যুক্ত হওয়াটাও বিশেষ জরুরি। একারণেই সে ছোট ছেলে কাদেরকে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে উৎসাহিত করে। আবদুল আজিজের কাছে ব্রিটিশ আইনই জমিদার-জোতদারদের স্বার্থের সুরক্ষা-কবচ, তাই সে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে : 'বৃটিশ খেদাতে তোমরা উঠে পড়ে লেগেছো, দেশটা তোমাদের হাতে পড়লে এর হালটা কী হয় তখন দেখে নিও।' (পৃ. ৩৭৩)। কাদেরের মুসলিম লীগের রাজনীতিটা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য হলেও এর অন্তরালে ছিল ক্ষমতাবলয়ে থেকে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা। এক্ষেত্রে কাদেরের পন্থাটাই ছিল শরাফতের কাছে অধিক বাস্তবসম্মত। ফলত কাদেরদের এই নতুন নেতৃত্বের জাতীয়তাবাদী ও ধনতন্ত্রী রাজনীতিতে প্রান্তিক মানুষের মুক্তি সম্ভব ছিল না। কিন্তু শোষণ-মুক্তির স্বপ্ন নিয়েই প্রান্তবাসী গণমানুষ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আত্মসমর্পণ করেছিল। তমিজ চরিত্রের ক্রমরেখায় আমরা লক্ষ করবো, বাংলার গহিন প্রান্তিক মানবমণ্ডলীর জীবনসংগ্রাম, তাদের স্বপ্নভঙ্গ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী প্রয়াস।

তমিজ গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ কৌমজনগোষ্ঠীর একজন হলেও পিতার মতো সে নির্বিশেষ নয়; সামষ্টিকতার ভেতর থেকে তার উত্থান সবিশেষ আত্মপরিচয়সমেত। এই পরিচয়ে সে কেবল সমাজের বাসিন্দা নয়, আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকও। এই রূপান্তর কেবল তমিজের নয়, বাংলার অন্ত্যজ গণমানুষের ঐতিহাসিক পর্বান্তর। ভূমিহীন তমিজ সম্মানজনক আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়; উৎপাদক হতে চায়; জমির মালিক হতে চায়; একটি সম্পন্ন গার্হস্থ্য জীবন চায়। কিন্তু তমিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পশ্চিমা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নিয়মে নয়, এর শেকড় প্রোথিত বাংলার শাশ্বত যৌথজীবনচেতনায়। তার জীবন-অভীপ্সায় পর-সম্পদ মোক্ষণের আকাঙ্ক্ষা নেই, কঠোর পরিশ্রমই তার ব্রত, যার মূল নিহিত পূর্বপুরুষের জঙ্গলে সভ্যতারচনার বীরত্বের প্রত্ন-স্মৃতিতে : 'বিলের এপারে গিরিরডাঙার অর্ধেক, অর্ধেক না হলেও সিকি জমির জঙ্গল কেটে বসত করলো কে?— সোভান ধুমা ছাড়া আবার কে? করতোয়ার পশ্চিমে কোথায় খুব গোলমাল করে কাদের তাড়া খেয়ে সোভানের বাপ এখানে যখন আসে এই তল্লাট জুড়ে তখন খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। সোভানের মা ছিল চার জন, ভাইবোন পঁচিশ তিরিশ জনের কম নয়। এর মধ্যে প্রায় সবই বেটাছেলে। ... আরে, বিলের পশ্চিমে এতো বড়ো জঙ্গল কেটে চাষের জমি বার করা কি মেয়েছেলের কাম নাকি? জঙ্গলও জঙ্গল। জঙ্গল জুড়ে তখন বাঘ, ভাল্লুক, বুনো শুওর আর সাপ। প্রথম দিকে গাঁইগুঁই করলেও জানোয়ারগুলো তটস্থ থাকতো সোভান আর তার ভাইদের ভয়ে। শেষে এমন হলো যে, সোভানের গায়ের গন্ধ পেলে বাঘ পর্যন্ত আর

পালাবার দিশা পায় না। ধরতে পারলে সোভান ধুমা বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চড়িয়ে তাকে দিয়ে লাঙল টানায়।' (পৃ. ৩৭১)। পূর্বপুরুষদের মতোই প্রচণ্ড শক্তিমান ও পরিশ্রমক্ষম মানুষ তমিজ; বাঘাড় শিকারের বীরত্ব তার শোণিতে; 'বাঘাড়' তার আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা। প্রাকৃতিক ও জান্তব শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী এই বীরেরা সম্পদ-লিপ্সু মানুষের চাতুর্যের কাছে পরাভূত। এক্ষেত্রে গ্রামীণ জীবনের ঘেরাটোপে আবদ্ধ এই সরল মানুষদের অসচেতন সত্তা শত্রু-মিত্র শনাক্তিতে যেমন ব্যর্থ, তেমনি শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশলটাও তাদের অজানা। তমিজ এই ধারাবাহিকতায় ব্যতিক্রম। পরিশ্রমেই জীবন গড়ে নিতে সে বদ্ধপরিকর; তার লড়াকু-সত্তা নিশ্চেতনায় সমর্পিত নয়, গভীর সচেতনতায় উজ্জীবিত। পিতার আধা-জাগরণের কাদামাটি থেকে তমিজ উঠে দাঁড়ায় বাস্তবের শক্ত মাটিতে। প্রত্যাশা-পূরণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ তার জানা; ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে থাকা শত্রু-মিত্রও তার চেনা। গ্রামীণ চৌহদ্দির বাইরে তথাকথিত অভিজাতবলয়ে বিচরণসূত্রে তার গ্রহিষ্ণু ও সঞ্চরণশীল সত্তায় ধরা পড়েছে তাদের শঠতা-প্রতারণার কূটকৌশলগুলো; চিহ্নিত করেছে তার প্রকৃত শত্রু। পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, পরসম্পদ-লিপ্সু মানুষমাত্রই তার শত্রু—— সে বহিরাগত ঔপনিবেশিক শক্তি হোক বা নিজ জনগোষ্ঠীভুক্ত আত্মীয়ই হোক।

জনশ্রুতিবাহিত ইতিহাসের সুবাদে অনেকের মতোই তমিজ জানে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতেই ভেঙে পড়েছে তাদের শান্তস্নিগ্ধ ও সম্পন্নতার কৌমজীবন। তবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ব্রিটিশরা ছিল বিমূর্ত সত্তা; ব্রিটিশদের স্থানীয় সহকারী জমিদার-জোতদার-মহাজনদের শোষণটাই ছিল তাদের কাছে মূর্ত। উপনিবেশকদের আইনি ছত্রছায়া ও প্রয়োজনসাপেক্ষে সামরিক সহযোগিতায় জমিদাররা পেয়েছিল যথেচ্ছ শোষণের সুযোগ। জমিদারদের খাজনা-মাথট-আবওয়াব ইত্যাদি নানান নামের দাবি মেটাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে কপর্দকহীন হয়ে পড়ে কৃষক সমাজ। জলাভূমিতে মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে জেলেরা এবং পেশা হারিয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষেরাও ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। অনিবার্যতই কাছের এই শোষকরাই ছিল প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীর দৃশ্যমান শত্রু। শোষণটা অসহনীয় হয়ে উঠলে জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভে জ্বলে উঠতো, কখনো-কখনো সেটা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নিত। অসংগঠিত এ লড়াইগুলো শেষ হয়েছে ব্যাপক দমন-পীড়নে প্রান্তবর্তী মানুষদের অধিকতর প্রান্তিক হওয়ার মধ্য দিয়ে। এই মানুষগুলো গভীরতর দারিদ্র্য আর ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে নিষ্ক্রিয়তার স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতে ঢুকে পড়ে। তমিজের বাপ, চেরাগ আলী, কুলসুম, বৈকুণ্ঠ——এরা প্রত্যেকেই খোয়াবের জগতের নিষ্ক্রিয় বাসিন্দা। তমিজও স্বপ্নজগতের মানুষ, তবে তার স্বপ্ন আত্মপ্রতিষ্ঠার এবং অনিবার্যভাবেই সক্রিয় সংগ্রামের। তার সংগ্রাম এগিয়েছে জীবনযাপনের বাঁকে বাঁকে লব্ধ অভিজ্ঞতা-জারিত রাজনীতিবোধের ক্রমবিকাশের নিয়মে।

তমিজ মাঝির ছেলে, কিন্তু পূর্বপুরুষ ছিল কৃষক। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জমি হারিয়ে এই কৃষকেরা পরিণত হয় কাৎলাহার বিলের মাঝি। এবার কাৎলাহার বিলে মাছ ধরার অধিকার হারিয়ে আবারও তারা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এবার প্রকৃতি নয়, জমিদারের নায়েব আর জোতদার শরাফত মণ্ডলের সীমাহীন অর্থলিপ্সাই তাদের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে; এবার তারা হয় বর্গাচাষি, নয় দিনমজুর। যাদের অল্প-স্বল্প জমি ছিল তাও জমিদারি শোষণ ও মহাজনি ঋণের ফাঁদে হাতছাড়া। তমিজও ভূমিহীন কৃষক, তার ভূমিহীন হওয়ার কারণ : 'আকালের বছর [তমিজের বাপ] তার সবেধন নীলমণি তিন বিঘা জমি শরাফত মণ্ডলকে বেচে সে শোধ করলো জগদীশ সাহার দেনা, তার গোরুটা পর্যন্ত নিয়ে গেলো জগদীশের মানুষ এসে। তাতেও নাকি সাহার সুদের টাকা সব শোধ হয়নি।' (পৃ. ৩৬৪)। সর্বরিক্ত তমিজকে তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামটা শুরু করতে হয় কৌশলে, আপস আর আনুগত্যের ভিত্তিতে। খিয়ারে খেতমজুরি দিতে গিয়ে তার মনে জাগে নিজগ্রামের বর্গাচাষি হওয়ার স্বপ্ন; এ-স্বপ্ন উত্তরণের——খেতমজুর থেকে বর্গাচাষি হয়ে জমির মালিক হওয়া। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রাথমিক ধাপে কাদের ও শরাফত মণ্ডলকে আনুগত্য ও তোয়াজে সন্তুষ্ট করে তমিজ জমি বর্গা নেয়। জমি-মালিকের কঠিন শর্তকেও সে ন্যায়সংগতই মনে করে এবং শরাফত মণ্ডলের প্রতি হুরমতুল্লার ক্ষোভকে মূল্যায়ন করে অকৃতজ্ঞতা ও বেইমানি হিসেবে। বর্গাচাষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হুরমতুল্লার প্রতি চাপা বিদ্বেষটাই এখানে মুখ্য

ব্যাপার। এই বিদ্বেষ কেবল তমিজ-হুরমতুল্লার পারস্পরিক নয়, ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক অন্তর্ঘাতের বহিঃপ্রকাশ; পরস্পরের প্রতি বিষোদ্‌গার করে জোতদারের কাছ থেকে জমি হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা। একইভাবে শোষিত হলেও তারা এখানে পরস্পরের শত্রু; আর আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় শোষক-জোতদারের উগ্র সম্পদ-বুভুক্ষু চেহারা। এটা তাদের অধিকার ও শত্রু-মিত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অসহায়ত্বের চিহ্নায়ক। এতে বিচূর্ণিত হয় কৌমজীবনের পারস্পরিক সহমর্মিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য। যে বিভাজককে তত্ত্বভূমি ধরে ব্রিটিশরা ভারত শাসননীতি প্রণয়ন করেছিল তা শাসক-শাসিতের সম্পর্ক-নির্ধারণী প্রাথমিক সীমা অতিক্রম করে আন্তঃসাম্প্রদায়িক পর্ব পেরিয়ে প্রান্তবর্তী কৌমজীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাজনরেখায় আনাগোনা করেছে হিংসা-বিদ্বেষ-দমন-শোষণের উগ্র আকাঙ্ক্ষা। *খোয়াবনামা*-য় ইলিয়াস বাংলার সমাজজীবনের প্রতিটি বিভাজনরেখায় বিদ্যমান অসংগতিসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন। প্রথম পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক বিভাজনটি ছিল হিন্দু-মুসলমানের অভিজাতবলয়ে কেন্দ্রীভূত। হিন্দু অভিজাতশ্রেণি শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানে থেকে সমাজনিয়ন্ত্রণের অবারিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। এই নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়ন যেমন ছিল, তেমনি ছিল মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রতি সীমাহীন তুচ্ছতাচ্ছিল্য। *খোয়াবনামা* থেকে উদ্ধৃত একটি দৃষ্টান্ত : 'শরাফতের বাপচাচাকে কাছারির কোনো নায়েব তুইতোকারি ছাড়া ডাকে নি। অনেক আগে শরাফতের জ্যাঠা পিয়ারুল্লা মণ্ডলকে আগের নায়েব ডাকতো শিয়ারুল্লা বলে বলে, এই নায়েবের আমলে সে পরিচিত হলো শিয়ালু বলে এবং মরার পরও ওই নাম থেকে জ্যাঠা তার রেহাই পায় নি, তার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি সবার বাপদাদার নাম এখনো লেখা হয় শিয়ালু মণ্ডল।' (পৃ. ৪০২)। এই শোষণ-অপমান অসহায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর মনে চাপা ক্ষোভের জন্ম দেয়। স্মর্তব্য, সংখ্যা-স্বল্প হলেও বাংলার সমাজকাঠামোয় হিন্দু জমিদার ও অভিজাতশ্রেণির সমবয়সী একটি মুসলমান জমিদার-জোতদার ও শিক্ষিতশ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। সম্প্রদায়গত ব্যবধান ছাপিয়ে তারা ছিল অভিন্ন মূল্যবোধের মানুষ; পারস্পরিক সখ্যও ছিল সুগভীর এবং রায়তদের প্রতি তাদের মনোভাবও ছিল তুচ্ছতাচ্ছিল্যের। ঔপনিবেশিক শাসকদের মিত্রবদলের নীতিতে বাংলায় যে নতুন মুসলিম অভিজাতগোষ্ঠীর জন্ম হয়, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহে তাদের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়। ব্রিটিশ-শাসনের শেষপর্বে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে তার ভ্রূণ নিহিত ছিল দুই সম্প্রদায়ের চেতনতলে শায়িত পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষে। মুসলিম লীগের রাজনীতির থিম তৈরিই হয়েছে এই পটে : 'হিন্দু জমিদার আর হিন্দু মহাজনের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই তো লীগের পাকিস্তানের লড়াই।' (পৃ. ৩৭৩)।

আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিভাজনের পাশাপাশি মুসলমান জনগোষ্ঠীর অন্তঃসম্প্রদায় বিভাজনও ছিল মর্মান্তিক। নিজে হালুয়া চাষার ছেলে হলেও আভিজাত্যের কাঠামোয় দাঁড়িয়ে শরাফত চাষাদের 'ছোট লোক' বলে ধিক্কার দেয়; আবার এক প্রজন্ম-পূর্ববর্তী চাষার পরিচয়কে সামনে এনে শরাফতের আভিজাত্যকে খারিজ করে দেয় শিমুলতলার বড়োমিয়া। এদিকে দারিদ্র্যপীড়িত প্রান্তিক মানুষদের কৌমজীবনেও লেগেছে বিভাজনের ঢেউ, সেটা কখনো সম্প্রদায়ভিত্তিক, কখনো গোত্রভিত্তিক। বৈকুণ্ঠের অসাম্প্রদায়িক মনে অবচেতনে জেগে ওঠে নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের অনুরণন; তার মনোভাবে ছিল 'ভিন জাতের' মুসলমান থেকে নিজের জাতপাত রক্ষা এবং মুনসি বয়াতুল্লাকে ভবানি পাঠকের অধীন করার প্রয়াস। বিপরীতে তমিজের বাপ মুনসি ও সন্ন্যাসী দুজনকেই মানে মুরুব্বি হিসেবে আর কেরামত ভবানি পাঠকের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে না, পুরো জনপদ জুড়ে মজনু শাহের দাপটকেই সে প্রত্যক্ষ করে। নিম্নকোটির মানুষের মধ্যকার অন্তঃধর্মীয় পরিসরে আন্তঃগোত্রীয় দ্বৈরথ পরিলক্ষিত হয় কৃষক-মাঝির শ্রেষ্ঠত্বের বিবাদে। স্বাজাত্যশ্রেষ্ঠত্বের তাড়নায় হুরমতুল্লা তমিজের বাপের সঙ্গে পাশাপাশি খাবার খেতে অস্বস্তি বোধ করে আর ফুলজান তমিজের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করে অপমানের সঙ্গে। এভাবে হরেক রকম বিভাজকে আটকে যায় অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর যৌথজীবনচেতনা। ঠুনকো মর্যাদার বিভাজক পেরিয়ে ফুলজানের সঙ্গে তমিজের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে লোকচেতনায় অন্তঃশীল থাকে ঐক্যবোধ পুনরুদ্ধারের ব্যঞ্জনা। কাৎলাহার পাড়ের জনগোষ্ঠীর অবচেতনে সক্রিয় যৌথচেতনায় ভাঙন ধরানোটা দুই সম্প্রদায়ের

Dhaka University Institutional Repository

সামন্তগোষ্ঠীর কাছেই জরুরি ছিল এবং এ বিষয়ে তাদের ঐকমত্যও ছিল। ভবানী পাঠকের সঙ্গে ভবানী দেবীর নামের সাদৃশ্যকে ব্যবহার করে নায়েববাবু পোড়াদহের মেলায় ভবানী ঠাকুরের স্থলে ভবানী দেবীর পুজা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়; আর তাতে পূর্ণ সমর্থনজ্ঞাপন করে শরাফত মণ্ডল।

তমিজের হাড়-ভাঙা খাটুনিতে জমিতে আমনের প্রচুর ফলন হয়। তমিজ ফসলের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের সম্পন্নতার খোয়াবে আচ্ছন্ন হয় : 'তমিজের আমন হবে এখানে আউশ যা হয়েছিল তার আড়াই গুণ। এতো এতো ধান তারা খাবে কতো? দূর! আমন ধানের চিকন চাল দাঁতের ভেতর কেমন ফস্কে ফস্কে যায়, ভাত খাবার জুত হয় না। খাবার জন্যে আউশ ধানের ভাত কতো ভালো। আর অতো খাবার লালচ কেন? আমন বেচে টাকা যা পাবে সবটা পেটের ভেতর না সেঁধিয়ে জমিয়ে রাখবে। এক জোড়া গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই কিনতে পারলে বর্গা জমি পেতে কষ্ট হয় না। বেশি নয়, বছর তিনেক বর্গা করতে পারলে দুটো ফসল ঘরে তুলে অন্তত ১৫ শতাংশ জমি কেনার টাকা হয়। নিজেদের ভিটার লাগোয়া জমিটা মণ্ডলের কাছ থেকে ফেরত পাওয়া যায় কি-না একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? ... মণ্ডল জমি যদি না-ও বেচে তো অন্তত খাইখালাসি দিক। বাপটাকে তমিজ তা হলে ওখানেই লাগিয়ে রাখতে পারে।... বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছ থেকে মুনসি তাকে যদি একটু কোল দেয় তো বিলের জমিজিরেত কি তার হাতে না এসে পারে?' (পৃ. ৩৯৫-৯৬)। কিন্তু তমিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় ভাগাভাগির সময় নানান অজুহাতে ফসলের সিংহভাগ শরাফত গ্রাস করলে। অসহায় তমিজ ক্ষোভে ফোঁসে, কিন্তু মৃদু প্রতিবাদেই তাকে থামতে হয়। অন্যথায় পুনর্বার বর্গাচাষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা। এছাড়া লাঙল-গরু না-থাকাকেও সে বঞ্চনার কারণ হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু লাভ হয়নি তাতে, মৃদু আপত্তির শাস্তি হিসেবে পরের বার তমিজের জন্য শরাফতের বন্দোবস্ত হয় হুরমতুল্লার বর্গাজমিতে গতর-খাটুনি। এতে তমিজের স্বপ্ন আহত হয়, তবে পরাভূত হয় না। লাঙল-গরু কেনার পয়সা জোগাতে অদম্য তমিজ মেলায় কুলির কাজ করে। ফসল-ভাগের সময় কাদেরের অনুপস্থিতির চাতুর্যকে সে বুঝতে পারেনি বলেই কাদেরের প্রতি তার আস্থাটা অটুট থাকে এবং কাদেরের আঁকা পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখায় নিজের স্বপ্ন বোনে। কাদেরের রূপাঙ্কিত 'পাকিস্তানে জমিদারি সিস্টেম উচ্ছেদ করা হবে। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে। পাকিস্তানে নিয়ম হবে জমি তার লাঙল যার। পাকিস্তানে আমিরে গরিবে ফারাক থাকবে না।' (পৃ. ৪২৯)। মুসলিম লীগ ছিল জমিদার, জোতদার আর বড়লোকদের রাজনৈতিক সংগঠন। তাই মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাজনীতিতে ধনিকশ্রেণির স্বার্থই ছিল মুখ্য। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিহীন চাষা। তাদেরকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত করা না গেলে পাকিস্তানের দাবিকে জনভিত্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই নেতাদেরকে মুসলিম লীগের রাজনীতিকে ইসলামি সাম্যবাদের মোড়কে সাজাতে হয়েছিল। মুসলমান জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগের দায় হিন্দু জমিদারদের ওপর চাপিয়ে দিতে তারা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে। চিরশত্রু কম্যুনিস্ট রাজনীতিকে নিষ্ক্রিয় করতে কম্যুনিস্ট স্লোগানকে তারা ধর্মীয় রাজনীতির মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেয়। পাকিস্তানে বর্গাচাষিদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো জমি কেড়ে নেয়ার অধিকার রহিত করার কথা বলে, তেভাগা বাস্তবায়নের কথা বলে। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে নেতাকর্মীদের বাগিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এই কৌশলে। পাকিস্তানের দাবিতে নেতারা পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের কথা বলে; কেননা মুসলমানদের বিভক্তি মানেই হিন্দু স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা, হিন্দু জমিদার-মহাজনদের কাছে মুসলমানদের শোষিত-অপদস্থ হওয়ার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা। ভোটের রাজনীতির কৌশল হিসেবে তারা নিম্নকোটির মানুষের কৌম-জীবনচেতনাকে জুঁতসইভাবে কাজে লাগায়। ইসমাইলের চিন্তায় : 'তাদের মুরুব্বি আছে, সমাজ আছে, সমাজের ভেতর উপ-সমাজ আছে। ইলেকশন করতে গেলে এসব খেয়াল করতে হয়। এখানে ভোটার হলো পাড়াগাঁয়ের মানুষ। তাদের মধ্যে আবার ছয় আনা ট্যাকস দেয় যারা ভোট দেবে কেবল তারাই। বিয়েশাদি, আকিকা; মুর্দার দাফন, চেহলাম ভোট এসব করে তারা সমাজ মেনে।' (পৃ. ৪৫৯)। তাই কাদেরের আপত্তি উপেক্ষা করেই ইসমাইল ছোটে যায় কাৎলাহার পাড়ের মাঝি সম্প্রদায়ের নেতা কালাম মাঝির কাছে। কৌম-জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব গড়ে উঠতো ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য কিংবা অলৌকিক ক্ষমতার ভিত্তিতে। আর্থিক সামর্থ্যের বিবেচনায় কালাম মাঝি যেমন মাঝিদের নেতা, তেমনি চাষাদের নেতা শরাফত মণ্ডল। কৌম-নেতার ঐতিহ্যবাহী যৌথ-কল্যাণবোধ বিধ্বস্ত হতে দেখা যায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ-লিপ্সায়; আর এ-লিপ্সা প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক ধনবাদী আগ্রাসনে বিধ্বস্ত নৈতিকতার পরিণতি। মাঝি-সম্প্রদায়ের সমর্থন কব্জা করতে ইসমাইল কাৎলাহার বিলের মালিকানা মাঝিদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, যা ছিল কাদেরের পারিবারিক স্বার্থে আঘাত। পরবর্তীতে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিলের মালিকানা কালাম মাঝির হস্তগত হয়। মালিকানার এই হস্তান্তরে বিলে মাঝিদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি; হয়েছে গোষ্ঠীচেতনাকে কাজে লাগিয়ে কালাম মাঝির ব্যক্তিগত সম্পদ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা। বিলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাঝি-সম্প্রদায়কে শরাফত মণ্ডলের মতো কালাম মাঝির সঙ্গেও মুখোমুখি লড়াই করতে হয়েছে। দেশবিভাগের আগে-পরের দুই লড়াইয়েই তমিজের বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতির মামলা হয়েছে। প্রথমবার তাকে এক বছর জেল খাটতে হয়েছে, দ্বিতীয়বার চিরতরে তাকে দেশছাড়া হতে হয়েছে। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীকে মুসলিম লীগের ছত্রতলে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে ইসমাইল একদিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বশে রেখে নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতের বিপ্লবের হাত থেকে নিজের শ্রেণিস্বার্থকে সুরক্ষিত করার কৌশল গ্রহণ করেছে। মুসলমান জনগোষ্ঠীর হিন্দুবিদ্বেষী সর্বাত্মক আন্দোলনের বিপরীতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিও প্রকট আকার ধারণ করে। সকল হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং পোড়াদহ মেলার সর্বজনীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে নায়েববাবু সন্ন্যাসীর স্থানে দুর্গাপূজা আয়োজনের উদ্যোগ নেন। যুক্তি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-এর প্রসঙ্গ তোলা হয়, যেখানে বলা হয়েছে, 'সন্ন্যাসীরা ম্লেচ্ছদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল'। (পৃ. ৫৮১)। বৈকুণ্ঠ, কেষ্ট পালরা এই বিকৃত ইতিহাসের প্রতিবাদ করলেও নায়েববাবুর কূটকৌশলে তারাও সাম্প্রদায়িক হিংসায় ঢুকে পড়ে। এভাবে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষ সহিংসতায় গড়ায়। কলকাতায় হিন্দু-সন্ত্রাসীর হাতে মুসলমান হত্যাকাণ্ডের ঢেউ আছড়ে পড়ে প্রত্যন্ত কাৎলাহার তীরবর্তী জনপদে। ভেঙে পড়ে এই জনপদের চিরায়ত সম্মিলনবাদী জীবনধারা। রক্তস্নাত দাঙ্গার সহিংসতার পটে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান এবং শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় মুসলিম অভিজাতশ্রেণি।

পাকিস্তানের স্বাধীনতায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনে ক্লিষ্ট প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠী বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে, তাদের দুর্ভোগের অবসান ঘটতে যাচ্ছে, সামনে তাদের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ জীবনের হাতছানি। স্বাধীনতার দিনেই তমিজ কয়েদ-মুক্ত হয়েছে; জেলখানা থেকে সে বের হয়ে এসেছে তার স্বপ্নপূরণের গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। তার বিশ্বাস : 'পাকিস্তানে তেভাগা তো হবেই।' (পৃ. ৫৯০)। কারণ এই তেভাগার সঙ্গেই জড়িয়েছিল ভূমিহীন তমিজের স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা। অপরদিকে তমিজের বাপ প্রত্যক্ষ করে ভয়াবহ বিপর্যয় : 'সব্বোনাশ হছে। বিলের উত্তর সিথানত পাকুড়গাছ খুঁজ্যা পাই না। পাকুড়গাছ নাই।' (পৃ. ৫৯৩)। তমিজ যদিও পিতার এই উদ্বেগকে আমলে নেয় না, কিন্তু এই উদ্বেগের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার সর্বনাশের বীজ। স্বাধীন দেশে তার নতুন জীবন শুরু করতে হয়েছে ক্ষেতমজুর হিসেবেই; তবে 'কামলা দেওয়ার শর্তে তমিজ একটু অন্যরকম করতে চায়। মজুরি দিলে চলতি হারেই দেবে। কিন্তু হুরমতুল্লা ইচ্ছা করলে অন্যভাবেও দিতে পারে। ধান উঠলে মণ্ডলের গোলায় তুলে হুরমতুল্লা বর্গাচাষী হিসেবে যা পাবে তার একটা ভাগ দেবে তমিজকে।––এ কেমন কথা।––তমিজ জোর দিয়ে বলে, ততদিনে তেভাগা হয়া যাচ্ছে। জোতদার পাবি একভাগ, তোমার ভাগ দুইটা। তার দুই আনিও যদি হামাক দাও তো তোমার কতো ধান থাকে হিসাব করিছো?' (পৃ. ৫৯৪)। তমিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নটা অন্যভাবেও ঘুরপাক খায় : 'ফুলজানের ভাগের জমিটা পাবে যে তাকে বিয়ে করবে সে-ই তো? তমিজকে বিয়ে করতে ফুলজানের এখন আর আপত্তি কি থাকতে পারে। তমিজ বরং ফুলজানের জমি আরো কতো বাড়িয়ে দিতে পারে। ফুলজানকে বিয়ে করলে, বেশি না, কেবল তার জমিটুকুও যদি হুরমতুল্লা তাকে দেয় তো তিন বছরের ফসল বেচে তমিজ নিজের বাড়ির পালানটা কিনে ফেলতে পারে শরাফতের কাছ থেকে। তার আগে কালাম মাঝিকে টাকা শোধ করে উদ্ধার করতে হবে তার ঘর ও ভিটা। মোষের দিঘির পুবের জমিটা তো পত্তন নিলো হুরমতুল্লা, পশ্চিমের জমি নেবে তমিজ। জমিদারি তো উঠেই যাচ্ছে, তখন জমিদারদের এই খাস জমি পাবে তো তারাই। তখন জমিতে নামো, লাঙল বাও আর ফসল তোলো। ... এক দাগে ছয় বিঘা জমির মালিক হতে তার তিন বছরও লাগবে না।' (পৃ. ৫৯৬)। এইসব হিসাব-নিকাশে তমিজের সরল কৌম-মন আগ্রাসী ধনবাদী শরাফত-

Dhaka University Institutional Repository

কালামদের কুটিলতাকে অনুধাবন করতে পারেনি। তমিজ যখন পরিশ্রমের ভিতে জীবন গড়ে নেয়ার স্বপ্নে বিভোর, তখন তার চারদিকে দাঙ্গা-ধর্ষণ-হত্যা-লুটপাট-নৃশংসতার মহোৎসব। জীবন বাঁচাতে হিন্দুরা সর্বস্ব ত্যাগ করে ছোটে ভারতের দিকে। আলোচ্য পাঠকৃতিতে নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, জগদীশ সাহা, মুকুন্দ সাহা, সতীশ মোক্তার প্রমুখের দেশত্যাগে বিম্বিত হয়েছে প্রভাবশালী ভদ্রলোকদের দেশত্যাগের হিড়িক। যারা বাস্তু আঁকড়ে থাকার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাদের শিকার হতে হয়েছে হত্যাকাণ্ডের। ফণীবাবুর হত্যাকাণ্ডটি তারই নমুনা। দখল থেকে রক্ষা পায়নি প্রখ্যাত ব্রিটিশ-বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনৈতিক নেতা যতীন রায়ের বাড়িও। এব্যাপারে কাদেরের যুক্তি হলো : 'উপায় কী? এতো এতো রিফিউজি আসছে। তাদের শেলটার দিতে হবে তো।' (পৃ. ৬১৩)। এই পরিস্থিতিতে শরাফত-কালামরা হিন্দুদের জমি ও সম্পদ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্ত; হিন্দুপাড়ায় নৃশংসতা চালিয়ে লুটপাটে লিপ্ত শুক্কুর শেখ। কালামকে টেক্কা দিয়ে শরাফত জগদীশ সাহার একদাগের বারো বিঘা জমি কিনে ফেলে পানির দামে; আর মাত্র হাজারখানেক টাকায় কিনে নেয় মুকুন্দ সাহার দুই বিঘা জমির ওপর বিশাল বাড়ি। ওদিকে আজিজ কিনে ফেলে শহরের কালীতলার কার্তিক ভাদুড়ির বাড়ি। পরিবারের নতুন সম্পত্তি হাতাবার ক্ষেত্রে কাদেরের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আজিজের সঙ্গে কথোপকথনে কাদেরের সম্পদগ্রাসী রূপটি উন্মোচিত :

> 'আজিজ একটু বিব্রত হলেও ... কাদেরের সন্দেহজনক প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলে, 'মুকুন্দ সাহার বাড়ির চাবিটাবি তুই রাখিছিস? দলিল দস্তাবেজ ঠিক রাখিছিস?'
> 'চাবি বাজানের কাছে। দলিলও তার সিন্দুকের মধ্যে। পাহারা মোতায়েন করিছি আমি।' ' (পৃ. ৬১৬)।

কাদেরের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শরাফতের ধূর্তবুদ্ধির সঙ্গে কুলাতে না-পারলেও কালাম মুকুন্দ সাহার দোকান দখল করে বৈকুণ্ঠকে হত্যার মাধ্যমে আর কাৎলাহার বিলের দখল নেয় ইসমাইলের বদান্যতায়। বিলের দখল নিতে গিয়ে আবার নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে সে। ফলশ্রুতিতে স্বসম্প্রদায়ের ওপর কর্তৃত্ব হারায় সে; একইসঙ্গে হারায় কাদেরের সঙ্গে আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রভাববিস্তারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা। নব-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে কাদের হয়ে ওঠে এক ক্ষমতাধর আঞ্চলিক নেতা।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদদের গণবিরোধী চরিত্র বোঝার জন্য কাদেরের রাজনৈতিক নেতা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কাদের প্রত্যন্ত বাংলার কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। কাৎলাহার তীরবর্তী ভূমিহীন কৃষক-সমাজে ভূমির মালিকানাসূত্রে তার পিতা শরাফত মণ্ডল গোত্রীয় নেতৃত্বে আসীন হয়। কৌম-জনগোষ্ঠীর নেতার যৌথকল্যাণ তার নেই; পশ্চিমা আগ্রাসী পুঁজিতন্ত্রের সে পরিপোষক। বিত্তের আধিপত্যে আনুগত্যের শেকলে বন্দি করে সে স্বগোত্রের মানুষকে শোষণের আওতায় নিয়ে আসে। দুই চান্সে আইএ পাস করা ছোট ছেলে কাদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে না-পাঠিয়ে শরাফত তার গ্রামীণ শোষণকাঠামোতে জুঁতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চল্লিশের দশকে বাংলায় মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাওয়া গ্রামীণ জনপদে বইতে শুরু করলে কাদের এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। স্বল্প-শিক্ষা আর পারিবারিক প্রভাব তার আঞ্চলিক নেতা হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট ছিল। ইসমাইল হোসেনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য তাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা জুগিয়েছে। মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে তার প্রাথমিক কাজ ছিল উগ্র বিদ্বেষ ছড়িয়ে গ্রামীণ পর্যায়ে মুসলিম লীগের পক্ষে জনমত তৈরি করা এবং হিন্দু-ঘনিষ্ঠতার সমালোচনা করে কৃষক-প্রজা পার্টিকে দুর্বল করা। তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি নমুনা :

> 'কয়েকটা ছেলেকে কাদের বোঝাচ্ছে, 'তোমরা সবাইকে বলবা, মোসলমানের মধ্যে তো চাষাই বেশি। অবস্থা ভালো আর কয় জনের? মোসলমানের দল চাষার স্বার্থ না দেখলে আর কে দেখবে? বুঝিছো? এটা তো ঠিক কথাই যে, হক সাহেব খুব বড়ো নেতা। মোসলমান একদিন একবাক্যে তাকে ইমাম মানিছে, তার কথায় ওঠাবসা করিছে। কিন্তু তিনি তো গেলেন হিন্দু মহাসভার সাথে। যে হিন্দু মোসলমানের হাতে পানি খায় না, মোসলমান দেখলে ঘিননা করে, দেখো না নায়েববাবু বুড়া বুড়া মুরুব্বি মানুষের সাথে তুই তোকারি করে কথা কয়, সেই হিন্দু জাতের সাথে হাত মেলালে হক সাহেবকে নেতা মানি কীভাবে? ভালো করে বুঝায়া কবা, বুঝিছো?' (পৃ. ৪৭০)।

Dhaka University Institutional Repository

'ইমান' ও 'ইজ্জত' কৌম জনগোষ্ঠীর চালিকাশক্তি। ইমানের জোরে তারা ঐক্যবদ্ধ হয় ও নেতার আনুগত্য করে, ইজ্জতের প্রেরণায় ভয়ংকর বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাদের মুসলিম কৃষক-সমাজের ইজ্জতের ধারণাকে খুঁচিয়েই সমাজে হিন্দু-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। দরিদ্র কৃষকদের কাছে তখন ইজ্জতের চেয়ে প্রাণ-রক্ষার দায়টাই ছিল মুখ্য। কাদের কৌমজনগোষ্ঠীর চেতনাস্তরে প্রোথিত 'ইমান'-এর ধারণাকে ব্যবহার করেছে জুতসইভাবে। তাদের কাছে 'ইমান'-এর মৌলিক প্রেরণা 'ইনসাফ' বা ন্যায়বোধ। প্রান্তিক কৃষক-সমাজকে মুসলিম লীগে প্রলুব্ধ করতে কাদের ইনসাফের কথা বলে :

> 'আরে গরিবের জন্যেই তো পাকিস্তান দাবি করা হচ্ছে, ... পাকিস্তানে ধনীরা জাকাত ফান্ডে টাকা না দিলে পুলিশ ঐ ধনী লোককে এ্যারেস্ট করবে। আইন পাশ হবে। গরিব না খেয়ে থাকবে না, জাকাতের টাকায় হক থাকবে গরিবের। ... পাকিস্তান হলে চাষার হক আদায় করার আইন পাস হবে। জমিদারি প্রথা উঠায়া দেওয়া হবে। তাহলে জমির মালিক হবে কে? ... পাকিস্তান হোক, চাষার হিস্যা ষোলো আনাই পাওয়া যাবি। এখন গোলমাল করলে সবারই লোকসান।' (পৃ. ৪৭০-৭১)।

তার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা থাকলেও আধিয়ারদের তেভাগা আন্দোলনের বিষয়ে তার বক্তব্য কূটাভাসপূর্ণ। তেভাগা আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা না-করলেও কাদেররা একে পাকিস্তান-আন্দোলনবিরোধী অন্তর্ঘাতমূলক 'গোলমাল' বলে প্রচার করে এবং তেভাগা আন্দোলনের ভাগ্যকে ভবিষ্যৎ-রাষ্ট্র পাকিস্তানের 'ন্যায়' আর 'ইনসাফে'র হাতে সমর্পণ করে। এই প্রচার-কৌশলের উদ্দেশ্য ছিল তেভাগা আন্দোলনকে বাগে এনে পাকিস্তান-আন্দোলনের অনুকূলে ব্যবহার করা এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় চিরতরে নির্মূল করা। কাদেরদের তুমুল প্রচারে ন্যায়-রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই হয়ে ওঠে আধিয়ার কৃষকদের আন্দোলনের বর্শামুখ। তেভাগার লালঝাণ্ডা ছেড়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয় মুসলিম লীগের পতাকাতলে। এ অবস্থায় জোতদারের পরিবর্তে জমিদার থেকে নিম্নতল পর্যন্ত পুরো হিন্দু জনগোষ্ঠীই হয় তাদের শত্রুপক্ষ। নিম্নকোটির মানুষের উন্মাদনায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গা বাংলার জনজীবনের গহিনে পৌঁছে যায়। কাৎলাহার পাড়ে সংঘটিত কয়েকটি হত্যাকাণ্ড তারই প্রমাণবহ। কাদেরের সাম্প্রদায়িক বিভাজনমুখ্য রাজনৈতিক ভাবনায় জনমানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছিল উপেক্ষিত। এক্ষেত্রে স্বল্পশিক্ষিত কাদেরের চিন্তার সীমাবদ্ধতা যেমন ছিল, তেমনি এ ধরনের চিন্তার দায়ও তার ছিল না। তার ভাবনায় ছিল যেনতেন প্রকারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, যেখানে জমিদারদের হটিয়ে দিয়ে তাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া; ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে থেকে নিজেদের সম্পদ ও প্রভাব বৃদ্ধি করা; সর্বোপরি অভিজাতশ্রেণিতে উত্তরণ। পাকিস্তান-পর্বে কাদেরকে আমরা আবির্ভূত হতে দেখি শ্রেণিস্বার্থের-প্রতিভূ হিসেবে, তার আকাঙ্ক্ষাসমেত। লুটপাটের সম্পদে সে বাড়িয়ে তোলে পারিবারিক বিত্ত-বৈভব; ক্ষমতার পক্ষপুটে লুটপাট আর শোষণে হয়ে ওঠে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিমান। মিয়া বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করে প্রতাপ ও আভিজাত্য বাড়িয়ে নেয়ার স্বপ্নে সে বিভোর। সার্বিক বিবেচনায় ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রায়ণে জন্ম ও বিকশিত হওয়া বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক চমৎকার বিজ্ঞাপন আবদুল কাদের।

কাদেরদের সুবচনের পৌনঃপুনিক প্রচারে প্রভাবিত হয় বিশ্বাসপ্রবণ ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষেরা। তার অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতিজালে আটকা পড়ে তেভাগা-চেতন তমিজও; হয়ে ওঠে কাদেরের সাগরেদ। এক্ষেত্রে কাদেরের দরিদ্র-দরদি মুখোশ তাকে বিভ্রান্ত করেছে। বাপকে সুপারিশ করে সে তমিজের জন্য বর্গাজমির বন্দোবস্ত করে। কাদেরের বদান্যতায় তমিজের ক্ষেতমজুর থেকে বর্গাচাষিতে উত্তরণ ঘটে। এজন্য তমিজ কাদেরের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আর এটি ছিল তমিজের মতো শক্তিশালী এক বিদ্রোহীসত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল : 'তমিজটা এখন তার বশেই থাকবে। ... একে দিয়েই মাঝিপাড়াটা কাদের নিজের দিকে টানতে পারবে। ... এই রকম কর্মী এই এলাকায় আর পাওয়া যাবে না।' (পৃ. ৩৭৭)। ফসল-ভাগের দিনে কাদেরের অনুপস্থিতি ছিল নিজের কৃষক-হিতৈষী ইমেজ ঠিক রেখে কৃষকদের ওপর শোষণটাকে জিইয়ে রাখারই কৌশল। এই চতুর কৌশল বুঝতে পারেনি বলেই ক্ষুব্ধ হলেও তমিজ কাদেরের ওপর আস্থা হারায়নি। কাৎলাহার বিলের দখলটাকে সুরক্ষিত রাখতে কাদেরের প্রতি তমিজের কৃতজ্ঞতাবোধ দীর্ঘসময় ধরে কাজে দিয়েছে। শরাফত

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক পিতার অপমানের প্রতিশোধ হিসেবে কাৎলাহার বিলের মাছ-ধরাকে কেন্দ্র করে কাদেরের প্রতি তমিজের কৃতজ্ঞতার বন্ধন ছিন্ন হয়। প্রতিনিয়ত ইনসাফের কথা বললেও কাৎলাহার বিলে মাঝিদের অধিকার-হরণকে কাদের অন্যায় মনে করেনি; বরং কাৎলাহার বিলে তমিজের উপস্থিতিতে সে বিস্মিত হয়। অকৃতজ্ঞতার দায়ে ডাকাতি ও খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে তমিজকে জেলে পাঠায়। এই অপকর্মেও নিজের জনদরদি ইমেজ ঠিক রাখতে কাদের এর দায়ভার চাপায় নায়েববাবুর কাঁধে। কালাম মাঝির সঙ্গে বিবাদে তমিজ যখন হত্যাকাণ্ডের ফেরারি আসামি, তখন এই চরম দুঃসময়ে ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয় কাদেরই। অবশ্য এক্ষেত্রে কাদেরের দুটি উদ্দেশ্য ছিল––এক. মাঝি-সম্প্রদায়ের সমর্থন নিজের অনুকূলে নিয়ে আঞ্চলিক নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থেকে কালাম মাঝিকে ছেঁটে ফেলা এবং দুই. তমিজকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়া; কারণ জেল-খাটা তমিজের রাজনৈতিক সচেতনতা, তার দৃঢ়চেতা মনোভাব, তার আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী স্বপ্ন ও সংগ্রামশীলতা, সর্বোপরি মাঝি-সম্প্রদায়ের ওপর তার প্রভাবের কারণে তমিজ নিজেই ছিল কাদেরের জন্য এক মূর্তিমান আতঙ্ক। কালাম মাঝি কাৎলাহার বিলে মাঝিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে প্রতারণার আশ্রয়ে নিজেই বিলটি করায়ত্ত করে। ফলত, কালাম মাঝির সঙ্গে সংঘাত বাধে মাঝি সম্প্রদায়ের; এতে তমিজ নিজে আহত হয় এবং তার হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয় যমুনা পাড়ের এক মাঝি। কাৎলাহার বিলের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের খাতায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয় এক ভয়ংকর অপরাধী হিসেবে। পুলিশের জুলুম থেকে বাঁচতে তাকে আশ্রয় নিতে হয় ইসমাইলের বাড়িতে। স্বাধীন দেশেও তাকে যাপন করতে হয় পলাতকের জীবন; বিচ্ছিন্ন হতে হয় নিজের পারিবারিক জীবন থেকে; উন্মূলিত হতে হয় তার শেকড় থেকে; কিন্তু সত্তায় মূলীভূত ভূমিকর্ষণকেন্দ্রিক স্বপ্নটিতে তমিজ ছিল অটল। স্বপ্ন-মগ্ন তমিজ গভীর আশায় প্রহর গোণে জমিতে কৃষকের অধিকার ও তেভাগা বিষয়ে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের। তমিজ তেভাগা প্রসঙ্গ উঠালে কাদের গম্ভীর হয়ে যায় এবং উত্তরে বলে, 'উগলান কথা এখন রাখ। আমাদের নতুন রাষ্ট্র, ইন্ডিয়ার দালালরা মানুষকে ক্ষেপাতে চায়, মানুষ গোলমাল করলে ইন্ডিয়া সুযোগ নিয়া নয়া দেশটাকে খপ কর‍্যা খায়া ফালাবি।' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৬০২)। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অজুহাতে আইনি কাঠামোর মধ্যেই চলে তেভাগা আন্দোলন দমনের নৃশংসতা। তমিজের সঙ্গে কথোপকথনে কাদেরের মুখে ধ্বনিত হয় পুলিশি তৎপরতায় তেভাগা আন্দোলন দমনের তৃপ্তি-স্বস্তি :

> 'তমিজটা একেবারে নাছোড়বান্দা, ' আপনেরা না কছিলেন জমির উপরে বর্গাদারের হক কায়েম করার আইন জারি হবি?'
>
> আবদুল কাদের রাগ করলেও হেসে ফেলে, 'তোর বাপু এতো কথাও মনে থাকে? তোক এম এল এ করা লাগে। ... দুই বছর আগে এ্যাসেম্বলিতে জমিারি উচ্ছেদের বিল উঠলে বর্গাদারদের সম্বন্ধে ঐ ধরণের একটা কথা ছিলো। ঐ বিল তো আনার উঠিছে, এই তো কয়দিন আগেই উঠলো। এবার বর্গাদারের কথা বাদ দিছে।'
>
> 'বাদ দিছে?' তমিজের হাত থেকে মিহি করে সার মেশানো মাটি পড়ে যায় ঘাসের ওপর। এক আইন আবার দুইবার দুই রকম হয় কী করে? হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না,––ভদ্দরলোকদের এই বচন কি ভদ্দরলোকরাই খারিজ করে দিচ্ছে?
>
> ...
>
> সে জানতে চায়, 'তেভাগা হলেও কাম হয়। তেভাগা তো হচ্ছেই, না?'
>
> ... কাদের তমিজের একটি ব্যাপারেই লেগে থাকা নিয়ে হাসে, 'তোর খালি এক কথা। উগলান তো সব শ্যাষ হয়া গেছে বাপু। নাচোলের দিকে এখনো মাথা গরম কিছু চ্যাংড়া––।' ' (পৃ. ৬৪৭)।

প্রতিশ্রুতি-খেলাপি ভদ্রলোকদের প্রতি তার কৌম-ইমান বিধ্বস্ত হয়; স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ তার চেতনাকে অবশ করে দেয়। এদিকে ইসমাইল তাকে আশ্রয় দেয়, কিন্তু অপরাধীর তালিকা থেকে মুক্তি দেয় না। নতুন রাষ্ট্রে শাসকরাই সর্বেসর্বা, আইনের গতি তাদের মর্জির অধীন। আইন কেবল শাসকদেরই সুরক্ষিত করে না, শাসকদের ইচ্ছায় অপরাধীও থাকে সুরক্ষিত। প্রান্তিক মানুষেরা এখানে ক্ষমতাধরদের করুণার পাত্র; দান-দক্ষিণা এখানে মহত্ত্ব হিসেবে বন্দিত। নিজবাড়িতে তমিজকে আশ্রয়দান আপাতদৃষ্টিতে ইসমাইলের একজন অনুগত অপরাধীর প্রতি প্রদর্শিত মহত্ত্ব হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ও অধিকার-সচেতন এক প্রবল শক্তিকে নজর-বন্দি করার ফাঁদ। কর্মে সততা ও একাগ্রতার মধ্য দিয়ে তমিজ পরিণত হয় ইসমাইলের

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ির 'বিশ্বাসী চাকর' রূপে। (দ্র. পৃ. ৬৬১)। পুরস্কারস্বরূপ তাকে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা হয়। ইসমাইল-পত্নী রিজিয়া বেগম তাকে 'পুরনো টুইলের শার্ট, প্রায় নতুন একটা লুঙি... একটুখানি ছেঁড়া ছাইরঙের শেরোয়ানি' (পৃ. ৬৬১) দিয়ে শোভন নাগরিক রূপে সাজানোর ব্যবস্থা করে। এমনকি 'বৌ ও বাচ্চার জন্যে যথাক্রমে শাড়ি, ব্লাউজ ও ফ্রক কিনে দিয়েছে।' (পৃ. ৬৬১)। আনুগত্য ও দাসত্বের বিনিময়ে শুধু আত্মরক্ষা নয়, এটা ছিল ক্ষমতার ছত্রছায়ায় অবস্থান করে অনৈতিক পন্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠার একটি সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু মিথ্যা অপরাধের দায় মাথায় নিয়ে পলায়ন, পরাশ্রয় ও পরমুখাপেক্ষিতা তার কাঙ্ক্ষিত নয়; তার প্রত্ন-বীরত্বে মিশে আছে স্বয়ম্ভরতার চেতনা; নিজের ভাগ্য সে গড়ে নিতে চায় আপন হাতে। আর এই আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে তমিজ উপলব্ধি করে, আশ্রয়দাতা ইসমাইল-কাদেররাই তার প্রকৃত শত্রু।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের হাত থেকে মুক্ত হলেও ঔপনিবেশিকতা থেকে প্রান্তিক মানুষদের মুক্তি মেলেনি। নতুন রাষ্ট্রে জমিদারি প্রথা রহিত হয়েছে, তবে জোতদার রয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামোতে জোতদারদের অবস্থান ছিলো জমিদার-মহাজনদের একস্তর নিচে; কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক স্তরের ক্ষমতায় তারাই শীর্ষকর্তা। নিজের মুঠোবন্দি ক্ষমতার বলে আগের চেয়ে তাদের শোষণ-ক্ষমতা অনেক বেশি সুসংহত। তাদের স্বার্থের অনুকূলে কৃষকদের ওপর শোষণ-চালানোর যাবতীয় ঔপনিবেশিক কলাকৌশল ও আইনি কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে। এভাবে উপনিবেশবাদ এদেশের মানুষকে এক পরিত্রাণহীন দিগন্তের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ-অবস্থায় সমাজবদলের জন্য প্রয়োজন সমাজের ভেতরের মানুষের কর্মোদ্যোগ এবং অনিষ্টকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আত্মশক্তির সমাবেশ। এর জন্য ব্যক্তির ভেতরের শক্তির জাগরণ দরকার। সমাজ যদি হয় সক্রিয় প্রতিনিধিত্বকারী এবং ব্যক্তি যদি সক্রিয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে সমাজের, তাহলে পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ায় সমাজে দায়বদ্ধতা ও সংহতির সংস্কৃতি তৈরি হয়; ব্যক্তির কর্মোদ্যমে সমাজ এগিয়ে যায়। *খোয়াবনামা*-য় তমিজ আবিষ্কৃত হয় সামষ্টিকতার বৃহৎ পরিসরে; নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে ব্যক্তির মহিমান্বিত উত্থানে। যাপিত জীবনের রুদ্র-কঠিন অভিজ্ঞতা পেরিয়ে তমিজ উপনীত হয় এক নতুন রাজনৈতিক বোধে। এই বোধের শেকড় প্রোথিত শাশ্বত কৌমজীবনের সামষ্টিক কল্যাণবোধে; কিন্তু এর স্বপ্নাচ্ছন্ন অলৌকিকতাকে সে পরিহার করে। কারণ এই নিশ্চেতনার সুযোগেই ঔপনিবেশিক শক্তি অনায়াসে ঢুকে পড়েছে কৌম-সমাজে। শোষকের কব্জা থেকে নিজের সম্পদ ও অধিকারকে তারা সুরক্ষিত করতে পারেনি। অন্যদিকে ইসমাইলদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি শেষপর্যন্ত ধনতান্ত্রিক; ধনতান্ত্রিক শোষণে ব্যক্তির ফুলেফেঁপে ওঠার অবারিত সুযোগে সামষ্টিক মানুষ চরম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়। শোষকের পক্ষপুটে নিম্নকোটির মানুষের সম্মান ও মুক্তি নেই, মানুষের মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠা ঘটে তার সংগ্রামশীল আত্মনির্ভরতায়। ধনতন্ত্র শোষণের একটি সিস্টেম, যা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রছায়ায়। এর বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াইটাও হতে হবে সামষ্টিক ও আদর্শিক। আদর্শ তার কৌমসমাজের গভীরে নিহিত শোষণ-বঞ্চনামুক্ত পারস্পরিক সহমর্মিতার স্বয়ংসম্পূর্ণ যৌথজীবনচেতনায়। প্রবল ক্ষমতাধর ইসমাইলের সুরক্ষিত খাঁচায় ধরা না-দিয়ে তমিজ ছোটে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তেভাগার দিকে, আপন ভূমির খোঁজে। তার ঢাকামুখী যাত্রা হঠাৎ দিক বদল করে হয় সান্তাহারমুখী : 'শান্তাহারের গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা বাজলো। তমিজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে দরজার মানুষদের ঠেলেঠুলে নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। পাশের লাইনে দাঁড়ানো শান্তাহারের গাড়ির একটা থার্ড ক্লাস কামরার খোঁজে সে দৌড় দেয়। গার্ড সাহেবের লম্বা হুইসিলে গাড়ির ইঞ্জিনের বড়ো চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করেছে। তমিজ উঠে পড়লো শান্তাহারের গাড়ির একটা কামরায়। এই গাড়িতে ভিড় কম। বেঞ্চিতে জায়গা থাকলেও উদাম গায়ে গামছা-ঘাড়ে মানুষ অনেকেই বসে রয়েছে মেঝেতে। নিজেদের বাঁক আর ঝুড়ি আর কোদাল তারা ঠেলে রেখেছে বেঞ্চের তলায়। তমিজের সাফসুতরো জামা আর পরিষ্কার লুঙি আর পায়ে রবারের স্যান্ডেল দেখে অনেকে একটু সরে সরে বসে। বেঞ্চে বসতে তার চটের ব্যাগটার কথা মনে হলে তমিজ চমকে ওঠে। কিন্তু গাড়ি তখন গতি নিয়ে ফেলেছে। এতোগুলো জামাকাপড়! কাপড়চোপড়ের ভাঁজে ছিলো! পাঁচটা টাকা! এখনতো আর ফেরার জো নাই! ফিরে কাজ নাই!' (পৃ. ৬৬৩)। ইসমাইলের সুবাদে রচিত ব্যবধান ও প্রলোভন ঘুচিয়ে তমিজ মিশে যায় প্রান্তবাসী কৃষকদের সঙ্গে। ঢাকাগামী

Dhaka University Institutional Repository

গাড়ির প্রচণ্ড ভিড়ের বিপরীতে সান্তাহারমুখী গাড়ির ভিড় কম––এই বৈপরীত্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্ববাংলা ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের দিকটির প্রতীকী প্রতিফলন ঘটেছে। রাজধানীমুখী এই জনস্রোত স্বভূমে আত্মপ্রতিষ্ঠার শেকড় না-পাওয়া ভূমিহীন অসহায় প্রান্তিক মানুষদের স্বপ্ন-ছোঁয়ার যাত্রা। অথচ গ্রামই বাংলার প্রাণকেন্দ্র; গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেই পূর্ববাংলার মানষের ভাগ্য জড়িত। একটি স্বাধীন দেশের উন্নয়ন-কৌশল নির্ধারিত হতে হয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের কর্মদক্ষতাকে বিবেচনায় নিয়ে। পুঁজিবাদী কায়দায় শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নে নয়, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্যেই পূর্ববাংলার প্রান্তিক মানুষদের সার্বিক মুক্তি নিহিত। এক্ষেত্রে গ্রামের মানুষকে গ্রামে রেখে তাদের উৎপাদন-দক্ষতার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং শ্রমলব্ধ সম্পদে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজনীতিবিদদের হীন-রাজনৈতিক অভীপ্সা ও অদূরদর্শিতার কারণে কার্যকর উন্নয়ন-কৌশল গৃহীত না-হওয়ায় গ্রামের হত-দরিদ্র, অসহায়, বিভ্রান্ত মানুষেরা শহরের নিরুদ্দিষ্ট গন্তব্যে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু তমিজের স্বপ্ন ছিল পরিষ্কার, শত্রুও চেনা এবং স্বপ্নদূর জীবনটাকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য লড়াইটা চালিয়ে যাওয়া। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানের দিকেই সে ছুটে চলে : 'ঠাকুরগাঁ না নাটোর না নাচোল না-কি হিলির দিকেই চাষাদের মার দিলেও তাদের জোট এখনো ভাঙেনি। আর কোথাও না হোক ওদিকটায় তেভাগা হবেই।' (পৃ. ৬৭৮)। তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে তমিজ তার পরিবারের কাছে নিখোঁজ হয়, অথবা পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যুও হতে পারে। পরিণতি যা-ই হোক তমিজ আত্মপ্রতিষ্ঠার এক প্রত্যয়ী স্বাপ্নিক মানুষ, স্বপ্নঘাতক ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে এক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। তার শোষণ-মুক্ত যৌথকল্যাণের কৌম-স্বপ্নটা চিরঞ্জীব, তার বার্তা মেলে তমিজের মেয়ে সখিনার চাঁদের হেঁসেলে ভাত রান্নার স্বপ্নের মধ্যে। বলাবাহুল্য, উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর কাছে পুরো ঔপনিবেশিক কালই ছিল এক ভয়ানক খোয়াব, দুঃস্বপ্ন তাড়িত আচ্ছন্নদশা; উত্তর-ঔপনিবেশিককালেও সেই ভয়ানক খোয়াব থেকে প্রান্তিক মানুষদের মুক্তি মেলেনি। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের মূল্যবোধলালিত স্থানীয় অভিজাতগোষ্ঠী প্রান্তিক মানুষদেরকে মূর্খ, অনাধুনিক, বর্বর খেতাবে কলঙ্কিত করে তাদেরকে সভ্যতা থেকে খারিজ করে দিয়ে তাদের প্রতি পশুর মতো নির্মমতা চালানোর বৈধতা খুঁজেছে; খেটে-খাওয়া মানুষদেরকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভেঙেচুরে দিয়ে চিরতরে অধীন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু আধুনিকতা ও সভ্যতার মুখোশে আবৃত পশ্চিমা শোষণ-নৃশংসতার নোংরামির বিপরীতে বাংলার প্রান্তিক মানুষেরা মানবিকতায়, নৈতিকতায়, মূল্যবোধে অনেক বেশি মহিমান্বিত, তার অনন্য দৃষ্টান্ত তমিজ। ইসমাইল-কাদেরদের স্বার্থপরতা, প্রতারণা, পরাশ্রয়িতা ও আগ্রাসী শোষণবৃত্তির বিপরীতে শান্তিপ্রিয়তায়, পরার্থপরতায়, সমষ্টির কল্যাণে আত্মবিবেদনে ও নিজস্ব উৎপাদন-সামর্থ্যে আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রত্যয়ে তমিজ এক শুদ্ধসত্ত্ব কৌম-বীর। তমিজ এখানে পশ্চিমা-শ্রেষ্ঠত্বের মিথের বিরুদ্ধে প্রাচ্য জীবনবোধের এক গর্বমিশ্রিত স্পর্ধিত আত্মপ্রকাশ।

পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য এই, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিপুল আত্মত্যাগের কেন্দ্রে ছিল শোষণ-বঞ্চনাহীন একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র পাওয়ার স্বপ্ন। স্বাধীনতা অর্জনের পর এদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী তাদের স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বত্রিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। কিন্তু দায়িত্ব পালনে মধ্যবিত্তশ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কেবল উদাসীনই ছিল না, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ভূমিকা ছিল বিশ্বাসঘাতকের। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বৃহদংশ লিপ্ত হয় ক্ষমতাকেন্দ্রিক অন্তর্কলহ ও দুর্বৃত্তায়নে; সামরিক-বেসামরিক আমলারা নিয়োজিত হয় ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং নবোদ্ভূত বাঙালি পুঁজিপতিশ্রেণি মেতে ওঠে মুনাফামত্ত কর্মকাণ্ডে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের ভূমিকা দাঁড়ায় পুরনো ঔপনিবেশিকের; শোষণ-শাসনের যে-কাজটি ঔপনিবেশিক শাসকেরা করেছে দেশ-দখলের মাধ্যমে, ক্ষমতাকাঠামোয় অবস্থান নিয়ে সেই কাজটিতেই অবতীর্ণ হয় দেশীয় শাসক-আমলারা। ব্যাপক দুর্নীতি-লুণ্ঠনে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা তৈরি হয়। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় মূহ্যমান হয় সাধারণ জনগণ ও সদর্থ মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী; ক্ষুব্ধ হয় ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে থাকা স্বার্থান্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণিও। চরম বিশৃঙ্খলার পটে এই সংকট থেকে উত্তরণের কার্যকর কোনো উদ্যোগ না-

Dhaka University Institutional Repository

থাকায় সাধারণ মানুষের হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পুনরুজ্জীবিত হয়। এই বিশৃঙ্খল পরিবেশে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে নিহত হন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রত্যাখ্যাত পুরনো সেনাশাসন; আর সেনা-স্বৈরতন্ত্রের পক্ষপুটে পূর্ণপ্রতাপে জেঁকে বসে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র। রহিত হয় গণমানুষের বাক্‌স্বাধীনতা, সক্রিয় হয় দমন-পীড়নমূলক ঔপনিবেশিক আইনসমূহ। অর্থাৎ যে-লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে বাংলার গণমানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যগুলো থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে। দুঃস্বপ্ন ও যন্ত্রণার জটিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয় আপামর গণমানুষ; বিক্ষুব্ধ জনতার প্রবল আন্দোলনে সেনাশাসনের অবসান ঘটলেও মধ্যবিত্তমানসে ঔপনিবেশিকতার জোরদার উপস্থিতির কারণে স্বৈরতান্ত্রিকতা ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে গণমানুষের মুক্তি মেলে না। মুক্তিযুদ্ধোত্তর এই হতাশা ও পরাজয়ক্লিষ্টতা ১৯৭১-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়পর্বের বাংলাদেশের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপজীব্য। এই অবরুদ্ধ স্তব্ধবাক্ পরিবেশে আমাদের আলোচিত কিছু উপন্যাসের পট অনেকক্ষেত্রে সমকাল থেকে সরে গিয়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে শরণার্থী হয়েছে। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসসমূহে বিচ্ছুরিত হয়েছে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষের আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিকণা; যার মধ্যে সংগুপ্ত থাকে গণমানুষের লুণ্ঠিত স্বপ্ন উদ্ধারের অনিঃশেষ শক্তি ও প্রেরণা। ক্ষমতাকেন্দ্র দূরবর্তী প্রান্তিক মানুষের আত্ম-অন্বেষা এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভেদী লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখা উত্তর-উপনিবেশবাদের জরুরি প্রত্যয়; এই প্রত্যয়ের শানিত প্রকাশ ঘটেছে আমাদের আলোচিত উপন্যাসসমূহে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মাহমুদুল হক : *জীবন আমার বোন* , ২০১২, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

২. অজয় ভট্টাচার্য : *অরণ্যানী*, ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা।

৩. শওকত আলী : *দক্ষিণায়ণের দিন* (ত্রয়ী উপন্যাস), ২০১৬, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র*, ২০১২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৫. "Masturbation-কে আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই দেখি। কারণ এর ভেতর আমি society--কেই দেখতে পাই। যে লোকটা masturbate করছে সে এক চূড়ান্ত lonely man এবং unhealthy man এবং he is the product of an unhealthy society… sick society-তে লোক masturbate করে। তবে এটা শুধু free sex-এর ব্যাপার না। বহু married লোকেরাও regular masturbate করে। মানে, যে ঐ কাজটা তার কোন partner নেই, বা যে-partner আছে তার সাথে কোনো improvement নেই। তার in his deep inside নিঃসঙ্গতা আছে; সে সব অর্থেই একজন partnerless man। একটা sick society-এর মানুষের এ অবস্থা হয়। ... আমার তো মনে হয়––কিছু মনে কোরো না––গোরভাচভও এখন masturbate করে; কারণ এখন সে একটা sick society তৈরি করার হোতা। (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ২০০৫, জীবনের জঙ্গমতা : লেখকের উপনিবেশ, কলকাতা, সময় : ৫০-৫২)।

৬. কায়েস আহমেদ : *নির্বাসিত একজন* , কায়েস আহমেদ সমগ্র, ২০১৪, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৭. সেলিনা হোসেন : *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬), উপন্যাস ত্রয়ী, ২০১৯, ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.।

৮. '... জেলেপাড়ার ঘরবাড়ি, নারকেল সারি, মরিচের খেত, শুকোতে দেয়া জাল ... এইসব দৃশ্য বড় বেশি আপন, একান্ত নিজস্ব। এইসবের ভেতরেই ওর সুখ-দুখের বিস্তার, ভালবাসা বেদনার

Dhaka University Institutional Repository

ঘরগেরস্তি। ভিন্ন ভিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে মালার মতো গেঁথে আছে, যেমন সেন্টমার্টিনের কালো পাথরের চাঁই।' (সেলিনা, ২০২০ : ৪৮৭)।

৯. 'সাফিয়ার উপর ও জোর করেনি ভালোবাসার ধরে ওর ঘৃণা ও ঘৃণা নিয়ে পরাজিত মানুষ হতে রাজি ওর নিজস্ব ধারনা আছে ও বিশ্বাস করে যৌন চেতনায় শৃঙ্খলা বোধ না থাকলে সে জীবন যাপন ইতর জীবন যাপনের পর্যায়ে নেমে যায়। ইতর জীবনের পৌরুষে ওর আকাঙ্ক্ষা নেই বরং এই পরাজয় সহনীয় গ্লানি মুক্ত এবং নির্মল অন্তত মানুষ হিসেবে তো খাটো হয়ে যায়নি যারা মানুষ হিসেবে খাটো হয়ে যায় তারা এই সমাজের সবচেয়ে অসামাজিক জীব বেশিরভাগ লোকই এটা বুঝতে পারে না বলে এত গলদ।' (সেলিনা, ২০২০ : ৪৬৮-৬৯)।

১০. 'সমিতির মধ্য দিয়ে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে হবে যা বর্ম হয়ে ওদের রক্ষা করবে কারো খেয়াল খুশির কাঠগড়ায় আরেকজনকে আত্মহত্যা করতে হবে না নামের শাহপরীর দ্বীপ নামের নরক তাকে ফুলের স্বর্গ বানানোর স্বপ্ন দেখে।' (সেলিনা, ২০২০ : ৪৫২)।

১১. 'প্রথমে সবাইকে একসাথে আনতে হবে। জড়ো করতে না পারলে তো কঠিন বাঁধন দৃঢ় হবে না। ওর সমিতি নিয়ে ও মানুষের ঘরে ঘরে যাবে বোঝাবে মাটির কদর মানুষের কদর। ... আশেপাশের মানুষের হৃদয়কে বরকত করে এগোতে হচ্ছে হৃদয় কেটে ওর পথ করে এগোতে হচ্ছে।' (সেলিনা, ২০২০ : ৪৫৫)।

১২. 'খন্দকারকে সভাপতি করে মালেক সমিতি বানিয়ে ফেলে। সব জেলের নৌকা হবে জাল হবে মূল স্লোগান এটা। লোকজনের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। নিজের ঘরের সঙ্গের বাড়তি জায়গাটুকুতে চাল ওঠে। একটা ঘর বানিয়েছে সবাই এখানে বসে আলাপ আলোচনা হয় কিভাবে এগোবে তার পরিকল্পনা চলে।' (সেলিনা, ২০২০ : ৪৬২)।

১৩. হুমায়ূন আহমদ : ১৯৭১, ২০১৯, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৪. শহীদুল জহির : *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮) শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস, ২০০৭, ঢাকা, সমাবেশ।

১৫. সেলিনা হোসেন : কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯), ২০১৩, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।ছ।

১৬. মঞ্জু সরকার : *প্রতিমা উপাখ্যান*, ১৯৯০, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

১৭. ' 'ধর্ম' ও 'ধর্মভাব' দুটো ধারণার মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ [আছে]। ধর্ম শব্দের নানা অর্থ আছে, প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন এবং সুসংগঠিত দর্শন ধর্মের অন্তর্গত। ... ধর্মভাব সুসংহত নাও হতে পারে, কোনরকম প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনে আবদ্ধ নাও থাকতে পারে। ধর্মভাব চৈতন্যের এক বিশেষ স্তর। কিন্তু প্রাক্-ধনতান্ত্রিক বা আধা-ধনতান্ত্রিক এই চৈতন্যের মধ্যেই মানুষ তার পরিদৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতাকে বোঝবার সূত্র খুঁজে বার করে আবার সময় সময় তার নিজের ও চারপাশের সমাজের নানা কর্তব্য বা ইতিকর্তব্যকে ধরবার চেষ্টা করে। ... পাপ/পূণ্য, ন্যায়/অন্যায় বোধ ধর্মবোধের মধ্যে নিহিত আছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে বা তাকে উপেক্ষা করে নানা নতুন পন্থেও সাধনা ভারতীয় ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু সেই ব্রাত্য সাধনার পথে, দর্শনে, তাদের সাধারণ ভক্তদের ধারণায় অথবা লৌকিক সংস্কৃতির নানা আচরণে যে চৈতন্যের, যে দর্শনের আভাস পাওয়া যায় তাকে যে সবসময় কোন অসঙ্গ, বসুবন্ধু বা নাগার্জুন অথবা শঙ্করাচার্য বা শাহ ওয়ালিউল্লাহ কোন সংহত সূত্রে নিবদ্ধ করবেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হয়তো বা সেটাই হলো ধর্মভাবের শক্তি। রূপান্তরের অনন্ত সম্ভাবনা, চৈতন্যের খোলামেলা রূপ, অনিশ্চয়তা, কোন লৌহকঠিন কাঠামোর মধ্যে যাবার বিরুদ্ধে অন্তর্লীন অনীহা ধর্মভাবকে এমন এক শক্তি দেয় যে তার মধ্যেই বারবার নিম্নকোটি খুঁজে পায় তার প্রতিবাদের ভাষা, উচ্চকোটির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে তুচ্ছ করার তাগিদ।' (গৌতম, ২০১৮ : ৯-১০)।

১৮. 'আকালের সময় কামারদের জমিজমার অর্ধেকটা চলে যাচ্ছিলো জগদীশ সাহার দখলে, কামারদের ডেকে শরাফত টাকা দিলে সেই টাকা তারা জগদীশকে দিয়ে জমিগুলোকে ক্রোক হওয়া থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচায়। তবে সেগুলোর মালিক হয় শরাফত নিজেই। ওইসব কামার টাউনের দিকে চলে গেলে তাদের ভিটায় হাল দিতে যায় মণ্ডলের কামলারা... । তার পয়মন্ত সংসারে ছেলেমেয়ে, বৌঝি, গোরুবাছুর, হাঁস-মুরগি, জমিজমা, কামলাপাট দিনদিন বেড়েই চলেছে।' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৩৮)।

১৯. 'বুড়ার পাট হয়েছে ভারি সুন্দর। অতি চমৎকার। একটু দেরিতেই কাটলো, কিন্তু পাট নষ্ট হয়নি। গাছ একেকটা পুরুষ্টু কী! পাকা ছাল ফুঁড়ে আঁশের সোনালি আভা উঁকি দিচ্ছে এখন থেকেই। তমিজের মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে হুরমতুল্লা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'পাট তো আল্লা ভালই হছে। লাভ কী? সোগলি বুঝি মণ্ডলের বাড়িতই তোলা লাগে গো। পাঁচ বছর তার জমি বর্গা করি, খন্দ উঠলে হামার ঘরত যা তুলি তা কামলা দিলেও মনে হয় ততোকোনাই তুলতাম। কখন ধান করজ করি, কিবা কিবা হিসাব কয়, ফসল হামি কিছুই পাই না।' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৮০)।

২০. ' [মোষের দিঘি পত্তন] পেলে দিঘির চারপাশ মিলে এক দাগে বিঘা বিশেক জমি শরাফতের দখলে আসে। জোত এরকম এক দাগে হলে হিসাব রাখতে সুবিধা, জমিতে গিয়ে চোখও জুড়ায়। ওদিকে দক্ষিণে অর্জুনগাছের একটু ওপাশে কামারপাড়ার অনেকটাই শরাফত কিনে ফেলেছে। কেবল দশরথ আর নারদ আর ওদিকে গৌরাঙ্গ আট বিঘা জমি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। ওরা উঠে গেলেই ওখানে এক দাগে সতেরো বিঘা জমি হয়। আহা! তাহলে নিজের বাপের গ্রামের অর্ধেকের বেশির মালিক হতে পারে সে।' (আখতারুজ্জামান, ২০১২ : ৩৭৪)।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

একশ নব্বই বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার নিজস্ব জীবনধারাকে গুরুতরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। কৃষি ও শিল্পে সমকালীন বাংলা ছিল একটি অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ। বাংলার শিল্পপণ্যের উৎকর্ষ ও ব্যাপক জোগান-সামর্থ্যের কারণে ইউরোপীয় বণিকরা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তোলে। আঠার শতকে এসে বাণিজ্য সম্পর্কের আড়ালে বাংলায় ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের তৎপরতা শুরু হয়। এর পরিণতিতে ১৭৫৭ সালে বাংলা ব্রিটিশদের করতলে চলে যায়। এই শাসনের প্রভাবে বাংলার এতিহ্যগত শিল্পসমৃদ্ধি ধ্বংস হয়, কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সীমাহীন দারিদ্র্য নেমে আসে জনজীবনে, দুর্ভিক্ষ হয়ে যায় বাংলার জনমানুষের নিত্যসঙ্গী। এরপর বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধ্বংস বা বিকৃত করে দিয়ে বাঙালির মনের ভূগোলটাও দখলে নিয়েছে। এটাই ছিল বাংলায় ঔপনিবেশিকতা চিরস্থায়ী হওয়ার মূল কারণ। বাঙালি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও তাদের জীবন থেকে দুর্ভোগের অবসান ঘটে না–এই বাস্তবতা নিহিত রয়েছে বাঙালির মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশায়নে। ব্রিটিশদের পরিকল্পিত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এদেশে যে শিক্ষিতশ্রেণি গড়ে উঠেছে তাঁরা মননে-মগজে পশ্চিমা মূল্যবোধলালিত। তাঁদের মনে তৈরি হয়েছে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং সম্পদের লালসা। জীবনযাপনে ও কর্মকাণ্ডে তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনটা বাংলায় পরিচালিত হয়েছে তাঁদের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় জনজীবনে ব্রিটিশদের উপস্থিতিটা ছিল অদৃশ্য, স্থানীয় শাসকদের উপস্থিতিটাই ছিল প্রত্যক্ষ। কালক্রমে এই শিক্ষিতশ্রেণির মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা; কারণ ব্রিটিশদের করতলে থেকে দেশশাসনে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। পরমুখাপেক্ষী শাসনকে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে পরাধীনতা। পরিবর্তিত বাস্তবতায় ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনকৌশলেও পরিবর্তন আসে; এমন একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে, যেখানে ক্ষমতাকাঠামোতে মধ্যবিত্তশ্রেণির অংশীদারিত্ব বাড়বে, কিন্তু নিজেদের ভেতরের বিরোধটাও বাড়বে। উপনিবেশকদের পরিকল্পনা অনুসারেই এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে। ক্ষমতার জন্য এই শিক্ষিতশ্রেণি রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত ও সাম্প্রদায়িকতায় কলুষিত করেছে। তাঁদের অন্তর্ঘাতী ক্ষমতালিপ্সার নিয়মেই বৃহৎ পরিসরে ভারত এবং আঞ্চলিক পরিসরে বাংলা দ্বিধাবিভক্ত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এবং ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রেই অধিষ্ঠিত হয়েছে ব্রিটিশ মূল্যবোধলালিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। ভারত গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেলেও পাকিস্তানে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। এর কারণও নিহিত রয়েছে দুই মধ্যবিত্তের গড়ে ওঠার মধ্যে। হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি ছিল পরিণত ও কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই শ্রেণির মধ্য থেকে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মুসলিম মধ্যবিত্ত ছিল অপরিণত এবং প্রতিক্রিয়াশীল। সংগতকারণেই তাঁদের মধ্যে কোনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তৈরি হয়নি। নেতৃত্বের অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা ও অন্ধ ক্ষমতালিপ্সার কারণে পাকিস্তানে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র জেঁকে বসে। কালক্রমে প্রথমে বেসামরিক ও পরে সামরিক আমলাতন্ত্র পাকিস্তানের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি হয়নি এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়নি। ক্ষমতাগোষ্ঠীর অনুকূলে বিকৃত উন্নয়ন আর দমনপীড়নে স্পৃষ্ট হয়েছে পাকিস্তানের আপামর মানুষ। অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়ে ছিল পূর্ববাংলায়। পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ফিরে আসে পূর্ববর্তী ব্রিটিশশাসনের চেয়েও ভয়াবহ রূপ নিয়ে। বাঙালির জাতিসত্তাকেই মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। মুক্তিকামী বাঙালি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী শাসকদের এই নব্য-উপনিবেশবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ভাষা-সংস্কৃতির ওপর আঘাত পূর্ববাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়। এরপর রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার পটে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সামরিক একনায়কতন্ত্র। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অধীনে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালির ওপর নেমে আসে সর্বাত্মক দমন-পীড়ন-শোষণ। ঐতিহ্যগতভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি জাতির এই নব্য-ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ চলমান থাকে। এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ভেতর থেকে পুনর্জাগ্রত হয় বাঙালির অন্তর্নিহিত সর্বজনীন জীবনবোধ, গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি ও বাংলার সার্বভৌমত্ব নেই, আইয়ুবের সামরিক শাসনে তা

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্ট হয়ে উঠলে বাঙালি গোপনে ও প্রকাশ্যে আন্দোলন ও অভ্যুত্থানের নকশা গড়ে তোলে। ১৯৬১-র সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ছয়দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পথ বেয়ে তা ১৯৭১-এ এসে স্বাধীনতার সংগ্রামে পর্যবসিত হয় এবং ইতিহাসের বৃহত্তম রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার স্বপ্নলালিত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সময়সীমায় রচিত পূর্ববাংলার উপন্যাস হয়ে উঠেছে বাঙালির আত্ম-অন্বেষী মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্র। বাঙালিকে পাকিস্তানিকরণের ধর্মীয় প্রচেষ্টার প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে *লালসালু*-তে এবং এই প্রয়াস প্রতিহত হয় মাজারে জমিলার পদাঘাতে। এই উপনিবেশমুক্তির কার্যকরপন্থার ইঙ্গিতও আছে আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। *চাঁদের অমাবস্যা*-য় আমরা প্রত্যক্ষ করি বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবিলা। আরেফ আলী দুর্বল, কিন্তু অনড় দৃঢ়তায় নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেই সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। *সংশপ্তক*-এ আমরা দেখেছি মানুষের মুক্তির স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে রাজনীতিতে রমজানের প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটেছে; কিন্তু এর বিপরীতে জাহেদের নেতৃত্বে মুক্তির সংগ্রামটাও চলমান। *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে দেখি পাকিস্তানের অভিজাত হয়ে উঠার আত্মধ্বংসী উচ্চাশার অবসান ঘটে তার মূললগ্ন স্বেচ্ছামৃত্যুতে। এটা বাঙালির জাতিসত্তায় মূলীভূত হওয়ার অসাধারণ প্রতীকী প্রকাশ।মুক্তির স্বপ্ন যখন প্রেরণা হয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে অভিন্ন জাতিসত্তায় উদ্বেলিত করে, সেই জাতির মুক্তি তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে *বিদ্রোহী কৈবর্ত*-এর মধ্যে এ-সত্য অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। উনসত্তরের বাঙালির উত্তাল জাতীয়তার আন্দোলনে পটে লিখিত এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালির একটি রাষ্ট্র পাওয়ার আগামভাষ্য। বাংলার এক কৌমজনগোষ্ঠীর মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত রাষ্ট্রপরিচালায় দিব্বোকের তীক্ষ্ম রাজনৈতিক অভিজ্ঞান ও সুশাসনে বিম্বিত হয়েছে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর স্বাধীন আত্মবিকাশের পথনির্দেশিকা। আমরা লক্ষ করি, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী প্রতিটি উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে গভীর আশাবাদে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধকবলিত, কিন্তু সেখানে কেবলি হতাশা-ক্লান্তি-বিভিক্তি আর উপন্যাসের সর্বাবয়ব জুড়ে আছে এই হতাশা-ক্লান্তির কার্যকারণের ব্যবচ্ছেদ। *জীবন আমার বোন* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধে খোকার জড়ত্বে লুকিয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার ক্রান্তদর্শী অবলোকন। খোকার ভাবালুতা-বর্জিত নির্মোহ আত্মসমীক্ষায় উঠে আসে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীস্বার্থের বৃত্তের বাইরে সর্বজনীন কল্যাণবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যর্থতা এবং তার পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধের গভীরে নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনার অপমৃত্যুর বৃত্তান্ত। *অরণ্যানী* উপন্যাসে অবশ্য হতাশা নেই, বাস্তু-উদ্ধারের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা থেকে ত্রিপুর জনগোষ্ঠী সম্মিলিত সংগ্রাম গড়ে তোলে। পলায়ন বা আত্মসমর্পণ নয়, মুক্তির জন্য মুখোমুখি প্রতিরোধই একমাত্র পথ।

শওকত আলীর ট্রিলজি *দক্ষিণায়ণের দিন–কুলায় কালস্রোত-পূর্বরাত্রি-পূর্বদিন*-এ আইয়ুবশাহীর দুর্বৃত্তায়িত স্বৈরশাসনের অভিঘাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার পর্যায়ে পাকিস্তানের মুৎসুদ্দি পুঁজির সক্রিয় অংশীদার হাসানের আওয়ামী লীগে যোগদান এবং ওপরের সারির নেতা হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সংকেতিত হয় সম্ভাব্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাকিস্তানি ঘরানার শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাটাই অনিবার্য এবং মানুষের মুক্তির স্বপ্নটাও সুদূর পরাহত। বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতিও স্বার্থান্ধ মধ্যবিত্তকবলিত এবং বিশ্বগণমুক্তির চেতনাও বাগাড়ম্বর মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সর্বার্থ মুক্তির জন্য ঔপন্যাসিক বামপন্থায় আস্থা রাখেন; এর জন্য সেজানের মতো সেজানের মতো নিঃস্বার্থ ও শ্রেণিচ্যুত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান কামনা করেন। ঔপনিবেশিকের আশাবাদী চেতনা উত্তর-উপনিবেশবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যে গ্রথিত। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসের পটভূমিও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের পরিণতি মধ্যবিত্তের নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, যে নেতৃত্বে স্বাধীনতা আসবে, কিন্তু খিজিরদের মুক্তির স্বপ্ন দুরাশায় পরিণত হওয়া অবধারিত। খিজিরদের স্বপ্নপূরণের জন্য মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের বিকল্প নেই, তবে মধ্যবিত্তকে হতে হবে শ্রেণিচ্যুত। খিজিরদের মুক্তির জন্য ঔপন্যাসিক খিজির-কবলিত সর্বহারা ওসমানের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সংকেতিত করেন। এক্ষেত্রে পাগলামির তত্ত্বায়ন ঔপন্যাসিকের অসাধারণ শিল্পসিদ্ধির পরিচায়ক। *নির্বাসিত একজন* উপন্যাসে আমরা পাই, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উন্মত্ততায় অর্জিত স্বাধীনতার

Dhaka University Institutional Repository

পরিণাম সংখ্যালঘু মানুষের বাস্তুচ্যুতির পরাধীনতা। স্বপ্নভঙ্গের ক্ষত নিয়েও বৈরী রাষ্ট্রে মানুষ আত্মনির্ভর স্বাধীন পরিচয়নির্মাণের সংগ্রামটা চালিয়ে যায়, খোকার মধ্য দিয়ে আমরা সেই সংগ্রামের চলমানতা জানতে পারি। সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসে আমরা দেখেছি উপনিবেশবাদ-উৎসারিত মূল্যবোধ ও পুঁজির দৌরাত্ম্য কীভাবে প্রান্তবর্তী ধীবর জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্বে হানা দেয় এবং পুঁজির জালে বন্দী হয়ে মানুষ পোকামাকড়তুল্য জন্তুসত্তায় পরিণত হয়। এই উপন্যাসে ধীবরদের দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত কারণ লুকিয়ে আছে নিজেদের মনস্তত্ত্বলালিত পুঁজিবাদী আকাঙ্ক্ষায়। অশিক্ষিত মানুষের নিশ্চেতন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না পুঁজিবাদের জালের বিস্তৃতি ও আটকে ফেলার অনিঃশেষ ক্ষমতা। এই জাল কেবল আটকায়, মুক্তি দেয় না। প্রবল শক্তিধরের বিরুদ্ধে ব্যক্তির লড়াই খুবই অসম, দরকার সম্মিলিত প্রতিরোধের। এর জন্য দরকার পুরো জনগোষ্ঠীকে ঐক্যের চেতনায় শানিত করা। প্রতিরোধের কাজটি পরিচালিত হবে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে এবং পরার্থপর, বিচক্ষণ ও অদম্য নেতৃত্বে। আর এই নেতৃত্ব গড়ে উঠবে সমাজের ভেতর থেকে, যে সমাজ-অন্তর্গত মানুষের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত এবং নিজ সমাজের মানুষের যন্ত্রণা নিজের বলে উপলব্ধি করবে, তাদের প্রতি পোষণ করবে অপরিসীম দরদ ও ভালোবাসা। মানুষের নিজের বৃত্তি থেকে ছিন্ন করে নয়, সেখানে স্থিত রেখেই তাদের জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলবে। এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকা পরিবেশ-প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখা। হতচেতন মানুষের মধ্যে অধিকারবোধ ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি এবং সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তোলায় দায়িত্বশীল পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বুদ্ধিজীবী সমাজ। উত্তর-উপনিবেশবাদ উপনিবেশোত্তর দেশের দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকবলিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক মুক্তির পথ এভাবেই সন্ধান করে।

হুমায়ূন আহমেদের **১৯৭১** উপন্যাসে উল্লেখিত নীলগঞ্জ গ্রামটি শহর থেকে বহুদূরবর্তী এক নিভৃত জনপদ; গ্রামের মানুষেরা একান্ত প্রান্তিক, তুচ্ছ, খেটে-খাওয়া। মেজর এজাজের মাধ্যমে এই গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ প্রবেশ করে। ধর্ষণ, হত্যা, নির্যাতন, অপমানে ক্ষতবিক্ষত করা হয় এই নিরিবিলি জনপদ। শিকার হয়ে নির্বিবাদী মানুষেরা প্রতিরোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়। উপলব্ধির স্তর বেয়ে মিলিটারির সহযোগী রফিক বুঝতে পারে এ যুদ্ধটা আসলে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধ। নবলব্ধ উপলব্ধির প্রেক্ষিতে এ অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করা ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় থাকে না এবং প্রতিবাদটি করেছে নিজের জীবন দিয়ে। অস্তিত্বের শেষ সীমানা থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অবতীর্ণ হয়েছে এই যুদ্ধে, যার কারণে মুক্তিযুদ্ধটা গণযুদ্ধও। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপনের ভেতর থেকে হুমায়ূন আবিষ্কার করেন মুক্তিযুদ্ধকে, যা প্রচলিত জাতীয়তাবাদী বয়ানের বিপরীত পিঠ। হুমায়ূন আরও আবিষ্কার করেছেন, আপাত নিরীহ ও নিস্পৃহ সাধারণ মানুষের সামষ্টিক শক্তির অসীম সম্ভাবনা, যা বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নের মূল উপজীব্য। শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতাকেন্দ্রিক অবক্ষয়িত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গণমানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগমণ্ডিত মুক্তিযুদ্ধের ব্যর্থতা এবং স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিকচক্রের সদম্ভ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আখ্যান। নির্বিবেক, স্বার্থপর রাজনীতিবিদদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষগুলো নতুন করে অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি হয়; এবার আর প্রতিরোধ নয়, পলায়নই হয় তাদের আত্মরক্ষার উপায়।

সেলিনা হোসেনের *কাঁটাতারে প্রজাপতি* উপন্যাসটি বাংলার কিংবদন্তিতুল্য রাজনৈতিক নেত্রী ইলা মিত্রের সংগ্রামমুখর জীবনের আখ্যান। এই উপন্যাসের সুবাদে আমরা জেনেছি, ইলা মিত্র বাংলার স্বার্থকবলিত রাজনৈতিকব্যবস্থায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুটো সীমাবদ্ধতা ভেঙেছেন—১. আভিজাত্যের খোলস ভেঙে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনজীবনের সমতলে পৌঁছা; এবং ২. পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির পুরোভাগে নারীনেতৃত্বের অধিষ্ঠান। সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ফলপ্রসূ স্বাধীনতা অর্জনের উপায়ও সংকেতিত হয়েছে এই উপন্যাসে। শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানতম শর্ত। রাজনীতিবিদদের চরিত্রই নির্ধারণ করে রাষ্ট্রের চরিত্র; রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি ও নীতিমালা অনেকাংশেই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতিগতির ওপর নির্ভরশীল। প্রবল ব্যক্তিত্ব, অপরিসীম সাহস, সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও অগাধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বই পারে সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দেশকে সর্বাত্মক মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে। এর জন্য তাদেরকে পরিত্যাগ করতে হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহ; আভিজাত্যের গরিমা ভুলে মিশে যেতে হয় সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে; তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। নিপীড়িত মানুষের প্রতি করুণা নয়, দায়িত্ববোধই তাদের কর্মপ্রেরণা। ক্ষমতার দাপটে অবদমিত করা নয়, পরম মমতায় প্রতিটি নাগরিককে আত্মবিশ্বাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করাই একজন যথার্থ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃত ভূমিকা। দেশের প্রত্যন্ত জনপদ পর্যন্ত তার নিবিড় যোগাযোগ থাকবে, দেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে থাকবে সুস্পষ্ট ধারণা, সবকিছুকে আমলে নিয়েই প্রণয়ন করবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা—ইলা মিত্র এমন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মানদণ্ড।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসের বিশদ কাঠামোয় আমরা পাই বহুস্তর ইতিহাসের মধ্যে জনশ্রুতিবাহিত প্রত্ন-ঘটনাবলির সংশ্লেষে জনজীবন আবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। বাংলার অন্ত্যেবাসী শ্রমজীবী মানুষের চোখে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল বাইরের অনুপ্রবেশকারী শক্তি। ঔপনিবেশিক শাসককুল যখন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বত্র নিজেদের সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়, তখন শাসকের আধিপত্যকে পাশ কাটিয়ে প্রান্তজ মানুষেরা তাদের মৃত্তিকা-কর্ষিত একান্ত নিজস্ব জীবনটাই যাপন করতে চেয়েছে এবং প্রাণপণে সেই জীবনটাকেই সংরক্ষণ করতে চেয়েছে। পাকিস্তানি শাসকদের অপরিকল্পিত উন্নয়নের অংশ হিসেবে স্বভূমে বাস্তুচ্যুত মানুষদের ঢাকামুখী একটি ঢল শুরু হয়। কিন্তু ইসমাইলের পরিকল্পিত ঢাকামুখী যাত্রা পরিহার করে তমিজ ছোটে সান্তাহার অভিমুখে, তেভাগার খোঁজে। তমিজের এই সান্তাহার-যাত্রা উপনিবেশমুক্তির নতুন অভিযান। তমিজ তার জীবনকে সন্ধান করে মৃত্তিকামূলে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাকে উন্মূলিত করতে সচেষ্ট। তমিজের স্বপ্ন ছিল পরিষ্কার, শত্রুও তার চেনা; স্বপ্নপূরণের পন্থাটা সশস্ত্র সংগ্রামের। স্বপ্নদূর জীবনটাকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। তমিজ তার পরিবারের কাছে নিখোঁজ হয়, অথবা পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যুও হতে পারে। পরিণতি যা-ই হোক তমিজ আত্মপ্রতিষ্ঠার এক প্রত্যয়ী স্বাপ্নিক মানুষ, স্বপ্নঘাতক ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে এক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। তার শোষণ-মুক্ত যৌথকল্যাণের কৌম-স্বপ্নটা চিরঞ্জীব, তার বার্তা মেলে তমিজের মেয়ে সখিনার চাঁদের হেঁসেলে ভাত রান্নার স্বপ্নের মধ্যে। বলাবাহুল্য, উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর কাছে পুরো ঔপনিবেশিক কালই ছিল এক ভয়ানক খোয়াব, দুঃস্বপ্ন তাড়িত আচ্ছন্নদশা; উত্তর-ঔপনিবেশিককালেও সেই ভয়ানক খোয়াব থেকে প্রান্তিক মানুষদের মুক্তি মেলেনি। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের মূল্যবোধলালিত স্থানীয় অভিজাতগোষ্ঠী প্রান্তিক মানুষদেরকে মূর্খ, অনাধুনিক, বর্বর খেতাবে কলঙ্কিত করে তাদেরকে সভ্যতা থেকে খারিজ করে দিয়ে তাদের প্রতি পশুর মতো নির্মমতা চালানোর বৈধতা খুঁজেছে; খেটে-খাওয়া মানুষদেরকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভেঙেচুরে দিয়ে চিরতরে অধীন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু আধুনিকতা ও সভ্যতার মুখোশে আবৃত পশ্চিমা শোষণ-নৃশংসতার নোংরামির বিপরীতে বাংলার প্রান্তিক মানুষেরা মানবিকতায়, নৈতিকতায়, মূল্যবোধে অনেক বেশি মহিমান্বিত, তার অনন্য দৃষ্টান্ত তমিজ। ইসমাইল-কাদেরদের স্বার্থপরতা, প্রতারণা, পরাশ্রয়িতা ও আগ্রাসী শোষণবৃত্তির বিপরীতে শান্তিপ্রিয়তায়, পরার্থপরতায়, সমষ্টির কল্যাণে আত্মবিবেদনে ও নিজস্ব উৎপাদন-সামর্থ্যে আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রত্যয়ে তমিজ এক শুদ্ধসত্ত্ব কৌম-বীর। তমিজ এখানে পশ্চিমা-শ্রেষ্ঠত্বের মিথের বিরুদ্ধে প্রাচ্য জীবনবোধের এক গর্বমিশ্রিত স্পর্ধিত আত্মপ্রকাশ।

১৯৪৭-২০০০ সময়পর্বের বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহে দুটো বিষয়ের বহুমাত্রিক প্রতিফলন ঘটেছে; ১. সমাজের ওপরতলার মানুষের স্বার্থান্ধতা, দুর্বৃত্তায়ন, জনমূলবিচ্ছিন্নতা, প্রভুত্ববাদী মানসিকতা; তাদের হাতেই পুঞ্জীভূত ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা। তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্ষমতাচর্চায় শুধু অন্ত্যজ মানুষেরাই নিষ্পেষিত হয়নি, প্রাণ-

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতি-পরিবেশও। ২. সমগ্র ভূখণ্ডে ছড়িয়ে বিপুল অন্ত্যজ মানুষ, যারা অন্তহীন দুর্ভোগের শিকার হয়ে স্বাধীনতায় মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু ওপরতলার মানুষের দৌরাত্ম্যে তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বপ্নটা বারবার লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু মুক্তির স্বপ্নটা তাদের মনে অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের অন্তহীন লড়াইটাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের চুম্বক। ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী প্রান্তিক মানুষের আত্ম-অন্বেষা এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভেদী লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে রাখা উত্তর-উপনিবেশবাদের জরুরি প্রত্যয়; এই প্রত্যয়ের শানিত প্রকাশ ঘটেছে আমাদের আলোচিত উপন্যাসসমূহে। উত্তর-উপনিবেশবাদের আরেকটি জরুরি প্রত্যয়, প্রান্তিক জনমানুষের মুক্তি নিহিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল ভূমিকায়। তাঁরাই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসের উত্তর-উপনিবেশবাদী অধ্যয়নে আমরা এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণিকে বহুলাংশে নিপীড়ক স্বার্থপরতার ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য এবং দাপুটে ক্ষমতাধর না হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসে আমরা এমন কিছু বুদ্ধিজীবীর সন্ধান পাই, যাঁরা ভূয়োদর্শী প্রজ্ঞা, মানবিক দায়িত্ববোধ, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আর অপার সাহসে অন্ত্যজ মানুষের মুক্তির স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং মুক্তির সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। প্রতীকে, রূপকে, আখ্যানে আরেফ আলী, সেকান্দার মাস্টার, কবি নওয়াসের, সকিনা খাতুন, সেজান, ওসমান, ইলা মিত্র প্রমুখ উত্তর-উপনিবেশবাদের অভীপ্সা বুদ্ধিজীবীর প্রতিমূর্তি।

ঔপনিবেশিক শাসনে মানুষের জীবনের অবরুদ্ধতা, অপরায়ণের যন্ত্রণা, মুক্তির স্বপ্ন ও সংগ্রাম, উপনিবেশমুক্তির আনন্দ ও স্বাধীন দেশে নতুন করে উপনিবেশিত হওয়ার বিষাদ––এই চক্রব্যূহে আবর্তিত জীবনের বহুবিভঙ্গ প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের আমাদের আলোচিত উপন্যাস সাহিত্যে; বিশেষত ব্রিটিশোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকেরা সূক্ষ্মদর্শী সৃজনশীলতায় কথাশিল্পের অবয়বে অনুসন্ধান করেন সাবেক উপনিবেশসমূহে ঔপনিবেশিক শাসনের বহমানতা, চলিষ্ণু জীবনের ভাঁজে ভাঁজে সন্ধান করেন উপনিবেশিতের মনস্তত্ত্বে শেকড়ায়িত উপনিবেশায়নের বহুস্তরীভূত তন্তুজাল এবং জাল ছিন্ন করার প্রেরণা ও কলাকৌশল। জীবন অনুসন্ধানের আকর উপাদান হিসেবে সমাজবীক্ষণে সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম এবং উত্তর-উপনিবেশবাদী বীক্ষণে আমাদের আলোচিত অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস এই মূল্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

অজয় ভট্টাচার্য : *অরণ্যানী*, ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *চিলেকোঠার সেপাই*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র২, ২০১২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *খোয়াবনামা*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র২, ২০১২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

কায়েস আহমেদ : *নির্বাসিত একজন* , কায়েস আহমেদ সমগ্র, ২০১৪, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

মঞ্জু সরকার : *প্রতিমা উপাখ্যান*, ১৯৯০, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

মাহমুদুল হক : *জীবন আমার বোন*, ২০১২, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ।

শওকত আলী : *দক্ষিণায়ণের দিন* (ত্রয়ী উপন্যাস), ২০১৬, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

শওকত ওসমান : *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৩), শওকত ওসমান উপন্যাসসমগ্র-১, ৪র্থ মুদ্রণ ২০১০,ঢাকা, সময় প্রকাশন।

শহীদুল্লাহ কায়সার : *সংশপ্তক* (১৯৬৫), শহীদুল্লাহ কায়সার উপন্যাসসমগ্র-২ প্রথম প্রকাশ, ২০১০, ঢাকা, চারুলিপি প্রকাশন।

শহীদুল জহির : *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* (১৯৮৮) শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাস, ২০০৭, ঢাকা, সমাবেশ।

সত্যেন সেন : *বিদ্রোহী কৈবর্ত* (১৯৬৯), ২০১৭, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।

সেলিনা হোসেন : *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬), উপন্যাস ত্রয়ী, ২০১৯, ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.।

: কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯), ২০১৩, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : *লালসালু* (১৯৪৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

: *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

: *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্- রচনাবলী ১ (সমগ্র উপন্যাস, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।।

হুমায়ূন আহমদ : ১৯৭১, ২০১৯, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ

লেখক/সম্পাদক নামের বর্ণানুক্রমে

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, ২০১৩, বিভাস, ঢাকা।

অনুপম সেন : *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ*, ২০১৬, অবসর, ঢাকা।

অমর্ত্য সেন : *ভারতের অতীত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে*, ১৯৯৯, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

: *তর্কপ্রিয় ভারতীয়*, ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

: *পরিচিতি ও হিংসা*, ২০১৬, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায় : *উত্তর-আধুনিক চিন্তা*, ২০১১, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

অমলেশ ত্রিপাঠী : *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*, বৈশাখ ১৩৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

অর্জুন গোস্বামী (সম্পাদনা) : *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, ২০২২, প্রতিভাস, কলকাতা।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা*, ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বি-সং ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা।

অলককুমার ঘোষ, নিখিল সুর (সম্পাঃ) : *ভারতের ইতিহাস নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০০৫, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, ১৯৯৩, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

আকতার কামাল : *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, ২০১৪, অবসর, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*,২০০১, প্যাপিরাস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জমান (সম্পাঃ) : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
: *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আনু মাহমুদ : *বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ২০০৮, অনন্যা, ঢাকা।
: *ইলিয়াস ও প্রশ্নের শক্তি* , ২০২২, গ্রন্থিক প্রকাশন, ঢাকা।
আফজালুল বাশার : *বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
আবদুল্লাহ আবু সাঈদ (স.) : *সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ*, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা।
আবদুল করিম : *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ১৯৯৯, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।
আবদুল মওদুদ : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*
আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা : *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম*; ২০১৩, ঢাকা, চারদিক।
আবুল কাসেম ফজলুল হক : *মুক্তি সংগ্রাম* (প্রথম পর্ব), ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
আবুল মনসুর আহমদ : *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ১৯৯৫, ঢাকা।
আবুল হাশিম : *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, ২০১২, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।
আলাউদ্দিন মণ্ডল : *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস নির্মাণে বিনির্মাণে*, ২০০৯, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
আলী আনোয়ার (সম্পাদক) : *ধর্মনিরপেক্ষতা*, ২০১৫, বিপিএল, ঢাকা।
আশিস নন্দী (অনুবাদ: সজল বসু) : *ভারতীয় রাজনীতির সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্ব*, ২০১৬, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
আশীষ লাহিড়ী : *বুদ্ধিজীবীর ভাববিশ্ব*, ২০১৭, মনফকিরা, কলকাতা।
আহমদ ছফা : *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, তৃ-সং ১৯৮৭, মুক্তধারা, ঢাকা।
আহমদ রফিক
ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত : *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*, ২০১১ ২য় সং, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
ই.এম. ফরস্টার (অনাবাদ: সুব্রত বড়ুয়া) : *উপন্যাসের বিষয়-আশয়*, ২০২৪, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
ইরফান হবিব : *মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি (৬৫০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ)*, ২০১৭, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
ইরফান হবিব : *ভারতের অর্থনীতি* (১৮৫৮-১৯১৪), ২০১৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
ইরফান হবিব : *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭), ২০১৯, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
এজাজ ইউসুফী : *উত্তরাধুনিকতা*, ২০১৬, বাতিঘর, ঢাকা।
এম এ রহিম (ডক্টর) : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ওবায়দুল্লাহ সাগর : *নানকার বিদ্রোহের নায়ক অজয় ভট্টাচার্য*, ২০২৪, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
কামরুদ্দিন আহমদ : *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
কালিকারঞ্জন কানুনগো : *রাজস্থান-কাহিনী*, ১৩৯৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।
কুদরত-ই-হুদা : *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস আঙ্গিক বিচার*, ২০১৬, আদর্শ, ঢাকা।
কো. আন্তোনভা ও অন্যান্য : *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১৯৮৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।
গিয়াস শামীম : *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ২০১৯, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।
গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, ১৯৮৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
গোলাম মুরশিদ : *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ২০০৬, অবসর, ঢাকা।
গোলাম মুরশিদ : *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, ২০১৯, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
গৌতম ভদ্র : *ইমান ও নিশান*, ২০১৮, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।
গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ) : *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, ২০১৮, আনন্দ, কলকাতা।
চন্দন আনোয়ার (সম্পা.) : *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি পাঠ ও মুল্যায়ন*, ২০২০, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।
জয়া চ্যাটার্জী : *বাঙলা ভাগ হল*, ২০০৩, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
জীনাত ইমতিয়াজ আলী : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : জীবন ও সাহিত্যকর্ম*, ১৯৯২, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।
ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টার : গ্রাম বাংলার ইতিকথা (অনুবাদ : অসীম চট্টোপাধ্যায়), ২০১৮, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।
তপোধীর ভট্টাচার্য : *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব*, ১৯৯৭, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।
: *বাখতিন*, ২০০৯, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।
দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় : *ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দশক*, ২০২০, , পত্রলেখা, কলকাতা।
দীপেশ চক্রবর্তী : *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ২০১৮, আনন্দ, কলকাতা।
দীপেশ চক্রবর্তী : *মানবিকতা ও অ-মানবিকতা*, ২০১৮, অনুষ্টুপ, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে*, ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় : *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*,২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায় : *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য*, ১৯৯০, প্যাপিরাস, কলকাতা।

নবেন্দু সেন (সম্পা.) : *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, ২০১৬, রত্নাবলী, কলকাতা।

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, ২০০৯, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।

নূর মোহাম্মদ : *বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা*,২০১৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

পরমেশ আচার্য : *বাঙালি প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর বিতর্ক*, ২০০২, নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপন্যাস রাজনৈতিক* , ১৯৯১, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

ফকরুল চৌধুরী (সম্পাদিত) : *সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার*, ২০১৩ কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

: *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, ২০১১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

: *ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য*, ২০০৯, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

: *প্রাচ্যতত্ত্ব ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজ*, ২০১৪, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

ফজলুল আলম : *সংস্কৃতিতত্ত্ব ও বাঙালি*, ২০১৫, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

ফয়েজ আলম (ভাষান্তর) : *এডওয়ার্ড সাঈদ-এর অরিয়েন্টালিজম*, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৭, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

: *ভাষা ক্ষমতা ও আমাদের লড়াই প্রসঙ্গে*, ২০০৮, সংবেদ, ঢাকা।

: *উত্তর-উপনিবেশী মন*, ২০১৪, সংবেদ, ঢাকা।

ফ্রাঞ্জ ফানো (অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া) : *জগতের লাঞ্ছিত*, ২০১৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর : *'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা'*, ১৯৬৯, গ্রন্থনা, ঢাকা।

: *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ১৯৯০, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা।

: *বাংলাদেশের রাজনীতি*, ২০১৩, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত) : *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

: *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, ২০১৬, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

: *বাদশাহী আমল*, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

বিপান চন্দ্র : *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭-১৯৪৭)*, দ্বিতীয় অনুবাদ সংস্করণ ২০১৪, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. : *সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব প্রয়োগ*, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ১৯৯১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *কথামালা*, ১৯৯১, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : *সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, দ্বি-সং ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বুদ্ধদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস (সম্পা.) : *সাতচল্লিশের দেশভাগ*, ২০২১, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (সম্পা.) : *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, ২০১৪, অবসর, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল : *মহাবিদ্রোহের আখ্যানতত্ত্ব ও কথাশিল্প*, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ*, ১৯৯৬, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী : জনান্তিকের মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২০১৩, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

: *নিয়তির পক্ষ-বিপক্ষ ও বিবিধ প্রসঙ্গ*,২০১০, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা ।

: *প্রিয় প্রবন্ধ*, ২০২১, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমাজ ও রাজনীতি, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মঈন চৌধুরী : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ২০১২, নদী পাবলিশিং এ্যান্ড মিডিয়া হাউস, ঢাকা।

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, ১৯৭৪, পূর্বালেখ প্রকাশনী, ঢাকা।

মমতাজুর রহমান তরফদার : *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মহাত্মা গান্ধী : প্রতিরোধ ও বিউপনিবেশীকরণ, (সম্পা. : পারভেজ হোসেন), ২০১৬, সংবেদ, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ : *ঔপনিবেশিক যুগের শিল্প-সাহিত্য*, ২০০৭, ঐতিহ্য, ঢাকা।

মাইকেল প্যারেন্টি : *সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে*, ২০০২ চিরায়ত প্রকাশন, কলিকাতা।

মিখাইল নেস্তুর্খ : *মানব সমাজ প্রজাতি জাতি প্রগতি*, ১৯৮৪, মীর প্রকাশন, ঢাকা।

মীণাক্ষী মুখোপাধ্যায় : *উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্প-ইতিহাস*,২০০৩, থীমা, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মামুন : *বাংলাদেশের রাজনীতি : এক দশক (১৯৮৮-১৯৯৮)*, ১৯৯৯, অনন্যা, ঢাকা ।
: *ঔপনিবেশিকোত্তর ঔপনিবেশিক মন*, ২০১৫, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী*, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক,ড. : *বাংলার ইতিহাস ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব*, ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মুস্তাফা নূরুল ইসলাম এবং
সৌমিত্র শেখর (সম্পাদিত) : *মুক্তিযুদ্ধের ৪০ বছর*, ২০১৩, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।
মোহাম্মদ আজম : *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, ২০১৪, আদর্শ, ঢাকা।
: *হুমায়ূন আহমেদ পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য*, ২০২০, প্রথমা, ঢাকা।
মোহাম্মদ মোস্তফা : *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ*, ২০১০, নান্দনিক, ঢাকা।
মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার : *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) : পার্লামেন্টের ভাষ্য*,২০১৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
রংগলাল সেন (ডক্টর) : *সমাজকাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, ২০০১, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
রজতকান্ত রায় : *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, ২০১৯, আনন্দ, কলকাতা।
রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ* (১৯৫৯), প্রথম প্যাপিরাস প্রকাশ২০১২, প্যাপিরাস, ঢাকা।
রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
: *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, ২০০২, অনন্যা, ঢাকা।
রফিকুল ইসলাম : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯২, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
রাজনারায়ণ বসু : *আত্মচরিত*, ১৯০৯, কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।
রামশরণ শর্মা : *ভারতের প্রাচীন অতীত*; পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, হায়দরাবাদ।
রাসেল মাহমুদ : *অজয় ভট্টাচার্যের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, ২০২২, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।
শওকত ওসমান : *সংস্কৃতির চড়াই-উৎরাই*, ২০২২, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
: *মুসলিম মানসের রূপান্তর*, ২০২২, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
শহীদ ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*, ২০১০, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।
: *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষ ও কথাশিল্প*, ২০১৯, অক্ষর, ঢাকা।
শাহীদা আখতার : *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, ২০১৩, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
শিরিণ আখতার : *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, ১৯৯৩, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ১৯৯২, কলিকাতা।
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী : *আমার দেবোত্তর সম্পত্তি*, আনন্দ পাবলিশার্স)
সব্যসাচী ভট্টাচার্য : *বাংলায় সন্ধিক্ষণ ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭*, বাংলা সংস্করণ ২০১৮, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলকাতা।
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর*, ১৯৭৬, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।
সাঈদ-উর রহমান : *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি এবং কবিতা*, ১৯৮৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
সালাহউদ্দীন আইয়ুব : *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*, ১৯৯৮, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
সিরাজ সালেকীন : *ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা*, ২০১৩, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
সিরাজুল ইসলাম : *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক) : *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১): সামাজিক সাংস্কৃতিক ৩য় খণ্ড*; ২০০০, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : *একই সূত্রে গাঁথা*, ২০২০, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে, স্মৃতিতে, ২০২৫, বেঙ্গলবুকস, ঢাকা।
সুখময় মুখোপাধ্যায় : *বাংলার ইতিহাসে দু'শো বছর*, *স্বাধীন সুলতানদের আমল*, ভারতীয় বুক স্টল, কলিকাতা।
সুপ্রকাশ রায় : *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, ১৯৮০, ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলকাতা।
সুব্রত কুমার দাস : *প্রসঙ্গ শিক্ষা এবং সাহিত্য*, জুন ২০০৫, সূচীপত্র, ঢাকা।
সুমিত সরকার (ভাষান্তর: আশীষ লাহিড়ী) : *মডার্ন টাইম্‌স*, ২০১৯, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।
সুরজিৎ দাশগুপ্ত : *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*, ২০০৪, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
সুরজিৎ দাশগুপ্ত : *ভারতীয় মুসলমানদের সংকট*,পৌষ-১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
সুশীল চৌধুরী : *পলাশীর অজানা কাহিনী*, ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান
ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত : *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর*, ২০০৭, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
সৈয়দ আকরম হোসেন : *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*, ২০১০, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
: *বাংলাদেশ ও কিঞ্চিৎ সাহিত্য*, ২০২৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সৈয়দ আজিজুল হক : *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, ২০১৭, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : *কতিপয় প্রবন্ধ*, ১৯৯২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
হরিপদ দত্ত : *কথাসাহিত্যে সাম্য*, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, বর্ণায়ন, ঢাকা।
হাবিব রহমান (সম্পাদিত) : *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ধ্রুপদী ও আধুনিক*, ২০১৪, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
হায়দার আকবর খান রনো : *পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা*, ২০১১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
: *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ২০১৬, অগ্রদূত, ঢাকা।
হিমেল বরকত : *বাংলাদেশের কবিতায় উত্তর-ঔপনিবেশিক চৈতন্য*, ২০২৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
হোসেনউদ্দীন হোসেন : *বাংলার বিদ্রোহ*, ১৯৯৯, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা।

Adam Culre : *Educational Strategy for Developing Societies*,1963, London.
Aime Cesaire : *Discourse on Colonialism* , (Trans: Joan Pinkham), 2010, Aakar,
Ania Loomba, : *Colonialism / Postcolonilism*, 2001, London: Routledge.
Ashis Nandy : *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under colonialism*, 1989, Oxford University Press, Delhi.
A.T.M. Azfar Hussain : *The Point to (ex)change it: Toward a Political Economy of Land, Labour, Language, and the Body*, 2003, Ph D dissertation, Wasington State University, Department of English, Manuscript microfilmed by UMI.
Ashcroft, Bill;Griffiths, Gareth
and Tiffin, Helen Ed. : *The Post-colonial Studies Reader*, 2nd Edition, reprint, 2006, London and New York: Routledge
B.M. Bhatia, : *Hitory and Social Development, vol. 1*, 1974, Delhi.
Bal Krishna, : *Commercial Relations between India and England*, 1924, London, George Routledge
Charles Edward Trevelyan: *On the Education of the People of India*, 1838, London; LONGMAN, OMRE, GREEN, & LONGMANS.
Charles Lam Markmann : *black skin white masks*, 2008, Pluto Press.
Childs and Williams : *An Introduction to Postcolonial Theory*, 1997, Pearson Education Limited.
Chris Weedon : *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*, B. Blackwell, 1987
David Kopf, : *British Orientalism and The Bengal Renaissane: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, 1969, University of California Press, Berkely and Angeles.
Denis Judd : *Empire : The British Imperial Experience from 1765 to the Present*, 1996, HarperCollins.
Edward Said, : *Orientalism*, 1995[1978], New York: Penguin Books.
: *Culture and Imperialism*, 1993, Vintage, London.
Edwin F. Bryant
& Laurie L Patton, Ed. : *The Indo-Aryan Controversy: Evidence and Inference in Indian History*, 2005, London: Routledge.
Elleke Boehmer : *Colonial and Postcolonial Literature Migrant Metaphors*, Second Edition, 2005, Oxford University Press.
Eqbal Ahmad : *Confronting Empire*, 2016, Haymarket Books, Chicago, Illinois.
Eric Stokes, : *The English Utilitarians and India*, 1990, New Delhi and

Dhaka University Institutional Repository

Oxford: Oxford University Press.
Frantz Fanon : *The Wretched of the Earth*, 2001, PENGUIN BOOKS.
Fanon, Frantz (Translated by
Charles Lam Markmann) : *black skin white masks*, 2008, Pluto Press.
Fredrik Cooper : *Colonialism In Question; Theory, Knowledge, History*, 2005, Berkely: University of California Press.
Gauri Viswanathan, : *Masks of Conquest : Literary Study and British Rule in India*, 2009, Oxford University Press, New Delhi.
.Gayatri Chakravorty, Spivak : *A critic of postcolonial reason*, 1999, Harvard University press,
Georg Lukac's : *Studies in European Realism*, 1972, London.
Gunner Myrdal : Asian Drama, vol. iii, Pelican edition, p.1669)|
Homi K. Bhabha : *The Location of Culture*, reprint 1994, Routledge,London and New York.

H. Kulke and D. Rothermund, :*A HISTORY OF INDIA*, 2004, Routledge, New York.
Irving Howe : *Politics And The Novel*, 1957, A Horizon Press Book, New York.
Irene Diamond and Lee Quinby : *Feminism and Foucault: Reflections on Resistance*, 1988, Northeastern University Press.
Jawharlal Nehru : *The Discovery of India*, 1960, London,

J.C. Sinha Hunter : *Economic Annals of Bengal*, ch. 2

James Mill : *The History of British India (vol.1)*, 1817, London: Printed for
Baldwin, Cradock and Joy, Paternoster Row.
John Mcleod : *Beginning Postcolonilism*, First South Asia Edition, Manchester University Press,
Kalikinkar Datta : *Survey of India's Social life and Economic Condition in the Eighteenth Century (1707-1813)*, 1961, Calcutta.
Khushwant Singh, Raj Anand and Nayantara Sahgal : *New Literatures in English*, 1985, Delhi, Allied Publishers,. (Chaman Nahal, "The Indian Political Novel")
K. Marx, : *Capital*, vol. iii, 1971, Moscow
Lata Mani : *The Debate on SATI in Colonial India*, Source: Cultural Critique, No. 7. The Nature and Context of Minority Discourse II . Autumn, 1987.
M. A. Bowers : *Magic(al) Realism*, 2004, London: Routledge.
Max Horkheimer, and Theodor W. Adorno,
(Trans by John Cumming) : *Dialectic Enlightment*, 1972, New York, Herder and Herder.
Michael R. Anderson : *Islamic Law and the Colonial Encounter in British India* 1996
Morris Edmund Speare : *The Political Novel: It's Development in England and America*, 1924, New York: Oxford University Press.
M.V. Ramanrao : *A Short History of the Indian National Congress*, 1st Edition, 1959,

Dhaka University Institutional Repository

Nalini Bhushan
and Garfield, Jay L. Ed. : *Indian Philosophy in English : From Renaissance to Independence*, 2011, London: Oxford University Press.
Narendra Nath Law, : Studies in Ancient Hindu Polity (Based on the Arthasastra of Kautilya), v.i, 1914, LONGMANS, GREEN AND CO., Calcutta.
Ngugi Wa Thiong'o, : *Decolonising the Mind*, 2007, Word-view Publications, Delhi.
Partha Chatterjee : *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism*, 1998, Oxford (India), Oxford University Press.
Partha Chatterjee (Ed.) : *Texts of Power: Emerging Disciplines In Colonial Bengal Minneapolis*, 1995, University of Minnesota Press.
P. Spear : *The Twilight of the Mughals, Studies in LateMughal,* 1951, Delhi.
P. E. Roberts : *History of British India*, second edition, 1938, Oxford Press.
Pramod K. Nayar : *Frantz Fanon*, 2013, Routledge, London and New York.
Pulina Dasa (Editor) : *Report of the Indigo Commission, 1860*, 1992, Publication Bureau, University of North Bengal.
Ranajit Guha : *An Indian Historiography of India : A nineteenth-Century Agenda and its Implication*, 1988, K P Bagchi & Company, Calcutta, Delhi
Rachel Van M. Baumer (Editor) (1975) : *Aspects of Bengali. History and Society* (Asian studies at Hawaii; no. 12). THE UNIVERSITY PRESS OF HAWAII
Rafiuddin Ahmed : *The Bengal Muslim: 1871-1906*; 1998, Oxford India Paperbacks.
Richard Snyder, Foreword, : *The Political Novel, Joseph Blotner,*
R. Samasastry, (trans.by Dr. J.F. Fleet) : *Kautilya's Arthasastra*, 1975, Bangalore.
Richard Snyder, Foreword, : *The Political Novel, Joseph Blotner,*
R. Samasastry, (trans.by Dr. J.F. Fleet) : *Kautilya's Arthasastra*, 1975, Bangalore.
Robert J. C. Young, : *Postcolonilism: A very Short Introduction*, 2003, London: Oxford University Press.
Robert Tucker : *The Marx-Engels Reader* (2nd Edition), 1975, New York, Princeton University Press.
Sarah Harasym (Ed.) : *The Postcolonial Critic: Interviews,Strategies, Dialogues,* G. Chakravorty, Spivak, 1990, New York.
Shail Marayam : *Against History, Against State:Counterperspectives from the Margins*, 2004, Columbia: Columbia University Press.
Sir Jodunath Sarkar : *The History of Bengal*, vol-ii, Edited by, The University of Dacca, 1976.
Sumit Sarkar : *Rammohun Roy and the Break with the Past*
S.K. Chatterji : *Languages and Literature in modern India*, 1963, Calcutta.
Syed Golam Hossain : *Seir Mutaquerin* (View of Modern Times), vol. I, 1783,Calcutta.
V.I. Lenin, : *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*, 1947, Foreign Languages Publishing House, Moscow.

Dhaka University Institutional Repository

W.K. Firminger : *Historical Introduction to the Bengal Portion of the fifth report* (Indian Studies Edition), 1962, Calcutta.

William Dalrymple : `*The East India Company: The Original Corporate Raiders'*, in The Guardian Newspaper, 2015

W.W. Hunter : *Annals of Rural Bengal*, Third edition, 1868, London, Smith Elder and Co.

পত্রিকাপঞ্জি

নতুন দিগন্ত, সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা-২০১৯

নান্দীপাঠ, সংখ্যা: ছয়।। ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।

অন্তর্দেশ, সংখ্যা : প্রথম বর্ষ বসন্ত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০১৫

একবিংশ, সংখ্যা : ৩০, ডিসেম্বর ২০১৬

একবিংশ , সংখ্যা : ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬

উলুখাগড়া বর্ষ ১, সংখ্যা ২, নভেম্বর, ২০০৫

গল্পকথা ৫, বর্ষ ৪ সংখ্যা ৫, মাহমুদুল হক সংখ্যা

গল্পকথা ৭, বর্ষ ৬ সংখ্যা ৭, শওকত আলী সংখ্যা

দীপন ৭, রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২৩, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা

নান্দীপাঠ, সংখ্যা : আট, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

হালখাতা, সংখ্যা: ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১০, বাংলা উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা

হালখাতা, সংখ্যা: ৮ম বর্ষ ২য় ও ৩য় যৌথসংখ্যা, এপ্রিল- সেপ্টেম্বর ২০১৪, বাঙালি মুসলমান সংখ্যা

হালখাতা, সংখ্যা: ১২তম, বর্ষ ২য় ও ৩য় যৌথসংখ্যা, এপ্রিল- সেপ্টেম্বর ২০১৮, বাঙালি মুসলমান সংখ্যা : দুই

Karl Marx; The British Rule in India, New-York Daily Tribune, 25 June 1853

Karl Marx, The Future Results of British Rule in India, New York Daily Tribune, 3 August 1853

Peary Chand Mitra, "*Notes on Early Commerce in Bengal*" The Calcutta Review, vol. lxxii. (1881)